বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

১০ ডিসেম্বর ২০১৬

পি-এইচ.ডি. গবেষক

মো. আনিসুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বাবদ্যালয়
রেজি. নং – ১৮০

শিক্ষাবর্ষ- ২০১২-২০১৩

তত্ত্বাবধায়ক

ড. প্রদীপ কুমার রায়
প্রফেসর
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, “বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, উপর্যুক্ত শিরোনামে কেউ কোনো গবেষণা কর্ম ইতোপূর্বে করেননি। আমি পি-এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ দেশি-বিদেশি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোনো জার্নালে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

মো. আনিসুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে “বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি গবেষক মো. আনিসুজ্জামানের মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই গবেষণা কর্মটি তিনি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করেছেন। আমার জানা মতে, তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোনো প্রতিষ্ঠানে বা কোনো প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করেননি।

ড. প্রদীপ কুমার রায়
তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পিতা মরহুম আফছর আলী

যিনি এই গবেষণা কর্মটি কখনোই পড়তে পারবেন না

আমার মানসিক মানবিক বিপর্যয়ে

যিনি সাহস ও শক্তি যোগান।

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র---১

প্রত্যয়নপত্র ---২

উৎসর্গ ---৩

অবতরণিকা ---৫

প্রথম অধ্যায় : প্রস্তাবনা ---৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ও বাঙালি --১৯

তৃতীয় অধ্যায় : বাঙালির দর্শনচিন্তার ইতিহাস -------------------------------৪১

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলার রেনেসাঁ ও বাঙালির দর্শন -----------------------------৬৪

পঞ্চম অধ্যায় : বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা -----------------৮৪

ক) খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (১৮৭৩ - ১৯৬৫) ---------------------------------৮৫

খ) মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮ - ১৯৭৪) ------------------------------------১০৭

গ) আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০ - ১৯৮৫) -----------------------------------১২৮

ঘ) আবুল হাশিম (১৯০৫ - ১৯৭৪) --১৭১

ঙ) দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬ -১৯৯৯) -------------------------------২০১

চ) সাইদুর রহমান (১৯০৯ - ১৯৮৭) --২১৯

ছ) আহমদ শরীফ (১৯২১ - ১৯৯৯) ---২৫০

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার --২৯৩

গ্রন্থপঞ্জি -- ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

আবহমানকালে বাংলাদেশের মানুষ জগৎ-জীবন এবং জগৎ ও জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। এই ধারা আজও অব্যাহত। জীবন ও জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণতি সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই দেশের মানুষ করেছে ধর্মের আবরণে, কখনো বা বৌদ্ধিক উপায়ে, কখনো ধর্ম ও বৌদ্ধিক ভাবধারা সমন্বিত করে। তাঁদের এই আলোচনায় কখনো প্রাধান্য পেয়েছে জ্ঞানতত্ত্ব, কখনো অধিবিদ্যা, আবার কখনো মূল্যবিদ্যা। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কোনো কোনো পণ্ডিত দর্শনের এই তিন ধারা নিয়েই আলোচনা করছেন।

জগতের উৎপত্তি, পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গ্রিক দার্শনিকেরা পানি, বায়ু, অগ্নি, সংখ্যা ইত্যাদির কথা বলেছেন। ভারতীয় দর্শনে জগৎ এবং জীবনের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের কথা পাওয়া যায়। লোকায়ত, বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা দর্শনের চর্চা ভারতবর্ষে হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের সমসায়য়িক ভারতীয় দার্শনিক অজিত কেশ কম্বলী মনে করেন, জীব মাটি, জল, উত্তাপ, বায়ু এবং শূন্যতা এই পঞ্চ ভূতের সমষ্টি– মৃত্যুর পর এগুলো নিজ নিজ স্থানে চলে যায়। পকুধ কচ্চায়নের মতে, জগতের সবকিছু শ্বাশ্বত ও অব্যয়, পর্বত-চূড়ার ন্যায় স্থির ও দৃঢ়। তিনি মনে করেন, জীব ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ, সুখ, দুঃখ এবং জীব এই সাত ভূতের সমষ্টি। রামায়ণের জাবালি মুনি, হরিবংশের রাজা বেণ, ভাগুরিসহ অনেকে ছিলেন বস্তুবাদী চিন্তার আদি প্রণেতা। হরিসেনের *বৃহৎকথাকোষ* গ্রন্থে বর্ণিত আছে পুন্ড্রবর্ধনের জৈন দার্শনিক ভদ্রবাহু ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শিক্ষাগুরু। ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলী পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

ন্যায় দর্শনের ইতিহাস প্রাচীন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন প্রাক-বৌদ্ধযুগে ন্যায় দর্শনের সূচনা হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ন্যায় দর্শনের মূলনীতিগুলো নির্ধারিত হয়। মহর্ষি গৌতমের *ন্যায়সূত্র* ন্যায়দর্শনের প্রথম গ্রন্থ। উদয়নাচার্যের সময় ন্যায়দর্শনের চরম বিকাশ ঘটে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে গাঙ্গেশ উপাধ্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থকে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়দর্শনের সূচনা হয়। বাংলাদেশে ন্যায় এবং নব্যন্যায় দর্শনের চর্চা হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে বাসুদেব সার্বভৌমের নেতৃত্বে নব্যন্যায়ের নতুন যুগের সূচনা হয়। লক্ষণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ শৈব, বৈষ্ণব, মীমাংসা দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মহাবিশেষজ্ঞ চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের জন্ম ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, যশোর ও খুলনা জেলায় নব্যন্যায়ের চর্চা বেশি হয়েছে। দেশের প্রায় সর্বত্রই নব্যন্যায়ের স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৫শ শতাব্দী থেকে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে নব্যন্যায়ের চর্চা হয়েছে। হরিদাশ ন্যায়ালঙ্কার, ষোল শতকের রঘুনাথ শিরোমণি, কণাদ তর্কবাগীশ এবং সতেরো শতকের জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং জয়রাম পঞ্চানন, হরিনাম তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন নব্যন্যায়পন্থী

বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত। কোটালীপাড়ার রামচন্দ্র তর্কবাগীশ নব্য নৈয়ায়িক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের নারীরাও দর্শনচর্চা থেকে পিছিয়ে ছিল না। আঠারো শতকে গোপালগঞ্জের বৈজয়ন্তী দেবী ও প্রিয়ম্বদা দেবী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রিয়ম্বদা দেবী মীমাংসা দর্শনে খ্যাতি-লাভ করেছিলেন।

বাংলাদেশে যে বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা হয়েছে তার প্রমাণ সোমপুর মহাবিহার। এই মহাবিহার ছিল বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন চর্চার কেন্দ্রস্থল। বোধিভদ্র এই বিহারে বাস করতেন। অতীশ দীপঙ্কর কিছুদিন সোমপুরে ছিলেন। জগদ্দল মহাবিহার, পণ্ডিত বিহার, ভাসু বিহার, সীতাকূট বিহার, শালবন বিহার শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। সমতটের শীলভদ্র এবং বিক্রমপুরের অতীশ দীপঙ্কর মহাযানপন্থী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহাযান মতবাদ পরবর্তীকালে বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান, সহজযান এবং কালচক্রযানে রূপান্তরিত হয়ে চর্যাপদে রূপলাভ করে। বজ্রযান, কালচক্রযান এবং সহজযানে নাগার্জুনের শূন্যতত্ত্ব বিশেষ স্থান লাভ করেছে। চর্যাপদে সহজযান মতবাদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। শূন্যতা, তথতা এবং সংবৃতি ইত্যাদি দার্শনিক ধারণাগুলো চর্যাপদে পাওয়া যায়।

সুলতানি এবং নবাবি আমলকে বাংলাদেশে মধ্যযুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মধ্যযুগের কিছু আগে আরব বিশ্বের সুফি-সাধকরা এদেশে এসেছেন, স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। পারস্যের সুফিরাও এদেশে এসেছেন। সুফি-সাধকদের চিন্তার সঙ্গে দেশীয় উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় বঙ্গীয় সুফিবাদ। মধ্যযুগে বাংলার সুফিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে জীবন জিজ্ঞাসা, নৈতিকতা, সমাজে মানুষের অবস্থান ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্নাদির উপস্থিতি দেখা যায়। ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষ বিজয়*, মীর সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞান চৌতিশা*, হাজী মুহম্মদের *নূরনামা*, মোহসেন আলির *মোকাম-মঞ্জিল কথা*, শেখ মনসুরের *সির্নামা*, শেখ জাহিদের *আদ্যপরিচয়* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থের মধ্যে বাংলার সুফি শাস্ত্রের বিবরণ ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। হাজী মুহম্মদের *নূরনামা* গ্রন্থে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের গ্রন্থ পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালি সুফি-সাধকদের এসব গ্রন্থের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, শূন্যতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, জীবন জিজ্ঞাসা গুরুত্বের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের কাব্যে পরিণামতাত্ত্বিক নীতিশাস্ত্র, মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা, দাম্পত্য নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষমূলক নীতিশাস্ত্র, বৈঠকী নীতিশাস্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের দার্শনিকেরা পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় দর্শনের অনুপ্রেরণায় দর্শন চর্চা করলেও তাঁদের দর্শনচিন্তা বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ প্রভাবিত ছিল। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙালি দার্শনিকের দর্শনচিন্তায় পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবের চেয়ে বেদান্ত দর্শনের অনুসরণ বেশি দেখা যায়। পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন অধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ এই নীতি দ্বারা রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভাবিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন 'জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন'। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা দিয়ে প্রভাবিত হলেও কোরান এবং হাদিস থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটেনি। কোরান এবং হাদিসকে মূলভিত্তি হিসাবে ধরে মুসলিম দার্শনিকেরা দর্শনচর্চা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বশীল মুসলিম চিন্তাবিদ নবাব আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তায় উপযোগবাদের প্রভাব দেখা গেলেও কোরান এবং হাসিদই ছিল তাদের চিন্তার উৎস। সৈয়দ আমীর আলীর *The Spirit of Islam, A Short History of the Saracens, The Ethics of Islam.* ইত্যাদি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ইসলামী চেতনা লক্ষ্য করা যায়। এম এন রায়ের নেতৃত্বে এদেশে মার্কসবাদের চর্চা শুরু হয়। মার্কসবাদী দর্শন ও সাহিত্য চর্চায় কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ, অবণী মুখার্জী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিশেষ অবদান রাখেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গুরুদাস চ্যাটার্জী, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামকমল ভট্টাচার্য প্রমুখের চেষ্টায় কলকাতায় 'পজিটিভিস্ট ক্লাব' গড়ে উঠেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রত্যক্ষবাদ দিয়ে প্রভাবিত হয়ে *বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভাববাদী দার্শনিক শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হিউমের সংশয়বাদ এবং স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। তাঁর দর্শনচিন্তায় শঙ্করাচার্য এবং বুদ্ধের চিন্তার মিশ্রণ দেখা যায়।

লালন এবং হাছন রাজা বাংলাদেশের দুইজন মৌলিক দার্শনিক। লালনের দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা রয়েছে। হাছন রাজার গানেও অধিবিদ্যক বিষয়গুলো বিদ্যমান। জ্ঞানবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলোও হাছন রাজার গানের মধ্যে রয়েছে। সহমরণ প্রথা এবং হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমন্বয় লালন দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন;
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম;
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খযবয় বদবয়।

হাছন রাজার এই গানটি উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই - সেটি এই যে ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্ব সত্য।'

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় দর্শনের মিথস্ক্রিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শনচর্চা শুরু হয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের চিন্তার জগতে ধর্মের উপস্থিতি বেশি। কোরান এবং হাদিসকে মূলভিত্তি হিসাবে ধরে বিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো বাঙালি মুসলিম দার্শনিক দর্শনচর্চা করেছেন। জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তায় দেখা যায়। দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলোতে বাঙালি মুসলমানেরাও অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। "বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা" অভিসন্দর্ভে প্রতিনিধিত্বশীল বিশিষ্ট সাতজন বাঙালি মুসলিম দার্শনিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, আরজ আলী মাতুব্বর, আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সাইদুর রহমান এবং আহমদ শরীফের জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ আবুল হাশিম এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শনচিন্তায় ধর্মের প্রভাব বেশি। আরজ আলী মাতুব্বর এবং আহমদ শরীফ ধর্মনিপেক্ষ বস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবে পরিচিত, সাইদুর রহমানের দর্শনচিন্তায় বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার সুযোগদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যাঁরা আমাকে এই অভিসন্দর্ভ রচনার অনুমতি দান করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আইবিএস লাইব্রেরি, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, ইতিহাস এবং বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি থেকে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেখে দেয়া এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সংশোধনী করে দিয়েছেন এই অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. প্রদীপ কুমার রায়। আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনার সময় দিকনির্দেশনা দিয়ে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আমার স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রতীতি শিরীন এই গবেষণা কর্ম তরান্বিত করার জন্য বারবার তাগদা দিয়ে কাজটি দ্রুত শেষ করতে সহযোগিতা করেছেন।

মো. আনিসুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা

পি-এইচ.ডি. গবেষক

মো. আনিসুজ্জামান

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বাবদ্যালয়

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক ভূগোলে স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। কিন্তু ভূখণ্ডটি প্রাচীন এবং প্রাচীনকালে বাংলাদেশে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে। এই মানুষ জীবন ও জগতের উদ্ভব, পরিণতি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। মধ্যযুগেও এই অঞ্চলের মানুষ জীবন এবং জগতকে জানার চেষ্টা করেছে। আজও উপর্যুক্ত ধারা অব্যাহত। জীবন ও জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং পরিণতি সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এ দেশের মানুষ করেছে ধর্মের আবরণে, কখনো বা বৌদ্ধিক উপায়ে, কখনো ধর্ম ও বৌদ্ধিক ভাবধারা সমন্বিত করে। তাঁদের এই আলোচনায় কখনো প্রাধান্য পেয়েছে জ্ঞানতত্ত্ব, কখনো অধিবিদ্যা, আবার কখনো মূল্যবিদ্যা। কোনো কোনো পণ্ডিত দর্শনের উপর্যুক্ত তিন ধারা নিয়েই আলোচনা করেছেন।

জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারতবর্ষে লোকায়ত, বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায় এবং মীমাংসা দার্শনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশেও লোকায়ত, বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায় এবং মীমাংসা দর্শনের চর্চা হয়েছে। লোকায়ত দর্শন বস্তুবাদী। ভারতীয় দর্শনে ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূতের সাহায্যে জগৎ - জীবনের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রামায়ণের জাবালি মুনি, হরিবংশের রাজা বেণ, গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক অজিত কেশকম্বল, পকুধ কচ্চায়ন জড়বাদী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গ্রিক দার্শনিকেরাও জগতের আদি উপাদান হিসাবে পানি, বায়ু, অগ্নি, সংখ্যা ইত্যাদির কথা বলেছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ। সোমপুর মহাবিহারে বোধিভদ্র বাস করতেন। অতীশ দীপঙ্কর কিছুদিন সোমপুরে ছিলেন। জগদ্দল মহাবিহার, পণ্ডিত বিহার, ভাসু বিহার, সীতাকূট বিহার, শালবন বিহার শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। সমতটের শীলভদ্র এবং বিক্রমপুরের অতীশ দীপঙ্কর মহাযানপন্থী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহাযান মতবাদ পরবর্তীকালে বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান, সহজযান এবং কালচক্রযানে রূপান্তরিত হয়ে চর্যাপদে রূপলাভ করে। বজ্রযান, কালচক্রযান এবং সহজযানে নাগার্জুনের শূন্যতত্ত্ব বিশেষ স্থান লাভ করেছে। চর্যাপদে সহজযান মতবাদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। শূন্যতা, তথতা এবং সংবৃতি ইত্যাদি দার্শনিক ধারণাগুলো

Dhaka University Institutional Repository

চর্যাপদে পাওয়া যায়। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে বৌদ্ধ দর্শনের বিকাশের ধারায় যুক্তিবিদ্যা এবং দ্বান্দ্বিক মতবাদের যে বিকাশ ঘটেছিল তা ছিল যথেষ্ট উন্নতমানের।

ন্যায় ও মীমাংসা দর্শনের চর্চা হয়েছে বাংলাদেশে। প্রায় পাঁচশত বৎসর বাংলাদেশে ন্যায় এবং নব্যন্যায় দর্শনের চর্চা হয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন ভারতবর্ষে প্রাক-বৌদ্ধযুগে ন্যায় দর্শনের সূচনা হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ন্যায় দর্শনের মূলনীতিগুলো নির্ধারিত হয়। মহর্ষি গৌতমের *ন্যায়সূত্র* ন্যায়দর্শনের প্রথম গ্রন্থ। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে গাঙ্গেশ উপাধ্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থকে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়দর্শনের সূচনা হয়। বাংলাদেশে নব্যন্যায় চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন বাসুদেব সার্বভৌম। পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের জন্ম। বাসুদেবের পিতা নরহরি বিশারদ ভট্টাচার্য নবদ্বীপে নৈয়ায়িক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পিতার কাছে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে পক্ষধর মিশ্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সার্বভৌম উপাধি লাভ করেন। লক্ষণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ শৈব, বৈষ্ণব, মীমাংসা দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মহাবিশেষজ্ঞ চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের জন্ম ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, যশোর ও খুলনা জেলায় নব্যন্যায়ের চর্চা বেশি হয়েছে। হরিদাশ ন্যায়ালঙ্কার, ষোল শতকের রঘুনাথ শিরোমণি, কণাদ তর্কবাগীশ এবং সতেরো শতকের জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং জয়রাম পঞ্চানন, হরিনাম তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন নব্যন্যায়পন্থী বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত। কোটালীপাড়ার রামচন্দ্র তর্কবাগীশ নব্য নৈয়ায়িক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের নারীরাও দর্শনচর্চা থেকে পিছিয়ে ছিল না। আঠারো শতকে গোপালগঞ্জের বৈজয়ন্তী দেবী ও প্রিয়ম্বদা দেবী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রিয়ম্বদা দেবী মীমাংসা দর্শনে খ্যাতি-লাভ করেছিলেন।

মধ্যযুগে বাংলার সুফিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে জীবন জিজ্ঞাসা, নৈতিকতা, সমাজে মানুষের অবস্থান ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্নাদির উপস্থিতি দেখা যায়। ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষ বিজয়*, মীর সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞানপ্রদীপ*, *জ্ঞান চৌতিশা*, হাজী মুহম্মদের *নূরনামা*, মোহসেন আলির *মোকাম-মঞ্জিল কথা*, শেখ মনসুরের *সির্নামা*, শেখ জাহিদের *আদ্যপরিচয়* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থের মধ্যে বাংলার সুফি শাস্ত্রের বিবরণ ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। হাজী মুহম্মদের *নূরনামা* গ্রন্থে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের গ্রন্থ পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালি সুফি-সাধকদের এসব গ্রন্থের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, শূন্যতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, জীবন জিজ্ঞাসা গুরুত্বের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের কাব্যে পরিণামতাত্ত্বিক নীতিশাস্ত্র, মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা, দাম্পত্য নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষমূলক নীতিশাস্ত্র, বৈঠকী নীতিশাস্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন জনপ্রিয় করেন। সংস্কৃত ভাষায় মাত্র আটটি শ্লোকের মাধ্যমে তিনি বিধৃত করেন তাঁর প্রেমাত্মক মানবতাবাদী দর্শন। চৈতন্যদেবের অনুসারীরা তাঁর ভক্তি

প্রেম ও বাণীকে সংগ্রহ করে *চৈতন্য ভাগবত*, *চৈতন্য চরিতামৃত*, *চৈতন্য মঙ্গল* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্যদেবের দর্শন চিন্তায় মাধ্বাচার্য, বল্লভ ভট্ট, রামানুজ, বৌদ্ধ ও সুফি দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর মতে জীবাত্মা ও জগৎ পরস্পর ভিন্ন কিন্তু ঈশ্বর সাথে সম্বন্ধ সাপেক্ষে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

চৈতন্যদেবের অন্যতম শিষ্য সনাতন, রূপ এবং জীব গোস্বামীর গ্রন্থগুলো অবলম্বন করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে। জীব গোস্বামীর *তত্ত্ব-সন্দর্ভ*, *ভগবৎ-সন্দর্ভ*, *পরমাত্মা-সন্দর্ভ*, *কৃষ্ণ-সন্দর্ভ*, *ভক্তি-সন্দর্ভ* ও *প্রীতি-সন্দর্ভের* মধ্যে দিয়েই প্রধানত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল মতবাদ তথা রাধাবাদের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এছাড়া গোস্বামীদের গ্রন্থাবলিতে পৌরাণিক তত্ত্ব, দর্শন, কান্তিবিদ্যা এবং ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের অনুপ্রেরণায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি দার্শনিকেরা দর্শনচিন্তা করলেও বেদ-বেদান্ত, উপনিষদের দর্শন দিয়ে তাঁরা প্রভাবিত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙালি দার্শনিকের দর্শনচিন্তায় পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবের চেয়ে বেদান্ত দর্শনের অনুসরণ বেশি দেখা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী দর্শন অধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ - এই নীতি দ্বারা রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভাবিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন 'জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন'। তাঁর এই মত শঙ্করাচার্যকে সমর্থন করে না, কিন্তু হেগেলের মতকে সমর্থন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাংখ্য দর্শন' পড়লে তাঁকে ভারতীয় দার্শনিক হিসাবেই অভিহিত করতে হয়। আবার 'চিত্তশুদ্ধি,' 'ভালবাসার অত্যাচার,' 'মনুষ্যত্ব কি' এসব প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হলেও কোরান এবং হাদিস থেকে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটেনি। কোরান এবং হাদিসকে মূল ভিত্তি হিসাবে ধরে মুসলিম দার্শনিকেরা দর্শনচর্চা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বশীল মুসলিম চিন্তাবিদ নবাব আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তায় উপযোগবাদের প্রভাব দেখা গেলেও কোরান এবং হাসিদই ছিল তাদের চিন্তার উৎস। এম এন রায়ের নেতৃত্বে এদেশে মার্কসবাদের চর্চা শুরু হয়। মার্কসবাদী দর্শন ও সাহিত্য চর্চায় কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদ, অবণী মুখার্জী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিশেষ অবদান রাখেন। কাজী নজরুল ইসলাম কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ না করলেও তাঁর রচনার মধ্যে মার্কসীয় সাম্যবাদের প্রভাব দেখা

যায়। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক মতবাদের চেয়ে নজরুলের চিন্তায় সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বেশি। উপলব্ধির সাহায্যে তিনি সমাজের শোষণ বঞ্চনার অবসান চেয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভাববাদী দার্শনিক শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হিউমের সংশয়বাদ এবং স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন।

লালন এবং হাছন রাজা বাংলাদেশের দুইজন মৌলিক দার্শনিক। লালনের দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা রয়েছে। যদিও অধিবিদ্যক বিষয়গুলো লালনের দর্শনে প্রধান উপজীব্য তথাপি জ্ঞানবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা লালনের গানের অন্যতম বিষয়। হাছন রাজার গানেও অধিবিদ্যক বিষয়গুলো বিদ্যমান রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে দর্শনচর্চা শুরু হয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের চিন্তার জগতে ধর্মের উপস্থিতি বেশি। কোরান এবং হাদিসকে মূলভিত্তি হিসাবে ধরে বিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো বাঙালি মুসলিম দার্শনিক দর্শনচর্চা করেছেন। “বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভে প্রতিনিধিত্বশীল বিশিষ্ট সাতজন বাঙালি মুসলিম দার্শনিক খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, আরজ আলী মাতুব্বর, আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সাইদুর রহমান এবং আহমদ শরীফ - এর জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দার্শনিক খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। জ্ঞানবিদ্যায় তিনি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। তবে চূড়ান্ত জ্ঞানের জন্য স্বজ্ঞার বিকল্প কিছু নেই বলে তিনি মনে করেন। খান বাহাদুর আহ্‌ছানউল্লাহর স্বজ্ঞাবাদ হেনরি বার্গসোঁর স্বজ্ঞাবাদ থেকে ভিন্ন। হেনরি বার্গসোঁ স্বজ্ঞার সাহায্যে জ্ঞানলাভের কথা বলেছেন। খান বাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা স্বজ্ঞার সাহায্যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে মিল দেখতে চেয়েছেন। স্বজ্ঞার সাহায্যে তিনি পরমসত্তার উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। অধিবিদ্যার অন্যতম বিষয় ঈশ্বর, আত্মা নিয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। সুফিবাদ দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মনে করেন পরমাত্মা থেকেই জীবাত্মার সৃষ্টি। জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলতে চায়। অধিবিদ্যার বিষয়গুলোতে তিনি যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লার দর্শনে যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস প্রবল। বিশ্বাসের পথ

ধর্মের আর দর্শনের পথ যুক্তির। খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লার দর্শনচিন্তায় যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসের গুরুত্ব বেশি। তিনি যুক্তি দিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করতে চেয়েছেন। দর্শনের অন্যতম শাখা মূল্যবিদ্যায় তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন ধরনের শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহই প্রথম দর্শনের পরিভাষা এবং দার্শনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চা শুরু করেন। জ্ঞানতত্ত্বে বরকতুল্লাহ যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা বলেছেন তা স্বজ্ঞারই নামান্তর। বরকতুল্লাহ ছিলেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী। শেষ জীবনে তিনি ইসলামিক আদর্শকে বড় করে তুলে ধরেছেন। অতীন্দ্রিয় সত্তাকে প্রমাণের জন্যই তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন। বরকতুল্লাহর মতে স্রষ্টা বিশ্বের আদি কারণ। নীতিচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা এবং সমাজচিন্তায় তিনি বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। সমাজচিন্তায় দেখা যায় মোহম্মদ বরকতুল্লাহ কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণও করেন নি আবার বর্জনও করেন নি। তিনি শোষণ মুক্তির জন্য সমতাবাদের কথা বলেছেন। বিজ্ঞান এবং ধর্মের পথ ভিন্ন। বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর, ধর্ম বিশ্বাস নির্ভর। উভয়ের পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন। মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দর্শনে ভিন্নমুখী দুটি বিষয়ের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস দেখা যায়।

আরজ আলী মাতুব্বর বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের একজন মৌলিক বাস্তববাদী মুসলিম দার্শনিক। জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তিনি কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছেন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব অভিজ্ঞতাভিত্তিক। তিনি মনে করেন অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমাদের জ্ঞান হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা প্রত্যক্ষ করা যায় তাই জ্ঞানের উপাদান। কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকলে সে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না বলে আরজ আলী মাতুব্বর মনে করেন। ইউরোপের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক, বার্কলী, হিউম জ্ঞানের উৎস হিসাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান সমাজের কি কাজে লাগে তা তাঁরা বলেন নি। আরজ আলী মাতুব্বরের মতে, অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান দিয়ে সমাজের কুসংস্কার দূর করা সম্ভব। অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয়গুলো নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলে এগুলোকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। ধর্মকে তিনি বর্জন করেননি। কিন্তু ধর্মের মধ্যে কুসংস্কারকে তিনি বর্জন করেছেন। ধর্মের প্রভাবমুক্ত হয়ে তিনি স্বাধীনভাবে মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর দর্শন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। ফলে তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী দার্শনিক হিসেবে অভিহিত করা যায়। তিনি কুসংস্কার মুক্ত একটি সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। এই সমাজ নির্মাণের জন্য তিনি কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভাববাদী দার্শনিক আবুল হাশিম ছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক নেতা। বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য তিনি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হিসাবে আবুল হাশিম অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি ইন্দ্রিয় সংবেদনমূলক জ্ঞানকে বর্জন করেছেন। তিনি বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞার সংমিশ্রণ করেছেন। স্বজ্ঞাকে বুদ্ধির উপর স্থান দিয়েছেন। আবুল হাশিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের সাথে আল-গাযালীর জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের মিল পাওয়া যায়। আল-গাযালীর মতে, অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান হচ্ছে উচ্চস্তরের জ্ঞান। আবুল হাশিমও অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞানকে উচ্চস্তরে স্থান দিয়েছেন। আবুল হাশিমের মতে, কুরআনের জ্ঞানই সর্বোচ্চ জ্ঞান। জ্ঞানতত্ত্বে স্বজ্ঞাবাদের সাহায্যে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। তিনি রাজনীতি করেছেন অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের জন্য। কিন্তু তিনি গণতন্ত্র পছন্দ করতেন না। গণতন্ত্রকে তিনি নাসিকা গণনার পদ্ধতি বলে উপহাস করেছিলেন।

বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনায় দেখা যায় তিনি ইসলামী দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসাবে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দিলেও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন বোধিলব্ধ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে স্বজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন ইসলামের একেশ্বরবাদ সমর্থন করার জন্য। অধিবিদ্যার বিষয় ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল ইত্যাদি নিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার প্রকাশ। আল্লাহ শুধু মানুষ সৃষ্টি করেননি এ দুনিয়াও সৃষ্টি করেছেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দার্শনিক হিসাবে অভিহিত করা যায়। ধর্মের অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি স্বাধীন মতপ্রকাশে এবং মুক্ত মনে চিন্তা করতে সক্ষম হন নি। তাঁর দর্শনচিন্তা ধর্মমুক্ত নয়। ধর্মীয় আবরণে তিনি চিন্তা করেছেন এবং ধর্মকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক সাইদুর রহমান তাঁর দর্শনের নাম দিয়েছিলেন কল্যাণ দর্শন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় কল্যাণভিত্তিক সমাজ নির্মাণের কথা উঠে এসেছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে তিনি সংশয়বাদ গ্রহণ করেছেন সত্যকে জানার জন্য। রেনে দেকার্ত সত্যকে জানার জন্য সংশয়কে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সাইদুর রহমান কুসংস্কার দূর করার জন্য সংশয়কে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। সংশয় না থাকলে প্রথা, কুসংস্কার নিয়ে প্রশ্ন উঠে না। আর প্রশ্ন না থাকলে সত্য জানা যায় না। সাইদুর রহমানের কল্যাণভিত্তিক সমাজ

নির্মাণের জন্যই সত্যকে জানা প্রয়োজন। সমাজের উন্নয়নের জন্য তিনি নারী স্বাধীনতার কথা বলেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি সমর্থন করেছেন। এ সবকিছুর মূলেই রয়েছে তাঁর কল্যাণ দর্শন – এই কল্যাণ মানুষের কল্যাণ।

আহমদ শরীফ বাংলাদেশের অন্যতম বাস্তববাদী দার্শনিক। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে তিনি সমাদৃত। তিনি মনে করতেন, যে জ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য নেই তা নিষ্ফল। আহমদ শরীফ মনে করেন জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের সৃষ্টি। যার জিজ্ঞাসা নেই তার কোনো জ্ঞান নেই। জিজ্ঞাসাহীন মানুষ অন্ধ। জিজ্ঞাসাহীন মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো কাজে আসে না। জিজ্ঞাসা কি এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন কার্যকারণকে জানার ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা। জ্ঞানের সাহায্যে তিনি সমাজের-রাষ্ট্রের কুসংস্কার দূর করে একটি যৌক্তিক সমাজ নির্মাণ করেছেন। অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মনে করতেন অধিবিদ্যা সমাজে কুসংস্কার সৃষ্টি করে। কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষ ভূত-প্রেতে বিশ্বাস রাখে। তাঁর মূল্যবিদ্যা আলোচনার সময় দেখা যায় তিনি বিজ্ঞানমনস্ক, শোষণমুক্ত আধুনিক একটি সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুসারী ছিলেন, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না। রাজনীতিকে তিনি দেখেছেন একাডেমিক দিক থেকে। তিনি বিশ্বাস করেন, গণমানুষের জীবন জীবিকার নিরাপত্তার জন্য সমাজতন্ত্রই এ পর্যন্ত একমাত্র মতবাদ হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। আহমদ শরীফ মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন।
বাঙালির দর্শন মানেই জীবন দর্শন। জীবন দর্শনের অপর নাম প্রায়োগিক দর্শন। মানুষকে সুস্থ-সুন্দরভাবে, স্বাধীনভাবে, মুক্তভাবে, যৌক্তিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য দর্শন। বাঙালি চিরকাল সুস্থ-সুন্দর এবং যৌক্তিকভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই বাঙালি সৃষ্টি করেছে শাস্ত্রের এবং দর্শনের। বাঙালির জীবনে ধর্ম একটি বড় বিষয়। কিন্তু ধর্মও সবসময় এক ছিল না। জীবনের প্রয়োজনে বাঙালি ধর্ম গ্রহণ করেছে আবার বর্জনও করেছে। প্রাচীন বাংলার ধর্ম এবং মধ্যযুগের বাংলার ধর্ম এক নয়। জীবনের প্রয়োজনে বাঙালির ধর্মীয় জীবনের পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের। কিন্তু বাঙালি ধর্মকে কখনো বর্জন করেনি। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শনচিন্তায় ধর্ম বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে তাঁদের দর্শনকে ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দর্শন হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এবং মোহম্মদ বরকতুল্লাহর ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদও ইউরোপীয় কিংবা ভারতীয় ভাববাদী দর্শন দিয়ে প্রভাবিত নয়। ইসলাম ধর্মের আলোকেই তাঁরা ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দর্শনের চর্চা

করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর এবং আহমদ শরীফ ধর্মনিপেক্ষ বস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবে পরিচিত, সাইদুর রহমানের দর্শনচিন্তায় বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বশীল বিশিষ্ট সাতজন বাঙালি মুসলিম দার্শনিকের দর্শনচিন্তায় আমরা ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাস্তববাদ এবং সমন্বয়বাদ দেখেছি। সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের জন্য বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেও মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলোতে তাঁরা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলোকে তাঁরা প্রায়োগিক অর্থে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা সবাই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে মানবের কল্যাণ সাধনের পরামর্শ দিয়েছেন। আলোচনা শেষে বলা যায় বাঙালির দর্শন মানেই প্রায়োগিক দর্শন। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের দর্শনও প্রায়োগিক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই ভূখণ্ড প্রাচীন। প্রাচীন আমল থেকে এই ভূখণ্ডে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন ছিল নদী কেন্দ্রিক। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন এসেছে। প্রাচীন আমলে বাংলাদেশ পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, কলিঙ্গ, রাঢ়, সমতট ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত ছিল। এই জনপদগুলোর নাম মূলত কৌম নাম। বিভিন্ন কৌমে বিভক্ত জনগোষ্ঠীর বাস ছিল বাংলাদেশে। এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মজীবনে বিভিন্ন দেবতা, উপদেবতার বিশ্বাস থেকে এর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদের মানুষ জীবন ও জগতের উৎস, বৈশিষ্ট্য এবং পরিণতি নিয়ে চিন্তা করেছে। মধ্যযুগেও এই অঞ্চলের মানুষ জীবন এবং জগতকে জানার চেষ্টা করেছে। জীবন, জগতের উৎস, বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এদেশের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদের আশ্রয় নিয়েছে। ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ দিয়ে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদ এবং ভাববাদী দর্শনের সমন্বয়ে সমন্বয়বাদী দর্শনের চর্চাও করেছে। বাঙালির যুক্তিবাদী এবং বিশ্লেষণী দর্শনচর্চার ইতিহাসও বেশ প্রাচীন। চার্বাকদের বিশুদ্ধ বস্তুবাদী দর্শনের চর্চা বাংলাদেশে হয়েছে। কাপালিকদের অনুসারিও ছিল বঙ্গদেশে। রামায়ণের জাবালি মুনি, হরিবংশের রাজা বেণ, ভাগুরিসহ অনেকে ছিলেন বস্তুবাদী চিন্তার আদি প্রণেতা। গৌতম বুদ্ধের সমসায়য়িক ভারতীয় জড়বাদী দার্শনিক অজিত কেশ কম্বলী, পকুধ কচ্চায়ান, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হরিসেনের *বৃহৎকথাকোষ* গ্রন্থে বর্ণিত আছে পুন্ড্রবর্ধনের জৈন দার্শনিক ভদ্রবাহু ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের শিক্ষাগুরু। ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলী পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

ন্যায় দর্শনের ইতিহাস প্রাচীন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন প্রাক-বৌদ্ধযুগে ন্যায় দর্শনের সূচনা হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ন্যায় দর্শনের মূলনীতিগুলো নির্ধারিত হয়। ন্যায় দর্শন দুইভাগে বিভক্ত। প্রাচীন ন্যায় এবং নব্যন্যায়। প্রাচীন ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মহর্ষি গৌতম এবং নব্যন্যায়ের প্রবর্তক হিসেবে দ্বাদশ শতকের গাঙ্গেশ উপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি গৌতমের *ন্যায়সূত্র* ন্যায়দর্শনের প্রথম গ্রন্থ। উদয়নাচার্যের সময় ন্যায়দর্শনের চরম বিকাশ ঘটে। ন্যায়দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা ও তর্কবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। নব্য ন্যায়দর্শনের সুচনা হয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে গাঙ্গেশ উপাধ্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশে ন্যায় এবং নব্যন্যায় দর্শনের চর্চা হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মহাবিশেষজ্ঞ চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের জন্ম ময়মনসিংহ জেলায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, যশোর ও খুলনা জেলায় নব্যন্যায়ের চর্চা বেশি হয়েছে। ১৫শ শতাব্দী থেকে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে নব্যন্যায়ের চর্চা হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে বাসুদেব সার্বভৌমের নেতৃত্বে নব্যন্যায়ের নতুন যুগের সূচনা হয়। হরিদাশ ন্যায়ালঙ্কার, ষোল শতকের রঘুনাথ শিরোমণি, কণাদ তর্কবাগীশ এবং সতেরো শতকের জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং জয়রাম পঞ্চানন, হরিনাম তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন নব্যন্যায়পন্থী বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত। কোটালীপাড়ার রামচন্দ্র তর্কবাগীশ নব্য নৈয়ায়িক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের নারীরাও দর্শনচর্চা থেকে পিছিয়ে ছিল না। আঠারো শতকে গোপালগঞ্জের বৈজয়ন্তী দেবী ও প্রিয়ম্বদা দেবী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রিয়ম্বদা দেবী মীমাংসা দর্শনে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

বাংলাদেশে যে বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা হয়েছে তার প্রমাণ সোমপুর মহাবিহার। পাল রাজাদের পৃষ্টপোষকতায় এই মহাবিহার ছিল বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন চর্চার কেন্দ্রস্থল। বোধিভদ্র এই বিহারে বাস করতেন। অতীশ দীপঙ্কর কিছুদিন সোমপুরে ছিলেন। সোমপুর মহাবিহারকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য করা হয়। জগদ্দল মহাবিহার, পণ্ডিত বিহার, ভাসু বিহার, সীতাকূট বিহার, শালবন বিহার শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। গুপ্ত যুগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। নালন্দায় দশ হাজার শিক্ষার্থী এবং ১৫০০ শিক্ষক ছিল। সপ্তম শতকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন শীল ভদ্র। তিনি ছিলে মহাযানপন্থী দার্শনিক। বিক্রমশীলা মহাবিহারে তিন হাজার শিক্ষার্থী এবং ১৪৪ জন অধ্যাপক ছিলেন। এই বিহারের আচার্য ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। বিক্রমপুরের অতীশ দীপঙ্কর মহাযানপন্থী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহাযান মতবাদ পরবর্তীকালে বজ্রযান এবং বজ্রযান সহজযানে এবং কালচক্রযানে রূপান্তরিত হয়ে বাংলাদেশে চর্যাপদে রূপলাভ করে। চর্যাপদের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে, শূন্যতা, তথতা, সংবৃত্তি প্রভৃতি দার্শনিক ধারণাগুলো রয়েছে। চর্যাকারদের পদগুলোতে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যক এবং মূল্যবিদ্যা রয়েছে।

মধ্যযুগে সুফিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে জীবন-জিজ্ঞাসা, নৈতিকতা, সমাজে মানুষের অবস্থান ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্নাদির উপস্থিতি দেখা যায়। এসব গ্রন্থের মধ্যে ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষ বিজয়*, মীর সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞানপ্রদীপ*, *জ্ঞান চৌতিশা*, হাজী মুহম্মদের *নূরনামা*, মোহসেন আলির *মোকাম-মঞ্জিল* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের কাব্যে পরিণামতাত্ত্বিক নীতিশাস্ত্র, দাম্পত্য নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষমূলক নীতিশাস্ত্র, বৈঠকী নীতিশাস্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যেযুগের বাংলায় যে শুধু মুসলিম কবিদের কাব্যের মধ্যে নীতিকথা ছিল তাই নয়, সে-সময় বৈষ্ণবধর্মেরও বিকাশ ঘটে। শ্রী চৈতন্যদেবের

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম দর্শন, রাধাতত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ মধ্যযুগে বাংলাদেশে বিকশিত হয়। সুফিদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শনের মিলনে সৃষ্টি হয় বাউল দর্শনের।

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের পদগুলোতে বৌদ্ধ সহজিয়া মতে প্রভাব দেখা যায়। চর্যাপদের কতগুলো পদের মধ্যে অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদগুলোতে বৌদ্ধ মহাযান তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ধর্মভাবনার প্রতিফলন রয়েছে। জন্ম মৃত্যু, সুখ দুখ ইত্যাদি জীবন জিজ্ঞাসা চর্যাপদে রয়েছে। ইংরেজদের আগমনের ফলে বাংলায় নতুন যুগের সূচনা হয়। ইংরেজদের সঙ্গে আসে তাদের বইপত্র। ইংরেজি ভাষায় রচিত বই, পত্রপত্রিকা এদেশের মানুষ পাঠ করে। ইউরোপের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের ইংরেজি জানা বাঙালিদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ফলে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দ্বিধাবিভক্ত বঙালি হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষায় তারা আলোকিত হয়। পিছিয়ে যায় বাঙালি মুসিলম। কিন্তু এরাও পুনরুজ্জীবন চায়। এদের মনে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু- মুসলিম দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের বাঙালির এই নতুন চেতনাকে বাংলার রেনেসাঁস বলা হয়।

বাংলায় রেনেসাঁসের আগে ইংল্যান্ডে রিফরমেশন হয়ে গেছে। ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট ভাগ হয়েছে। শিল্পবিপ্লব হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব হয়েছে। সেন্ট সাইমন, রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফুরিয়ের ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বাংলার নবজাগরণের নেতাদের মধ্যে অনেককে আকৃষ্ট করেছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষ নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। এ সময়েই ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদ, উপযোগবাদ দ্বারা অনেক বাঙালি চিন্তাবিদ প্রভাবিত ছিলেন।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ফসল হিসাবে বেশকিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সভা-সমিতি গড়ে ওঠে। ধর্মীয় এবং সমাজ সংস্কার প্রধান বিষয় হিসাবে দেখা দেয়। ইউরোপীয় চিন্তাচেতনার প্রভাবে এদেশেও মুক্তচিন্তার পরিবেশ গড়ে ওঠে। বাংলাভাষার আধুনিকায়ন হয় এসময়ই। জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষও ঘটে রেনেসাঁসের প্রভাবেই।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজে ডিরোজিও শিক্ষক হিসাবে যোগদান করার পর তাঁকে কেন্দ্র করে ইয়ংবেঙ্গল স্কুলের সূচনা হয়। ১৮২৮ সালে ডিরোজিও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে 'একাডেমিক এসোসিয়েসন' গঠন করেন।

'অধিক সংখ্যক মানুষের অধিক পরিমান সুখ'- উপযোগবাদী এই নীতির প্রবর্তক হলেন ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৮২)। বেন্থামের মতবাদ সমর্থন করেন, জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) ও জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)। জেমস মিল 'ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস'-এর সহকারী পরীক্ষক হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিলও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনের অনেক চিন্তাবিদ উপযোগবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। রামমোহন ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৩-১৮৮৪) চিন্তা-চেতনায় উপযোগবাদের ছাপ স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৯৪) চিন্তার জগতে প্রাচীন ভারতীয় উপাদান থাকলেও তাঁর মধ্যে উপযোগবাদী প্রবণতা দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাংখ্যদর্শন' পড়লে তাঁকে ভারতীয় দার্শনিক বলেই মনে হয়। আবার 'চিত্তশুদ্ধি', 'জ্ঞান', 'ভালবাসার অত্যাচার', 'মনুষ্যত্ব কি' পড়লে তাঁকে উপযোগবাদী বলা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উপযোগবাদী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অক্ষয়কুমার দত্ত অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ দিয়ে প্রভাবিত হয়ে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' করেছেন।

ইউরোপীয় প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের প্রভাবে উনিশ শতকে কলকাতায় পজিটিভিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গুরুদাস চ্যাটার্জী, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামকমল ভট্টাচার্য প্রমুখের তৎপরতায় কলকাতায় 'পজিটিভিস্ট ক্লাব' গঠিত হয়।

১৮৩৭ সালে ফার্সির স্থলে ইংরেজি রাজভাষা হওয়ায় সরকারি চাকরি এবং ইংরেজ প্রদত্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বাঙালি মুসলমানেরা বঞ্চিত হয়। মুসলিম নেতাদের মধ্যে নবাব আব্দুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৬) নাম সবার আগে আসে। তিনি মুসলিম সমাজকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদলে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য ইংরেজি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৬৪ সালে নবাব আব্দুল লতিফ কলকাতায় মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি, প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আবদুল লতিফের মতো সৈয়দ আমীর আলীও (১৮৪৮-১৯২৮) উপযোগবাদী নীতি অবলম্বন করে বাঙালি মুসলমান সমাজকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিমের চিন্তা-চেতনায় যুক্তিবাদী মতাদর্শ দেখা যায়। এ ধারার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন দেলওয়ার হোসেন (১৮৪০-১৯১৩)। এম. এন রায়ের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে মার্কসীয় দর্শনের চর্চা শুরু হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এম. এন রায়ের প্রথম দিকে সহযোগী ছিলেন মুজাফ্ফর আহমদ। কাজী নজরুল ইসলামও এদের সঙ্গে ছিলেন কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেননি। কিন্তু তাঁর দর্শন ও সাহিত্যে সাম্যবাদের ছাপ পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের লক্ষ্যে কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেন, আবদুল হক, আবদুল কাদির, আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজ 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে খ্যাত। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র বার্ষিকী সাময়িকপত্র 'শিখা' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে motto স্বরূপ মুদ্রিত হয়, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি

সেখানে আড়ষ্ঠ, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত 'শিখা'-এর পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

এ অঞ্চলের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শনচর্চার বিকাশ ঘটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সকল বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে দর্শন চর্চায় বিশেষ অবদান রাখেন তাদের মধ্যে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, কে. সি ভট্টাচার্য, হরিদাস ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র রায়, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কাজেমউদ্দিন আহমদ, মন্মথ মুখার্জী, ক্ষিরোদচন্দ্র মুখার্জী, ড. বিনয়েন্দ্রনাথ রায়, ড. মৌলভী মমতাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ দর্শনশাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান, জীবন ও জগৎ-এর সামগ্রিক রূপ ও কাঠামো সম্বন্ধে কিছু মৌলিক প্রশ্নের বিচারসম্মতভাবে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেছেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানের যৌক্তিক আলোচনাই তাঁদের দর্শন। ইউরোপীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও মূল্যবিদ্যার আলোকে বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানেরা দর্শনচিন্তা করেছে। ইউরোপীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানের উৎপত্তি, বৈধতা ও সীমা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে। জ্ঞানের জন্য জ্ঞাতা, জ্ঞেয়বস্তু ও জ্ঞানের উৎসকে স্বীকার করেছে ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়। এছাড়া ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব প্রমাণ ভিত্তিক। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে মানব জীবনে দুঃখ কষ্ট ও বেদনার সৃষ্টি হয় এমন কথাও ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায়। যথার্থ জ্ঞানই মানব জীবনের মুক্তির একমাত্র পথ।

জগতের মূল উপাদান, আত্মা, ঈশ্বর, দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতিক সত্তা নিয়ে অধিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়। ইংরেজি metaphysics শব্দের অর্থ করা হয়েছে, the branch of philosophy that deals with the nature of existence truth and knowledge. পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়গুলোকে অধিবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়।

মূল্যবিদ্যাকে আদর্শবিদ্যা, মানবিদ্যা বা Theories of Value নামে অভিহিত করা হয়। ব্যবহারিক দর্শনের আলোচনা মূল্যবিদ্যার আওতাভুক্ত। নীতিবিজ্ঞান, সৌন্দর্য দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, নারীবাদ নিয়ে মূল্যবিদ্যা আলোচনা করে। যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচনাও মূল্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দর্শনচর্চায় বিশেষ অবদান রাখেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫), আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪), দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯), সাইদুর রহমান (১৯০৯-১৯৮৭), আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) প্রমুখ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৮৯৫ সালে দর্শনে এম. এ ডিগ্রী অর্জনের পর দীর্ঘ সময় শিক্ষা বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে উপযোগবাদ স্থান পেয়েছে। তাঁর দর্শনচিন্তায় সুফিবাদের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর একটি গ্রন্থের নাম *ছুফী*। *সৃষ্টিতত্ত্ব* নিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অন্য একটি গ্রন্থ রয়েছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে তিনি বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু চূড়ান্ত জ্ঞানের জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করেছেন। এই পরিদৃশ্যমান অবভাসিক জগতের অন্তরালে কোন অদৃশ্য সত্তা, আত্মা, ঈশ্বর পরলোক ইত্যাদি আছে কি-না, থাকলে তার বৈশিষ্ট্য কি এধরনের প্রশ্নের উত্তর অধিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি অধিবিদ্যক বিষয় স্থান পেয়েছে। জ্ঞানের উৎস, বৈশিষ্ট এবং শর্ত সীমা নিয়েও তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন। ইসলাম ধর্মে সুপণ্ডিত হয়েও তিনি সকল ধর্মের মানুষের উন্নতি চেয়েছেন। তাঁর চিন্তা ও কর্মে মানবকল্যাণ বিশেষ স্থান দখল করে আছে। 'খোদার এবাদত বান্দার খেদমত' এর লক্ষ্যে তিনি ১৯৩৫ সালে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। মানবকল্যাণই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালির মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ যথার্থ দার্শনিক কলাকৌশল, যুক্তিমালা ও পরিভাষা সহকারে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। *মানুষের ধর্ম* গ্রন্থে বরকতুল্লার দর্শনভাবনার প্রকাশ ঘটেছে সুস্পষ্ট ও সূক্ষ্মতর সংবেদনায়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনি প্রথম দর্শনচর্চা করেছেন। তাঁর কৃতিত্ব এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের গণ্ডি অতিক্রম করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করার মধ্যে দিয়ে মহাজাগতিক রহস্য অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। জগৎ ও জীবন, জড়প্রকৃতি ও মনোজগৎ, আত্মা ও পরমাত্মা, ইহলোক ও পরলোক ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্ন বরকতুল্লাহ আলোচনা করেছেন। তাঁর এ ধরনের আলোচনা অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। মহাজাগতিক রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি ভাববাদের আশ্রয় নিয়েছেন। উপযোগবাদী নীতি অবলম্বন করে বরকতুল্লাহ সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ কামনা করেছেন। জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া হিসাবে বরকতুল্লাহ স্বজ্ঞার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরমসত্তার সাক্ষাৎ জ্ঞান পাওয়া যায় না। তাছাড়া বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানও পাওয়া যায়না। পরমাত্মা ও জীবাত্মা এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য 'অতীন্দ্রিয় অনুভূতি' স্বজ্ঞার উপর তিনি নির্ভর করেছেন। তিনি মনে করেন স্বজ্ঞার সাহায্যেই জ্ঞানলাভ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

আরজ আলী মাতুব্বরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তাঁর *সৃষ্টি রহস্য* ও *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থ দুটি দর্শনের গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত। *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থের অন্য আরেকটি নাম তিনি দিয়েছেন *লৌকিক দর্শন*। *সৃষ্টি রহস্য*-কে অনেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের (Comparative Religion) আকরগ্রন্থ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর দর্শনচিন্তাকে অনেকে বলেছেন 'কাণ্ডজ্ঞানের দর্শন'। তিনি ভাববাদ ও রহস্যবাদের প্রতি অনাস্থাশীল। জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যা পেয়েছেন বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে যাকে যৌক্তিক বলে জেনেছেন তিনি তাকেই সত্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে মাতুব্বরের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল ইত্যাদি নিয়ে অধিবিদ্যা আলোচনা করে, জ্ঞানের উৎস এবং জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। নীতিবিদ্যা এবং মানবকল্যাণ আরজ আলী মাতুব্বরের রচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বর মানবকল্যাণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি সব করেছেন। জীবনের ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর অর্জিত সম্পত্তি তিনি সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। পরবর্তী একুশ বছরের অর্জিত সম্পত্তি তিনি উইল করে জনকল্যাণমূলক কাজে দান করেন। মানবের সেবায় তিনি চক্ষু এবং দেহ মেডিক্যাল কলেজে দান করেছেন। এমনকি মৃতদেহটি বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যাংকে টাকা পর্যন্ত রেখে গেছেন। দর্শনের মৌলিক বিষয় অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, মূল্যবিদ্য এবং মানবকল্যাণ আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরজ আলী মাতুববরের পূর্ণাঙ্গ দর্শন আলোচনা সম্ভব।

আবুল হাশিম *The Creed of Islam or the Revolutionary Character of Kalima, As I See it, In Retrospection* গ্রন্থে জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, মূল্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া হিসাবে তিনি স্বজ্ঞার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস ইন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায় না। বুদ্ধির সাহায্যেও অবভাসিক জগতের যথার্থ জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। মুনি-ঋষি ও সুফিসাধকরা স্বজ্ঞার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করেন। তিনি মনে করেন স্বজ্ঞার সাহায্যে আমরা বস্তুর প্রকৃত রূপ জানতে পারি। নীতিবিদ্যা নিয়ে আবুল হাশিমের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ইসলাম ধর্মের উপর পূর্ণ আস্থাশীল হয়েও তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং মোল্লাতন্ত্রকে প্রশ্রয় দেননি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম, ফিলসফি অব হিস্ট্রি, ফিলসফি এন্ড রিলিজিয়ন*সহ বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক বক্তব্য রয়েছে। তিনি ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখায়, ইসলামের সর্বজনীন জীবনদৃষ্টি, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক ন্যায়পরতা গভীর দার্শনিক প্রত্যয়ে ও যুক্তিতে সমৃদ্ধ। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ভাববাদী দর্শনের সমর্থক। জীবনের প্রথম দিকে তিনি হেগেলের ভাববাদের অনুরাগী ছিলেন।

পরিণত বয়সে তিনি নিজস্ব ভাববাদী মত রচনা করেন। তাঁর চিন্তা ও রচনার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির, আবেগের সঙ্গে বিবেকের, এক কথায় ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সংযোগ ও সমন্বয় বিধানে পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন ধর্ম ও দর্শন ভিন্ন হলেও এদের উৎস অভিন্ন। ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর অভিমতকে অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া হিসাবে তিনি স্বজ্ঞার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন জীবনে বুদ্ধিই সব নয়, জীবন বুদ্ধির চেয়ে অনেক বড়।

সাইদুর রহমান তাঁর দর্শনকে 'কল্যাণ দর্শন' নামে অভিহিত করেছেন। যুক্তিবাদী হিসাবে সাইদুর রহমান বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ চেয়েছেন। অস্তিত্ববাদী দর্শনকে সাইদুর রহমান গভীর তাৎপর্যময় ও মানুষের সমস্যাবলি সমাধানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করেন। সাইদুর রহমান জ্ঞানের উৎস, বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করেছেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে সংশয়বাদকে তিনি পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আধুনিক দর্শনে দেকার্ত দর্শনের পদ্ধতি হিসাবে সংশয়বাদ গ্রহণ করে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছেন। সাইদুর রহমান সংশয়বাদকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে জ্ঞানলাভের মধ্যে দিয়ে সমাজের কল্যাণ কামনা করেছেন। সাইদুর রহমান যুক্তি বুদ্ধি এবং বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে অধিবিদ্যার অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। ভাববাদকে তিনি কল্পনাবিলাস হিসাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্মকে অস্বীকর করেন নি। ইসলাম ধর্মের ইহজাগতিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে। মূল্যবিদ্যায় সাইদুর রহমানের বিশেষ অবদান রয়েছে। সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি কুসংস্কারমুক্ত সমাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

আহমদ শরীফ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শনের অধ্যাপক না হলেও তাঁর চিন্তাধারায় দর্শনের ছাপ স্পষ্ট। বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া তিনি কোন কিছুই গ্রহণ করেননি। আহমদ শরীফের দর্শনচিন্তায় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, মূল্যবিদ্যা, বিশেষস্থান দখল করে আছে। মূল্যবিদ্যার অন্যতম আলোচনার বিষয় নীতিবিদ্যা। তিনি মনে করেন, সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষ জ্ঞান ও যুক্তি আশ্রয়ী হলেই সবার সুখ কাম্য হতে পারে। বিশ্বাসী মানুষ জ্ঞানার্জন করতে পারে না। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের উৎস, পরিধি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। জিজ্ঞাসা থেকেই দর্শনের সৃষ্টি। জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া হিসাবে আহমদ শরীফের এই জিজ্ঞাসা অভিজ্ঞতাবাদ সমর্থন করে। আহমদ শরীফের ধর্মসংক্রান্ত চিন্তাকে অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের দর্শনচিন্তায় দেখা যায় জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, মূল্যবিদ্যা গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। তাঁদের জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, মূল্যবিদ্যা ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা করাই বর্তমান গবেষণার মূললক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছি। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা

নিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বাংলা ও বাঙালি, বাঙালির দর্শনচিন্তার ইতিহাস, রেনেসাঁসের আলোকে বাঙালির দর্শনের উপর আলোচনা করেছি। বিংশ শতাব্দীর বাঙালির দর্শনচিন্তা শীর্ষক অভিসন্দর্ভের উপসংহারে দেখানো হয়েছে বাঙালির দর্শন মাত্রই ব্যবহারিক। বাঙালি জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও মূল্যবিদ্যার চর্চা করেছে জীবনের প্রয়োজন থেকে। পাশ্চাত্য দর্শনে মূল্যবিদ্যাকে ব্যবহারিক দর্শন বলা হলেও বাঙালির দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা এবং অধিবিদ্যাও ব্যবহারিক। জীবন বিচ্ছিন্ন কোনো কিছুই বাঙালি গ্রহণ করেনি। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের দর্শন মাত্রই ব্যবহারিক দর্শন।

উদ্দেশ্য

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা অগ্রসর হয়েছে।

(ক) বাঙালির দর্শনচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারায় বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও দর্শনচিন্তা বিকাশ লাভ করেছে।

(খ) বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের দর্শনচিন্তায় দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের দর্শচিন্তায় স্বকীয়তাও আছে।

পরিধি

বিংশ শতাব্দীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শনচর্চা শুরু হয়। মুসলমানেরা দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষালাভ এবং দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘ সময় যুক্ত থাকার ফলে তাদের চিন্তাচেতনায় মৌলিক দর্শনচিন্তা গড়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তার উপর অভিসন্দর্ভ রচনা করার সুবিধার জন্য অধ্যায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে বাঙালি জাতির উৎপত্তি থেকে অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। বাঙালি জাতির দর্শনচিন্তার উপর ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা না হলে মনে হতে পারে বিংশ শতাব্দীতেই এই অঞ্চলের বাঙালি মুসলমানেরাই কেবল দর্শনচর্চা করেছে। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচর্চা এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ সময়ের চিন্তার ফসল।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তায় দর্শনের মৌলিক উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। অভিসন্দর্ভের পরিসর যাতে ব্যাপক না হয় সে জন্য আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বশীল বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

সাতজন বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনায় স্থান পেয়েছে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রতিনিধিশীল বাঙালি মুসলিম দার্শনিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল হাশিম, আরজ আলী মাতুব্বর, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সাইদুর রহমান ও আহমদ শরীফ।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত বর্ণনামূলক, বিচার-বিশ্লেষণী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা প্রথমে অভিসন্দর্ভের বিষয়গুলো বর্ণনা করেছি এবং পরবর্তীতে সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করেছি।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা

প্রথম অধ্যায় : প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ও বাঙালি

তৃতীয় অধ্যায় : বাঙালির দর্শনচিন্তার ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলার রেনেসাঁ ও বাঙালির দর্শন

পঞ্চম অধ্যায় : বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা

১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (১৮৭৩ - ১৯৬৫)
২. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮ - ১৯৭৪)
৩. আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০ - ১৯৮৫)
৪. আবুল হাশিম (১৯০৫ - ১৯৭৪)
৫. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬ -১৯৯৯)
৬. সাইদুর রহমান (১৯০৯ - ১৯৮৭)
৭. আহমদ শরীফ (১৯২১ - ১৯৯৯)

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ও বাঙালি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই ভূখণ্ড প্রাচীন। বাংলাদেশের প্রাচীনতম ভূমিরূপ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল ও কুমিল্লা জেলার লালমাই ময়নামতি। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, এসব পাহাড়ি অঞ্চল গড়ে ওঠে টারশিয়ারি যুগপর্বে। এরপর প্লাইস্টোসিন সময়ে গড়ে ওঠে দেশের লালমাটি নিয়ে গড়ে ওঠা বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর গড়। এই দুই ধরনের ভূমিরূপের বাইরে যে বিস্তৃত পললভূমি দেখা যায় তা সাম্প্রতিক সময়ে গড়ে ওঠা প্লাবনভূমি।[১] পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি, মধুপুরের গড় ও উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র ভূমি লক্ষ বছরের প্রাচীন। লালমাই পাহাড়ে প্রাচীনকালে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, লালমাই ও উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাগৈতিহাসিক কালের আবিষ্কৃত হাতিয়ার থেকে অনুমান করা হয়, সে সময় বাংলাদেশে জনবসতি ছিল।

পৃথিবীতে প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে কৃষির উদ্ভব হয়েছে। কৃষিকাজের উদ্ভাবনের সময় থেকে মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। মিশর, চীন, মেসোপটেমিয়া ও হরপ্পায় মানুষ প্রথম নগরসভ্যতা গড়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে পৃথিবীতে যে নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সেখানে মহাস্থানগড় এবং উয়ারী-বটেশ্বরের নাম রয়েছে। কোনো স্থানে নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার অনেক আগে থেকে সে-স্থানে জনবসতি শুরু হয়। জনবসতির একটি পর্যায়ে নগর গড়ে ওঠে। হরপ্পা (সিন্ধু) নগরসভ্যতা বিকশিত হয়েছিল ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব প্রায় সাত হাজার বছর পূর্বে বেলুচিস্তানের মেহেরগড়ে যে গ্রাম-সংস্কৃতির পত্তন হয়েছিল, কালের পরিক্রমায় তা হরপ্পা নগরসভ্যতায় পরিণত হয়।[২] খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক বা সমসাময়িক সময়ে উয়ারী-বটেশ্বরে মহাজনপদ ও নগরসভ্যতার উদ্ভব ঘটে।[৩] সে হিসাবে এখানে জনবসতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে। নব্যপ্রস্তর, তাম্র-প্রস্তর যুগে রাঢ় ছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র।[৪]

প্রাগৈতিহাসিককালে বাংলাদেশে নদী কেন্দ্রিক জনজীবন গড়ে উঠেছিল। বাংলার "পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পৃথকভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কর্তা কিন্তু বাংলার নদ-নদী যে এই তিনেরই

---

[১]সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *উয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫৪
[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
[৩]প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
[৪]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

কর্তা।"[৫] বাংলায় নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে নদ-নদীকে কেন্দ্র করেই। উয়ারী-বটেশ্বর ছিল ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকায়। এখনও উয়ারী গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কয়রা নদীর সংকীর্ণ খাত। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে জনবসতি পরিবর্তিত হয়েছে। সবশেষে ১৭৮০ সালের ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র গতিপথ পরিবর্তন করে।[৬] প্রাচীনকালে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিছিন্ন ছিল না। কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে এখানে বণিকশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। স্থল ও জলপথে এদেশের মানুষ বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। "উয়ারী-বটেশ্বর ছিল নদীবন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও স্বল্প-মূল্যবান পাথরের পুঁতি উৎপাদন কেন্দ্র।... এ অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।"[৭] উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত রোলেটেড মৃৎপাত্র ও স্যান্ডউইচ কাচের পুঁতি তা প্রমাণ করে।

আজকে যে মানচিত্র নিয়ে বাংলাদেশ, প্রাচীনকালে সেরকম কোনো দেশ ছিল না। প্রচীনকালে বাংলাদেশ বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র, চন্দ্রদ্বীপ, বরেন্দ্র, কজঙ্গল, বঙ্গাল, দণ্ডভুক্তি, খাড়ি, নাব্য ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত ছিল। এই জনপদগুলো একই সময়ে গড়ে ওঠেনি। জনপদগুলো অপরিবর্তিত ছিল না। জনপদগুলোতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্বর বুনো মানুষ গোষ্ঠী জীবনে অভ্যস্ত ছিল।[৮] জনপদের বুনো বর্বর মানুষগুলো খ্রিস্টপূর্ব হাজার বছর পূর্বেই যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে কৃষি নির্ভর জীবিকায় অভ্যস্ত হয় এবং স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলে।

জনপদগুলোর নাম হলো মূলত কৌম নাম।[৯] বিভিন্ন কৌমে বিভক্ত জনগোষ্ঠীর বাস ছিল বাংলাদেশে। এ-অঞ্চলের মানুষের ধর্মজীবনে বিভিন্ন দেবতা, উপদেবতায় বিশ্বাস থেকে এর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। জনপদগুলো প্রথমে কৌমের নামে হলেও পরবর্তী সময়ে ভৌগোলিক নামে রূপ ধারণ করে। ভৌগোলিক নামগুলো কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন ১৯৪৭ সালের আগেও বাঙালি জাতির আবাসভূমির নাম ছিল বঙ্গ দেশ। ইংরেজরা এর নাম দিয়েছিল 'বেঙ্গল' আর পর্তুগিজরা বলতো 'বেঙ্গলা'। সুলতানি এবং নবাবি আমলের বঙ্গাল নামের রূপান্তর ঘটেছিল পর্তুগিজ এবং ইংরেজদের কাছে। বঙ্গ নামটি বিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ হয়েছে। *আইন-ই আকবরী* গ্রন্থে আবুল ফজল লিখেছেন,

---

[৫]রমেশচন্দ্র মজুমদার,*বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, প্রথম খণ্ড, জেনারেল, জুলাই ২০১০, পৃ. ২

[৬]Willem van Schendel, *A History of Bangladesh*, Cambridge University Press, 2009, p. 9

[৭]D. K. Chakrabarti, *Ancient Bangladesh*, (Dhaka 1999); E Haque, S. S. M. Rahman and S.M. Ahsan, A Preliminary Report on Wari-Bateshwar Trial Excavation by ICSBA, *Journal of Bengla Art 5*, (Dhaka 2000), 283-315; S. S. M.Rahman, Glass Beads from Wari-Bateshwar, Bangladesh : a Preliminary Study, *Journal of Bengal Art* 6 (Dhaka 2001), 201-209; সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত কাচের পুঁতি : একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা, *প্রত্নতত্ত্ব* ৯ (ঢাকা ২০০৩), ১-১০; সুফি মোস্তাফিজুর রহমান,উয়ারী-বটেশ্বর :বাংলাদেশের বিস্ময়কর গৌরবময় ঐতিহ্য, *ইতিহাস : সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে ...*, (ঢাকা ১৫৯-১৬৫); সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত লকেট ও মন্ত্রপূত কবচ : ইতিহাস রচনার অবহেলিত উপাদান, ইতিহাস : সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে ..., (ঢাকা ২০০৪) ১১৯-১২৬,সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *উয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে, পৃ.* ৩২

[৮]আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১

[৯]অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫১

> বাংলাদেশের নাম পূর্ব্বে বঙ্গই ছিল; পরে আল শব্দ তাহাতে যুক্ত হয়। এই আল শব্দের অর্থ জল প্রতিরোধের বাঁধ। বঙ্গদেশে অনেক নিম্নভূমি আছে, সেখানে বাঁধ বা খাল বাঁধিতে হইত; সেই জন্য বঙ্গ শব্দের সহিত এই 'আল' শব্দের যোগ হইয়া বাঙ্গাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বাঙ্গাল শেষে বাঙ্গলাতে পরিণত হইয়াছে।[১০]

চর্যাপদে বঙ্গাল, বাঙ্গালী নাম রয়েছে। সুকুমার সেন লিখেছেন, "বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি বঙ্গপাল থেকে বলে মনে হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল সেকালে প্রধানত জলা জায়গা ছিল। এই জলা জায়গার সাধারণ ছিল বঙ্গ।"[১১] ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলাদেশ কখনো এক নামে ছিল না। "বাংলার ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৭খি:) 'শাহ-ই-বাংলা' উপাধি গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বাংলা দেশবাচক নামে রূপান্তরিত হয়েছে।"[১২] তুর্কী আমলে বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র আলাদাভাবে চিহ্নিত হত। মোঘল আমলে সম্রাট আকবর বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, সমতট, বরেন্দ্র অঞ্চলের বিশাল ভূভাগ নিয়ে গড়ে তোলেন সুবাহ-ই-বাংলা।

বেদে, সংহিতায়, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে বঙ্গের নাম আছে।'বঙ্গ' নামের সঙ্গে বৈদিক যুগের আর্যরা পরিচিত ছিল। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ভাষ্যে পতঞ্জলি সুক্ষাঃ, পুণ্ড্রাঃ, বঙ্গার নাম উল্লেখ করেছেন। "বঙ্গ খুবই প্রাচীন দেশ। প্রাচীন পুঁথিতে এর উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে মহাভারতেও। চন্দ্র রাজাদের মেহেররৌলী শিলালেখে, চানুক্য রাজবংশের ইতিবৃত্তে বঙ্গ জনপদের উল্লেখ আছে।"[১৩] মহাভারতে দেখা যায় ভীম দিগ্বিজয়ে বের হয়ে মুঙ্গের রাজাকে হত্যা করে কোশী নদী তীরবর্তী পুণ্ড্র রাজাকে পরাজিত করার পর তিনি বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুক্ষ্ম রাজাদের পরাজিত করেন। কালিদাসের *রঘুবংশে* রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে গৌড়, বঙ্গ এবং সুক্ষ্মের নাম উল্লেখ করেছেন। বাৎসায়ন তাঁর *কামসূত্রে* এ অঞ্চলের নারীদের কোমল স্বভাব এবং প্রেমভাবাপূর্ণ এবং কোমলাঙ্গী বলে প্রশংসা করেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বঙ্গের নাম রয়েছে। সেখানে বঙ্গের অধিবাসীদের পক্ষিজাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে পুণ্ড্রের নামও রয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রের অধিবাসীদের দস্যু নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে বাংলাদেশের অধিবাসীদের ঘৃণার চোখে দেখা হলেও রামায়ণ, মহাভারতে এই জনপদের মানুষকে অবহেলার চোখে দেখা হয়নি।

জনপদগুলো ভৌগোলিক নাম নিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কথিত আছে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করে গঙ্গারাঢ় দেশের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর খোঁজ নিয়ে বিপাশা নদীর তীর থেকে দেশে ফিরে যান। বিপাশা নদীর অপর তীরে নন্দ রাজার বিশাল সাম্রাজ্য ও সামরিক ক্ষমতার খবর আলেকজান্ডার

[১০]আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী*, পাঁকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ ১৯০০, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৯২, নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৮

[১১] সুকুমার সেন, *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪০৩, পৃ. ১

[১২]এ কে এম ইয়াকুব আলী, *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১১

[১৩] অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহ করে আর সে দিকে অগ্রসর হন নাই। আলেকজান্ডারের যুদ্ধ শিবিরে গঙ্গাঋদ্ধি দেশের সামরিক শক্তির খবর পৌঁছেছিল। "গ্রিক দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে গঙ্গারিডই অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল এবং তা কলিঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকের আমলে কলিঙ্গ জয়ের ফলে বাংলাদেশ যে মৌর্য সম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"[১৪] গঙ্গাঋদ্ধির রাজা ছিলেন সামরিক শক্তিতে অদ্বিতীয়। তাঁর ছিল বিশাল পদাতিক ও হস্তী বাহিনী। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব নিম্ন অঞ্চলের নৌবাহিনী বিখ্যাত ছিল। 'নৌসাধ্যনোদ্যত' বাঙালীদের জয় করতে কালিদাসের কাব্যের নায়ক রঘুকে বেগ পেতে হয়েছিল।[১৫] টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায়, তাম্রলিপ্তির পূর্বে গঙ্গার সবগুলো মোহনায় অর্থাৎ সমগ্র সমুদ্র উপকূলে গঙ্গাঋদ্ধি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ছিল। গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকদের বিবরণ থেকেও গঙ্গাঋদ্ধি রাষ্ট্র সম্পর্কে জানা যায়। অজয় রায় গঙ্গাঋদ্ধি রাষ্ট্রের ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লিখিত মতগুলো গ্রহণ করে বলেছেন, রাঢ়, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রের সম্মিলিত রূপই ছিল গঙ্গাঋদ্ধি।[১৬] সেই হিসাবে গঙ্গাঋদ্ধি আজকের বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অংশমাত্র।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করে নন্দ সাম্রাজ্য, নন্দ সৈন্য-সামন্ত ধনরত্নের মালিক হয়েছিলেন। মহাপদ্মনন্দ ও তাঁর পুত্রদের গঙ্গা রাষ্ট্রও মৌর্য সাম্রাজ্যের অর্ন্তগত হয়েছিল।[১৭] উয়ারী বটেশ্বর ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমানা। পুণ্ড্রনগর ছিল মৌর্যদের প্রশাসনিক কেন্দ্র। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় ছিল মৌর্যদের প্রভিনশিয়াল রাজধানী এবং উয়ারী বটেশ্বর ছিল মৌর্যদের নদীবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। মৌর্যরা সুসংগঠিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অর্থমন্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে কিছু শুঙ্গ পোড়ামাটির ফলক ও কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। কুষাণ সাম্রাজ্য এদেশে ছিল কিনা বলা যায় না। অনুমান করা হয়, বাণিজ্য সূত্রে কুষাণ মুদ্রা এদেশে এসেছিল। শুঙ্গ রাজাদের আমলেও বাংলাদেশ পাটলিপুত্রের অর্ন্তগত ছিল বলে অনুমান করা হয়। এ সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই, তবে শুঙ্গ শিল্পশৈলী এবং সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল।[১৮]

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী শিলালিপি থেকে এই অঞ্চলে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়।[১৯] প্রাচীনকালে বঙ্গ এবং গৌড় একত্রিত ছিল না। গৌড় ছিল আলাদা। হিউয়েন সাঙ ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে চাঙ-অন প্রদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন শিক্ষালাভের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে আসেন। ভারতবর্ষের অনেক শহর বন্দর তিনি ভ্রমণ করেন। হিউয়েন সাঙ ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তি, কামরূপ,

[১৪] নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ ঃ ধর্ম ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৮৭
[১৫] সুকুমার সেন, *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী*, পৃ. ৮
[১৬] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৮
[১৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ.৩৫৬
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬
[১৯] Willem van Schendel, *A History of Bangladesh*, p. 16 প্রাগুপ্ত, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

সমতট, কর্ণসুবর্ণের নাম থাকলেও বঙ্গের নাম নেই।[২০] ভারত থেকে ফিরে যাওয়ার সময় সঙ্গে হিউয়েন সাঙ বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধ মূর্তি সঙ্গে নিয়ে যান "২২টি ঘোড়ার পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া ৫২০ বোঝা অন্যান্য শাস্ত্র বই।"[২১] এর সঙ্গে মহাযান শাখার ১২৪টি সূত্রের পুঁথিও ছিল।

পাল বংশের শাসনামলের শেষ দিকে বঙ্গ জনপদ উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। গোপাল ছিলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। গোপালের পুত্র ধর্মপাল নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহার এবং কুমিল্লা জেলায় শালবন বিহার নির্মাণ করেন। বাংলাদেশের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং বৌদ্ধ শাসনে ছিল এই দুটি বিশাল স্থাপনা তারই নিদর্শন। শাসনকার্যে সুসংগঠিতভাবে ধর্মের ব্যবহার এ অঞ্চলে প্রথম বৌদ্ধরাই শুরু করেন।[২২] "পাল ও চন্দ্র বংশের রাজারা শুধু মহারাজা-ধিরাজই নয়, পরমেশ্বর ও পরম ভট্টারক বলেও অভিহিত হতেন। ঈশ্বরের একেবারে খাস অবতার ও পরম গুরু। এসবই সম্রাটের বর্ধিত ক্ষমতার পরিচায়ক।"[২৩] কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার বিশাল ব্যয় কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের উপর নির্ভর করেছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে। গুপ্তশাসনামলে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়েছে, তবে অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর।

বৃহৎবঙ্গে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন শশাঙ্ক ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে।[২৪] "শশাংকের আমলেই প্রথম গোটা বাংলাদেশকে এক নামে অভিহিত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।"[২৫] তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী। অনেক বৌদ্ধ স্থাপনা তিনি ধ্বংস করেন। শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন তিনি। বৃহৎবঙ্গ সেনদের অধীনেও ছিল। বল্লাস সেনের সাম্রাজ্য লক্ষণ সেন আরো বড় করেছেন।

কুতুবদ্দীন আইবেকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন্ - বখতিয়ার খিলজী ১২০২ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া অধিকার করেন। লক্ষণ সেন তখন সেখানে ছিলেন। অনুমান করা যায় লক্ষণ সেনের রাজ্যসীমা নদীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে লক্ষণ সেন নদীয়া থেকে পালিয়ে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বেশকিছু দিন অবস্থান করেছেন। পরে তিনি সোনারগাঁয়ে চলে যান। লক্ষণ সেন নিজের নামানুসারে গৌড় নগরীকে লক্ষণাবতী নামে নামকরণ করেছিলেন।[২৬] লক্ষণ সেন প্রথমদিকে শক্তিশালী রাজা ছিলেন। লক্ষণ সেনের পরবর্তী বংশধরেরা আরো প্রায় একশ বৎসর এদেশ শাসন করেন। সুলতানি এবং নবাবি আমলে বৃহৎবঙ্গ দিল্লীর শাসনে ছিল। তবে সুলতান এবং নবাবরা ছিল প্রায় স্বাধীন।

[২০] *হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত*. প্রেমময় দাশগুপ্ত, (সংকলক), ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৪৫, ১৪৯
[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
[২২] Willem van Schendel, *A History of Bangladesh,* p. 26
[২৩] অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, পৃ.৭৩
[২৪] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)*, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ.৩৫
[২৫] অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, পৃ. ৫৮
[২৬] খান-সাহেব আবিদ আলী খান, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি*, চৌধুরী শামসুর রহমান (অনূদিত ও সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ০১

হোসেন শাহী শাসনকে বাংলার স্বর্ণযুগ হিসাবে অভিহিত করা হয়। বৈষ্ণব আন্দোলন, নব্য ন্যায়ের চর্চা, মনসা ও সত্য পীরের পূজার এসময় প্রসার ঘটে। দেশের অর্থনীতি গতিশীল করার লক্ষ্যে এ অঞ্চলের শাসকগণ মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কুমিল্লা জেলার "ময়নামতির কুটিলা মুরার খনন-কার্যের তৃতীয় পর্যায়ের উপরের স্তরে মুসতাসিম বিল্লাহর (১২৪১-৫৮খ্রিঃ) একটি স্বর্ণমুদ্রাসহ যে কয়টি আব্বাসীয় রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে তা এই অঞ্চলের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়।"[২৭] বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মানুষ এসেছে। বণিকদের সঙ্গে ধর্ম-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এদেশে এসেছে। হোসেন শাহী শাসন আমলে বাণিজ্য উপলক্ষে পর্তুগিজদের আগমন ঘটে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পর্তুগিজ পাদ্রীরাও বাংলাদেশে আসে। বাণিজ্য করতে আসলেও পর্তুগিজরাই প্রথম বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের প্রচার করেন। চন্দননগর, হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পর্তুগিজ পার্দ্রিদের কার্যকলাপ ছিল। মোঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপও হোসেন শাহী বাংলাকে ভোগ করতে হয়েছে।[২৮] হোসেন শাহী আমলের বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা নবাবি আমলে অব্যাহত ছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য করতে এসে প্রায় দুইশত বছর শাসন-শোষণ করেছে। বাংলাদেশের কাপড় ইউরোপের বাজারে প্রসিদ্ধ ছিল। মসলিন ছাড়াও মোটা কাপড়ের চাহিদা ছিল। ঢাকা থেকে সবচেয়ে বেশি কাপড় রপ্তানি হতো। সোনারগাঁও কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল।[২৯] বাংলার কাপড় ইউরোপের বাজারে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

১৬৯০ সালে জব চার্ণক সুটিনাটি গ্রামটি অধিকার করার পর কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন শুরু হয়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের মধ্যে দিয়ে শুধু বাংলাদেশ ব্রিটিশ শাসনে আসে নাই, দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পথ সুগম হয়। কলকাতার সুটিনাটি গ্রাম থেকে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ডাচ ব্যবসায়ীরাও বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে। ডাচ বাণিজ্য কুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও এদেশে রয়েছে। আমেরিকার সঙ্গেও বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। "স্বাধীনতা লাভের পর বৎসরই অর্থাৎ ১৭৪৮ সনের শেষ নাগাদ ইয়াংকীরা ইউনাইটেড স্টেটস নামের একটি জাহাজ নিয়ে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তাদের বাণিজ্যিক উপস্থিতি ঘোষণা করে। বাংলায় প্রথম মার্কিন বাণিজ্যিক জাহাজ হাইড্রার আগমন ঘটে ১৭৮৫ সালের জুন মাসে।"[৩০] বাংলার পণ্য আমেরিকার বাজারে যায়। বাংলায় আমেরিকার বাণিজ্য এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, পনের বছরের মধ্যে কলকাতা বন্দরের মোট ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাপে

---

[২৭]মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৮৩

[২৮]মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেন শাহী আমলে বাংলা ১৪৯৪-১৫৩৮, একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যালোচনা* (মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১ পৃ. ৩১

[২৯]Willem van Schendel, *A History of Bangladesh*, P. 42

[৩০]সিরাজুল ইসলাম, "মার্কিন বণিকদের বাংলা-বাণিজ্য ও প্রাচ্যচর্চায় তাঁদের অবদান (১৭৮৪-১৮৪০)" *মানববিদ্যা বক্তৃতা* -২০১২, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

খোদ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমকক্ষ হয়ে উঠে।[৩১] শুধু পণ্যের আমদানি-রপ্তানি নয় সংস্কৃতির আদান-প্রদানও ঘটে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। বাংলাদেশ হল পাকিস্তানের উপনিবেশ। এ অঞ্চলের বাঙালি মুসলমানেরা আন্দোলন করেই পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। আবার পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্থান করে নেয়।

বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়

বাংলাদেশে মানব বসতি কখন থেকে শুরু হয়েছিল বলা মুশকিল। আদি মানবের কঙ্কাল বাংলাদেশের কোনো স্থানেই পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয় দ্বিতীয় স্তরে পৃথিবীতে মানব বসতি শুরুর সময়ে বাংলাদেশে মানব বসতি শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের উয়ারী বটেশ্বরে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। হাতিয়ারের ব্যবহার থেকে বলা যায় নব্যপ্রস্তর যুগে কিংবা তারও আগে এ অঞ্চলে মানুষের বসতি ছিল।[৩২] এই মানুষ কোথা থেকে কিভাবে এসেছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এসব মানুষের আকার-আকৃতি তাদের ধর্ম বিশ্বাস কোনো কিছু সম্পর্কেই সুনির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। বাংলাদেশের আদিম মানুষের নানা বিবর্তিত ও পরিবর্তিত রূপ যে বর্তমানের বাঙালি জাতি, এনিয়ে সন্দেহ করার কোনো উপায় নেই। গবেষকরা দাবি করেন বাঙালি সঙ্কর জাতি। নানা জাতি-উপজাতি, বর্ণ-গোত্রের, রক্তের মানুষের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠেছে বাঙালি জাতি। এখনও যে বাঙালিদের আকার-আকৃতি, গায়ের রং, মাথার খুলির ধরন, নাকের গঠন, চুলের রং এবং আকারের পরিবর্তন হচ্ছে না তা কি বলার উপায় আছে। বিশ্বায়নের যুগে কে কোন রক্ত বহন করে চলেছে তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। বিশ্বের সর্বত্রই পরিবর্তন হচ্ছে। কোথাও দ্রুত আবার কোথাও হয়তো ধীর গতিতে। বর্তমানে ইউরোপীয়, এশিয়ান, বাঙালির সংমিশ্রণ কি ঘটছেনা? কাজেই শুধু বাঙালিই সঙ্কর জাতি বলার উপায় নেই। বিশ্বের কোন জাতিই একশতভাগ বিশুদ্ধ নয়।

বাংলাদেশ উর্বর পলিমাটির দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে প্রচুর ফসল উৎপাদন হয়। নদ-নদী, খাল-বিল-হাওড়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হিসাবে বিশ্বে পরিচিত ছিল। আদিকালে পাহাড়ে-জঙ্গলে, মাঠে-ময়দানে

---

[৩১]প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[৩২]অজয় রায়,*বাংলা ও বাঙালি*, পৃ. ১২

খাদ্যের অভাব ছিলনা। প্রাগৈতিহাসিককালে নিরাপদ খাদ্যের সন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশে এসেছে এবং স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছে। এদেশের মানুষের সঙ্গে বহিরাগতদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

বাঙালিদের গায়ের রং, কপালের গঠন, মাথার খুলি, নাক, চোখ, মুখের আকার, চুলের রং ও প্রকৃতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বাঙালি জাতির নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়। ঐতিহাসিকদের দাবি অনুযায়ী প্রাগৈতিহাসিক যুগে উপমহাদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করে খর্বকায় নিগ্রোপ্রতিম লোকেরা। আফ্রিকা থেকে আরব উপদ্বীপ হয়ে পারস্যের উপকূল বেয়ে তারা এই উপমহাদেশে প্রবেশ করে, ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এরা বাংলাদেশেও বসতি গড়েছিল। নেগ্রিটোদের পর আসে আদি অস্ট্রেলিয় বা অস্ট্রিকরা।

> বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রাক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় তাদের বলা হয় আদি অস্ত্রাল। আদি অস্ত্রাল বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের দৈহিক গঠনের মিল আছে। দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের রক্তের মিলও আছে।[৩৩]

অস্ট্রিকদের পর বাংলায় আসে দ্রাবিড়ভাষী লোকেরা। অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় কোন জনগোষ্ঠীর নাম নয়। এরা ভাষা গোষ্ঠী। এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে উপমহাদেশে প্রবেশ করে। আদি অস্ত্রালরা অস্ট্রিক ভাষায় কথা বলতো। বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ভাষার শব্দ এখনো প্রচুর রয়েছে। খাঁ-খাঁ, বাদুড়, নারকেল, গোড়ালি, ঘন্টা, চোঙ্গা, কাক, বোয়াল, করাত, দা, কদম্ব, জাম্বুরা, মাতঙ্গ ময়ূর ইত্যাদি শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। দ্রাবিড় ভাষাও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। কুটীর, কুটুম্ব, নীর, ওড়না, কুকুর, কানা, নিরালা, বিলাই, ছোলা ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ হলো দ্রাবিড়।

উপমহাদেশে আর্যভাষী নর্ডিক ও মঙ্গোলরা আসে অনেক পরে। নর্ডিকরা আর্যভাষী হয়ে ওঠার আগে এদের আদি নিবাস ছিল রাশিয়ার উরাল পর্বতমালার দক্ষিণে ইউরোপীয় মালভূমিতে। নর্ডিকরা পশু পোষ মানাতে শিখেছিল। এরা প্রথম ঘোড়া পোষ মানায়। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে এই নর্ডিকরা তাদের আদিভূমি ছেড়ে মেসোপটেমিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। এখানে তারা গরু পোষ মানায়। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে এরা ছাগল সংগ্রহ করেছিল।[৩৪] আর্যভাষী জনগোষ্ঠী নানা গোত্রে, কৌমে বিভক্ত ছিল। এরা এক সঙ্গে একই সময়ে বাংলায় আসেনি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে নানা বিবর্তিত রূপ নিয়ে এরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বৃহৎ বঙ্গের বিভিন্ন কোমে বিভক্ত জনগোষ্ঠীর বাস থেকে এর কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

[৩৩]অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ.২৪
[৩৪]অজয় রায়, *বাংলা ও বাঙালি*, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের লোকজনের মধ্যে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাব দেখা যায়। চেপ্টা নাক, গালের উঁচু হাড়, গোঁফ-দাড়ি অপেক্ষাকৃত কম, গোল বা মাঝারি মাথা, চোখের কোণে ভাঁজ ইত্যাদি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য।[৩৫] দক্ষিণ-পশ্চিম চীন থেকে এরা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রাশ্রয়ী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৩৬] পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের পাহাড়ী অঞ্চল, ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলার পাহাড়ী এলাকা ছাড়াও দেশের প্রায় সর্বত্রই এই শ্রেণীর লোক রয়েছে। অন্যান্য জাতির মত মঙ্গোলরাও সব এক সাথে এক স্থান থেকে এদেশে আসেনি। আদি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তারা ভাটির দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসতি করেছে। এদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর রক্তের সঙ্গে তারা মিশে গেছে। "বিভিন্নগোত্রীয় রক্তের আনুপাতিক হার অবশ্য আজো অর্নিণীত। তবু প্রমাণে-অনুমানে বলা চলে শতকরা সত্তরভাগ অস্ট্রিক, বিশভাগ ভোটচীনা, পাঁচভাগ অন্যান্য রক্ত রয়েছে বাঙালী-ধমনীতে।"[৩৭]

বাংলাদেশে আর্যরা আসার আগে অস্ট্রিক-ভাষী, দ্রাবিড়-ভাষী ভোটচীন-ভাষীরা এদেশে এসেছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। এছাড়া অন্য জাতি-উপজাতির জনগোষ্ঠীও এদেশে এসেছে, বসবাস করেছে। এদেশের মানুষের রক্তের সাথে তাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এরা সবাই ছিল অনার্য। বৈদিক সাহিত্যে দাস, দস্যু, নিষাদ ইত্যাদি অনেক নাম পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় আর্যরা আসার আগে এদেশে একাধিক জাতি-উপজাতির বাস ছিল। অনার্যদের সম্পর্কে, ঋগ্বেদের এক স্তোত্রে লেখা রয়েছে, "আমাদিগের চর্তুদ্দিকে দস্যুজাতি আছে - তাহারা যজ্ঞ করে না, তাহারা কিছু মানে না - তাহারা মানুষের মধ্যেই নয়, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন রকমের। হে ইন্দ্র ! তুমি ইহাদিগকে বিনাশ কর।"[৩৮]

মগধের রাজশক্তির জয়জয়কার অবস্থায় আর্যরা বাংলাদেশে আসে। "বাংলাদেশে আর্যভাষা এল এই প্রতিষ্ঠাবান মগধ রাজশক্তির প্রতিনিধিরূপে।"[৩৯] আর্য রাজ ভাষা হওয়ায় অন্য ভাষার প্রভাব কমে যায়। আর্য ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে। হিউয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণকালে এ অঞ্চল আর্যভাষীদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। এ সময় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রসার ঘটে। হাবসীদের আগমন কখন ঘটেছিল সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। "বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ-ছয়জন হাবসী সুলতান বহুদিন ধরে রাজত্ব করেছে। হাবসী প্রহরী রাখার প্রচলন এদেশে ছিল।"[৪০]এদের রক্তের সাথেও বাঙালীর রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আর্যদের পর অনুমান করা হয় এদেশে শকেরা এসেছে। পারস্য উপমহাদেশ থেকে এদের অভিযান শুরু হয়। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে

[৩৫]প্রাগুক্ত, পৃ.১৭
[৩৬]নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ.৩৪
[৩৭]আহমদ শরীফ, *বাঙালা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৫৭
[৩৮]ঋগ্বেদের এই উদ্ধৃতি দীনেশচন্দ্র সেনের বৃহৎ বঙ্গ থেকে নেয়া হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৫, দে'জ পুনমুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ.১২১
[৩৯]অজয় রায়, *বাংলা ও বাঙালি*, পৃ. ২৪
[৪০] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ. ৪১

এরা ছড়িয়ে পড়ে।[৪১] কথিত আছে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাসের এক মেয়েকে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।[৪২] আলেকজান্ডারের বিশাল সেনাবাহিনীর সবাই নিজ দেশে ফিরে যাননি। অনেকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য এদেশ থেকে নারীকে বিয়ে করে নিয়ে গেছেন। আফগান, পাঠান, তুর্কি, পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ ইত্যাদি নানা জাতি-উপজাতির মানুষ এদেশে এসেছে। এদের মধ্যে অনেকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। আনেকে দেশে ফিরে গেছে। এদের রক্তের সঙ্গেও বাঙালির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারততীর্থকে অগণিত জাতির মিলনক্ষেত্র হিসাবে অভিহিত করে বলেছেন,

কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্র হল হারা।

বাঙালির ধর্মচিন্তা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের ধর্ম বিশ্বাস কিভাবে শুরু হয়েছিল সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। বাৎসায়নের *কামসূত্রে* ধর্ম, অর্থ ও কাম[৪৩] মানব জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাৎসায়ন বলেছেন তিনি কামসূত্রের রচয়িতা নন সংকলক মাত্র। ভারতবর্ষে জনজীবনে এগুলো ছিল। *রামায়ণে* ধর্ম-কাম ও অর্থ[৪৪] মানব জীবনের প্রধান অবলম্বন বলা হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলাদেশের মানুষ ব্যবহারিক প্রয়োজনে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র কিংবা কোন বড় বৃক্ষ, ঔষধি গাছ উপাস্য হিসাবে মেনে নিয়েছে। মানুষের কাছে জগৎ ও জীবন ছিল রহস্যময়। সসীম মানুষ অসীম শক্তিকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকার জন্য, সুস্থ থাকার জন্য, অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য পূজা করতো। শীতলা, মনসা ইত্যাদি দেব-দেবী এভাবেই বাঙালির জনজীবনে স্থান পেয়েছে।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন কৌমে বিভক্ত জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। এই কৌমগুলোর ছিল নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস। কৌমগুলোর দেব-দেবতারা বাংলার স্থানীয় দেব-দেবতার আসন লাভ করেছে। কালের বিবর্তনে এসব দেবতারা অনেকেই লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়েছে। কৌম জনগোষ্ঠীর অনেক দেবতা ব্রাহ্মণ্য সমাজে সম্মানের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে। আদিম কৌম সমাজে প্রজনন শক্তির পূজা বিশেষভাবে

---

[৪১] অজয় রায়, *বাংলা ও বাঙালি*, পৃ.১৯
[৪২] দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫০
[৪৩] Vatsyayana, *Kama Sutra* (The illustred Kam sutrs, Ananga-ranga. Perfumed garden), The Sir Richard Burton and F.F Arbuthnot translations edited and introduced by Charles Fowkes, Hamlyn, England, Third impression 1989, P. 18
[৪৪]বাল্মীকি, *রামায়ণ*, রাজশেখর বসু (সারানুবাদ), এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, দশম মুদ্রণ ১৩৯৬,পৃ. ৭

উল্লেখযোগ্য।[৪৫] আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতা দেখা যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি খ্রিস্টধর্মের প্রসারের ফলে তাদের আদি দেবতাদের প্রভাব ক্রমশ কমছে।

উয়ারি-বটেশ্বরে প্রাগৈতিহাসিক কালের নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের ব্যবহার থেকে অনুমান করা হয়, এ অঞ্চলে বসবাসকারী প্রস্তর, তাম্র-প্রস্তর ও লৌহযুগের মানুষ সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিল।[৪৬] ঐতিহাসিক যুগে এ অঞ্চলে জৈন, বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি বেশি পাওয়া গেছে। এসব মূর্তির বেশিরভাগই পাল, সেন ও চন্দ্রবর্মণ আমলের। শাসক সম্প্রদায় এসব দেব-দেবীর পূজা করতেন এবং পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। এছাড়া দেশে লৌকিক দেব-দেবীর পূজা হত। "এই সব দেব-দেবীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাদু শক্তি ও প্রজনন শক্তির প্রতীক।"[৪৭] কৌম সমাজে যাদু শক্তি এবং প্রজনন শক্তির দেব-দেবীর কদর ছিল। সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক। কৌম সমাজে সাপের পূজা হতো প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির জন্য। "কালক্রমে এই অনার্য দেবী ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাঙ্গুলী মনসারই বৌদ্ধ প্রতিরূপ।"[৪৮] বাংলা, আসাম ও ওড়িষ্যায় মনসা দেবীর পূজা প্রচলিত। প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসাবে আদিবাসী সমাজের মধ্যে কোন না কোন রূপে মনসার পূজার প্রচলন ছিলই।[৪৯] মনসা পূজার জন্য প্রতিমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু "একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক-পূর্বে বাংলাদেশে মনসার প্রতিমা পূজা হত।"[৫০]

বহু দেব-দেবী বিবর্তিত হয়ে বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ীভাবে আসন করে নিয়েছে।"সূর্যপুত্র রেবন্ত আদিতে ছিলেন নিষাদ কৌমের দেবতা। তার বাহন অশ্ব। বাহন সূত্রেই পরবর্তীকালে সূর্যেও সম্পর্কিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান পেয়েছিলেন।"[৫১] শিব অনার্য কৌমের প্রজনন ও উর্বরতার দেবতা। বাংলাদেশের বহু স্থানে শিবের মূর্তি পাওয়া গেছে। "এদেশে প্রাচীন অনার্য শিব ভোট-চীনার প্রভাবে 'নাথ' হয়ে আবার ব্রাহ্মণ্য প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেব-রুদ্র রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম, প্রাচীন ও অর্বাচীন তথা দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোঙ্গল ও আর্য মনন-প্রসূত সব দ্বান্দ্বিক গুণ নিয়ে শিব আজো জীবন্ত উপাস্য দেবতা।"[৫২]এখানে বলে নেয়াই ভাল প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রথমে যোনি ও পরে লিঙ্গ পূজা

---

[৪৫]এস. এম রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১০৩
[৪৬] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *উয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে*, পৃ. ১৯৯
[৪৭] মমতাজুর রহমান তরফদার, ''বাংলার ধর্ম জীবন",*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, (প্রধান সম্পাদক, আনিসুজ্জামান), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ.১৩২
[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩
[৪৯]নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ. ৪৮৯
[৫০]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯
[৫১]মমতাজুর রহমান তরফদার, "বাংলার ধর্ম জীবন", *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, (প্রধান সম্পাদক, আনিসুজ্জামান), পৃ. ২৩৩
[৫২]আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, পুনর্মুদ্রণ ২০১০, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করেছিল। উৎপাদন এবং প্রজনন শক্তির উৎস হিসাবে তারা এসবে বিশ্বাস করতো।"তন্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতির আদি মৈথুন থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি। সাংখ্যেও তাই।"[৫৩]

উয়ারী-বটেশ্বরে খননের ফলে বহুনেত্রধারী দেবীর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পোড়ামাটির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।[৫৪] একে শীতলা দেবী হিসাবে ধরা হয়। শীতলা অনার্য দেবী। প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস ছিল শীতলার আরাধনায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কমে। মহামারী আকারে বসন্ত রোগ বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিলেও শীতলা এখনো উপাস্য দেবতা। গ্রাম দেবতা নামে বাংলাদেশে আরেক দেবতা সর্বত্র সমাদৃত ছিল। গ্রাম দেবতা একই নামে সবসময় পরিচিত ছিল না। কালী, কোথাও ভৈরব আবার ভৈরবী কোথাও বা বনদুর্গা বা চণ্ডী অথবা অন্য নামে পূজা পেত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বন দেবতা নিষিদ্ধ ছিল। মনু এসব দেবতাদের পূজারীদের পতিত হিসাবে অভিহিত করেছেন।[৫৫] কিন্তু অনার্য দেব – দেবী শীতলা, মনসা, চণ্ডী, কালী, জাঙ্গুলী, বনদুর্গা, শ্মশানচারী শিব ইত্যাদি নামে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান করে নিয়েছে।

আর্য উপজাতিগুলো ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে। এরা সঙ্গে করে ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে এসেছে। আর্য উপজাতিগুলো একসঙ্গে একই সময়ে ভারতবর্ষে আসেনি। তাদের ধর্মীয় শাসনও একরকম নয়, দেবতাদের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। "বেদবাদ হল ভারতে জাত ধর্ম বিশ্বাসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন একটি সমন্বিত রূপ। এই ব্যবস্থা উপমহাদেশের পরবর্তী কালের ধর্মীয় মত-প্রবণতা ও দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।"[৫৬] উপমহাদেশের ধর্মীয় বিশ্বাস বাংলাদেশের ধর্মচিন্তায় প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভারতবর্ষে "বৈদিক ধর্মের এক অপরিহার্য অঙ্গ হল বহু ঈশ্বরবাদ, অর্থাৎ নরত্ব আরোপ করা বহু সংখ্যক দেবদেবী ও অবতারের পূজা আরাধনা।"[৫৭] বৈদিক দেব-দেবীতে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের আস্থা এখনো রয়েছে। তারা তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ ও পার্থিব জগতের উন্নতি এবং পরকালে মুক্তির জন্য এসব দেব-দেবীর উপর আস্থা রাখে। বেদের দেব-দেবী বাংলাদেশের নয়। এরা বাইরে থেকে এসেছে। এসব দেব-দেবীরা বাঙালি দেব-দেবীর সঙ্গে মিশে বাঙালি রূপ নিয়েছে।

বাংলাদেশে জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ছিল। এই তিন ধর্মই বেদ বিরোধী। "এই তিন ধর্মের মধ্যে আবার জৈন ও আজীবিক ধর্মের সঙ্গেই কৌম বাঙালীর প্রথম আর্য ধর্ম-পরিচয়।"[৫৮] বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে জৈনদের বাস ছিল। জৈন ধর্ম সূত্রাদিতে বহুবার বঙ্গের নাম উল্লেখ থাকলেও বাংলায় এই

---

[৫৩]আহমদ শরীফ, *বাংলার সুফী সাহিত্য*,বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ.ঋ
[৫৪]সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *উয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে*,পৃ. ১৯৯
[৫৫]নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ. ৪৮১
[৫৬]কোকা আন্তোনভা, গ্রিগ্রেরি বোনগার্দ-লেভিন, গ্রিগ্রোরি কতোভস্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (অনুবাদ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন ভারত ও মধ্যযুগীয় ভারত, দ্বিজেন শর্মা, আধুনিক ভারত, সাম্প্রতিক ইতিহাস), প্রগতি প্রকাশ, মস্কো, ১৯৮২, পৃ. ৬০
[৫৭]প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
[৫৮]নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ. ৪৯২

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের প্রসার কিভাবে হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ় দেশ পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু রাঢ়ের মানুষ তাঁকে সমাদর করেনি। "খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকেই পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গে জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ছিল।"[৫৯] এখনো কোথাও কোথাও জৈনরা রয়েছে। রাজশাহী শহরে মাত্র একটি জৈন মন্দির রয়েছে। রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র যাদুঘরে চব্বিশ জন জৈন তীর্থঙ্করের একত্রে একটি মূর্তি রয়েছে। পাকিস্তান আমলেও রাজশাহীতে শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম-মৃত্যুর দিন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা হতো। বর্তমানে রাজশাহীতে মাত্র একটি জৈন পরিবার রয়েছে। সেই পরিবারের অধিকাংশ সদস্য প্রতিবেশি দেশে বসবাস করে।

বৌদ্ধ ধর্ম বাংলাদেশে জয়জয়কার অবস্থায় ছিল। গৌতম বুদ্ধ বাংলাদেশে আসেন নাই। কিন্তু রাজধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ বাংলাদেশে প্রবেশ করে। মৌর্য সম্রাট অশোকের আগেই বৌদ্ধ ধর্ম বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পর বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। সুসংগঠিত ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মই প্রথম রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। রাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ শাসকরা ধর্মকে ব্যবহার করেন। অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধরা প্রায় চারশত বৎসর বাংলাদেশ শাসন করে। এসময় বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মপালের শাসনামলে নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর বিহার নির্মিত হয়েছিল। এই বিহারে আচার্য বোধিভদ্র বাস করতেন। তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। অতীশ দীপঙ্কর কিছু দিন এই বিহারে ছিলেন।[৬০] শালবন বিহার এ সময়েই নির্মাণ করা হয়। হিউয়েন সাঙের ভারতবর্ষ ভ্রমণের ডায়রি থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার সম্পর্কে জানা যায়।

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় এখনো অনেক বৌদ্ধ পরিবারের বাস ও বৌদ্ধ মঠ-মন্দির রয়েছে। অনেক গবেষক দাবি করেন বৌদ্ধ ধর্মই এক সময় বাংলাদেশের প্রধান ধর্ম ছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্মে বিলীন হলেও বাঙালির দৈনন্দিন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব রয়েছে। মানিকগঞ্জ জেলার কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও বিয়ের সময় বৌদ্ধ রীতি কিছুটা অনুসরণ করা হয়।[৬১] পাহাড়পুর, ময়নামতি, মহাস্থানগড় অঞ্চলে বৌদ্ধ মঠ, মন্দির ও বিদ্যাপীঠগুলো নদী তীরে হওয়ায় বৌদ্ধ শাসনামলে বহির্বাণিজ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষ করে ময়নামতিতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। পাহাড়পুরে পালযুগের তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এখানে সুলতানি

---

[৫৯]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩

[৬০]মমতাজুর রহমান তরফদার, "বাংলার ধর্মজীবন", *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, (প্রধান সম্পাদক, আনিসুজ্জামান), পৃ. ২৫৯

[৬১]মানিকগঞ্জের কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়েতে দেখা যায় বর বিয়ের আসরে যাওয়ার সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মত গেরুয়া কাপড় পরিধান করে। বরের হাতে ভিক্ষুদের মত লাঠি থাকে। গবেষক এই রকম একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মানিকগঞ্জে যে একসময় বৌদ্ধদের বাস ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ভদ্রবাহুর বাড়ি মানিকগঞ্জে। সুতরাং বৌদ্ধদের জীবন প্রণালী বাঙালির জীবনে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

আমলের অনেকগুলো রুপার মুদ্রার সন্ধান মিলেছে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বৌদ্ধ শাসনামলে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক সুদৃঢ় ছিল।[৬২]

বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তিত নানা রূপ সমাজ-মানসে টিকে আছে। মহাযানের বিবর্তিত রূপ মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান। এই চার যানের মধ্যে বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান "এই তিন যানের উদ্ভব যেখানেই হউক বাংলাদেশেই ইহারা লালিত ও বর্ধিত হইয়াছিল।"[৬৩] রাজা মহিপালের সময় পিটো নামক জনৈক আচার্য কালচক্রযান প্রবর্তন করেছিলেন। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম বাংলাদেশের কৌম সমাজের বিশ্বাসগুলো আত্তীকরণ করে পরিপুষ্টি সাধন করেছে। "কৌম সমাজকে বৌদ্ধ ধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, ডাকিনী, পিশাচ ও মাত্রিকাতন্ত্রের নানা দেবী প্রভৃতিকে অসঙ্গ মহাযান-দেবতায়তনে স্থান দান করিয়াছিলেন।"[৬৪] বাংলাদেশের মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ধর্মের কঠিন নিয়ম-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ ছিল না। মনেপ্রাণে বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনে বিশ্বাস করেনি। তাই নিরীশ্বর নৈরাত্ম্য বৌদ্ধ চৈতন্যগুলো ক্রমে বহু দেবতা ও উপদেবতার মন্দিরে পরিণত হল। হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, সহজযান, ইত্যাদি মতাদর্শ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল।[৬৫]

শাক্ত-শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার নিজস্ব ধর্ম। এ ধর্মগুলোর বিকাশ বাংলাদেশে ঘটেছে। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর বিহারের মন্দিরে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে যুক্ত কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে পোড়া মাটির ফলকগুলো এর কিছুটা সাক্ষ্য বহন করে। পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে কৃষ্ণায়ণের গল্পগুলো অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হয়েছে, পূজার উদ্দেশ্য নয়। মন্দিরের ধংসাবশেষে এখনও যে অলঙ্করণগুলো দেখা যায় তা পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভক্তদের এখানে স্থান নেই।

হোসেন শাহী শাসনামলে শ্রী চৈতন্যের ভাব আন্দোলন বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের নবমাত্রা যোগ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম নানা বিবর্তিত রূপে রয়েছে। তবে একথা সত্য যে "বৈষ্ণব ধর্মের রাধা শাক্ত ধর্মের শক্তিরই বৈষ্ণব রূপান্তর মাত্র।"[৬৬] শৈব ধর্মের প্রসার বাংলাদেশে ঘটেছিল। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই শিবভক্ত ছিল। শিব লিঙ্গ এখনো বাংলাদেশে পূজা পায়। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে বাংলাদেশে সৌর ধর্ম প্রসারলাভ করে। রাজশাহী জেলার কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুটি সূর্যমূর্তি কুষাণ পর্বের না হলেও আদি গুপ্ত পর্বের।[৬৭] বগুড়া জেলায় সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে। এসব থেকে অনুমান করা হয় বাংলাদেশে একটি সৌর সম্প্রদায় গড়ে ওঠেছিল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কুবের ইত্যাদি বৈদিক

[৬২]মমতাজুর রহমান তরফদার, "বাংলার ধর্মজীবন", *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (প্রধান সম্পাদক, আনিসুজ্জামান), পৃ. ২৬৫
[৬৩]নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ. ৫২৯
[৬৪]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫
[৬৫]আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, পৃ. ৯৪
[৬৬]নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ. ৪৯৯
[৬৭]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১

দেবতাদের স্বতন্ত্র মূর্তি বাংলাদেশে পাওয়া গেছে।"পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তি-গাত্রে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ এবং কুবেরের একাধিক প্রতিমা-প্রমাণ বিদ্যমান।"[৬৮] পরবর্তী সময়ে এসব দেবতারা অনেকেই বাংলাদেশ থেকে বিলীন হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস ও সংস্কারগুলো প্রধানত কৌম সমাজ থেকে এসেছে। গ্রাম দেবতা, অশরীরী ভূত-প্রেতে বিশ্বাসসহ আরো কিছু ধর্মানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো সাধারণত এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় পালন করে। তারপরও বলা যায় সব সময় সব দেবতা সমান মর্যাদা পায়নি। শাসকদের দেবতারা অধিক মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিশ্বাসগুলো সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যায়নি। গুপ্ত আমল থেকে শুরু করে মুসলমানদের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের উপরের স্তরে বিভিন্ন অনার্য উপকরণের সঙ্গে মিশেছে বৈদিক, পৌরাণিক, বৈষ্ণব, শৈব,-শাক্ত, ও সৌর উপদান। একদিকে সৃষ্টি হয়েছে লৌকিক দেবদেবী, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসম্মত দেবতায়নের। এ দুয়ের মধ্যে মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছে।[৬৯]

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ওদন্তপুরি জয় করেন। ওদন্তপুরি ছিল বৌদ্ধ বিহার। মুসলিমরা এর নাম দেন বিহার।[৭০]এসময় রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়ভাবে আরবীয় খিলাফত নতুন শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।[৭১] নদীয়া দখলের আগে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজী মুহাম্মদ ঘোরী ও কুতুব-উদ-দীন আইবেকের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে ব্যর্থ হন। কিন্তু অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হিজবর-উদ-দীন তাকে ভিউলি ও ভাগত নামে দুটি পরগণার জায়গীর নিযুক্ত করেন। এসময় তিনি ছোট ছোট অনেক রাজ্যে লুটপাট করে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন। লুটের মালামাল ও নগদ অর্থ নিয়ে তিনি মুহাম্মদ ঘোরীর ভারতের প্রতিনিধি কুতুব-উদ-দীন আইবেকের সঙ্গে দেখা করেন। এর পরের বছর অর্থাৎ ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজী বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে নদীয়া দখল করেন। লক্ষণ সেনের ধনরত্ন, রাজকীয় পরিবারের অনেক মহিলা, ভৃত্যবর্গ, ক্রীতদাস ইত্যাদি সকল কিছু বিজয়ী বাহিনীর দখলে আসে। বখতিয়ার খলজী নদীয়া জয় করে খোৎবা পাঠ করানোর ব্যবস্থা করেন এবং কুতুব-উদ-দীন আইবেকের নামে মুদ্রা চালু করেন।[৭২] খলজী বাংলাদেশ দখল করে শাসন করেন মাত্র তিন বছর। এ সময়ের মধ্যে তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা স্থাপন করেন। ১২০৫ সালে বখতিয়ার খলজী তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন এবং তিন বছর পর দেবকোটে মৃত্যুবরণ করেন।

---

[৬৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০
[৬৯]মমতাজুর রহমান তরফদার, "বাংলার ধর্মজীবন", *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, (প্রধান সম্পাদক, আনিসুজ্জামান), পৃ. ২৬৭
[৭০]আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭],*
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ.২০
[৭১]Richard M. Eaton, *The Raise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760),*Oxford University Press, New Delhi, First Indian edition 1994, Fifth impression 2006, P.23
[৭২]খান-সাহেব আবিদ আলী খান, *গৌড় ও পাভুয়ার স্মৃতি*, পৃ.৩

অনেকে বলেন আলী মর্দান তাকে হত্যা করে।[৭৩] প্রকৃতপক্ষে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর রাজ্য বিস্তারের মধ্যে দিয়ে রাজধর্ম হিসাবে ইসলাম বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশে তিনভাবে ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়েছে। বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আরবীয় কিছু ব্যবসায়ী উপকুলীয় অঞ্চলে এসেছে। এদের অনেকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। সুফি-সাধকদের দ্বারাও এদেশে ইসলামের প্রচার – প্রসার হয়েছে। তবে ব্যবসায়ী এবং সুফি-সাধকদের দিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রসার খুব সামান্যই হয়েছে। রাজধর্ম হিসাবে ইসলামের আগমন ঘটায় এর বিস্তৃতি বাড়ে দ্রুত। বাংলাদেশ হচ্ছে আদ্র-বদ্বীপ। ইসলাম মরুভূমি অঞ্চলের ধর্ম। মরু অঞ্চলের ধর্ম এ অঞ্চলের মানুষ কিভাবে গ্রহণ করেছিল তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জেভিয়ার দ্য প্লানহোল বলেছেন, "এটি হচ্ছে বেদুইনদের দ্বারা প্রচারিত শহরবাসী ও ব্যবসায়ীদের ধর্ম; এরা জমি ও জমিতে কাজ করা মানুষকে ঘৃণা করে।"[৭৪] বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ করে এবং তারা গ্রামে থাকে। এই গ্রামবাসীরাই প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

বখতিয়ার খলজীর সৈন্যবাহিনীর সবাই পরিবার-পরিজন সঙ্গে নিয়ে আসেনি। এক স্থান ও একই সংস্কৃতির মানুষও তারা ছিলেন না। সব সৈন্য ফিরেও যায়নি। অনেকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। ফলে এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বহিরাগতদের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। বখতিয়ার খলজীর সৈন্যবাহিনীতে আরবের সৈন্য ছিলনা। সুফিরা সবাই এক স্থান থেকে আসেনি এবং এক সংস্কৃতি ও এক তরিকাভূক্ত নয়। নানা স্থান থেকে এবং নানা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন তরিকার সুফিরা এদেশে এসেছে। এদের মধ্যে অনেকেই এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। অনেকে আবার কিছু সময় অবস্থান করে ফিরে গেছেন। সুফি সাধকদের মাজারগুলো এখনো সাধারণ মানুষের অতৃপ্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে রয়েছে।

মুসলিম শাসিত ভারতবর্ষের রাজভাষা ফার্সি ছিল প্রায় ছয়শত বছর। আরবি এদেশের শাসক – শাসিতের ভাষা হয়নি। এমনকি এদেশের 'আশরাফ' শ্রেণির ভাষাও আরবি ছিলনা। এদেশের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের মত করেই। সাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও পূর্বের বিশ্বাস, আচার-আচরণ তারা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেনি। জনজীবনে ভূত-প্রেতে, তাবিজে-কবজে-কবরে বিশ্বাস থেকেই যায়। মুহম্মদ এনামূল হক সাধারণ মানুষের এই ধর্মের নাম দিয়েছেন 'লৌকিক ইসলাম'। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

---

[৭৩]প্রাগুক্ত, পৃ.৩

[৭৪] জেভিয়ার দ্য প্লানহোলের এই উদ্বৃতিটি আকবর আলি খানের, *Discovery of Bangladesh : Exloration into Dynamics of a Hidden Nation* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ থেকে নেয়া। *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, আমিনুল ইসলাম ভুইয়া (অনূদিত) , বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৭৭

> সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে শাস্ত্রীয় ইসলাম কোনদিনই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। ফলে, আটঘাটবাঁধা শাস্ত্রীয় ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া, যে সকল সুফি ইসলামের সহিত এদেশীয় চিন্তাধারার যোগ ঘটাইলেন, তাহারাই সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানের হৃদয় অধিকার করিলেন। ইহাতে ফল হইল এই যে, বাঙলার সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এমন এক প্রকারের নতুন ইসলামের জন্মলাভ করিল, যাহাকে 'লৌকিক বলিয়া নাম দেয়া যায়। বাঙলার এই লৌকিক ইসলামের রূপ অতি চমৎকার ও কৌতুকাবহ। ইহাতে হিন্দুধর্ম স্থান পাইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম জায়গা করিয়া লইয়াছে এবং আর্য, অনার্য ও বৈষ্ণব-বিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে।[৭৫]

বাংলাদেশ লৌকিক ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বেশি। তবে শরিয়তপন্থীদের সংখ্যাও কম নয়। ওহাবি-ফরায়জি আন্দোলনের আগে এদেশে শরিয়তী ইসলামের চেয়ে লৌকিক ইসলামই গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশে শুধু লৌকিক ইসলাম বিকশিত হয়েছে তা নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই ইসলাম সে দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে বিকশিত হয়েছে। আমাদের দেশে ইসলাম সরাসরি আরব থেকে আসেনি। ইরান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, আফগান থেকে ইসলাম বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এসব দেশে বিকশিত ইসলামের রূপই বাংলাদেশে স্থান করে নেয়, দেশী সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ায়।

জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম, খ্রিস্টান কোন ধর্মই বাংলার নয়। এদেশের মানুষ বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু কোন ধর্মই সে অবিকৃত রাখেনি।"জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলামকে সে নিজের পছন্দমত রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে।"[৭৬] তবে শাসকদের ধর্ম এদেশে দ্রুত বিকশিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালি তাদের মত করেই ধর্ম-কর্ম করেছে। ফলে ধর্মের বিকৃত রূপ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত। এ-সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতির ফলে পেলাম বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান ও নাথপন্থ। ব্রাহ্মণ্য বিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা, ইসলামী বিকৃতিতে এল সত্য পীরকেন্দ্রী বহু দেবকল্প ও দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক পীর – যাদের দু'চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিক কাল্পনিক। আজো আমাদের সামাজিক, পারবণিক ও আচারিক রীতি-নীতিতে আদিম Animsm, Magic belief প্রবল ও মুখ্য।[৭৭]

বিদেশী-বিভাষীর ধর্ম বাঙালি গ্রহণ করেছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখেনি। তাই বাঙালির জনজীবনে অনার্য সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব এখনো রয়েছে। বাঙালির ধর্মজীবন আলোচনা করলে দেখা যায়, "আগে আমরা ছিলাম animsm পরে হলাম pagan, তারও পরে ছিলাম হিন্দু-বৌদ্ধ।"[৭৮] বর্তমানে আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং মুসলমান। ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মূল বাংলার ৩,৫৭,৬৯,৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১৭,৬০৯,১৩৫ এবং হিন্দুর সংখ্যা

---

[৭৫] মুহম্মদ এনামূল হক, "বঙ্গে 'লৌকিক ইসলাম' -এর উদ্ভব", *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, রায়হান রাইন (সম্পাদিত), সংবেদ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৯

[৭৬]আহমদ শরীফ, *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, পৃ. ৫৮

[৭৭]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৭৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৮,২০০,৪৩৮। বাকি অন্য সম্প্রদায়ের লোক। শতকরা হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের হার যথাক্রমে ৫০.১% এবং ৪৮.৮%।[৭৯] ১৮৮১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ৩৫,৬০৭,৬২৮ জনের মধ্যে মুসলমান ১৭,৮৬৩,৪১১ (৫১.১৬%) ও হিন্দু ১৬,৩৭০,৯৬৬ (৪৮.৪৫%)।[৮০] বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমছে। সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর থেকে দ্রুত হারে কমতে শুরু করেছে এখনো কমছে।

১৭০৯ সালে কলকাতার সেন্টয়্যান গির্জা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এদেশে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের পথ সুগম হয়। ১৭৫৬ সালে সিরাজদ্দৌলা কলকাতা শহর লুণ্ঠন করার সময় গির্জাটি ধ্বংস করেন।[৮১] খ্রিস্টান মিশনারীরা শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে এদেশে ধর্মান্তরকরণের কাজ করেন। বাঙালিদের মধ্যে ১৮০০ সালের ২৮ ডিসেম্বর কৃষ্ণপাল নামে এক সুতার প্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮০১ সালে কৃষ্ণপালের শ্যালিকা জয়মণি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। জয়মণিই বাঙ্গালা মণ্ডলীর প্রথম মহিলা সভ্য।[৮২] সাধারণত খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা লোভ-লালসা, ছলনা ইত্যাদি কলাকৌশল ব্যবহার করে এদেশের মানুষকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তর করেন। এক্ষেত্রে উজ্জল দৃষ্টান্ত হল মাইকেল মধুসুদন দত্ত। যেসব বাঙালি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে ধর্ম প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-১৮৮৫) নাম সবার আগে আসে। খ্রিস্টধর্ম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কোম্পানি মিশনারীদের সাহায্য-সহযোগিতা করেনি। হিন্দু-মুসলিম সমাজের বাধার সম্মুখীনও মিশনারীরা হয়েছেন। সাধারণ নিম্নশ্রেণির হিন্দু-মুসলমানেরাই খ্রিস্টান হয়েছে। সীমিত আকারে বাড়ছে খ্রিস্টানদের সংখ্যা এদেশে। মিশনারীদের কাজ করার ফলে আদীবাসী জনগোষ্ঠীর অনেকেই খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে যারা animist ছিল পরে pagan হয়ে এখন তারা প্রায় সবাই খ্রিস্টান।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলাদেশের ভূখণ্ড প্রাচীন। এখানকার ভাষাও প্রাচীন। বাঙালি জাতির ন্যায় বাংলা ভাষাও নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। বাংলা বর্ণমালা বহু পরিবর্তন ও সংশোধনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে। গবেষকদের বর্ণনা অনুসারে বাংলা বর্ণমালা উদ্ভব হয় ব্রাহ্মী লিপির ‘কুটিল’ রূপভেদ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে। অষ্টম শতাব্দীতে রচিত *আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প* সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায়, “গৌড় ও পুণ্ড্রের

[৭৯] *Report on the Sensus of Bengal*, 1872, Calcutta, 1872, pp. xxxII-xxxIII (General statement IB), ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩

[৮০] *Report on the Sensus of Bengal*, 1881, Calcutta, 1883, p. 74, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৮১] সুশীলকুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালর নবজাগরণ*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৭

[৮২] প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩

Dhaka University Institutional Repository

লোকেরা 'অসুর-ভাষা'- ভাষী (অসুরাণাং ভবেৎ বাচা-গৌড়-পুণ্ড্রোদ্‌ভবা সদা)।"[৮৩] মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, "এই 'অসুর-ভাষা' যে 'অস্ট্রিক'-বুলি তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান বাংলা ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে আমাদের দেশে যে এই 'অসুর-ভাষা' বা 'অস্ট্রিক' বুলি প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নেই।"[৮৪] বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ভাষার কিছু শব্দ এখনো রয়েছে। ভাষা বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে 'গৌড়ী-প্রাকৃত' থেকে। সংস্কৃত থেকে এ ভাষার উদ্ভব নয়। বর্তমান কালের বাংলা ভাষাতেও সংস্কৃতের প্রভাব কম।

> সংস্কৃত কোন কালেই লোক-ভাষা ছিল না, জন-জীবনের দৈনন্দিন কাজে মানুষ কোন সময়ই সংস্কৃত ব্যবহার করতো না। শাস্ত্র চর্চা, সাহিত্য রচনা প্রভৃতির জন্যে বৈদিক ভাষার সাথে সংগতি রেখে, তার উপর নির্ভর করে বৈয়াকরণিকেরা অনেকটা সেই ধরনের কৃত্রিম ভাষা গড়ে তুলেছিলেন। পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংস্কৃতের ব্যবহার টিকে ছিল ঠিকই, কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের গণ্ডির বাইরে যেতে পারেনি।[৮৫]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই মত সমর্থন করে লিখেছেন, "সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা জন্মিয়াছে এইরূপ মত কেহই পোষণ করিতে পারেন না, কারণ ভাষা প্রবাহের মধ্যে আমরা বাঙ্গালার পূর্বে অপভ্রংশ, তাহার পূর্বে প্রাকৃত যুগ দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক একটি সাহিত্যিক ভাষা।"[৮৬] আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> আদিযুগে সংস্কৃত ছিল বাংলা-ভারতের ধর্মের, শিক্ষার দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাব বিনিময়ের বাহন। বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারের বাহন রূপেই প্রথম দুটো বুলি – পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেককাল রাষ্ট্রশাসন কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগেনি বলে আর কোন বুলিই লেখ্যভাষার মর্যাদা পায়নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠি ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষায় রূপ পায়।[৮৭]

নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে "বাংলা ভাষা স্থায়িত্বরূপ লাভ করিয়াছে। এই চারিশত বৎসরই বাংলা-ভাষার সৃজ্যমান কাল। এই সময়ের একেবারেই গোড়ার দিকে বঙ্গদেশে 'সংস্কৃত' ছাড়া আরো দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল - তাহার একটি 'সৌরসেনী-প্রাকৃত' বা 'সৌরসেনী-অপভ্রংশ' আর একটি 'মাগধী-প্রাকৃত' বা 'মাগধী অপভ্রংশ'। এই মাগধী-অপভ্রংশেরই বিবর্তিত রূপ বাংলা ভাষা।"[৮৮] তবে ঊনিশ শতকের আগে বাংলা ভাষা শক্তিশালী ভাষা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি।

অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। কুড়ি, কলা, তাম্বুল বা পান, লাঙ্গল, লিঙ্গ, কম্বল, কার্পাস ইত্যাদি শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে অস্ট্রিক ভাষা থেকে। খাঁ-খাঁ, বাদুড়, ঠোঁট,

---

[৮৩] মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ. ৫
[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
[৮৫] অজয় রায়, *বাংলা ও বাঙালী*, পৃ. ৩১
[৮৬] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা. ২০১২, পৃ. ২৭
[৮৭] আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা ২০০০, পৃ. ৬০
[৮৮] মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৭

নারকেল, বাসি, পেট, ছোট, ঘন্টা, করাত, দা জাম্বুরা, ময়ূর ইত্যাদি শব্দগুলো অস্ট্রিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার ছাপ স্পষ্ট। কুটীর, ওড়না, কুকুর, কানা, মাদুর, ছোলা, বিড়াল, নীর, গোটা, নিরালা ইত্যাদি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এদেশের আদি বাসিন্দা। আধুনিক বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি ফার্সি শব্দ চালু রয়েছে। বাংলা ভাষার মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার ফার্সি শব্দ রয়েছে।[৮৯] তুর্কি এবং আফগান সেনাবাহিনী বাংলাদেশ দখলের পর দীর্ঘ সময় শাসনের মধ্যে দিয়ে ফারসি বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। তুর্কিদের রাজভাষা ছিল ফার্সি, আর গৃহভাষা ছিল তুর্কি।[৯০] বাংলাদেশে প্রায় ছয়শত বৎসর রাজভাষা ছিল ফার্সি। মধ্যযুগে অভিজাত বাঙালি মুসলমানের ভাষা ছিল ফার্সি। ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত ফার্সি ছিল দরবারের ভাষা।

হুসেন শাহের শাসনকালে পর্তুগিজরা বাংলাদেশে বাণিজ্য করতে আসে। পর্তুগিজদের সঙ্গে তাদের ভাষাও বাংলা ভাষায় এসেছে। আতা, আনারস, ইস্পাত, কপি, কামরা, কেরানি, গামলা, গির্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, নিলাম, পেঁপে, বেহালা, মিস্ত্রী, বারান্দা, ফিতা ইত্যাদি পর্তুগিজ শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। পর্তুগিজ শব্দের মত ইংরেজি বহু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে ১৮৩৬ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ফার্সির স্থলে ইংরেজি রাজভাষা হিসাবে প্রবর্তন করার পর। ডাচ কিছু শব্দও বাংলা ভাষায় যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান পেয়েছে। হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ ইত্যাদি শব্দগুলো ডাচ।

শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত ব্যাপটিস্ট মিশন বাংলা ভাষা আধুনিকায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মিশন থেকে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করে প্রচার করা হয়। প্রায় একই সময়ে কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* ও কাশিরাম দাসের *মহাভারত* এবং বাংলা গদ্যের পাঠ্যপুস্তকগুলো শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হয়। মিশনের পাদ্রী উইলিয়াম কেরী বাইবেলের অুনবাদ ছাড়া আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে রামরাম বসুর নাম স্মরণযোগ্য। তিনি প্রথমে পাদ্রি জন টমাসের বাংলা শিক্ষক ছিলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি *জ্ঞানোদয়* নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ১৮০২ সালে তিনি *লিপিমালা* প্রকাশ করেন। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটিও বাংলা গদ্যের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়।[৯১] বাংলা ভাষার বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা রয়েছে।

বাঙালি অভিজাত মুসলমানেরা বাংলা ভাষা গ্রহণ করতে যথেষ্ট সময় নেয়। নবাব আব্দুল লতিফ প্রমুখ বাঙালি মুসলমান বাংলাকে নিজেদের ভাষা বলে গ্রহণ করেনি। নবাব আব্দুল লতিফের মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির দরবারি ভাষা ছিল ফার্সি, ইংরেজি, উর্দু। বাংলার স্থান হয়নি। তিনি মনে করতেন,

[৮৯] অজয় রায়, *বাংলা ও বাঙালী*, পৃ. ৩০
[৯০] এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ, উনিশ শতক*, অবসর, ঢাকা ২০১৩, পৃ. ১৮৪
[৯১] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৩

"বাংলার মুসলিম ছোটলোকদের ভাষা বাংলা। আর অভিজাতদের ভাষা উর্দু।"[৯২] অভিজাত বাঙালি মুসলমানেরা বাড়িতে কিংবা মজলিসে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেন না। মীর মশাররাফ হোসেন *আমার জীবনী* গ্রন্থে লিখেছেন,

> মুন্সী সাহেব বাঙ্গালার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। সে সময়ের বাঙ্গালা পত্র কথাবার্তায় ভাষায় অর্থাৎ যে গ্রামের যেরূপ তাহাতেই লেখা হইত। খত্পত্র ভিন্ন অন্য কোন কার্যে ভাষার ব্যবহার ছিল না, কাহারও প্রয়োজনও হয় নাই। কারণ চিঠে পাঠে জমা ওয়াশীল বাকি, মনকষা, সেরকষা, চাকরাণ, মাহিনার হিসাব, জমা-খরচ, নগদ টাকা দাদন উশীল, খরিদ বিক্রয় হিসাব ভিন্ন সে সময় সাধু ভাষার ব্যবহারের কোন স্থান ছিল না। কাজেই মুন্সী সাহেবরা বাঙ্গালার কিছুই জানিতেন না। যাহারা জমিদারের খাজনা আদায়কারী গোমস্তা বা পাটওয়ারী ছিল, তাহারা জমা খরচ বাকীজায়, দাখিলা লেখা চিঠে পাঠের বিদ্যা থাকিলেই গ্রামে তাঁহার নাম জাঁকিয়া উঠিত। মুন্সী সাহেবরা ওরকম বিদ্যার নিকটে যাওয়া অপমান বিশেষ বোধ করিতেন। ঐ পরিমাণ বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তাহা জানিবেন কেন? আমার পূজনীয় পিতা বাঙ্গালার একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষর চিনিতেন, যেমনই কেন জড়ানো লেখা না হউক পড়িতে পারিতেন। কথার ভাষায় এবারত বলিয়া দিতেন, মুহুরী অথবা অপর কেহ পত্রাদি লিখিত। তিনি ফরাসীতে নাম সহি করিতেন।[৯৩]

অভিজাত অর্থাৎ আশরাফ বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেনি। বাংলার চেয়ে ফারসি, উর্দু ছিল তাদের ভাব প্রকাশের ভাষা। উর্দু বাঙালির ভাষা নয়। উর্দু ভাষায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তারপরও উর্দুকে বাঙালির রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত করার জন্য অভিজাত বাঙালি মুসলমানের মনোজগত ছিল সক্রিয়।

ভাষা শক্তিশালী হয় সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। শেক্সপিয়ারের সময় বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি হলেন সৈয়দ সুলতান ও মুকুন্দরাম।[৯৪] বাংলা ভাষা গতিশীল ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করে উনিশ শতকের শুরুতে। "ইতিপূর্বে আমাদের সাহিত্য কেবল পদ্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং ধর্ম ছিল সাহিত্যের বিষয়বস্তু। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য প্রধানত শাক্ত ও বৈষ্ণব কাব্যের সমষ্টি।"[৯৫] উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিশ্বমানের সাহিত্য সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষার আধুনিকায়ন হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ লেখকের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা শক্তিশালী সাহিত্যের ভাষা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে বাংলা বিশ্বের অন্যতম ভাষা।

---

[৯২] আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, পৃ. ৬৬

[৯৩] মুন্সী সাহেব মীর মশার্‌রাফ হোসেনের শিক্ষক। এই মুন্সী সাহেব মীর মশার্‌রাফ হোসেনের পিতারও শিক্ষক ছিলেন। কথিত ছিল মুন্সী সাহেব হাতে খড়ি দিলে দারগার চাকরি অবশ্যই পাওয়া যাবে। মীর মশার্‌রাফ হোসেন, *আমার জীবনী*, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), জেনারেল, কলকাতা, বাংলা ১৩৮৪ , পৃ. ৭৯

[৯৪] আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, পৃ. ৬১

[৯৫] সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ*, পৃ. ২৩৭

ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। ভাষার জন্য বিশ্বে একমাত্র বাঙালি জাতি প্রাণ দিয়ে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষের বাস ছিল এই ভূখণ্ডে। এই ভূখণ্ডের বাইরে থেকে মানুষ যেমন এসেছে তেমনি বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ এসেছে, কিন্তু সে সব ধর্ম ও মত এদেশে বিকশিত হয়েছে নিজস্ব রূপে। ফলে আদি ধর্মমতের সঙ্গে বঙ্গ অঞ্চলে বিকশিত মতের পার্থক্য অনেক। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম বাংলাদেশে নিজস্ব রূপে বিকশিত হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধ মত সহজযান, কালচক্রযান, বজ্রযান হয়ে বাউল মতে রূপ নিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলায় নতুন নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণার সৃষ্টি হয়। নতুন জ্ঞানের সঙ্গে বাঙালি পরিচিত হয় ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের মনন জগতে ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনার সঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধের সংযোগ ঘটে। এর সবটাই বাইরে থেকে আসে নাই। বাঙালির ধর্মচিন্তার কথা উল্লেখ করেছি সে অনুসারে ইসলামও এদেশের চিন্তার জগতে স্থান পেয়েছে। বাঙালির দর্শন চিন্তার ইতিহাস আলোচনার মধ্যে এটা পরিষ্কার হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙালির দর্শনচিন্তার ইতিহাস

জীবন ও জগতের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাকেই সাধারণ অর্থে দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন কালে বৃহৎবঙ্গের মানুষ জগৎ ও জীবনের রহস্য নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। জগতের আদি কারণ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। জানার চেষ্টা করেছে জগতের আদি কারণ কি? প্রাচীন কালের মানুষের এই চেষ্টাকেই তাদের দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিককালে বাংলাদেশে মানুষের বসতি ছিল। তারা জ্ঞানচর্চা করেছে। জীবনের প্রতিকূল সমস্যার সমাধান করেছে। বস্তুকে কেন্দ্র করেই তারা জীবন ও জগতের সমস্যাগুলো সমাধান করেছে। প্রাচীনকালের এই ভূখণ্ডের মানুষের বস্তুকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনাকে লোকায়ত দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুকেন্দ্রিক চিন্তার সঙ্গে ভাবকেন্দ্রিক চিন্তাও বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীনকালে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এই অঞ্চলে। নাগরিক জীবনে দর্শনের বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছিল। নাগরিক জীবনের বাইরে ছিল বিশাল জনগোষ্ঠী, সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষ লোকায়ত চিন্তা-চেতনা দিয়ে প্রভাবিত ছিল। প্রাচীনকালে, "সাধারণ মানুষ ভাববাদে বিশ্বাস করেনি, বিশ্বাস করেছে দেহাত্মবাদেই, বস্তুবাদেই। প্রমাণ, প্রাচীনদের অজস্র উক্তি। তাঁরা বলেছেন, বারবার বলেছেন, লোকায়ত মানে হলো সাধারণ মানুষের দর্শন, আর এই দর্শন অনুসারে মূর্ত জড় জগৎটাই একমাত্র সত্য : আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, পরলোক নেই, পুরুষার্থ বলতে শুধু অর্থ ও কাম।"[১] লোকায়ত দর্শনের কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতায় লোকায়ত চিন্তার কিছু উপাদান পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালি রামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

> প্রয়োজনীয় বিষয়ে যারা ধর্মপরায়ণ হ'তে যায় তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়, তারা ইহলোকে কষ্ট পায়, মরণান্তেও বিনাশ পায়। পিতৃশ্রাদ্ধে কেবল অন্নের নাশ হয়, মৃত ব্যক্তি কখনও আহার করতে পারে? চতুর লোকের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে আছে – যজ্ঞ কর, দান কর, তপস্যা কর, ত্যাগ কর, ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য কেবল জনসাধারণকে বশীভূত করা। অতএব রাম, তোমার এই বুদ্ধি হ'ক যে পরলোক নেই। যা প্রত্যক্ষ তার জন্যই উদযোগী হও, যা পরোক্ষ তা পরিহার কর।[২]

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদের মানুষ বস্তুকেন্দ্রিক চিন্তা করেছে। এ-কারণে শাস্ত্রকাররা এদেশে না আসার বিধান দিয়েছিল। ''বঙ্গদেশকে তখন বলা হতো অপবিত্র এবং ব্রাত্যদের দেশ। ব্রাত্যদের দেশ বলা হতো এই জন্যে যে, এদেশের লোকেরা বৈদিক পূজাপার্বণ পালন না করে স্থানীয়

[১] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম পুনমুদ্রণ ১৪১৬, পৃ. ৮৮

[২] বাল্মীকি, *রামায়ণ*, (সরলানুবাদ) রাজশেখর বসু, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, দশম মুদ্রণ বাংলা ১৩৯৬, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্রত্যাদি পালন করতেন। শাস্ত্রকাররা সে কারণে ‘সে দেশে যেয়ো না’ বলে বিধান দিয়েছিলেন।”[৩] শাস্ত্রকারদের নিষেধ অমান্য করে এদেশে এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের মানুষ। শাস্ত্রকারদের বিধান অমান্য করে যারা এদেশে এসেছে তাদের অনেককে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে আর্যরা এদেশে আসে। উত্তর ভারতে আর্যদের আগমন ঘটে আরো আগে। আর্যদের সঙ্গে আসে তাদের সংস্কৃতি। কোন স্থান থেকে আর্যরা এদেশে আসে তা নিয়ে মতভেদ আছে। অনুমান করা হয়,

> পূর্ব ইউরোপের কোন স্থানে ইহাদের আদি পিতৃভূমি ছিল। সেখান হইতে ইহারা - হয় মাসিডন ও থ্রেশিয়া এবং কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে এশিয়া মাইনরের উত্তর ভাগ হইয়া না হয় কৃষ্ণসাগরের উত্তরে দক্ষিণ রাশিয়া হইয়া, ককেসাস পর্বত পার হইয়া - প্রথমে মেসোপোটামিয়ায় আসে। সেখানে বাবিল ও আসিরীয় জাতি এবং অন্যান্য সুসভ্য জাতির সংস্পর্শে আসে, তাহার পর পারস্যদেশ হইয়া ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে বসতি স্থাপন করে।[৪]

বিজয়ী আর্য সংস্কৃতি এদেশের মানুষ গ্রহণ করলেও জনমনে থেকে যায় লোকায়ত বিশ্বাস। আর্যদের আগমনের আগে এদেশে নিষাদ ও কিরাত জাতির বাস ছিল। “বাংলাদেশ স্বরূপত আর্য অধ্যুষিত নয়, আর্যরক্ত-শঙ্কর মানুষও এখানে সুদুর্লভ। এ জন্যই বাহ্যত আর্যীকৃতি ও আর্যায়ণ সম্ভব হলেও অন্তরে বাঙালীরা লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ রক্ষা করেই চলেছিল।”[৫]

বাংলাদেশ ভারত উপমহাদেশের প্রান্তিক দেশ। ভারতবর্ষের চিন্তার সঙ্গে বাঙালির চিন্তায় প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভারতবর্ষে সংশয়বাদী ও বস্তুবাদী চিন্তার ইতিহাস প্রাচীন। ভারতবর্ষে “লোকায়ত, বস্তুবাদী এবং সংশয়বাদী দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দেই। সম্ভবত বুদ্ধের জন্মের সময়কালেই। (বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে পাওয়া সূত্রের বিচারে)। উপনিষদেও এইরকম চিন্তাধারার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। এসব চিন্তাধারা পরবর্তী সময়ে চার্বাক দর্শন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।”[৬] এ সব তথ্য প্রমাণাদি থেকে বলা যায় বস্তুবাদের বিকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশে। শৈব ধর্মাবলম্বীরা প্রধানত ইহজাগতিক। “কাপালিকের ধর্ম বৈদিক ধর্ম বিরুদ্ধ (শৈব তন্ত্রানুসারে ইহাদের উপাসনা)।”[৭] কাপালিকদের সঙ্গে লোকায়তদের মিল থাকলেও উভয়ে এক নয়। কাপালিকেরা ইন্দ্রিয় সুখকেই প্রাধান্য দেয়। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাইরে অন্য কোন কিছু তারা গ্রহণ করতে রাজি নয়। গুণরত্ন কাপালিক ও লোকায়তিকদের অভিন্ন মনে করেছেন। মাধবাচার্যের মতে লোকায়তিকেরা কামাচারী–অর্থ ও কাম সাধনাই তাদের লক্ষ্য।[৮]

---

[৩] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫১
[৪] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, বাংলা ১৩৬৪, পৃ. ১৫৭
[৫] আহমদ শরীফ, *বাঙালীর চিন্তা-চেতনায় বিবর্তনধারা*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৩১
[৬]Amartya Sen, *The Argumentative Indian*, Penguin Books, New Dilhi, 2005, p.23
[৭] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ৩৭
[৮] আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া , ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

চার্বাক বিশুদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়। চার্বাকেরা বস্তুজগৎকে চরম সত্য বলে ধরে নেয়। প্রত্যক্ষই তাদের মতে একমাত্র জ্ঞানের উৎস। চার্বাক দর্শন ভারতীয় নাস্তিক্যবাদী দর্শনের অন্যতম একটি শাখা হলেও প্রাচীন কালে বাঙালির দর্শন চিন্তায় বস্তুবাদী দর্শনের উপস্থিতি দেখা যায়। অনুমান করা হয় আর্যদের আগমনের আগে এখানকার মানুষে লোকায়ত চিন্তা-চেতনা দিয়ে প্রভাবিত ছিল। বৈদিক ধর্ম-দর্শনকে চার্বাকেরা গ্রহণ করেনি। "বৃহস্পতিলৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রহ্মাণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলে ঘোষণা করেন। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী। একারণে তাদেরকে বার্হস্পত্য বা লোকাতিক বলা হয়।"[৯] বৃহস্পতি কোন সময়ে জন্মেছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। লোক প্রবাদ অনুযায়ী চার্বাক দর্শনের প্রবক্তা হিসাবে বৃহস্পতিকে ধরে নেয়া হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিব্রাজক শ্রেণি হিসাবে যে ঋষিদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি। বৌদ্ধ সাহিত্যের এই পরিব্রাজকরা ছিলেন তর্ক কুশলী এবং ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে উদাসীন। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের সফিস্টদের চিন্তার সঙ্গে এই পরিব্রাজকদের চিন্তার মিল রয়েছে। বৃহস্পতি লোকায়ত দর্শন লিখে যান নাই। "বুদ্ধের সমসাময়িক কৃষ্ণ মিশ্র লোকায়ত দর্শনের মূলনীতিগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। লোকায়ত দর্শন অনুসারে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ উপাদান নিয়ে এই জগৎ গঠিত। সম্পদ এবং আনন্দই জীবনের লক্ষ্য। বস্তু চিন্তাক্ষম।"[১০]

ভারতবর্ষে বস্তুবাদী, সংশয়বাদী চিন্তার ইতিহাস প্রাচীন। রামায়ণের জাবালি মুনি, হরিবংশের রাজা বেণ, গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক অজিত কেশ কম্বলী, তাঁর শিষ্য পায়াসি, ভাগুরিসহ অনেকে ছিলেন বস্তুবাদী চিন্তার আদি প্রণেতা। পকুদ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত, মহাবীরসহ অনেকেই প্রাচীন ভারতে দর্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অজিত কেশকম্বলী জড়বাদী দার্শনিক। তাঁর মতে, ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ এবং ব্যোম এই পাঁচটি পদার্থের সমন্বয়ে জীবের সৃষ্টি। মৃত্যুর পর এই পঞ্চভূত পুনরায় স্বস্থানে চলে যায়। পকুদ কচ্চায়নের মতে, জীব ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ, সুখ, দুখ এবং জীব-এই সাতটি ভূতের সমষ্টি। এগুলো শাশ্বত এবং অব্যয়। সঞ্জয় বেলটঠিপুত্ত বলতেন ভালমন্দ বলতে কিছু নেই। পুরস্কার বা শাস্তি বলতেও কিছু নেই।[১১]

সাংখ্য এবং বৈশেষিক দর্শনে বস্তুবাদী ছাপ স্পষ্ট। কণাদের মতে, বস্তু মাত্রই বিভিন্ন উপাংশের সমষ্টি এবং পরমানুর সমন্বয়ে সৃষ্টি। কণাদের পরমানুবাদকে গ্রীক দর্শনের ডেমোক্রিটাসের পরমানুবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বাদরায়ন, শঙ্করসহ অনেক বেদপন্থী দার্শনিক কণাদের মতবাদের সমালোচনা করেছেন। "বাদরায়ন ব্রহ্ম-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বৈশেষিক দর্শনের এই সৃষ্টি বিষয়ক তত্ত্বটি খণ্ডন

---

[৯] আহমদ শরীফ, *বাঙলার সুফি সাহিত্য (আলোচনা ও নয়খানি গ্রন্থ সম্বলিত)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. উ

[১০] M. N. Roy, ``Materialism in Indian Philosophy'', *Selected works of M. N. Roy* ,Volum IV, 1932-1936 (Ed) Sibnarayan Roy, Oxford University Press, New Delhi, 1997, p. 324

[১১] জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ অর্থনীতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫০, ৫১

করেন।"[১২] সাংখ্য অতি প্রাচীন দর্শন। "সাংখ্য ও যোগের মূল ধারণাগুলি বেদ পূর্ব-যুগের।"[১৩] আর্য পূর্ব যুগেই সাংখ্য দর্শন এবং যোগপদ্ধতি সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। আহমদ শরীফের মতে, "সাংখ্য এবং যোগ এই দুই শাস্ত্র ও পদ্ধতি যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এ শাস্ত্র অস্ট্রিক কিংবা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিরাত জাতির মনন-উদ্ভূত, তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। তবে উভয় গোত্রীয় লোকের মিশ্র-মননে যে এর বিকাশ এবং আর্যোত্তর যুগে যে এর সর্বভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা এক রকম সুনিশ্চিত।"[১৪] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ।"[১৫]

প্রাচীন ভারতবর্ষে বস্তুবাদের প্রসার ছিল। জওহরলাল নেহরু এমত সমর্থন করে লিখেছেন, "অনেক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে জড়বাদ প্রচলিত ছিল এবং তখন দেশবাসীর উপর তার প্রভাবও অতিশয় ছিল।"[১৬] বাংলাদেশেও সে সময় বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল। বেদ বিরুদ্ধ বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনের প্রসার ছিল বাংলাদেশে। স্বনামধন্য অনেক বৌদ্ধ এবং জৈন পণ্ডিতের বাস বাংলাদেশের কোন না কোন স্থানে।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলাদেশে মীমাংসা দর্শনের চর্চা হয়েছে। "দামোদরপুরের এক ব্রাহ্মণ 'অগ্নিহোত্রোপযাগায়' ভূমি প্রার্থনা করেছেন। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বেদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। মীমাংসা - দর্শনেও তার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তাতে প্রতীয়মান হয় পঞ্চম শতাব্দীতে বঙ্গ দেশে মীমাংসা দর্শনের আলোচনা ও চর্চা হতো।"[১৭] মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জৈমিনিকে ধরে নেয়া হয়। জৈমিনির *মীমাংসা সূত্র* এই দর্শনের আদি গ্রন্থ। জৈমিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর পূর্বে বাদারি, ঐতিশায়ন, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয় প্রমুখ আচার্য পূর্ব মীমাংসা দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। মীমাংসা দর্শন জ্ঞানবিদ্যা, পরাবিদ্যা এবং ধর্মতত্ত্ব নিয়ে সাধারণত আলোচনা করে। বাংলাদেশের মীমাংসা দর্শনের পণ্ডিতদের দর্শনের মধ্যেও এগুলো বিদ্যমান ছিল।

[১২] রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৭৯

[১৩] আহমদ শরীফ, *বাঙলার সুফি সাহিত্য (আলোচনা ও নয়খানি গ্রন্থ সম্বলিত)*, পৃ. ই

[১৪] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পুনমুদ্রণ ২০১০, পৃ. ৭৯

[১৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ''সাংখ্যদর্শন'', শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, *বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ*, *বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ. ১১১

[১৬] জওহরলাল নেহরু, *ভারত সন্ধানে*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমেটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫, পৃ. ৭৮

[১৭] সৈয়দ আবুল মকসুদ, ''১৫০০ বছরে বাঙালি দার্শনিক : পাঁচ থেকে কুড়ি শতাব্দী'', খোন্দকার আশরাফ হোসেন (সম্পাদিত), *মানববিদ্যা বক্তৃতামালা*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ৭৭

বাংলাদেশে বিশেষভাবে ন্যায় দর্শনের চর্চা হয়েছে। ন্যায় দর্শনের ইতিহাস প্রাচীন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধ্যান্য।"[১৮] ন্যায় দর্শন দুইভাগে বিভক্ত। প্রাচীন ন্যায় এবং নব্যন্যায়। প্রাচীন ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মহর্ষি গৌতম এবং নব্যন্যায়ের প্রবর্তক হিসেবে দ্বাদশ শতকের গাঙ্গেশ উপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি গৌতমের *ন্যায়সূত্র* ন্যায়দর্শনের প্রথম গ্রন্থ। অনেক পণ্ডিত মনে করেন প্রাক-বৌদ্ধযুগে ন্যায় দর্শনের সূচনা হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ন্যায় দর্শনের মূলনীতিগুলো নির্ধারিত হয়।

মাধবাচার্যের *সবদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে ন্যায় দর্শনের নাম হল অক্ষপাদ দর্শন। (The Akshapada (or Nyaya) Darsana)।[১৯] গৌতমের ন্যায়সূত্রের উপর চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে বাৎস্যায়ন ভাষ্য রচনা করেন। বাৎস্যায়নের ন্যায় ভাষ্যের উপর উদ্দোতকর একটি বার্তিক লেখেন। উদ্দোতকরের বার্তিকের উপর বাচস্পতি মিশ্র একটি *ন্যায় বার্তিক তাৎপর্য টীকা* গ্রন্থ রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে দিঙনাগ (বৌদ্ধ নৈয়ায়িক) বাৎস্যায়নের ন্যায় ভাষ্যকে বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। উদ্দোতকর দিঙনাগের ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সপ্তম শতাব্দীতে ধর্মকীর্তি দিঙনাগের মত সমর্থন করে উদ্দোতকরের সমালোচনা করেন। ধর্মকীর্তির *ন্যায় বিন্দুর* উপর বিনীতদেব, শান্তভদ্র, ধর্মোত্তর, রত্নকীর্তি, পণ্ডিত অশোক, রত্মাকর শান্তিসহ আরো অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত ভাষ্য রচনা করেন।[২০] ধর্মর্কীতি ও শীলভদ্র দুজনেই ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ধর্মপালের শিষ্য ও সতীর্থ। ধর্মকীর্তির জন্ম হয়েছিল চোল (চেলামানি রাজ্য) বা উত্তর তামিলের প্রান্তদেশ তিরুমলে।

১২শ শতাব্দীতে গাঙ্গেশ উপাধ্যায় নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাকে কেন্দ্র করেই নব্য ন্যায়ের যাত্রা শুরু। তাঁর *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ নব্যন্যায়ের চিন্তা দ্বারা বাংলাদেশে যুগান্তর সৃষ্টি করে।[২১] পরাবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্বের উপর প্রাচীন ন্যায় গুরুত্ব আরোপ করে। নব্যন্যায় বিশুদ্ধ তর্কবিদ্যা এবং জ্ঞানবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করে। উন্নত গণিতের সঙ্গে নব্যন্যায়ের কিছুটা সাদৃশ্য ছিল।[২২] গাঙ্গেশ উপাধ্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থকে কেন্দ্র করে বঙ্গে যে নব্যন্যায়ের চর্চা শুরু হয়েছিল তার মূল উৎস ছিল উদয়নাচার্যের *ন্যায়কুমাঞ্জলি* ও *আত্মতত্ত্ববিবেক* গ্রন্থের মধ্যে। নব্যন্যায়ের ইতিহাসে উদয়নাচার্য আদি

---

[১৮] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সাংখ্যদর্শন", শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)*, পৃ. ১১১

[১৯] Madhava Acharaya, *Tha Sarva-Darsana-Samgraha or Review of the different systems of Hindu Philosophy*, E. B Cowell and A. E Gough (Translated), Trubner & co, Ludgate Hill, London, 1882, p. 161

[২০] রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, পৃ. ২৯৪

[২১] রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, পৃ. ২৯৫

[২২] রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ।[২৩] "বঙ্গদেশে নব্যন্যায় চর্চা সমৃদ্ধির পেছনে বিশেষ অবদান রয়েছে যাঁর, তিনি হলেন, অতি প্রতিসিদ্ধ মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম।"[২৪]

অনিরুদ্ধ ভট্ট ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালি দার্শনিক। তিনি বল্লাল সেনের শিক্ষক এবং ধর্মাধিকরণিক ছিলেন।[২৫] লক্ষণ সেনের মন্ত্রী পরিষদে ছিলেন হলায়ুধ। কথিত আছে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য রাজ্যকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা এই পাঁচটি প্রদেশে ভাগ করার কাজটি সেন আমলে তিনি করেন।[২৬] শৈব, বৈষ্ণব, মীমাংসা দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন হলায়ুধ। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মহাবিশেষজ্ঞ চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের জন্ম ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, যশোর ও খুলনা জেলায় নব্য ন্যায়ের চর্চা বেশি হয়েছে। দেশের প্রায় সর্বত্রই নব্য ন্যায়ের স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৫শ শতাব্দী থেকে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশেই নব্য-ন্যায়ের আবাসস্থল হিসাবে গণ্য হয়।[২৭] হরিদাশ ন্যায়ালঙ্কার, ষোল শতকের রঘুনাথ শিরোমণি, কণাদ তর্কবাগীশ এবং সতেরো শতকের জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং জয়রাম পঞ্চানন, হরিনাম তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন নব্যন্যায়পন্থী বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত।[২৮] পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী, বিজ্ঞান ভিক্ষু, মধুসূদন স্বরস্বতী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

> ষোড়শ শতাব্দীতে নব্য ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্র বাঙালীর মনস্বিতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ আবির্ভূত হয়। এই নব্যন্যায় চর্চার কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ এবং এখান হইতেই বাংলার নানাদিকে ইহা প্রসারিত হয়। এই নব্যন্যায় কোন ধর্মের বা দর্শনের তত্ত্ব-নিরূপণ নয়, বা কোনো নূতন ধর্মীয় বা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি নয়, ইহা কোন বস্তু বা বিষয়ের ধারণার যুক্তি-সিদ্ধ যথার্থ্য-নির্ধারণের উপায়। অবশ্য বাংলার নব্যন্যায়ের প্রথম পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি *ঈশ্বরানুমান*, *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্মীয় বা দার্শনিক তত্ত্বালোচনার কতকটা অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ কেবল তর্ক-বিদ্যারই চর্চা করিয়াছেন।[২৯]

বাংলায় পাঁচশত বছর ধরে নব্য ন্যায়ের অসংখ্য গ্রন্থ, টীকা, ভাষ্য রচিত হলেও পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথ শিরোমণিই কেবল নতুন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষধর মিশ্রের সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান ছিল রঘুনাথ শিরোমণির সম্প্রদায়।[৩০] পাঁচশত বছর বাংলাদেশে ন্যায় এবং নব্যন্যায়ের চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। বিক্রমপুর, কোটালিপাড়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে চৌদ্দ থেকে আঠারো শতকে দর্শন চর্চা হয়েছে। কোটালীপাড়ার রামচন্দ্র তর্কবাগীশ ছিলেন নব্য ন্যায়ের একজন দার্শনিক। বাংলাদেশে নারীরাও দর্শনচর্চা থেকে পিছিয়ে ছিল না। আঠারো শতকে গোপালগঞ্জের

---

[২৩] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, *বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান*, *প্রথম ভাগ*, *বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, চৈত্র ১৩৫৮, পৃ. ১

[২৪] মালবিকা বিশ্বাস, "বাংলার নব্যন্যায় ও বাসুদেব সার্বভৌম", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রিংশ খণ্ড, ২০১২, পৃ. ১৯৮

[২৫] রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ''মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু দর্শন,'' ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত), *বাঙালীর দর্শন চিন্তা*, পৃ. ১৬

[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

[২৮] আমিনুল ইসলাম, ''বাঙালির দর্শন : প্রাচীন ও মধ্যযুগ,'' শরীফ হারুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে দর্শন*, *ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান (দ্বিতীয় খন্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ০৩

[২৯] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ২৭৫

[৩০] শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, *বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান*, *প্রথম ভাগ*, *বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

বৈজয়ন্তী দেবী ও প্রিয়ম্বদা দেবী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রিয়ম্বদা মিমাংসা দর্শনে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।[৩১] "ইলিয়াস শাহী এবং হোসেন শাহী আমলে বাংলায় শান্তি ফিরে এলে যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নে আগ্রহী বাঙালি ছাত্রদের আবশ্যকীয়ভাবেই নবদ্বীপে গিয়ে জড়ো হতে হতো, কারণ সেটাই ছিল যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নের একমাত্র প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।"[৩২] বর্তমানে বাংলাদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষা কারিকুলামে পাশ্চত্য লজিকের আধ্যকত্যা থাকলেও নব্যন্যায়ের স্থান সঙ্কুলান হয়না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তিবিদ্যা নামে যা পড়ানো হয় তা পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা। ন্যায় ও বৌদ্ধ যুক্তিবিদ্যা এখনো পাঠ্যসূচিতে স্থান পায়নি। যদিও বহু আগেই সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ভারতীয় যুক্তিবিদ্যার ইতিহাস নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৩৩]

অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মহাস্থান-পাহাড়পুর, দিনাজপুর, এলাকায় (সে-কালের পৌণ্ড্রবর্ধনে), ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলে (সে-কালের সমতটে) এবং মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রাজবাড়ি ডাঙ্গায় (শশাঙ্কের রাজধানী শহর কর্ণসুবর্ণে) বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ছিল।[৩৪] বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারটি ধর্মপালের পুত্র দেবপাল নির্মাণ করেন। এই বিহারে ভিক্ষু বোধিভদ্র বাস করতেন। অতীশ দীপঙ্করও কিছুকাল এই বিহারে অবস্থান করেছিলেন।[৩৫] বিক্রমশিলা মহাবিহার পাল রাজাদের কীর্তি। জগদ্দল মহাবিহার, পণ্ডিত বিহার, ভাসু বিহার, সীতাকুট বিহার, শালবন বিহার ছিল মূলত বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের শিক্ষা কেন্দ্র। জগদ্দল মহাবিহারে বসেই ভিক্ষু মোক্ষাকর গুপ্ত তর্কশাস্ত্র *পরার্থমান* লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তুকীরা বিক্রমশীলা বিহার আক্রমন করলে এই বিহারের শেষ আচার্য শ্রীভদ্র জগদ্দল মহাবিহারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তিনি তিব্বতে চলে যান। ওদন্তপুরী বিহারের অধ্যক্ষ শাক্য শীলভদ্রও জগদ্দল বিহারে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সে সময় চীন ও তিব্বত থেকে অনেক শিক্ষার্থী এসব বিহার মহাবিহারে অধ্যয়ন করতে আসতেন। দেবকোট বিহারে বিখ্যাত তান্ত্রিকাচার্য অদ্বয়বজ্র ও উধিলিপা বাস করতেন। চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার ছিল বৌদ্ধতন্ত্র ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। এই বিহারে নাড়পাদের গুরু প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তৈলপাদ বাস করতেন। গুপ্ত সম্রাটদের মত পাল রাজারা দার্শনিক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করে জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিতেন। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৌদ্ধ মঠ ও বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শাসক শ্রেণির সঙ্গে পণ্ডিতদের কোন দ্বন্দ্ব ছিল না।

---

[৩১] সৈয়দ আবুল মকসুদ, ''১৫০০ বছরে বাঙালি দার্শনিক : পাঁচ থেকে কুড়ি শতাব্দী'', পৃ. ৮৩

[৩২] মমতাজুর রহমান তরফদার, *Husain Shahi Bengal (1494-1538) হোসেন শাহী আমলে বাংলা (১৪৯৪-১৫৩৮) একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যেষণা*, মোকাদ্দেসুর রহমান (অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২১৬

[৩৩] Satis Chandra Vidyabhusana, *A History of Indian Logic*, Calcutta, 1970

[৩৪] মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ সম্ভাবনা, পৃ : ০৮*

[৩৫] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ২৪০

"বঙ্গবিহারের পালবংশীয় রাজারা বৈষ্ণব, শৈব এবং বিশেষ করে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচুর জমির মধ্যস্বত্ত্ব দান করেছিলেন।"[৩৬]

অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, রত্নাকর শান্তি, প্রজ্ঞাকরমতি, জেতারি, অভয়ঙ্কর গুপ্ত ছিলেন বাঙালি বৌদ্ধ দার্শনিক। এদের মহাযান বৌদ্ধ দর্শন ছিল বাঙালির নিজস্ব দর্শন। আচার্য শীলভদ্র এবং চন্দ্রগোমীর নাম উল্লেখ না করলেই নয়। আচার্য শীলভদ্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আগে হেতুবিদ্যা, অথর্ববেদ এবং চিকিৎসা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রের কাছে পাঁচ বছর শিক্ষালাভ করেন। হিউয়েন সাঙ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। শীলভদ্রের নির্দেশে হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি ষোল বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে দেশে ফিরে যান। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের উপর জ্ঞানলাভ শেষে ফিরে যাবার সময় তিনি ২২টি ঘোড়ার পিঠে করে ৫২০টি বোঝা অন্যান্য শাস্ত্রের গ্রন্থ নিয়ে যান।

শীলভদ্র সমতটের প্রধান দার্শনিক ছিলেন। হিউয়েন সাঙ এর বিবরণ থেকে জানা যায়, বঙ্গে ন্যায় এবং সাংখ্য দর্শনই বেশি চর্চা হয়েছে। সমতটের মানুষের জ্ঞান চর্চা সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, ''জ্ঞান চর্চা করতে বেশ ভাল পারে, তাকে আয়ত্ত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। সত্যধর্ম ও অন্য ধর্ম দুয়েরই অনুগামী আছেন এখানে। তিরিশটি বা তার কাছাকাছি সংঘরাম আছে, প্রায় দুহাজার ভিক্ষু থাকেন। সকলেই স্থবির শাখার অনুগামী।"[৩৭] শান্তরক্ষিতও নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং আমন্ত্রিত হয়ে তিব্বত গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বৌদ্ধ দর্শন ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন। শান্তরক্ষিত বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন শিক্ষাদানের জন্য নেপালেও গিয়েছিলেন। *মদ্যমকালঙ্কার-কারিকা* ও *সত্যদ্বয়বিভঙ্গপঞ্জিকা* শান্তরক্ষিতের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ।[৩৮] গ্রন্থ দুটির কোনটিই বাংলা ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু লেখক বাঙালি। শান্তরক্ষিতের মতে জ্ঞান মাত্রই ক্ষণিক। তিনি মনে করেন, অবিদ্যার কারণে ভ্রমাত্মক জ্ঞানের উদ্ভব হয়। চন্দ্রগোমীর অমর কীর্তি *চান্দ্র ব্যাকরণ*।[৩৯]

বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধদর্শনের চর্চা বেশি হয়েছে। সমতটের শীলভদ্র এবং বিক্রমপুরের অতীশ দীপঙ্কর মহাযানপন্থী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহাযান মতবাদ পরবর্তীকালে বজ্রযান, এবং বজ্রযান সহজযানে এবং কালচক্রযানে রূপান্তরিত হয়ে বাংলাদেশে চর্যাপদে রূপলাভ করে।

---

[৩৬] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা*, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৮

[৩৭] হিউয়েন সাঙ, *বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ*, প্রেমময় দাশগুপ্ত (সংকলক), ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৪৭

[৩৮] সৈয়দ আবুল মকসুদ, ''১৫০০ বছরে বাঙালি দার্শনিক : পাঁচ থেকে কুড়ি শতাব্দী", খোন্দকার আশরাফ হোসেন (সম্পাদিত), *মানববিদ্যা বক্তৃতামালা*, পৃ. ৭৮

[৩৯] দেবপ্রিয় বড়ুয়া, ''বাঙালীর দর্শন চিন্তায় বৌদ্ধ প্রভাব," ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত), *বাঙালীর দর্শন চিন্তা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৪৪

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের পদগুলোতে বৌদ্ধ সহজিয়া মতে প্রভাব দেখা যায়। “শূন্যতা, তথতা, সংবৃত্তি প্রভৃতি দার্শনিক ধারণা চর্যাপদের পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে বিধৃত আছে।”[৪০] চর্যাপদের কতগুলো পদের মধ্যে অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। “চর্যাগীতির মধ্যে কতগুলির বিষয় সোজাসুজি আধ্যাত্মিক। তাহাতে জন্মমৃত্যুর; উত্থান পতনের, সুখ দুঃখের দোলা হইতে মুক্তি পাইবার ও সহজ আবস্থারূপ মহাসুখ-নিবাসে পৌঁছিবার ঠিকানা আছে, পরমার্থ সত্য উপলব্ধির জন্য গুরু-অনুগতির নিদের্শ আছে।”[৪১] শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, “চর্যাপদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি হইল দার্শনিক তত্ত্বের দিক, আর একটি হইল সাধনার দিক।”[৪২] যদিও দাশগুপ্ত স্বীকার করেছেন চর্যাপদে দার্শনিকের দিকের চেয়ে সাধনতত্ত্বের দিকই প্রধান। এ-সম্পর্কে আমিনুল ইসলাম লিখেছেন, “সুসংবদ্ধ দার্শনিক রীতিতে এবং বিস্তৃত যুক্তির আঙ্গিকে পরিবেশিত না হলেও এসব গীত রচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় জগৎ ও জীবনের এমন দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের যেগুলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক দার্শনিক সাহিত্যেরও উপজীব্য হতে দেখা যায়।”[৪৩] চর্যাপদের ভাষা বাংলা ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে ‘অবহট্‌ঠ’ নামে অভিহিত করেছেন। চর্যাপদ গুলোতে অধিবিদ্যক আলোচনা একেবারে কম নয়। কারণ চর্যাপদগুলোতে বৌদ্ধ মহাযান তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ধর্মভাবনার প্রতিফলন রয়েছে। এসবের মধ্যে যেমন বৈদান্তিকসুলভ অতি গভীর বস্তুবিমুখ ভাববাদ প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি যোগ ও তন্ত্রের মানবদেহকে সাধন ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[৪৪] অষ্টম শতকে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের সঙ্গে জ্ঞানবাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মায়াবাদ বিরোধী উত্তর সাধক ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ দার্শনিকেরা ভক্তিবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।[৪৫]

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া জয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। মুসলিম শাসনকালকে বাংলায় মধ্যযুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মধ্যযুগে বাংলাদেশে তুর্কী - আফগান বিজয়ীদের সঙ্গে রাজধর্ম হিসাবে ইসলামের আগমন ঘটে। এ-অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তা করার প্রক্রিয়ায় নতুন উপাদান যোগ হয়। পুরাতন বিশ্বাসের জায়গায় নতুনত্ব স্থান পায়। “মুসলমানদের ভারত বিজয় থেকে ইংরেজদের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালকে ভারতের মধ্যযুগ ধরা হয়। কমবেশি এ সময়ের ব্যবধানে ভারতের অন্যান্য

[৪০] রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭২
[৪১] শ্রী সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, *চর্যাচর্যটীকা সমেত*, ইস্টান পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৩, পৃ. ৩০
[৪২] শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ‘‘চর্যাপদে বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্ব,’’ রায়হান রাইন (সম্পাদিত), *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, সংবেদ প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৯৫
[৪৩] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ৪
[৪৪] শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৮
[৪৫] আহমদ শরীফ, *মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রদেশের মতো বাংলাদেশে মুসলমান সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়।"[৪৬] এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুলতানি এবং নবাবি আমলকে বাংলাদেশে মধ্যযুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির নদীয়া দখলের পূর্বে আরবীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনেক সুফি-সাধকের আগমন ঘটে এদেশে। "পাহাড়পুরের ভগ্নাবশেষ থেকে বাদশা হারুনর রশীদের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, অষ্টম শতকের এই মুদ্রা আরব বাণিজ্যের ব্যবসায়িক লেনদেনের ফল।"[৪৭] আরব বিশ্বের সুফি-সাধকরা এদেশে এসেছেন, স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। পারস্যের সুফিদের আগমন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এদেশে তাদের অনেক আস্তানা, খানকা, দরগা এখনো রয়েছে।

> বাঙলা দেশে সুফীমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগসাধন প্রভৃতি পন্থা বঙ্গের সুফী মতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সুফী মতবাদের সহিত এ দেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে। এবং সুফিবাদ ও সাধন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে থাকে। ...চিশতীয়হ ও সুহরবরদীয় সম্প্রদায়ের সাধনা ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতে আগমনের পর এ দেশীয় সাধনার সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল; ভারতের প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়া গেল।[৪৮]

সুফি-সাধকদের চিন্তার সঙ্গে দেশীয় উপাদানের মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি হয় বঙ্গীয় সুফিবাদ। বাঙালির দর্শনচিন্তায় সুফিবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "মধ্যযুগের বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় জীবনতত্ত্বের ও জগৎ-চেতনার যে কালিক, স্থানিক, সাম্প্রদায়িক ও শাস্ত্রিক অভিব্যক্তি ঘটেছে, গোড়ায় ছিল তার দুটো রূপ : একটি ঐহিক ও অপরটি ছিল পার্থিব জীবনসম্পৃক্ত হলেও আধ্যাত্মিক এবং পারত্রিক।"[৪৯] সুফিবাদ অধ্যাত্মিক হলেও এর জাগতিক উপদান অনেক। সুফিবাদকে পার্থিব জীবনসম্পৃক্ত বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না। বাংলার বাউল দর্শনও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

গবেষকরা দাবি করেন তুর্কি বিজয়ের পূর্বেই বাংলায় "মৈথুনতত্ত্ব ভিত্তি করে শাস্ত্র ও দর্শন গড়ে ওঠে।"[৫০] প্রাচীন আমলে বাংলা ছিল কৃষি নির্ভর। মধ্যযুগে কৃষিকাজই ছিল বাঙালির প্রধান পেশা। ফসল উৎপাদনের সঙ্গে মৈথুনতত্ত্ব জড়িত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য-দর্শনে মৈথুনতত্ত্ব স্থান করে নিয়েছে। মধ্যযুগে "চর্যাগীতি থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী সুফি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সন্ধান করা হয় জীবনের শ্রেয় ও জগতের পরমসত্তার।"[৫১] মধ্যযুগের অন্যতম কবি-দার্শনিক হলেন জয়দেব। যদিও তাঁর অমূল্য গ্রন্থ *গীত গোবিন্দ* সংস্কৃত ভাষায় রচিত।[৫২]

---

[৪৬] ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, প্রথম পুনমুদ্রণ ১৯৯৭, পৃ. ০১

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ০১

[৪৮] আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফি সাহিত্য*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০

[৪৯] আহমদ শরীফ, *বাঙালীর চিন্তা-চেতনায় বিবর্তনধারা*, পৃ. ১৩১

[৫০] ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, পৃ. ২১

[৫১] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১২

[৫২] এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ, উনিশ শতক*, অবসর, ২০১৩, পৃ. ২০৩

বাঙালী সুফিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে জীবন জিজ্ঞাসা, নৈতিকতা, সমাজে মানুষের অবস্থান ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্নাদির উপস্থিতি দেখা যায়। মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমানের দর্শন সমৃদ্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষ বিজয়*, মীর সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞানপ্রদীপ*, *জ্ঞান চৌতির্শা*, হাজী মুহম্মদের *নূরনামা*, মোহসেন আলির *মোকাম-মঞ্জিল কথা*, শেখ মনসুরের *সির্নামা*, শেখ জাহিদের *আদ্যপরিচয়* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থের মধ্যে বাঙলার সুফী শাস্ত্রের বিবরণ ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। হাজী মুহম্মদের নূরনামা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। হাজী মুহম্মদ যথার্থই দার্শনিক কবি ছিলেন।[৫৩] হাজী মুহম্মদের *নূরনামা* গ্রন্থে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত। বাঙালি সুফি-সাধকদের এসব গ্রন্থের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, শূন্যতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, জীবন জিজ্ঞাসা গুরুত্বের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে। আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> কাজী শেখ মনসুরের *সির্নামা* ইসলাম ও বাংলার সূফী মতের আপোষ ও সমন্বয় সাধনের প্রশংসনীয় প্রয়াস প্রত্যক্ষ করি। এ প্রয়াসে কবি সাফল্য অর্জন করেছেন। অতএব, *হরগৌরীসম্বাদ*, *আদ্যপরিচয়* কিংবা *যোগ কলন্দর* থেকে *সির্নামা* অবধি বাংলার সুফি সাধনা ও শাস্ত্রের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির ধারা অনুসরণ করা সহজসাধ্য। ষোল, সতেরো ও আঠারো শতকে বাঙালী মুসলমানের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের অমূল্য উপাদান মেলে এসব গ্রন্থে।[৫৪]

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের কাব্যে পরিণামতাত্ত্বিক নীতিশাস্ত্র, মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা, দাম্পত্য নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষমূলক নীতিশাস্ত্র, বৈঠকী নীতিশাস্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৫] মুসলমান কবিদের কাব্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে শাস্ত্র। মধ্যযুগে বাঙালি মুসলিম পরিমাণতাত্ত্বিক নীতিশাস্ত্রের লেখকদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাহ (ষোড়শ শতক), মুহম্মদ খান (অনু ১৫৮০-১৬৫০), মুজাফ্ফর (১৬০০-১৬৮০), শেখ চান্দ (১৬৭৫-১৭৪৫), সৈয়দ নূরুদ্দীন (১৭২৫-১৮০০), মুহম্মদ কাসিম (১৭৩০-১৮১০, বদিউদ্দীন (অঠারো শতক) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৫৬]

আল কোরান, হাদিস এবং ফেকাহ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের কাব্যে 'মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা' গড়ে ওঠেছে। এসব মুসলিম কবিদের মধ্যে শেখ সুলায়মান (ষেড়শ শতক), আলাওল (১৫৯৭-১৬৭৩), মুহম্মদ নেয়াজ (সতেরো শতক), আশরাফ, (আঠারো শতক), শেখ পরাণ (আঠারো শতক), হেয়াত মামুদ (আঠারো শতক), মুহম্মদ মুকিম (১৭০০-১৭৮০), মুহম্মদ আলী (আঠারো শতক), বালক ফকির (আঠারো শতক), কবি নজীব (আঠারো শতক), আবদুল্লাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কবির কাব্যে নীতিশাস্ত্র বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে।[৫৭] শেখ সুলায়মানের *অসিয়তনামা* কাব্য নীতিকথা ও নানা উপদেশের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে। আলাওল বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে অন্যতম। *পদ্মাবতী* তাঁর অনন্য সৃষ্টি। *তোহফা* আলাওলের একটি বিশিষ্ট নীতিকাব্য। কবি এ কাব্যের বাংলা নাম দিয়েছেন

[৫৩] আহমদ শরীফ, *বাঙলার সুফি সাহিত্য (আলোচনা ও নয়খানি গ্রন্থ সম্বলিত)*, পৃ. ৬
[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১
[৫৫] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. সূচীপত্র
[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ.২৯
[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

তত্ত্ব *উপদেশ*। কাব্যে বর্ণিত সকল বিষয়ই জ্ঞানীর কথা, আলিমের কথা, একেই কবি 'নীতিশাস্ত্র কথা' বলে অভিহিত করেছেন।[৫৮] দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটের কবি হেয়াত মামুদ বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট নীতি কবি। তাঁর *জঙ্গনামা*, *চিত্তউত্থান বা সর্বভেদবাণী*, *হিতজ্ঞানবাণী*, *আম্বিয়াবাণী* উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। হেয়াত মামুদের কাব্যগ্রন্থগুলোতে ইসলামের আচারিক রীতিনীতি বেশি পাওয়া যায়।

দাম্পত্য জীবনকে সুখী-সুন্দর করে গড়ে তোলাই মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের মূল উদ্দেশ্য। এসব নীতিশাস্ত্রমূলক কাব্যকে দাম্পত্য নীতিশাস্ত্র হিসাবে অভিহিত করা যায়। ফকির খাকী, সৈয়দ গাজী, আইনউদ্দীন, আবদুন নবী, মনোহর, হায়াত মাহমুদ, শাহ আলী, মজিলা খান, গোপাল দাস, নরোত্তম দাস প্রমুখের কাব্যগ্রন্থগুলো দাম্পত্য নীতি প্রধান।[৫৯] জ্যোতিষশাস্ত্র-মূলক নীতিশাস্ত্র মধ্যযুগে বাঙালি মুসলিম কবিদের কাব্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ-ধারার কবিদের মধ্যে মুজাম্মিল, আবদুল গণি, কবি উমর, সৈয়দ মুহম্মদ, মুহম্মদ রফি, হোসেন ফকির প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৬০] কবি মুহম্মদ খান একজন উল্লেখযোগ্য নীতিশাস্ত্রকার। তাঁর *সত্যকলি বিবাদ সংবাদ* কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নীতিশিক্ষা। নীতি প্রচারই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।[৬১] সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিমের *দুররা মজলিশ* কাব্যটি নীতি শিক্ষামূলক। আঠারো শতকের কবি হেয়াত মামুদের সর্বভেদবাণী একটি নীতিকাব্য। ড. মযহারুল ইসলাম এই কাব্যগ্রন্থকে নীতিকথার খনি বলে উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগে বাঙালি মুসলিম কবিদের নীতিশাস্ত্রমূলক কাব্যগুলো জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই নীতিশাস্ত্র মূলক কাব্যগুলো বাঙালির নীতিদর্শনের প্রাথমিক উৎস হিসাবে বিবেচনা করা যায়। মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের কাব্যের চরিত্রগুলোতে ঐতিহাসিক মানুষগুলোর উপর অতিমানবীয় চরিত্রের প্রলেপ দেয়া হয়েছে, যা ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।[৬২]

বৌদ্ধ শাসকেরা ধর্ম-দর্শন চর্চার জন্য ভূমিদান করতেন। কিন্তু মুসলিম তুর্কি-আফগানি মুসলিম শাসকেরা দর্শন চর্চা বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। জিয়াউদ্দিন বারানী *তারিখ-ই ফিরোজশাহী* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "যুক্তিবাদী ও দার্শনিক এবং যাহারা তাহাদের যুক্তি প্রদানে অটুট বিশ্বাস পোষণ করে, বাদশা তেমন লোকজনকে স্বরাজ্যে বসবাস করিতে দিবেন না। যে কোনো প্রকারেই হউক দার্শনিকদের শিক্ষাব্যবস্থা যাহাতে চালু না হয়, তৎপ্রতি তাঁহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে।"[৬৩] জিয়াউদ্দিন বারানীর মন্তব্য থেকে জানা যায় আফগান-তুর্কি মুসলমান শাসকেরা দর্শনশাস্ত্রের সমঝদার ছিলেন না। এমনকি দর্শন শাস্ত্রের চর্চা তারা নিষিদ্ধ করেছেন। তারপরও ব্যক্তিগত পর্যায়ে এদেশে দর্শনের চর্চা হয়েছে।

---

[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
[৬২] Asim Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Sterling publishers Ptv Ltd, New Delhi, 1993, p.89
[৬৩] জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, গোলাম সামদানী কোরায়শী (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৩

মধ্যযুগের চিন্তাবিদদের জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে কখনো কখনো উপমার অধিক ব্যবহার করতে হয়েছে। এরা আশ্রয় নিয়েছে শাস্ত্রের। মধ্যযুগের সওয়াল সাহিত্যে জীবন-জিজ্ঞাসা পাওয়া যায়। শেখ সাদীর *গদা-মালিকা সম্বাদ*, এতিম আলমের *আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল*, আলি রাজার *সিরাজ কুল্‌ব*, ইত্যাদি গ্রন্থ সওয়াল সাহিত্য হিসাবে সমাদৃত। আহমদ শরীফ *সওয়াল সাহিত্য* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যে-সব রহস্য-জিজ্ঞাসা মানুষকে চিরকাল আকুল করেছে, সেগুলোর শাস্ত্রীয়, কাল্পনিক ও নীতিজ্ঞান প্রসূত উত্তর দানের চেষ্টা আছে সওয়াল সাহিত্যে।"[৬৪]

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারি ছিল। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুড়ের সোমপুর বিহারের মন্দিরের গায়ে কৃষ্ণলীলার নানা রকম পোড়ামাটির মোটিফ রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিষ্ণুর মূর্তি পাওয়া গেছে। মধ্যেযুগের বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের বিকাশ ঘটে। হোসেন শাহী শাসনামলে শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন জনপ্রিয় করেন। চৈতন্যদেবের কোন গ্রন্থ নেই। "সংস্কৃত ভাষায় মাত্র আটটি শ্লোকের মাধ্যমে তিনি বিধৃত করেন তাঁর প্রেমাত্মক মানবতাবাদী দর্শন।"[৬৫] চৈতন্যদেবের অনুসারিরা তাঁর ভক্তি প্রেম ও বাণীকে সংগ্রহ করে *চৈতন্য ভাগবত*, *চৈতন্য চরিতামৃত*, *চৈতন্য মঙ্গল* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তাঁর ধর্ম-দর্শন। চৈতন্যদেবের দর্শন চিন্তায় মাধ্বাচার্য, বল্লভ ভট্ট, রামানুজ ও বৌদ্ধ ও সুফি দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর মতে জীবাত্মা ও জগৎ পরস্পর ভিন্ন কিন্তু ঈশ্বর সাথে সম্বন্ধ সাপেক্ষে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

চৈতন্যদেবের অন্যতম শিষ্য সনাতন গোস্বামী সুলতান হোসেন শাহীর 'দবীর খাস' অর্থাৎ ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। আর সনাতনের ভাই রূপ গোস্বামী ছিলেন 'সাকর মল্লিক' অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা। সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এরা বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন চর্চা করেছেন। সনাতন, রূপ এবং জীব গোস্বামীর গ্রন্থগুলো অবলম্বন করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দার্শনিক মত গড়ে ওঠেছে। জীব গোস্বামীর *তত্ত্ব-সন্দর্ভ*, *ভগবৎ-সন্দর্ভ*, *পরমাত্ম-সন্দর্ভ*, *কৃষ্ণ-সন্দর্ভ*, *ভক্তি-সন্দর্ভ* ও *প্রীতি-সন্দর্ভের* মধ্যে দিয়েই প্রধানত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল মতবাদ তথা রাধাবাদের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[৬৬] এছাড়া গোস্বামীদের গ্রন্থাবলিতে পৌরাণিক তত্ত্ব, দর্শন, কান্তিবিদ্যা এবং ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে।[৬৭]

> অষ্টম শতাব্দী হইতে রচিত কাব্য-সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। ঐ সঙ্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের লীলা বর্ণনাও পাওয়া যায়। সেন যুগে কাব্য-সাহিত্যের মারফতে রাধা-কৃষ্ণের লীলা কাহিনী বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, লীলা-শুক্ল, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত ও নানা কবির রচিত রাধা কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কবিতা রাধাকৃষ্ণবাদকে সর্বজন পরিচিত করে। লক্ষ্মী নারায়ণের দেবত্ব পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, রাধা-কৃষ্ণ ক্রমে লক্ষ্মী-নারায়ণের স্থান অধিকার

---

[৬৪] আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *সওয়াল সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ২

[৬৫] আমিনুল ইসলাম, ''বৈষ্ণব দর্শন ও মানবতাবাদ,"ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত), *বাঙালীর দর্শন চিন্তা*, পৃ. ৯৯

[৬৬] শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৯৮

[৬৭] রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

> করিলেন। সেন যুগেই রাধাকৃষ্ণবাদ একটা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ইহার পরিপূর্ণ দার্শনিক ও তাত্ত্বিক রূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গোস্বামীগণের হস্তে রচিত হয়।[৬৮]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষভাবে কান্তিবিদ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই এক ধর্ম, যার ভিত্তি ছিল কাব্য, নাটক, গান, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নন্দনতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাতা ছিলেন রূপ গোস্বামী।[৬৯] নন্দনতত্ত্ব দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তাছাড়া বৈষ্ণব দর্শনের গোড়ার কথা প্রেম-ভক্তি-করুণা। অপরের কল্যাণে আপন স্বার্থত্যাগ, তথা বিশ্বজনীন প্রেমানুভূতির উপর রচিত সনাতন বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি।[৭০] প্রত্যক্ষ, উপমান, অনুমানকে বৈষ্ণবরা জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেনি। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন সে কারণে প্রত্যক্ষের সাহায্যে সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। তাছাড়া চৈতন্যদেবের জীবন বাণী এবং জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন ভাববাদী। যদিও তিনি প্রেম ধর্মের সাহায্যে সব মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রমাণের উপরে ব্যবস্থিত। এই প্রমাণ শ্রুতি অথবা বেদ-প্রমাণ। গৌড়ীয় মতে এই প্রমাণই স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রাহ্য নয়।"[৭১] কৃষ্ণপ্রেমে রাধা আর যাই হোক মানব-মানবীর প্রেম নয়। কৃষ্ণের মুরলি শুনে অসংখ্য নারী তার সমস্ত কাজ ভুলে বৃন্দাবনে ছুটে আসে। এরা সবাই স্বামী সংসারী। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেম মানব আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। "কৃষ্ণপ্রেম চিদ্‌বস্তু-ইহাই চিদানন্দ-স্বরূপ।"[৭২] আধুনিক দর্শনের বিচারে কৃষ্ণলীলাকে অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

সুফিদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শনের মিলনে বাংলাদেশে সৃষ্টি হয় বাউল দর্শনের। বাউল দর্শন বাঙালির নিজস্ব দর্শন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, "১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় বাউল ধর্ম এক পূর্ণরূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।"[৭৩] বাউল মতের উদ্ভব সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সমবায়ে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্রমত - যার নাম নাথপন্থ। বামাচার নয়, কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। হঠযোগের মাধ্যমেই এ-সাধনা চলে। এক সময় এই নাথপন্থ ও সহজিয়া মতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়। চর্যাগীতি ও নাথ সাহিত্য তার প্রমাণ। এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক পরে ইসলামে ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয়নি বলে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্ম সাধনা করে চলে; তারই ফলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাউল-মতের উদ্ভব।[৭৪]

---

[৬৮] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ২৬২
[৬৯] রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, পৃ. ৬৭
[৭০] আমিনুল ইসলাম, ''বৈষ্ণব দর্শন ও মানবতাবাদ,"ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত), *বাঙালীর দর্শন চিন্তা*, পৃ. ৯৭
[৭১] রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, পৃ. ৫৮
[৭২] শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*, পৃ. ২১৮
[৭৩] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ২৮৯
[৭৪] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, উত্তণ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সুশীল কুমার গুপ্ত, বাউল মতের সৃষ্টি সম্পর্কে লিখেছেন, "সহজিয়া ধর্মের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সুফিবাদের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং ক্রমে সহজিয়া ও সুফিবাদের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া বাউল-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।"[৭৫] একতারা হাতে বাউলরা গানের মাধ্যমে নিজেদের মত প্রকাশ করেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা এবং মানুষে মানুষে ভেদ ছিল না বাউল ধর্মে। হিন্দু প্রভাবে বাউল গানে রাধাকৃষ্ণ, শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি পুরুষ-প্রকৃতির প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম প্রভাবে তেমনি মোকাম, মঞ্জিল, লতিফা, সিরাজম্মুনিরা, আল্লাহ, কাদের, গণি, রাসুল, রূহ, আনল হক, আদম-হাওয়া, মুহম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা, প্রভৃতি প্রতীকী রূপক গৃহীত হয়েছে। আবার বৌদ্ধ নাথ এবং নিরঞ্জনও বাদ যায়নি।[৭৬] বাউলদের কোন লিখিত গ্রন্থ নেই। বাউলেরা কোন দার্শনিক তত্ত্ব লিখে যান নাই। "বৈষ্ণব-সহজিয়াদের নানা গ্রন্থের তত্ত্ব ও দর্শনই বাউল ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন।"[৭৭] তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে হাসনা বেগম বাউল ধর্ম-দর্শনের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১.অধিবিদ্যক বৈশিষ্ট্য : ইহজাগতিক অধ্যাত্মবাদ,
২. জ্ঞানবিদ্যক বৈশিষ্ট্য : মরমীবাদ,
৩. নীতিবিদ্যক বৈশিষ্ট্য : মানবতাবাদ।[৭৮]

বাউলেরা মানব দেহের সাধনা করেন। দেহের মধ্যে সব পাওয়া যায়। এই দেহের মধ্যেই সব আছে।

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখ না রে মন ভেয়ে।
দেশদেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে।[৭৯]

অথবা

সখি গো, জন্মমৃত্যু যাঁহার নাই
তাহার সঙ্গে প্রেম গো চাই

এবং

উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্বসার
এ দেহে তার সব মিলে।[৮০]

মানব দেহই বাউলদের মতে চরম সত্য। যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে এটাই বাউলদের শেষ কথা অর্থাৎ চরম সত্য। বাউলমতে আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার অংশ। আত্মাকে জানলে পরমাত্মাকেই জানা যায়। এই দেহস্থিত আত্মাই মানুষ, মনের মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ

---

৭৫ সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৫
৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
৭৭ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ২৮৯
৭৮ হাসনা বেগম, ''বাউল দর্শন'', ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত), *বাঙালীর দর্শন চিন্তা*, পৃ. ১২৪
৭৯ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ৪৩
৮০ আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০০৩ , পৃ. ৫৭

সাঁই।[৮১] এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বাউল দর্শনকে অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। বাউলদের অনেক গানের মধ্যেই অধিবিদ্যক চিন্তা বিদ্যমান। নিম্নের বাউল গানটি সম্পূর্ণটাই অধিবিদ্যক।

সে বড় আজব কুদরতি।
আঠারো মোকামের মাঝে
ওরে জ্বলছে একটা রূপের বাতি।[৮২]

মরমীবাদী দার্শনিকরা মনে করেন, বুদ্ধির বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের সাহায্যে আমরা পরম সত্তাকে জানতে পারি না। সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব মনের একটি বিশেষ বৃত্তি দিয়ে অর্থাৎ মানব মনের মরমী শক্তি দিয়ে।[৮৩] বাউল দর্শনেও এ সত্য দেখা যায়। বাউলদের শাস্ত্রে আস্থা নেই। গুরুই একমাত্র ভরসা। গুরু অর্থাৎ সাঁইকে মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। "দেহ ও মনের সম্মিলনে চরম অবস্থায় উন্নীত হলেই কেবলমাত্র এইরূপ উপলব্ধির সন্ধান পাওয়া যায়।"[৮৪] বাউলেরা দেহ ও আত্মা দুটোকেই জানার চেষ্টা করেছেন। দেহের মধ্যে আত্মার অবস্থান। দেহ ও আত্মা এই দুটোকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবেই বাউলেরা ধরে নিয়েছেন। এই দুটোর সাধনাই বাউল গানে দেখা যায়। লালন শাহের একটি গানে এই বক্তব্য সুস্পষ্ট।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।

লালনের অনেক গানের মধ্যেই দেহ ও মনের দ্বৈতক্রিয়ার মিশ্রণ দেখা যায়। বাউল গানের বড় একটি উপাদান মানবতাবাদ। হিন্দু-মুসলিম এমনকি নারী-পুরুষকেও বাউলেরা একই অবস্থানে দেখেছেন। ইহজাগতিক কর্মই তাদের গানের প্রধান বিষয়।

ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান?
বামন যিনি পৈতার প্রমাণ,
বামনী চিনি কি ধ'রে।[৮৫]

শুধু লালন নয় বাংলাদেশের আরো অনেক বাউল যেমন শেখ মদন, পাগলা কানাই, পাঞ্জু সাঁই, সৈয়দ শাহনূর এর গানে দেহ ও মনের উপস্থিতি বিদ্যমান। মানবতার কথাও তারা বলেছেন। লালনের চরিত্র অবলম্বনে নির্মিত একটি চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে, লালন শাহের নেতৃত্বে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় সহমরণ প্রথায় বাধা দেয়ার জন্য লালন একটি লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং অনেক নারীকে জ্বলন্ত চিতা থেকে উদ্ধার করে আখড়ায় নিয়ে এসেছেন।

[৮১] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ২৯৭
[৮২] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ৪২
[৮৩] হাসনা বেগম, ''বাউল দর্শন'', ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত), *বাঙালীর দর্শন চিন্তা*, পৃ. ১২৫
[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
[৮৫] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, পৃ. ১২৩

ভারতীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাউলেরা প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের একমাত্র বিষয় হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তাদের কাছে পরকাল নেই। পাপ-পূণ্য তাদের কাছে গৌণ। অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির সাহায্যে বাউলেরা গানের মাধ্যমে মানব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশে দর্শন চর্চার ইতিহাসে হাছন রাজাকে উপক্ষো করা যায় না। হাছন রাজা গানের মধ্যে জীবন ও জগতের আদি রহস্য জানার চেষ্টা করেছেন। পরম সত্তাকে জানার চেষ্টা হাছনের গানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হাছন রাজার ঈশ্বর সম্পর্কীয় মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ হিসাবে অভিহিত করা যায়। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ হাছন রাজার সর্বেশ্বরবাদের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন,

> তাঁর এ মতবাদ অকুণ্ঠচিত্তে সর্বেশ্বরবাদ বলা যায়। কেননা তাঁর মৌলিক সত্তা পরম ব্রহ্মের মত ব্যক্তিত্বহীন নন, অথবা স্পিনোজার সারবস্তুর মত ইচ্ছাশক্তি বিহীনও নন। এ সত্তা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাকে ধর্মীয় ভাষায় ঈশ্বরও বলা যায়। তিনিই এ বিশ্বের মূল এবং তিনিই মানব-চেতনা বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এ বিশ্বকে সৃষ্টি করে তার আপন লীলা অনুভব করছেন।[৮৬]

বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ, ডাচ এবং আমেরিকানদের আগমনের ফলে বাংলায় নতুন যুগের সূচনা হয়। তাদের চিন্তা-চেতনা ও দর্শন দিয়ে এদেশের মানুষ প্রভাবিত হয়। পাশ্চাত্যের দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন চিন্তা-চেতনা ও উন্নত জীবনবোধ দিয়ে এদেশের মানুষ যে অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংক্ষেপে তাকেই বেঙ্গল রেঁনেসাস বলে। বাংলাদেশের লোকায়ত, বেদ-বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা, বৈষ্ণব, বাউল দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ বদলে যেতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ বদলায় না। লোকায়ত চিন্তা বৃহত্তর গণসমাজে সামান্য হলেও থেকে যায়। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদের চিন্তা দিয়েও উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রধান প্রধান চিন্তানায়কেরা প্রভাবিত ছিল। এ ক্ষেত্রে রাজা রামমোহনের নাম সবার আগেই আসে। রবীন্দ্রনাথ যাকে ভারত পথিক হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।

> রেনেসাঁ যুগের প্রথম বাঙালি রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন কুশলী যুক্তিবাদী হিসেবে। একই সঙ্গে বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরআন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ মন্থন করে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সব ধর্মের সারাৎসার এবং সেই শিক্ষাকে সন্নিবেশিত করেছিলেন তাঁর জীবনদর্শনে। তিনি যে ধর্মের কথা বলেন এবং যা ছিল তাঁর দর্শনের এক মস্তবড় প্রেরণা, তা কোন মন্ত্রতন্ত্রের সাধনা কিংবা পরলোকের চর্চা নয়। এ ধর্মের ভিত্তি রচিত যুক্তিবুদ্ধি ও দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের ওপর। এর মূল লক্ষ্য পরলোকে পরম সুখের জীবন নয়, বরং সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার এই ইহলোকেই ব্যাপক মানবকল্যাণ।[৮৭]

এই দিক বিবেচনা করে রাজা রামমোহন রায়কে উপযোগবাদী হিসাবে অভিহিত করা যায়। কিন্তু তিনি ছিলেন ভাববাদী। ঊনিশ শতকে অগাস্ট কোঁতে, স্যামুয়েল লব, জেমস গোডেস এবং হেনরী কটনের

---

[৮৬] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ''হাসন রেজার সর্বেশ্বরবাদ'', *দর্শন*, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (সম্পাদিত), বাংলাদেশ দর্শন সমিতির মুখপত্র, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম বর্ষ; প্রথম সংখ্য : মাঘ ১৩৭৯, পৃ. ২৬

[৮৭] আমিনুল ইসলাম, ''বাংলাদেশে দর্শনচর্চা,'' ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ এশিয়াটিস সোসাইটি পত্রিকা*, গোল্ডেন জুবিলি সংখ্যা, বিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০২ পৃ : ০২

প্রত্যক্ষবাদ দিয়ে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর শিষ্যরা প্রভাবিত ছিলেন। ডিরোজিওর অনুরাগী-অনুসারীরা ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত। ডিরোজিও শিক্ষার্থীদের হিউমের বইপত্র ও টম পেইনের *এজ অব রিজন* পড়তে দিতেন। পাশ্চাত্যের অন্যান্য বইপত্র নব্য ইংরেজি জানা লোকের হাতে আসে। এরাই ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদ এবং উপযোগবাদী দর্শন দিয়ে প্রভাবিত হয়।

উপযোগবাদের চেয়ে প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব বেশি দেখা যায় কলকাতা কেন্দ্রিক নব্য ইংরেজি জানা লোকের মধ্যে। ডিরোজিওর অনুরাগী রসিক কৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৭), দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী (১৮১৪-১৮৭৪), রাধানাথ সিকদার (১৮১৩-১৮৭০) প্রমুখের চিন্তায় প্রত্যক্ষবাদের ছাপ স্পষ্ট।

ঊনিশ শতকে কলকাতায় পজিটিভিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১৮৪২-১৯০২), *বাঙালি* পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯-১৮৭৯), গুরুদাস চ্যাটার্জি (১৮১৪-১৮৮২), কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩-১৮৭৯), সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) ও তাঁর ভাই রামকমল ভট্টাচার্য প্রমুখের তৎপরতায় কলকাতায় 'পজিটিভিস্ট ক্লাব' গঠিত হয়। 'অধিক সংখ্যক মানুষের অধিক সংখ্যক সুখ' উপযোগবাদী এই নীতির প্রবর্তক হলেন ব্রিটিশ দার্শনিক জেরমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৮২)। বেনথামের মতবাদ সমর্থন করেন, জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) ও জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)। জেমস মিল 'ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস' এর সহকারী পরীক্ষক হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। জন স্টুয়াট মিলও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনের অনেক চিন্তাবিদ উপযোগবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৩-১৮৮৪) চিন্তা-চেতনায় উপযোগবাদের ছাপ স্পষ্ট। এরা বেদ-বেদান্ত ও উপনিষদের প্রভাব ত্যাগ করতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর *আত্মতত্ত্ববিদ্যা* গ্রন্থে লিখেছেন, "জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন।"[৮৮] এই মত শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ সমর্থন করে না। দেবেন্দ্রনাথের ঠাকুরের উপর জার্মান দার্শনিক হেগেলেরও প্রভাব রয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী। অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ; – আকাশ পাতাল প্রভেদ!"[৮৯] অক্ষয় কুমার দত্তকে বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিশিক্ষকও বলা হয়।[৯০]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৯৪) চিন্তার জগতে প্রাচীন ভারতীয় উপাদান থাকলেও তাঁর মধ্যে উপযোগবাদী প্রবণতা দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাংখ্যদর্শন' পড়লে তাকে ভারতীয় দার্শনিক বলেই মনে

[৮৮] সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*, পৃ. ৬৫
[৮৯] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক (সম্পাদিত), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৩৭
[৯০] সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*, পৃ. ৭৯

হয়। আবার তাঁকে উপযোগবাদী বলা যায়, 'চিত্তশুদ্ধি', 'জ্ঞান', 'মনুষ্যত্ব' কি পড়লে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উপযোগবাদী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

মধ্যযুগে কোরান এবং হাদিসের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছে মুসলিম দার্শনিকেরা। গ্রিক এবং রোমান দর্শন দিয়ে প্রভাবিত মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যে বিভেদ, মতভেদ ও মতপার্থক্য থাকলেও কোরান এবং হাদিস ছিল মূল উৎস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকরাও ইউরোপীয় চিন্তাচেতনা দিয়ে প্রভাবিত হলেও কোরান এবং হাদিস থেকে তাদের বিচ্যুতি হয়নি। বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে নবাব আব্দুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৬) চিন্তা-চেতনায় উপযোগবাদের ছাপ রয়েছে। তিনি মুসলিম সমাজকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদলে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য ইংরেজি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৬৪ সালে নবাব আব্দুল লতিফ কলকাতায় মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' উচ্চবিত্ত মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নবাব আবদুল লতিফের মত সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৮-১৯২৮) উপযোগবাদী নীতি অবলম্বন করে মুসলামন সমাজকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন। ইসলাম ধর্মের মূলনীতিকে আদর্শ হিসাবে নিয়েছিলেন আব্দুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলী। সৈয়দ আমীর আলীর *The Spirit of Islam, A Short History of the Saracens, The Ethics of Islam* ইত্যাদি গ্রন্থের বিষয়বস্তু থেকে তাঁর চিন্তা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মকে আদর্শ হিসাবে নিলেও তাঁরা মানব সমাজে এর উপযোগিতার কথাই বলেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিমের চিন্তা চেতনায় যুক্তিবাদী মতাদর্শ দেখা যায়। এধারার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন দেলওয়ার হোসেন (১৮৪০-১৯১৩)।[৯১] এম.এন রায়ের নেতৃত্বে এদেশে মার্কসীয় দর্শনের চর্চা শুরু হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এছাড়া দেশের ভেতরে মার্কসীয় দর্শনের প্রচার ও প্রসার এবং কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে বিশেষ অবদান রাখেন কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ, অবণী মুখার্জী প্রমুখ।

বাংলা ভাষার আরেকজন ভাববাদী দার্শনিক হলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পকার এবং দার্শনিক। কবি পরিচয়েই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক সমাদৃত। গোবিন্দচন্দ্র দেব লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বের বড় কবি তাই নয়, তিনি একজন বড় দার্শনিকও।"[৯২] রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের পথে, সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, মানুষের ধর্ম, ধর্ম, পঞ্চভূত, শান্তিনিকেতন, কালান্তর এছাড়াও অসংখ্য গল্প, কবিতা এবং চিঠিপত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের দর্শনের ভিত্তি উপনিষদ। উপনিষদের অধিবিদ্যক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর রবীন্দ্রনাথের অধিবিদ্যা এবং জ্ঞানতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। নীতি

[৯১] সালাহউদ্দিন আহমদ,'' উনিশ শতকে মুসলিম সমাজচিন্তায় লোকায়ত ধারা,'' সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি : ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮

[৯২] গোবিন্দচন্দ্র দেব, ''রবীন্দ্রদর্শনের গোড়ার কথা'', শরীফ হারুন (সম্পাদিত) *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির বিশ বছর স্মারক সংকলন*, নভেম্বর ১৯৯২. পৃ. ১১

এবং শিক্ষা দর্শনের উপর তাঁর রয়েছে নিজস্ব মতাদর্শ। তিনি লিখেছেন, “আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ; তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটি ভাবা হচ্ছে তথ্য; সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।”[৯৩] গোবিন্দচন্দ্র দেব রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন সম্পর্কে লিখেছেন, “একদিকে পুরানো দিনের অধ্যাত্মবাদী ধর্মবোধ ও অন্যদিকে আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, এ দুয়ের মাঝ রাস্তায় রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের গোড়ার কথা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।”[৯৪]

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই এ অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন চর্চা শুরু হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম বছর দর্শন বিভাগে দুই জন বিএ সম্মান এবং ৫৮ জন বিএ পাস কোর্সের শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন।[৯৫] জর্জ হ্যারি ল্যাংলি ১৯২১ সালেই দর্শন বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন দর্শনে পণ্ডিত। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে দর্শন বিভাগ। ১৯২৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।[৯৬] হরিদাস ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র রায়, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কাজেমউদ্দিন আহামেদ, মন্মথ মুখার্জী, ক্ষিরোদচন্দ্র মুখার্জী, ড. বিনয়েন্দ্রনাথ রায়, ড. মৌলভী মমতাজউদ্দীন আহম্মদ প্রমুখ দর্শন শাস্ত্রে খ্যাতি অর্জনকারী শিক্ষক দর্শন বিভাগে যোগদান করেন। হরিদাস ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে দর্শন বিভাগের কৃতি ছাত্র সাইদুর রহমান লিখেছেন, “তিনি ছিলেন আমার ছাত্রাবস্থায় দর্শন বিভাগের হেড। তাকে কেউ কেউ চাণক্য বলে অভিহিত করতেন। তখন ভারতের দার্শনিক মহলে তিনি নাম্বার টু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নাম্বার ওয়ান ছিলেন স্যার রাধাকৃষ্ণাণ।”[৯৭] হরিদাস ভট্টাচার্যের জীবন সম্পর্কে সাইদুর রহমান লিখেছেন,

> হরিদাস ভট্টাচার্যকে এক আশ্চর্য মানুষ বলে আমার মনে হতো। তিনি অন্যের হাতে রান্না খেতেন না আবার সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন। আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তায় পুরোপুরি সেকুলার। তিনি মুসলমানদের মিলাদ মাহফিলেও অতি সুন্দর বক্তব্য রাখতেন এবং ইসলামের শিক্ষাকে জাগতিক ও বাস্তবমুখী করে দেখাতে পারতেন।[৯৮]

হরিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের শিক্ষক। শিক্ষক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> তিনি ছিলেন এ যুগের আর এক ডিরোজীও। কোন মতবাদকেই তিনি নির্ভুল বলে স্বীকার করতেন না এবং কোন ধর্মেই তার প্রত্যয় ছিল না। তাঁর শিক্ষাদানের প্রভাবের ফলে, ছেলেদের মানসেও

---

[৯৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যের পথে*, পৃ. ১৯

[৯৪] গোবিন্দচন্দ্র দেব, ‘‘রবীন্দ্রদর্শনের গোড়ার কথা’’, শরীফ হারুন (সম্পাদিত) *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির বিশ বছর স্মারক সংকলন*, পৃ. ১৪

[৯৫] প্রদীপ রায়, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ১৯২১-২০১১, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৩

[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[৯৭] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, যায়যায়দিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৭

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

নানা সন্দেহবাদের সৃষ্টি হয় এবং তারা কোন নীতি আবিস্কারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে দর্শনের প্রতি তাদের মনোভাব ব্যক্ত করার দিকেই ঝুঁকে পড়ে।[৯৯]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ হরিদাস ভট্টাচার্যের দর্শনচিন্তার বর্ণনা দিয়ে *অতীত জীবনের স্মৃতি* গ্রন্থে লিখেছেন, "কোন কিছুতেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। তবে তৎকালীন বাস্তববাদ বা Neo-Realism-এর ছাপ ছিল তার চিন্তাধারায়। ভাববাদ বা Idealism-কে নিয়ে তিনি খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। পরবর্তীকালে Contemporary Indian Philosophy নামক সংকলনে তাঁর মতবাদের সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ পেয়েছি।"[১০০]

সে সময় ঢাকা নতুন চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হচ্ছে। ঢাকা শহরে সভা-সমিতি গড়ে উঠছে। এ সময় ফ্রয়েডিয়ান সোসাইটি নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল।[১০১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হুসেন, আবদুল হক, আবদুল কাদির, আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজ 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামেও খ্যাত। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিল *শিখা*। এই সংগঠনের মূলমন্ত্র ছিল, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন,

> ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য-সমাজ যে-ভাবান্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নামে পরিচিতি পেয়েছিল। বাঙালি মুসলমান সমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা ছিল এর উদ্দেশ্য। অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের অনুশীলন করে, বিবেকবুদ্ধির নির্দেশ পালনকেই তাঁরা আদর্শ মান্য করেছিলেন। সমাজ তখন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র-শিক্ষককের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল - যদিও তার বাইরে থেকেও কিছু সমর্থন তাঁরা পেয়েছিলেন।[১০২]

বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের নেতারা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা, সামাজিক অনাচার দূর করে সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন। যুক্তিকে তারা প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের চিন্তায় উপযোগবাদের ছাপ স্পষ্ট। কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখের রচনায় উপযোগবাদী নীতিতে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও ধর্মীয় আবরণ থেকে তা মুক্ত নয়। আবুল হুসেন সত্য প্রবন্ধে লিখেছেন, "সংসারে থেকে যে সত্য লাভ করে, সেই ত প্রকৃত মহৎ। ইসলাম তোমাকে সংসারকে জয় করে মানুষ হতে সহায়তা করে। তার অনুষ্ঠান সত্যের পথ দেখিয়ে দেয়।"[১০৩] আবুল হুসেনের দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধের নাম

---

[৯৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ''বাংলাদেশে দর্শন'', *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির বিশ বছর স্মারক সংকলন*, পৃ. ১৮

[১০০] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *অতীত জীবনের স্মৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৮০

[১০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

[১০২] খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ সাহিত্য চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, মুখবন্ধ। আনিসুজ্জামান, খোন্দকার সিরাজুল হকের *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ সাহিত্য চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন।

[১০৩] আবুল হুসেন, "সত্য" *আবুল হুসেন রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*, আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮৩

"মুসলিম কালচার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি"। এই প্রবন্ধে তিনি দর্শনের চেয়ে বুদ্ধির মুক্তির কথাই বেশি বলেছেন। তাঁর মতে, "মুক্তবুদ্ধির পরিণতি - কালে ইউরোপীয় কালচারকে জন্ম দিয়েছিল। মুসলিম কালচারের সেই দার্শনিক ভিত্তি ইউরোপীয় কালচারে পরিণত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আমরা আজ বুদ্ধি সিকেয় তুলে রেখে আস্ফালন করছি আমরা মুসলমান।"[১০৪] বাংলাদেশে দর্শন চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন শহীদ দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ। "দর্শন বিষয়ে অবদান রাখার জন্য পূর্ব পাকিস্তান *সারস্বত সমাজ* তাঁকে 'দর্শন সাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অনেক সুধীজন তাঁকে প্রাচ্যের সক্রেটিস নামেও অভিহিত করতেন।"[১০৫] গোবিন্দচন্দ্র দেব ভাববাদ এবং বস্তুবাদ এই দুইটি সমন্বয় করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন।

> গোবিন্দ দেবের সমন্বয়ী দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভাববাদ। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস প্লেটো থেকে শুরু করে হেগেল এবং নব্য হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার তিনি নিরলসভাবে একাগ্রচিত্তে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পাঠ করেছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এর সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন একদেশদর্শী ভাববাদ কখনো বুদ্ধি, কখনো প্রজ্ঞা, কখনো বা স্বজ্ঞাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে ; সত্তাকে জীবন ও জগতকে একপেশেভাবে তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। খণ্ডিত এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা যে পূর্ণসত্তাকে জানা সম্ভব নয় তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।[১০৬]

তাঁর মতে দর্শন মাত্রই জীবনদর্শন। তিনি লিখেছেন, "সারাজীবন দর্শনের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপনের চেষ্টা করে এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে সার্থক দর্শন মাত্রই জীবনদর্শন। দর্শন কথাটি তাই জীবনদর্শন কথারই প্রতিশব্দ।"[১০৭] জীবন বিচ্ছিন্ন দর্শন তাঁর কছে পরিত্যাজ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সাইদুর রহমানের দর্শন বিষয়ে মৌলিক চিন্তা রয়েছে, যা এই গবেষণাকর্মের আলোচ্য বিষয়। আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক, কিন্তু বাংলাদেশ দর্শনে তাঁর মৌলিক অবদান অনেক। তিনি দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনচিন্তায় দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের দর্শনের ইতিহাসে খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল মতিন, হাসনা বেগম, আমিনুল ইসলাম, নীরুকুমার চাকমা, গালিব আহসান খান প্রমুখ দর্শনের নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। ইউরোপীয়, মুসলিম, ভারতীয় দর্শনের চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে হচ্ছে। এই চর্চার মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশ দর্শন নিজস্বরূপে বিকশিত হচ্ছে। রেনেসাঁ ও বাঙালির দর্শন অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির দর্শন আলোচনা করা হবে।

---

[১০৪] আবুল হুসেন,"মুসলিম কালচার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি", *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, রায়হান রাইন (সম্পাদিত), সংবেদ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৮

[১০৫] প্রদীপ রায়, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৫২

[১০৬] প্রদীপ রায় (সম্পাদিত), *গোবিন্দচন্দ্র দেব : অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৮ [ভূমিকা]

[১০৭] *গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ১০

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার রেনেসাঁ ও বাঙালির দর্শন

রেনেসাঁস ফরাসি শব্দ। এর অর্থ পুনর্জাগরণ বা পুনরুজ্জীবন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত অভিধানে রেনেসাঁ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, "১৪, ১৫, ১৬ শতকের য়োরোপে প্রাচীন গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদির পুনরুজ্জীবন; পুনর্জন্ম।"[১] রেনেসাঁ সম্পর্কে বাংলা একাডেমি প্রণীত অর্থ *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* - এ সমর্থন পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে রেনেসাঁ সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উন্নীত হয়েছে এমন অবস্থা।"[২] রেনেসাঁর সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক নিবিড়। বার্ট্রান্ড রাসেল রেনেসাঁর সংজ্ঞা দিয়ে লিখেছেন, "আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতালিতে যে আন্দোলন শুরু হয় তাকে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ নামে অভিহিত করা হয়।"[৩] রেনেসাঁর ফলে মানুষের জ্ঞান মর্ত্যে নেমে আসে। মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখে। অন্নদাশঙ্কর রায় রেনেসাঁ সম্পর্কে লিখেছেন, "রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ হলো দিব্য চেতনার পরিবর্তে মানবিক চেতনা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞান, পারলৌকিক কার্যকারণ পরম্পরার পরিবর্তে ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ পরম্পরা, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, আপ্তবাক্যের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ বাক্য, অথরিটির পরিবর্তে লিবার্টি।"[৪] রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানবপ্রেম ও ইহজাগতিকতা। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের অন্যতম ভিত্তি ছিল ইহজাগতিকতা। জর্জো ভাসারি-ই নবজাগরণ বা নবজন্ম ঘটানো সৃষ্টিসম্ভব মনস্বিতা অর্থে 'রেনেসাঁস' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।[৫]

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্যের স্কলাস্টিক দর্শন প্লেটোর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও অ্যারিস্টটলের দর্শন চার্চ কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল। ১২০৪ সালে ক্রুসেডীয়গণ কনস্টান্টিপোল দখল করার পর অ্যারিস্টটলের গ্রিক ভাষায় লেখা গ্রন্থগুলো ইউরোপে নেয়া হয় এবং সেন্ট টমাসের পর্যবেক্ষণে এগুলো ল্যাটিনে অনুবাদ করা হয়। এর দুই শতাব্দী পরে তুর্কীরা আবার কনস্টান্টিপোলের দিকে অগ্রসর হলে গ্রিক পণ্ডিতগণ ইতালিতে আশ্রয় নেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। গ্রিক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক মৌলিক গ্রন্থ আরবের পণ্ডিতগণ অনুবাদ ও সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। মুসলমানদের সাহায্যে ভারতীয় সংখ্যা, শূন্য, দশমিক ও ঋণাত্মক সংখ্যার ব্যবহার

---

[১] *Bangla Academy English-Bengali Dictonary*, Zillur Rahman Siddiqui (Ed), Bangla Academy, Dhaka. 32th Reprint 2009, p. 653

[২] *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫০০

[৩] বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*-৩, প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ৭

[৪] অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস*, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৪, পৃ. ৯-১০

[৫] আহমদ শরীফ, *সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ*, ড. নেহাল করিম (সংকলিত), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯৫

ইউরোপীয়দের কাছে পৌছে। ফলে ইউরোপীয়দের কাছে জ্ঞানের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার রেনেসাঁসের প্রাণ। গ্রিক ক্লাসিক্যাল গ্রন্থগুলো আরবিতে অনূদিত হয়েছিল। এগুলো পরবর্তী সময়ে ল্যাটিনে অনূদিত হয়। আরবি এবং ল্যাটিন জানা ইহুদি পণ্ডিতগণও অনুবাদকর্মে সহযোগিতা করেছিলেন। এ-সময় গ্রিক ভাষায় দক্ষতা অর্জনের প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল।

আরবি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রিক লজিক ও দর্শনকে কেন্দ্র করে প্রধানত স্কলাস্টিক দর্শনের শুরু। নবম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্কলাস্টিসিজমের ব্যাপ্তিকাল হিসাবে ধরা হয়। স্কলাস্টিসিজমে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরতা ছিল বেশি। আসমানি বিশ্বাসের কাছে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি ছিল নস্যি। স্কলাস্টিক দর্শনে প্রকৃতি নির্ভর যুক্তি-বুদ্ধি প্রবণতা ছিল তবে তা মাত্রায় কম। রেনেসাঁস মানুষকে প্রকৃতি নির্ভর করে, মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রেরণা দেয়। কিন্তু আসমানি বিশ্বাসকে অস্বীকার করে রেনেসাঁ হয়নি। অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে পাশ কাটিয়েই রেনেসাঁ হয়েছে। রেনেসাঁসের সাথে ইতালির নাম বিশেষভাবে জড়িত। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের শুরু ইতালি থেকে।

ইতালীয় রেনেসাঁসের শুরু ফ্লোরেন্স শহর থেকে। ফোরেন্স ছিল শিল্প, সাহিত্য এবং চারুকলা চর্চার প্রধান কেন্দ্র। তের শতকেই ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীতে অভিজাতশ্রেণি, ধনী-বণিক শ্রেণি এবং নিম্ন শ্রেণি বিদ্যমান ছিল।[৬] ফ্লোরেন্সের রেনেসাঁসের সময় সেখানে ধনতন্ত্র বিদ্যমান। ইতালির মিলান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, পাপাল ডোমেইন (পোপ-রাজ্য) এবং নাপলস নামে বড় পাঁচটি শহর ছিল। এছাড়াও ছিল বেশ কিছু ছোট ছোট শহর। বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেই শহরগুলোর গুরুত্ব ছিল, বিশেষ করে নৌবাণিজ্যে। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে ইতালিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ দ্রুত হয়।

সমুদ্রকেন্দ্রিক বাণিজ্যের ফলে নতুন নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কার মানুষকে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করে। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ভূগোল সম্পর্কে মানুষ আধুনিক পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে নতুন বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যে স্পেনের রাজা আর রাণী ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে তিনটি জাহাজ ও নগদ অর্থ দিয়ে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসার সহজ পথ আবিষ্কারের নির্দেশ দেন। কলম্বাস ভারতে আসতে গিয়ে বাহামা দ্বীপে পৌছেন। কলম্বাসের খুঁজে পাওয়া দেশের নাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিনি দেশ খুঁজতে এসে পেয়েছেন মহাদেশ। এর পাঁচ বছর পর পর্তুগালের রাজা ভাস্কোদাগামাকে সমুদ্রপথে ভারতে আসার সহজ পথ আবিষ্কারের নির্দেশ দেন। ভাস্কোদাগামা ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে চারটি জাহাজ ও তিনজন দোভাষী নিয়ে লিসবন থেকে যাত্রা শুরু করে ২৩ দিন পর ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌছেছিলেন। ইউরোপ, আমেরিকা তখন সারা বিশ্বে বাণিজ্য করছে। বাণিজ্যের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও হয়েছে। নতুনকে জানার আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে।

---

[৬] বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-৩*, প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ৯

ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং নতুনকে জানার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে রেনেসাঁসের সূচনা হয়। ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে রেনেসাঁসের যাত্রা শুরু হলেও এই আন্দোলন ইউরোপে ছড়িয়ে যায় পনের ও ষোল শতকে। সামন্ততন্ত্র থেকে এ-সময় ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশ শুরু হয়।

ধনতন্ত্রের বিকাশের সাথে রেনেসাঁ সম্পর্কিত। "রেনেসাঁস কোন জনপ্রিয় আন্দোলন ছিল না। স্বল্প সংখ্যক পণ্ডিত এবং শিল্পীদের নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিছু উদার পৃষ্ঠপোষক, বিশেষ করে মেডিসি এবং মানবতাবাদী পোপের উৎসাহে তাঁরা এই আন্দোলন শুরু করেন।"[৭] ইউরোপের সব দেশে একই সময়ে রেনেসাঁ হয়নি। ধনতন্ত্রের বিকাশও ইউরোপের সব দেশে একই সময়ে হয়নি। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়ায় রেনেসাঁস হয়েছে। প্রথম ফ্রান্সিসের পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্রান্সে রেনেসাঁসের শুরু হয়। ইংল্যান্ডের রেনেসাঁ সপ্তম হেনরি ও হাম্পারের সমর্থন পায়। ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও স্পেনে রেনেসাঁসের বিকাশ ঘটে।

ইউরোপের উৎপাদন ব্যবস্থা রেনেসাঁকে ত্বরান্বিত করে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের জীবন-যাত্রা সহজ করে। বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষের নানামুখী প্রশ্নের উত্তর শুধু প্রাচীন ধর্মনির্ভর দর্শন ও সাহিত্য নির্ভর জ্ঞান থেকে পাওয়া যায় না। বেকন, গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, কেপলার, নিউটন মানুষের বিচিত্র সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন।[৮] নতুন নতুন জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষ অথরিটির পরিবর্তে প্রকৃতি নির্ভর জ্ঞানের উপর নির্ভর করেছে।

রেনেসাঁসের ফলে গ্রিক ও রোমান মহাকাব্য, নাটক, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনায় নতুন প্রণোদনার সৃষ্টি করে। মর্ত্যের মানুষ প্রকৃতিকে অনুসরণ-অনুরণন করে নতুন নতুন সৃষ্টি করতে পারে। এই আত্মপ্রত্যয় থেকে বতিচেল্লির ভেনাসে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসায়, রাফায়েলের লেডায়, মাইকেলএঞ্জেলোর এ্যাপোলো ও ডেভিডে, দান্তের বিয়াত্রিচে ও পোত্রাকের লারায় অমরাবতির সৌন্দর্যের প্রতিফলন দেখা যায়। প্রকৃতি ও মানুষ এখানে মুখ্য।

স্কলাস্টিক দর্শনের পথ অনুসরণ না করে নিকোলাস কুসা (১৪০১-১৪৬৪) স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন। স্পেনের লুডোভিকো ভাইভেসও (১৪৯২-১৫৪০) স্কলাস্টিক দর্শন সমর্থন করেননি। ভাইভেসের মতবাদ দিয়ে প্রভাবিত ছিলেন পেট্রাস রামুস (১৫১৫-১৫৭২)। রেনেসাঁসের নগরী ইতালিতে প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বার্নাডিনো টেলিসিও (১৫০৮-১৫৮৮)। স্বাধীন মতপ্রকাশের দায়ে দক্ষিণ ইতালির নোলা নগরের বাসিন্দা ব্রুনোকে (১৫৪৮-১৬০০) আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। টমাসো ক্যাম্পানেল্লা (১৫৬৮-১৬৩৯), মাইকেল মন্টেইন (১৫৩৩-১৫৯২) প্রমুখের স্বাধীন চিন্তা-চেতনার ফলে আধুনিক দর্শনের সূচনা হয়।

---

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
[৮] অনুপম সেন, *বাংলাদেশ ও বাঙালি : রেনেসাঁস স্বাধীনতা-চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান*, অবসর, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৬২

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব বাড়ায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। লিউনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) চিত্রশিল্পী হিসাবে পরিচিত হলেও তিনি ছিলেন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, স্থপতি, শরীর বিজ্ঞানী এবং ভূতত্ত্ববিদ। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অনেক। টলেমির মতবাদ অস্বীকার করে স্বাধীন মতপ্রকাশ করেন কোপারনিকাস (১৪৭৪-১৫৪৩)। কোপারনিকাস ও টলেমির মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন টিকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১)। লিওনার্দো এবং গ্যালিলিও কামান এবং দূর্গ নির্মাণের কলাকৌশল উন্নতি করতে সক্ষম হওয়ায় তাঁদের সরকারি চাকরি হয়েছিল।[৯] কপারনিকাস, কেপলার ও গ্যালিলিও -এর মতবাদ পূর্ণতা পায় আইজাক নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) আবিষ্কারের মধ্যে। নিউটন মনে করতেন বিশ্বপ্রকৃতিতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, প্রকৃতি-প্রপঞ্চ খামখেয়ালি নয়, তাদের পরস্পরের সম্পর্কে রয়েছে গভীর যোগসূত্র ও শৃঙ্খলা।[১০]

রেনেসাঁসের অন্যতম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হলেন নিকোলো মেকিয়াভেলি (১৪৬৭-১৫২৭)। হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), লক (১৬৩২-১৭০৪), রুশোর (১৭১২-৭৮) রাষ্ট্রচিন্তা মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করতে প্রণোদিত করে।

রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে দর্শনের ইতিহাসে রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) প্রথম পদার্থ বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দর্শন রচনা করেছেন। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি সৈনিক হিসাবে চাকরি করেছেন কিছু সময়। ক্যাথলিক সেনাবাহিনীতেও তিনি যোগদান করেছিলেন। তিনি সবকিছু নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। এমনকি নিজের অস্তিত্ব নিয়েও দেকার্তের সংশয় ছিল। সংশয়কে তিনি পদ্ধতি হিসাবে নিয়ে নিশ্চিত সত্যে পৌঁছাতে চান। ব্রুনোর natura naturans এবং natura naturata পরবর্তী সময়ে একই অর্থে স্পিনোজা ব্যবহার করেছেন। লাইবনিজের মনাডতত্ত্বে এই শব্দ দুটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজকে যুক্তিবাদী দার্শনিক হিসাবে অভিহিত করা যায়। এঁরা সবাই যুক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা মনে করতেন ঈশ্বরের মত মানুষও যুক্তি বা শুদ্ধ চৈতন্যের অধিকারী।[১১]

আধুনিক যুগের দার্শনিকেরা অথরিটির প্রভাবমুক্ত হয়ে ঈশ্বর, আত্মা সম্পর্কে স্বাধীন মত প্রকাশ করেছেন। বাইবেল প্রণীত ঈশ্বরের বর্ণনার সাথে দার্শনিকদের ঈশ্বর এক নয়। "ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর হচ্ছেন ক্ষমতাশালী ঈশ্বর, নিউ টেস্টামেন্টের ঈশ্বর প্রেমময়; কিন্তু এরিস্টটল থেকে ক্যালভিন পর্যন্ত ধর্মতত্ত্ববিদদের ঈশ্বরের আবেদন হচ্ছে বৌদ্ধিক।"[১২] দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদীদের ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদীদের ঈশ্বর চিন্তার সমন্বয় করা কঠিন। আত্মগত ভাববাদী, অবভাসিক ভাববাদী এবং

[৯] বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-৩*, প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ৪
[১০] অনুপম সেন, *বাংলাদেশ ও বাঙালি : রেনেসাঁস স্বাধীনতা-চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান*, পৃ. ৬৩
[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
[১২] বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-৩*, প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ৯৫

বস্তুগত ভাববাদীদের ঈশ্বর চিন্তাও একরকম নয়। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, সর্বধরেশ্বরবাদ নামে ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। রেনেসাঁসের ফলেই এসব মতবাদের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

ইউরোপের রেনেসাঁসের চারশত বৎসর পর বাংলার রেনেসাঁ। ইউরোপের রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল নৌবাণিজ্য নগরী ইতালি থেকে। বাংলার রেনেসাঁসের শুরু বাণিজ্যিক নগরী কলকাতা থেকে। ইউরোপের রেনেসাঁ ছিল গ্রিক, রোমান সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধনতন্ত্রের বিকাশের ফল। বাংলার রেনেসাঁস হল ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কলকাতায় ধনতান্ত্রিক জীবনের সূচনালগ্নে। সুশোভন সরকার বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে লিখেছেন, "ব্রিটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় বাংলাতেই। এই প্রভাবের ফলে বাংলায় এক নবজাগরণের সূচনা হয়, যা বাংলার রেনেসাঁস নামে পরিচিত।"[১৩] বাংলার রেনেসাঁস ইউরোপের অনুকরণ নয়। বাংলার রেনেসাঁসের আগে ইউরোপে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট ভাগ হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব হয়েছে। আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করেছে। চার্চের ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেড়েছে। ইউরোপ আমেরিকা সারা বিশ্বে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। ব্যবহারিক বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করেছে। ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। এ অবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং ইংরেজদের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শ এবং সহযোগিতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় রেনেসাঁসের শুরু হয়। অগাস্ট কোঁতে, জন স্টুয়ার্ট মিল, বেনথাম রুশো, ভলতেয়ার, হবস্, লক, এডাম স্মিথ বঙ্গীয় রেনেসাঁর প্রেরণা ছিল। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, "আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপের চার শতাব্দীর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ও বিমিশ্র অনুবর্তন। অথচ অনুকরণ নয়। আমরা কতক নিয়েছি, কতক বাদ দিয়েছি। আমাদের প্রেরণার উৎস খ্রিস্টপূর্ব গ্রিস নয়। ইসলামপূর্ব ভারত নয়। প্রতীচ্যের নতুন বিদ্যা, নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান।"[১৪]

বাংলার রেনেসাঁসের আগে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন ছিল। মুঘল যুগের শেষে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণুতার চরম সীমায় পৌঁছে ছিল। ভারতে তখন গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক অচলায়ন – যা জীবনের মুক্ত স্রোত অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্রের অর্থহীন বাঁধনে গড়ে উঠেছিল এক অনড়, অচল, রুদ্ধস্রোত জীবনযাত্রা।[১৫] বংলায় তখন নবাবি শাসন। দিল্লীর বাদশাকে দিতে হয় বাৎসরিক খাজনা। বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসকের কোন সম্পর্ক ছিল না। কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগ ছিল জমিদার, জোতদার, মহাজনদের। জমিদার এবং জায়গিরদারদের সীমাহীন অত্যাচারে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা রুদ্ধ হয়ে আসে। নবাবি

[১৩] সুশোভন সরকার, *বাংলার রেনেসাঁস*, দীপায়ন, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ২০১১, পৃ. ১৩

[১৪] অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস*, পৃ. ১১

[১৫] নরহরি কবিরাজ, ''বাঙলার জাগরণ : মার্কসীয় বিচার'', *উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক*, নরহরি কবিরাজ (সম্পাদিত), কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৬৫

আমলের শেষের দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বাংলার অবস্থা উন্নয়নে শাসক শ্রেণির উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। রাজসভা ছিল বিলাসে এবং আত্মকলহে লিপ্ত। এই সময়েই বাণিজ্য উপলক্ষে ইংরেজদের ভারতবর্ষে আগমন ঘটে।

পলাশীর মাঠে নবাব আলিবর্দী খাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় এবং নিহত হওয়ার পর আলিবর্দী খাঁর মেয়ে জামাই মীরজাফর আলী খান বাংলার নবাব হন। মীরজাফর অল্প দিনের মধ্যেই পুত্র মীরণকে রাজকীয় পদে অভিষিক্ত করেন। ১৭৬৩ সালে বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হলে বাংলার সিংহাসনে নবাব হিসাবে আরোহণ করেন মীরজাফরের মেয়ে জামাই মীর কাসিম। ইংরেজদের থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করেন। এ-সময় নবাব ছিল নামে মাত্র। ১৭৬৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ লাভ করে। নবাবের শাসন বলতে আর কিছু ছিল না। ইউরোপ তখন সববিষয়ে আধুনিক। সমুদ্র নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের দখলে। সমুদ্র পথেই ইংরেজরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আসে। পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইয়াংকিরা বাংলায় বাণিজ্য করেছে।

সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং পলাশীর মাঠে যুদ্ধ না হলেও বাংলার শাসনভার ইংরেজদের হাতে চলে যেত বলে আহমদ শরীফ মনে করেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> মীরজাফর-জগৎশেঠ-রাজবল্লভ ষড়যন্ত্র না করলেও, পলাশীতে যুদ্ধ না হলেও, ইউরোপীয় যে-কোন কোম্পানী ভারত দখল করতই। তার প্রমাণ, অনুরূপ ষড়যন্ত্রের সুযোগ না পেয়েও একশ' বছরের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষ এক রকম বিনা যুদ্ধেই ইংরেজের পদানত হয়েছিল। এ সূত্রে গোয়া, দমন, দিউ, কারিকল, মাহে, পণ্ডীচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি এলাকায় পর্তুগিজ ও ফরাসীর অধিকার স্মর্তব্য।[১৬]

পলাশীর মাঠের যুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেনি। কথিত আছে মানুষ যুদ্ধ দেখতে গিয়েছিল। জনগণের রাষ্ট্র অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী চেতনা তখনো এদেশের মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়নি। পলাশীর মাঠে যুদ্ধের পর প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ইংরেজরা শাসন করবে না-কি শোষণ করবে এই সিদ্ধান্ত নিতে সময় লেগেছে। ১৭৯৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন এবং শোষণ এক সঙ্গে চালায়।[১৭] বাণিজ্যিক কোম্পানি শাসক শ্রেণিতে পরিণত হয়।

ইংরেজদের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে কলকাতা ছিল গ্রাম। ভাস্কোদাগামা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসার প্রায় দুইশত বৎসর পর জব চার্নক ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে সুতানুটি গ্রাম ক্রয় করে কলকাতা শহরের পত্তন করেন। অর্থাৎ ১৬৯০ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল গ্রাম। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালিন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী, লিখেছেন,

---

[১৬] আহমদ শরীফ, *সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ*, পৃ. ৯০
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

> ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে ডিসেম্বর দিবসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষ জব চার্ণক বাঙ্গালার সুবাদারের সহিত বিবাদ করিয়া, হুগলীর কুঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণী পত্নী সমভিব্যাহারে, হুগলীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুতানুটী নামক গ্রামে আসিয়া এক নিম্ববৃক্ষতলে আপনার শিবীর ও নতুন কুঠীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎপরে চার্ণক কিছু দিনের জন্য সেখান হইতেও তাড়িত হইয়া হিজলীর নিকটে গিয়া কুঠী স্থাপন করিয়া ছিলেন; কিন্তু পুনরায় ১৬৯০ সালের আগস্ট মাসে ফিরিয়া আসিয়া সুতানুটীতে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইহাই কালে মহানগরী কলিকাতারূপে পরিণত হইয়াছে।[১৮]

প্রথম দিকে কলকাতা ছিল বাণিজ্যিক নগরী। পরে ইংরেজ সরকার কলকাতাকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করে। বাণিজ্যিক নগরী কলকাতা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষ কলকাতায় আসা শুরু করে। ইংরেজদের সংস্পর্শে কলকাতা নগরগামী মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন, শিক্ষিত চাকুরে, উকিল, গোমস্তা, দেওয়ান, দালাল ও দোকানদারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয় কলকাতা শহর। "উনিশ শতকের প্রথমদিকেই বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কলকাতা বিকশিত হল, বাড়ির ভাড়া, জমির দাম গেল বেড়ে, জীবিকার প্রয়োজনে নানা ভাষাভাষী লোক এসে ভিড় জমাল এখানে, ফলে লোকসংখ্যাও বাড়তে লাগল দ্রুত।"[১৯] ইংরেজদের সংস্পর্শে এবং সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় কলকাতা শহরের নব্য ধনিক, বণিক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, উকিল, মোক্তার, শিক্ষকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার রেনেসাঁসের সূচনা হয়।

ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও অন্যান্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষা অনিবার্য হয়ে ওঠে। "ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেহেতু সমাজে বিশেষ সম্ভ্রম পেতে লাগল, তাই অশিক্ষিত পটু একদল লোকও এইসময় ইংরেজি শিক্ষা বিতরণ করে দু'পয়সা করে নিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ইংরেজি শিক্ষা জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, শুধুমাত্র জীবিকানির্বাহ ও সেই সূত্রে সৌভাগ্যের দ্বার খোলার জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।"[২০] ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। বাড়িতে শিক্ষক রেখেও কলকাতার নব্য ধণিক শ্রেণি সন্তানের ইংরেজি শিক্ষা নিশ্চিত করে। "সুবিধা বুঝিয়া কয়েজন ফিরিঙ্গি কলকাতার স্থানে স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন।"[২১] বাঙালিরাও পিছিয়ে ছিলেন না। বাঙালিদের মধ্যে রামজয় দত্ত প্রথম ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২২]

রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে নিজ ব্যয়ে হেদুয়া পুস্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামমোহন রায়ের অনুরূপ জগমোহন বসু একটি স্কুল পরিচালনা করিতেন। এই স্কুলটি ভবানীপুরে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত

---

[১৮] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১০
[১৯] স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*,পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃ. ১, ২
[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
[২১] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ. ৭৩
[২২] স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, পৃ. ৯

হয়েছেল।[২৩] ইংরেজি জানা লোকের চাকরি-ব্যবসা সবকিছুতেই একচেটিয়া অধিকার ছিল। এই সময় বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার নিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "একবার বড় ঝড় হইয়া একখানি জাহাজ গঙ্গার তীরে লাগিয়া আড় হইয়া পড়ে। পরদিন সেই জাহাজের সরকার বাবু ইংরাজ প্রভুকে আসিয়া বলিতেছেন – 'শার্ শার্ শিপ ইজ এইট্টিওয়ান্।' অর্থাৎ জাহাজ একাশি হইয়া পড়িয়াছে।"[২৪] রাজ-ভাষার সমাদর সবসময় আলাদা তা সে ভুলভাবে উচ্চারণ করলেও!

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এদেশের মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের নামই রেনেসাঁস। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন,

> সুদূর ইয়োরোপ থেকে জাহাজ আসে। গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দেয় ইংরেজি ভাষায় লেখা বইপত্র। নাটক উপন্যাস কাব্য প্রবন্ধ। রাজনীতি অর্থনীতি দর্শন বিজ্ঞান সন্দর্ভ। ইংরেজদের ঘরে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে বইপত্র জমে ওঠে। কিছু কি বাঙালিদের নজরে পড়ে না? ইংরেজদের জন্যে থিয়েটার গড়ে ওঠে। বাঙালীরা কেউ কি টিকিট কেটে অভনয় দেখতে যায় না? ইংরেজদের জন্যে পাশ্চাত্য পদ্ধতির সুরম্য হর্ম্য নির্মিত হয়। বাঙালী অভিজাতরা কেউ কি অনুকরণ করেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানী করা হয় ঘোড়ার গাড়ি। বাঙালী বড় লোকেরা কেউ কি কেনেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানী বা তৈরি করা হয় পাশ্চাত্য ধরনের অসবাব। শৌখীন বাঙালীরা কেউ কি তা দিয়ে ঘর সাজায় না? অলক্ষিতে বাঙালীর জীবনেও ইয়োরোপের স্রোত সঞ্চারিত হয়। সে ইয়োরোপ মধ্যযুগীয় নয়, আধুনিক। তাকে আধুনিক করে তুলেছে রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট, আমেরিকান তথা ফরাসী বিপ্লব।[২৫]

ইউরোপের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের ইংরেজি জানা বাঙালিদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। "ইংরেজ-শাসন ও তদধিক ইংরেজি শিক্ষা আঘাত হেনেছে বাঙালির ভাব-জীবন ও চিন্তাজীবনের মূলে, তাঁর আত্মতৃপ্তির মানসদূর্গে। আঘাত হেনেছে আচার সর্বস্ব, পুঞ্জীভূত অনাচার, অজস্র বিধি-নিষেধের আকর ধর্মে এবং নাড়া দিয়েছে প্রথাজীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, হাজারো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালি সমাজকে।"[২৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব সভা-সমিতিকে কেন্দ্র করেই নবযুগের সূচনা হয়। রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। "রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলায় লোয়ার্ সার্কিউলার্ রোডে একটি বাটী ইংরেজী প্রণালিতে সজ্জিত করিয়া তথায় বাস করেন।"[২৭] শিবনাথ শাস্ত্রী রামমোহন রায়ের কলকাতায় অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "তিনি কলিকাতাতে পদার্পন করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কার-

---

[২৩] সুশীলকুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালর নবজাগরণ*, এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৭, পৃ. ১৬২
[২৪] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ. ৭৪, ৭৫
[২৫] অন্নদাশঙ্কর রায়, ''বাংলার রেনেসাঁস : পুনর্ভাবনা'', *বাংলার রেনেসাঁস*, শিবনারায়ণ রায় (সম্পাদিত), রেনেসাঁস, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৯
[২৬] রাখাল চন্দ্র নাথ, *উনিশ শতক : ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়*, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. মুখবন্ধ viii
[২৭] নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহা রাজা রামমোহন রায় এবং ধম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও মতামত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮১, পৃ. ২০

প্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন।”[২৮] রাজা রামমোহন রায় সংস্কারপন্থী এই সকল ব্যক্তিদের নিয়ে ১৮১৫ সালে ‘আত্মীয়-সভা’ স্থাপন করেন। প্রথমদিকে এ সভার অধিবেশন রামমোহনের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হতো।[২৯] কলকাতা শহরের ধনীদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয় রামমোহনের রায়ের আত্মীয়-সভা। এই সভায় বৈদান্তিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো।[৩০] আত্মীয় সভায় শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করতেন এবং গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত করতেন। লোকনিন্দার ভয়ে অনেকে আত্মীয় সভা ত্যাগ করেছিলেন। সমালোচকরা আত্মীয় সভার সদস্যদের নাস্তিক হিসাবে অভিহিত করতো। সমালাচনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু প্রমুখ রামমোহন রায়ের সঙ্গে ছিলেন।[৩১]

দেশীয় এবং ইংরেজদের সমন্বয়ে ১৮১৭ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় স্কুলের পাঠ্য উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করাই ছিল এই সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য। ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৮ সালে স্থাপিত হয় ‘স্কুল সোসাইটি’। কলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করা ছিল এই সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য। ডেভিড হেয়ার এবং রাধাকান্ত দেব স্কুল সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন।

বহু ভাষায় পারদর্শী রামমোহন রায় ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অগ্রনায়ক ছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সি ভাষায় পত্রপত্রিকা সম্পাদনা ও গ্রন্থ লিখেছেন। *সংবাদকৌমুদ* এবং পারস্য ভাষায় *মিরাট আল আকবর* নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে রামমোহন রায়ের বেদান্ত দর্শনের অনুবাদ, ১৮১৫; বেদান্তসার এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ, ১৮১৬; কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপণিষদের অনুবাদ এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরেজি ও বাংলাতে, ১৮১৭; সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত বিচার পুস্তক, গায়ত্রীয় ব্যাখ্যা পুস্তক এবং সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ, ১৮১৮; সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মণ্ডুক ও সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ, ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়।[৩২] ফরাসী ভাষায় রচিত *তুহ্ফাত্-উল্-মুআহ্হিদীন* (একেশ্বর বিশ্বাসীদিগকে উপহার) এবং আরবি ভাষায় রচিত *মানাজারাতুল আদিয়ান* তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ। রামমোহন রায় প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক ছিলেন। কলকাতা শহরেই তাঁর ছিল ছয়টি বাড়ি। রামমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করলেও ধর্মহীন শিক্ষাকে পছন্দ করতেন না। এ-সম্পর্কে প্রচলিত গল্পে আছে, একদিন কোন একজন রাজা রামমোহন রায়কে এসে

---

[২৮]অন্নদাশঙ্কর রায়, ‘‘বাংলার রেনেসাঁস : পুনর্ভাবনা’’, *বাংলার রেনেসাঁস*, শিবনারায়ণ রায় (সম্পাদিত), পৃ. ৬০
[২৯] এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন : ব্রাহ্ম ভাবধারা*, প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ১৩
[৩০] স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)*, পৃ. ৭
[৩১] নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহা রাজা রামমোহন রায় এবং ধম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও মতামত*, পৃ. ১৫৮
[৩২] অন্নদাশঙ্কর রায়, ‘‘বাংলার রেনেসাঁস : পুনর্ভাবনা’’, *বাংলার রেনেসাঁস*, শিবনারায়ণ রায় (সম্পাদিত), পৃ. ৬১

বললেন, "দেওয়ানজি, অমুক আগে ছিল Polytheist, তারপর হইয়াছিল diest, এখন হইয়াছে atheist, রামমোহন রায় হাসিয়া বলিলেন, - শেষে বোধ হয় হইবে beast।"[৩৩] রামমোহন রায়কে দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর 'রাজা' উপাধি দিয়ে বাদশার দূত নিযুক্ত করে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়েছে। ব্রিস্টলের Arnos Vale Cemetery তে তাঁর সমাধি রয়েছে। ব্রিস্টলের Arnos Vale Cemetery তে প্রবেশের মুখেই রাজার সমাধি। রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিতে লেখা রয়েছে, Philosopher, Reformer, Patriot, Scholar, A founder father of Indian Renaissance. Arnos Vale Cemetery তে প্রতিবছর রাজার জন্মদিনে উৎসব হয়। ব্রিস্টলের স্থানীয় লোকজন এই উৎসবের আয়োজন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা রেনেসাঁসের আরেক ব্যক্তিত্ব দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামমোহনের সখ্যতা ছিল। তিনি "রামমোহন রায় কর্তৃক প্রচারিত একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় পরিবারে প্রচলিত পূজাদি কখনও তুলিয়া দেন নাই।"[৩৪] দ্বারকানাথ ছিলেন পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুসারী আধুনিক মানুষ। দেওয়ানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। প্রতিষ্ঠা করেন কার টেগোর এন্ড কোং, ইউনিয়ন ব্যাংক নামের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক, বীমা এবং জাহাজের ব্যবসা করে তিনি প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিদের ভাগ্য নির্ধারিত হত। বিলাতেও দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাসী জীবনযাপন করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "পিতা ইংলন্ডে থাকিতে তাঁহার হাত খরচের জন্য মাসিক লাখ টাকা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে হইত।"[৩৫] ভারতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী থাকলেও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিলাসী জীবনের অর্থ ভারতবর্ষ থেকেই গিয়েছে।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। "ডেভিড হেয়ার, স্যার্ এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এবং রামমোহন রায় এই তিনজনের যত্নে হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হয়।"[৩৬] হিন্দু কলেজ কমিটিতে অবশ্য রামমোহন রায় ছিলেন না। "রামমোহন রায় এবং তাঁহার প্রিয় বন্ধু ও শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর, উভয়েই হিন্দু কলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার যেটুকু ভাল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও দেশীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করেন নাই।"[৩৭] হিন্দু কলেজ ছিল এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া এদেশে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশে হিন্দু কলেজের অবদান সবচেয়ে বেশি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনে শিক্ষিত এই কলেজের শিক্ষার্থীরা

---

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
[৩৪] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সম্পাদিত), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৮, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ২৭৬, ১৭৭
[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭
[৩৬] নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহারাজা রামমোহন রায় এবং ধম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও মতামত*, পৃ. ২১১
[৩৭] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, পৃ. ২৬৩

বাংলার চিরায়ত জীবনধারায় ছন্দপতন ঘটায়। এ ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিওর আবদান স্মরণযোগ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "ডিরোজিওর সংশ্রবে আসিয়া হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মনে মহাবিপ্লব ঘটিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন।"[৩৮] রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষসহ অনেকেই ছিলেন এই সভার প্রধান বক্তা। সংস্কারগ্রস্ত সমাজে ডিরোজিওর চলার পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। তাঁকে স্রোতের বিপরীতে জ্ঞানের নৌকা চালাতে হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী এ-সম্পর্কে লিখেছেন,

> তখন শহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে বলিয়া বেড়াইত যে, ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে দোষ নাই, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।[৩৯]

হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিরোজিওর প্রভাব ছিল। তারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত হয়। সংস্কারগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলে। প্রশ্ন করার অভ্যাস হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থী বিশেষ করে ডিরোজির শিষ্যদের মধ্যে দেখা যায়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থী এবং ডিরোজিওর শিষ্য। তিনি কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তিনি গঙ্গা মানেন না।

> তৎকালে কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে হিন্দু সাক্ষীদিগকে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে হইত। তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল আনিবার জন্য একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিল। আমরা প্রথমে কলিকাতাতে আসিয়া তাহাকে যখন দেখিয়াছি, তখন তাহার বৃদ্ধাবস্থা। ঐ উড়িয়া ব্রাহ্মণ একখানি তাম্রকুণ্ডে করিয়া তুলসী ও গঙ্গাজল লইয়া সাক্ষীদের সম্মুখে আনিয়া ধরিত, তাহা স্পর্শ করিয়া হিন্দু সাক্ষীদিগকে শপথ করিতে হইত। যখন এই নিয়ম ছিল, তখন একবার কোনও এক মোকদ্দমাতে সাক্ষী হইয়া বালক রসিককৃষ্ণকে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইতে হয়। তিনি সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইলে উড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রথামত তাম্রকুণ্ড লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মধ্যে এক বিষম সংকট উপস্থিত। রসিককৃষ্ণ তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে চাহিলেন না; স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। আদালত সুদ্ধ লোক বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। বিচারপতি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রসিক বলিলেন - 'আমি গঙ্গা মানি না।' যখন ইন্টারপ্রিটার উচ্চৈঃস্বরে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া জজকে শুনাইলেন – 'I do not believe in the sacredness of the Ganges' তখন একেবারে চারিদিকে ইস্ ইস্ শব্দ উঠিয়া গেল; হিন্দু শ্রোতৃগণ কানে হাত দিলেন। অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে এই সংবাদ সহরে ছড়াইয়া পড়িল। 'মল্লিকদের বাটীর ছেলে প্রকাশ্যে আদালতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছে গঙ্গা মানি না; ঘোর কলি উপস্থিত, দেখ কলেজের শিক্ষার কি ফল!'[৪০]

---

[৩৮] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ. ৮৭

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২- ১০৩

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০- ১২১

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এ রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। মদ্য পান, গরুর মাংস খেয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে অবশিষ্টাংশ নিক্ষেপ ইত্যাদি। সনাতন ধর্মের সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ইয়ং বেঙ্গলরা। ডিরোজিওর শিষ্যদের ইয়ংবেঙ্গল নামে অভিহিত করা হত। বিজ্ঞানমনস্ক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবেই প্রশ্ন করার সক্ষমতা ইয়ং বেঙ্গলরা অর্জন করেছিল।

> ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজী ভাবাপন্ন হওয়াতে ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকট হয়ে উঠে। অনেকে সংশয়বাদী হইয়া পড়েন, আবার অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া নাস্তিক মতাক্রান্ত হন। রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মে আশ্রয় নেন। অপরদিকে ডফ, ডিয়ালট্রি প্রমুখ মিশনারীদের প্রভাবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃবৃন্দ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইয়ং বেঙ্গলের অবশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ধর্মান্তরিত না হইলেও প্রচলিত হিন্দুধর্মের রীতিনীতির উপর আস্থা হারাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।[৪১]

এর বিপরীতে রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রভাবে হিন্দু সমাজ আরো রক্ষণশীল হয়েছে। সংস্কারপন্থী একটি গ্রুপও সক্রিয় ছিল। বিপরীত মেরুতে ছিল জ্বীনে-পরীতে, প্রেত-পেত্নীতে, দেও- দানবে, পীর- মুরশিদ, মাজার-দরগা-কবর ও অলৌকিক-অতিপ্রাকৃতিক আসমানি শক্তিতে বিশ্বাসী বিপুল সংখ্যক মুসলিম। নারী তখন অন্ধকারে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি। সন্তান উৎপাদন এবং পুরুষের সেবা করাই যেন নারীর ধর্ম। রেনেসাঁ নারী স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচন করতে সহায়তা করে। নারী ঘরের বাইরে আসে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন ছিল। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়ের কাল। একদিকে শ্রমজীবী চাষী, ভাগচাষী, নানকার প্রজা, নিরন্ন, নির্যাতিত মানুষ। অপরদিকে এইসব মানুষের শ্রমের উপর নির্ভর করে শহরে গড়ে ওঠেছে জমিদার, জোতদার, তালুকদার, মহাজন, সুদখোর, দালাল, দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তাসহ সুবিধাবাদী মানুষের বিলাসী জীবন। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের নানকার প্রজাদের সঙ্গে দাসদের পার্থক্য খুবই সামান্য। নানকার প্রথা আদিম দাসত্ব প্রথারই এক সংস্কার করা রূপ।[৪২] নানকার প্রজাদের নিজস্ব বলে কিছু ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অনুমতি দেয়নি। এ সময় কলকাতার কিছু দূরে শ্রীরামপুরে মর্সম্যান, কেরী ও ওয়ার্ড নামে তিনজন পাদ্রী মিশন স্থাপন করেন। শ্রীরামপুর তখন ছিল দিনেমারদের অধীনে। ভারতবর্ষে ১৮০২ সালে পীতাম্বর নামে একজন সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রথম খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪৩] পাদ্রীরা আর্থিক সুযোগসুবিধাসহ নানা ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে। পরবর্তী সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তসহ অনেক বিখ্যাত মানুষও

---

[৪১] সুশীলকুমার গুপ্ত, *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালর নবজাগরণ*, পৃ. ২০১

[৪২] অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৭

[৪৩] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ. ৭২

খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এরা প্রত্যেকেই ইংরেজদের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পেছনে পারলৌকিক জীবনের চেয়ে ইহলৌকিক জীবনধর্ম বেশি কাজ করেছে।

১৮৭০ এর দশকে শশধর কর্তচূড়ামণির নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের একটি গ্রুপ সক্রিয় ছিল। এরা এতটাই রক্ষণশীল ছিল যে "তাঁদের বক্তব্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমরা যা কিছু প্রগতিশীল বলি তার সবকিছুই আছে সনাতন হিন্দুধর্মে।"[৪৪] সনাতন হিন্দুধর্মের সংস্কারপন্থী, মিশনারীদের প্রচারিত খ্রিস্টধর্ম এবং আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নিরীশ্বরবাদীদের একটি ছোট গ্রুপও তখন বিদ্যমান ছিল। এর বাইরে ছিল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মুসলিম। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল তো ছিলই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় শহর কেন্দ্রিক শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক আস্থিরতা প্রবলভাবে দেখা যায়। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত এবং সনাতনী চিন্তা-চেতনা তাড়িত হওয়ার ফলে এই অস্থিরতা দেখা দেয়। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ প্রমুখের জীবন ছিল ধর্মীয় আধ্যাত্মিক অস্থিরতায় পূর্ণ। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাতদের মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্থান হয়নি। "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে একবার ব্রাহ্ম উৎসবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু পাছে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বল্প-বসন অভিজাত অতিথিদের বিরক্তির কারণ ঘটায়, তাই তিনি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন।"[৪৫] কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সখ্যতা হয়েছিল। কেশবচন্দ্রই কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত অভিজাত মানুষের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।[৪৬] রামকৃষ্ণ বাংলা ভাষায় ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতেন। ভগবৎ প্রেমে বিভোর হয়ে তিনি নৃত্য করে, গান গেয়ে ভগবান ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতেন।[৪৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির দর্শনচিন্তায় অধিবিদ্যা, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং মূল্যবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়াদি পাওয়া যায়। এছাড়া প্রত্যক্ষবাদ, উপযোগবাদের প্রভাবও রয়েছে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষার মধ্যে বেশি দেখা যায়। রাষ্ট্র এবং সমাজ নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম রাজা রামমোহন রায়। তাঁর *তুহ্ফাত্-উল্-মুআহ্হিদীন* গ্রন্থকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের গ্রন্থ হিসাবে অভিহিত করা যায়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "আমি পৃথিবীর বহু দূর দেশে গিয়েছি। কখনো সমতল ভূমিতে, কখনো বা পার্ব্বত্য প্রদেশের নানাস্থানে বেড়িয়েছি। সর্ব্বত্রই দেখেছি যে সে সকল দেশের লোকেরা একটি বিষয়ে একমত এই যে এই

[৪৪] রাখাল চন্দ্র নাথ, *উনিশ শতক ঃ ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়*, পৃ. ১১
[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

জগতে সব কিছুরই আদি কারণ ও তার বিধাতারূপে (governor) এক পরম সত্তা বিদ্যমান আছেন।"[৪৮] ঈশ্বরকে তিনি সর্বশক্তিমান হিসাবে অভিহিত করেছেন। ঈশ্বরই জগতের আদি কারণ। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "সর্ব্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলসূত্র। জাতি বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা।"[৪৯] রামমোহন রায় খ্রীষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ ও নীতিকথার অনুরাগী ছিলেন।[৫০] তিনি একেশ্বরাদ প্রচার করেছেন।

রামমোহন রায় বেদান্তদর্শনে রামানুজের অনুসারী। শঙ্করাচার্যের মত তিনি জগতকে মিথ্যা বলেননি। তাঁর দৃষ্টিতে জগৎ বাস্তব। জগৎ মায়া নয়। ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী চার্লস ফুরিয়ে, রবার্ট ওয়েন দ্বারা প্রভাবিত রামমোহন রায় জগতের উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য ধরনের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। রামমোহন রায় ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। তাঁর ভাববাদকে বস্তুগত ভাববাদ (objective idealist) হিসাবে অভিহিত করা হয়।[৫১]

রামমোহন রায়ের ভাবশিষ্য উনবিংশ শতাব্দীর আরেকজন আত্মগত ভাববাদী দার্শনিক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মিল, বেন্থামের উপযোগবাদ এবং ইমানুয়েল কান্ট ও হেগেল দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ প্রভাবিত ছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য দর্শনের প্রভাবও তাঁর মধ্যে দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, উপাস্য এবং উপাসক এক হলে উপাসনা করবে কে? শঙ্করাচার্য জীব এবং ব্রহ্মকে এক বলে অভিহিত করেছেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিন্ন হিসাবে দেখেননি। *আত্মতত্ত্ববিদ্যা* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। আবার জড় হইতে জীবাত্মা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। তাহার সমান আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়।"[৫২] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ জীবনে দ্বৈতবাদ ত্যাগ করেন। তিনি লিখেছেন, "আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই একত্রে রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। এ দুইজন সর্বদা একত্রে থাকেন। একজন আশ্রয়, একজন আশ্রিত; একজন ফলভোগী, আর একজন ফলদাতা। অতএব তাঁহার সঙ্গে আমাদের কেমন নিকট সম্বন্ধ।"[৫৩] জগত এবং মানবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিরূপণ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ; কিন্তু আত্মাতেই তাহার রূপ দেখা যায়। সৃষ্টির

---

[৪৮] রাজা রামমোহন রায়, *তুহ্‌ফাতু-উল্‌-মুআহ্‌হিদীন, (একেশ্বর বিশ্বাসীদিগকে উপহার)*, মুহম্মদ আবূ তালিব (সম্পাদিত), আদর্শ পুস্তকালয়, মালদা, ১৯৯৫, পৃ. ২৩

[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৫০] সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, প্রথম খণ্ড, জি, এ, ই, পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯১, পৃ. ৬৯

[৫১] V. Brodov, *Indian Philosophy in Modern Times,* Progress publishers, Moscow, 1984, Second printing 1988, p. 145

[৫২] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মতত্ত্ব বিদ্যা*। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উদ্ধৃতিটি সুশীলকুমার গুপ্তের *উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ* গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। সুশীলকুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালর নবজাগরণ*, পৃ. ৬৫

[৫৩] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (প্রথম প্রকরণ ও দ্বিতীয় প্রকরণ) ও মাসিক ব্রাহ্ম সমাজের উপদেশ একত্রে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৪৫. পৃ. ১৭, সুশীলকুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর নবজাগরণ*, পৃ. ৬৬

সৌন্দর্যে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে, ধার্মিকের কল্যাণতর অনুষ্ঠানে তাঁহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়। আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ রূপ বিরাজ করিতেছে।"[৫৪] ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে সম্পাদক করে ১৮৫৩ সালে আত্মীয় সভা স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান মনে করতেন। কিন্তু সম্পাদক, সভাপতির পক্ষে মত না দিয়ে বলেন, 'ঈশ্বর বিচিত্রমান'। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এই বিষয়ে মতভেদের কারণে শেষপর্যন্ত আত্মীয় সভা বন্ধ হয়ে যায়।[৫৫] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঈশ্বর বিষয়ক মতবাদকে সর্বধরেশ্বরবাদ বা ঈশ্বরবাদ হিসাবে অভিহিত করা হয়। তাঁর অধ্যত্ম্যাবাদের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে ঈশ্বরবাদ।[৫৬] তিনি লিখেছেন, "আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে চাই।"[৫৭] কান্ট, হেগেল দ্বারা প্রভাবিত হলেও শেষপর্যন্ত উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদকে তিনি গ্রহণ করেছেন। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন,

> সৃষ্টির কৌশল-চিন্তায় স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয় পাই, এবং নক্ষত্র-খচিত আকাশ দেখিয়া বুঝি তিনি অনন্ত – এই সূত্রটুকু ধরিয়া তাঁহার স্বরূপ মনের মধ্যে আরও খুলিয়া গেল। দেখিলাম, যিনি অনন্ত জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করি; তিনি, তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রচনা করেন। তিনি জগতের কেবল রচনাকর্তা নহেন, তাহা হইতে উচ্চ; তিনি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই সৃষ্ট বস্তুসকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্তনশীল ও পরতন্ত্র; ইহাদিগকে যে পূর্ণ জ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন ও চালাইতেছেন, তিনি নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বতন্ত্র।[৫৮]

ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্তর আলোচনা করেছেন। ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কে দেবেন্দ্রেনাথ ঠাকুরের আলোচনা অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরেকজন ভাববাদী দার্শনিক কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)। রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদের চেয়ে তিনি ভক্তিবাদ দিয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। "কেশবচন্দ্রের জীবন ও মনন একাধারে ভক্তিবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সমাজ-সংস্কার ও মুক্তির প্রেরণা এক সমন্বিত রূপ পেয়েছে।"[৫৯] কেশবচন্দ্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তাঁর ঈশ্বর ছিল সর্বব্যাপী। তাঁর মতে, ঈশ্বরই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা; প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর প্রকাশমান, ইতিহাস ও মানবাত্মার মাধ্যমে ঐশ নির্দেশ অভিব্যক্তি লাভ করে।[৬০] কেশবচন্দ্র মনে করতেন এশিয়াতেই মানবসভ্যতার পীঠস্থান। এশিয়াতেই জন্মেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ মহান ব্যক্তি। রাজশক্তির প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল।

---

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
[৫৬] V. S. Naravane, *Modern Indian Thought, A Philosophical Survey*, Asia publishing house, Calcutata, Bomnay, New York…Reprinted 1967, p.37
[৫৭] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, পৃ. ২২
[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
[৫৯] সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭০
[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

"ইংরেজদের ভারত আগমনকে কেশবচন্দ্র ঐশ অভিপ্রায় বলে মনে করতেন এবং ইংল্যান্ডের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের স্বপক্ষেই ছিল তাঁর অভিমত।"[৬১]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ঊনিশ শতাব্দীর আরেক ভাববাদী দার্শনিক। তাঁর দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের সাহায্যে আমরা নতুন কোন কিছু দেখি না। আত্মার দ্বারা পূর্বে যা দেখা হয়েছিল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণে কেবল তারই প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। তিনি দ্বৈতবাদ খণ্ডন করে অদ্বৈতবাদ সমর্থন করেন। শেষ পর্যায়ে তিনি অদ্বৈতবাদে স্থির থাকতে পারেননি। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর অবস্থান দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য,

> আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী, তবে তার উত্তরে আমি এই বলিব যে প্রথমত ঃ জীবেশ্বরের মধ্যে গোড়ার ঐক্য সর্ব্বাবস্থাতেই অটল রহিয়াছি, এবং অটল থাকিবে - এ বিষয়ে আমি অদ্বৈতবাদী। দ্বিতীয়ত ঃ জীবেশ্বরের মধ্যে শেষের ঐক্য কস্মিনকালেও ছিল না – এখনও নাই – এবং ভবিষ্যতেও সংঘটনীয় নহে; কেননা কোনো জীবই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান ছিল না, হয় নাই, হইবে না। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতবাদী। তৃতীয়ত ঃ প্রত্যেক জ্ঞানবান জীবের অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানন্দের বীজ যাহা নিহিত আছে, তাহাই জীবেশ্বরের গোড়ার ঐক্যস্থান; ঈশ্বরোপাসনা রূপ ক্ষেত্র কর্ষণে এবং ঈশ্বরের প্রসাদরূপ বারিবর্ষণে সই বীজ উত্তরোত্তর ক্রমে বিকাশ পাইতে থাকে; যতই বিকাশ পায়, সাধক ততই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য–জ্ঞানে উপলব্ধি করে; প্রেমে উপভোগ করে এবং যত্নে আত্মসাৎ করিয়া ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হয়। এই রূপ গোড়ায় ঐক্য হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সাধক ঈশ্বরের সহিত গাঢ় হইতে গাঢ়তর ঐক্যবন্ধনের দিকে অগ্রসর হয়। উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে উপনীত হয়, গভীর থেকে গভীরতর অন্তরে নিমগ্ন হয়। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।[৬২]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে তাঁর রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।[৬৩] ব্রাহ্মসমাজের নেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৪৩-১৯১৩) ভাববাদী দার্শনিক হিসাবে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান ও বিশ্বাস, সংশয় ও বিশ্বাস, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ, মানব আত্মার সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা রয়েছে। *ধর্মজিজ্ঞাসা* তাঁর উল্লেখযোগ্য দর্শনের গ্রন্থ। জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের যোগ না থাকলে ধর্ম অনিষ্ঠকর ও কুসংস্কারে পরিণত হয়। ধর্মহীন জ্ঞান যেমন মানুষকে নাস্তিকতা ও অপবিত্রতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না তেমনি জ্ঞানহীন ধর্মও ভ্রমপ্রমাদে জড়িত হয়ে ধর্ম নামের অযোগ্য হয়ে পড়ে।[৬৪]

---

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[৬২] দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা, আদি ব্রহ্মসমাজ, কলকাতা, ১৮৯৭, পৃ. ৪১- ৪২, এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন : ব্রাহ্ম ভাবধারা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৮

[৬৩] এ প্রসঙ্গে এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন : ব্রাহ্ম ভাবধারা* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন : ব্রাহ্ম ভাবধারা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৯

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯

শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-৮৬) ভারতবর্ষের অন্যতম ভাববাদী দার্শনিক। তিনি দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন।[৬৫] তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে কোন বিভেদ নেই। তিনি বলেছেন, এক ঈশ্বর, তাঁহার অনন্ত শক্তি, প্রত্যেক শক্তির স্বতন্ত্র ভাব এবং স্বতন্ত্র রূপ। অনন্ত শক্তির উৎস ঈশ্বরকে যে কোন উপায়ে উপাসনা করা যায়। সেই প্রকার এক ঈশ্বরকে, যে যে ভাবেই উপাসনা করুক, তাহাতে কোন দোষ নাই।[৬৬] শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) হিউমের সংশয়বাদ এবং স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। বিবেকানন্দ নিজে কোন দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেননি।[৬৭] তাঁর দর্শনচিন্তায় শঙ্করাচার্য এবং বুদ্ধের চিন্তার মিশ্রণ দেখা যায়। শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদকে তিনি দর্শনচিন্তার মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিবেকানন্দের দর্শনের ব্যবহারিক দিকটায় বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব রয়েছে। তিনি বলতেন, "শংকরাচার্য বেদান্তকে নিয়ে গিয়েছিলেন অরণ্যের বিদ্যাচর্চায়। আমি সেই বনের বেদান্তকে এনেছি জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্যে পরিণত করার জন্য।"[৬৮] রামকৃষ্ণের মত তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। তিনি মানুষের মুক্তি চেয়েছেন। যদিও দু'জনের পথ ভিন্ন। কিন্তু লক্ষ্য অভিন্ন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির দর্শনচিন্তায় প্রত্যক্ষবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, উপযোগবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি মতবাদের সমন্বয় দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সবকটি মতবাদ দিয়ে প্রভাবিত ছিলেন। বঙ্কিম সম্পর্কে হাসনা বেগম লিখেছেন, "আমার বিবেচনায় তিনি একজন মৌলিক দার্শনিক।"[৬৯] তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থে দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, মূল্যবিদ্যার উপাদানগুলো বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জ্ঞান, সাংখ্যদর্শন, ভালবাসার অত্যাচার, অনুকরণ, মনুষ্যত্ব কি?, চিত্তশুদ্ধি, ধর্মতত্ত্ব, কমলাকান্তসহ আরো কিছু প্রবন্ধের মধ্যে হাসনা বেগমের দাবির পেছনে যৌক্তিকতা পাওয়া যায়। "বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য দর্শনগুলি পাঠ করেছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। তিনি সেই সব দর্শনের উৎকৃষ্ট সূত্রগুলি মাত্র গ্রহণ করেছিলেন।"[৭০] পাশ্চাত্য দর্শনকে তিনি অন্ধভাবে অনুকরণ করেননি। যেমন উপযোগবাদ দিয়ে তিনি প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু এই মতবাদের তিনি সমালোচনাও করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু দর্শনচর্চার জন্য দর্শনচর্চা করেননি। তিনি দর্শনকে জীবন ঘনিষ্ঠ করতে চেয়েছেন। দর্শনের ব্যবহারিক দিকের উপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দর্শন-আলোচনার মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে।[৭১] বঙ্কিমের চিন্তায় সাম্যবাদের প্রচুর

---

[৬৫] এম. মতিউর রহমান. *বাঙলার দার্শনিক মনীষা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮২

[৬৬] সেবক রামচন্দ্র, *শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত*, সেবকমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৪, পৃ. ৮২

[৬৭] সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ১১

[৬৮] বিবেকানন্দের এই উদ্বৃতিটি নেয়া হয়েছে, স্বামী জিতাত্মনন্দের, ''আত্মার স্বরূপ পূর্ণমানুষ বিবেকানন্দ'' প্রবন্ধ থেকে। *শাশ্বত বিবেকানন্দ*, নিমাইসাধন বসু (সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩১

[৬৯] এম. মতিউর রহমান (সংকলিত ও সম্পাদিত), *শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ভূমিকা

[৭০] সত্যনারায়ণ দাশ, *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা*, জিজ্ঞাসা কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৩৮

[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

উপাদান পাওয়া যায়। *সাম্য* নামে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সোশিয়ালিস্ট, কম্যুনিস্ট, কম্যুনিজম ও ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করেন। এই শব্দগুলো তিনি নিজের মত করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।[৭২]

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির অন্যতম নীতিশিক্ষক[৭৩] অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) দর্শনচিন্তায় রয়েছে প্রকৃতিবাদের প্রভাব। গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস, লুক্রেটিয়াস, আধুনিক দার্শনিক স্পিনোজাসহ অনেকে প্রকৃতিবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রকৃতিবাদীদের দৃষ্টিতে বিশ্ব নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। অক্ষয়কুমার দত্ত এই মতের সমর্থক। তাঁর মতে, বিশ্বজগৎ প্রকৃতির নিয়মেই চলে। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "সংসারের তাবৎ বস্তুর তাবৎ কার্য্যই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট রীত্যনুসারে সংঘটিত হয়।"[৭৪] কোন অতি-প্রাকৃতিক শক্তি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে নাই। অতি-প্রাকৃতিক কোন নিয়মেও বিশ্বজগৎ চলে না। অক্ষয়কুমার দত্তকে অজ্ঞেয়বাদী হিসাবে অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্য দর্শন, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত জীবন দর্শনের সন্ধান পেয়েছেন। *ধর্ম্মনীতি* গ্রন্থে অক্ষয়কুরমার দত্ত লিখেছেন,

> আমাদের আত্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন করা যেমন প্রথম কার্য্য, আপনার শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ রাখা দ্বিতীয় কার্য্য। পরাৎপর পরমেশ্বর অন্যান্য অশেষপ্রকার সুখকর ব্যাপারের ন্যায় শারীরিক স্বাস্থ্য-লাভও আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি মানুষকে উৎকৃষ্ট দেহ প্রদান করিয়া কতগুলি এপ্রকার মনোহর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, যে তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়।[৭৫]

মানুষের শরীর মন এবং বিশ্বপ্রকৃতি একই নিয়মে চলে। জ্ঞানার্জন মানুষের সুখে থাকার অন্যতম উপায় হিসাবে অক্ষয়কুমার দত্ত দেখতেন। তিনি মনে করেন, জ্ঞান মানুষকে সুখ দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) দর্শনচিন্তায় প্রথম দিকে প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস ও ধর্মের বৈজ্ঞানিক এবং কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা থেকে সরে এসে তিনি আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব আরোপ করেন।[৭৬] অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ দিয়ে প্রভাবিত হয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১৮৪২-১৯০২), *বাঙালি* পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯-১৮৭৯), গুরুদাস চ্যাটার্জি (১৮১৪-১৮৮২), কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩-১৮৭৯), সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) ও তাঁর ভাই রামকমল ভট্টাচার্য প্রমুখের তৎপরতায় কলকাতায় 'পজিটিভিস্ট ক্লাব' গঠিত হয়েছিল।

---

[৭২] যতীন সরকার, *বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৫
[৭৩] সুশীলকুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর নবজাগরণ*, পৃ. ২০৯
[৭৪] অক্ষয়কুমার দত্ত, *রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড*, স্বপন বসু (সংকলিত ও সম্পাদিত), পশ্চিম বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৩০
[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬
[৭৬] *সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, প্রথম খণ্ড*, পৃ. ১৩৮

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি বাস্তববাদী দার্শনিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। তিনি মনে করতেন, পাশ্চাত্য এবং দেশীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির চর্চা এবং শিক্ষার মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয়ের উপর একটা কার্যকরী দখল ছাড়া বাংলাদেশে সৃষ্টিশীল সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে না।[৭৭] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর সম্পর্কীয় মতবাদকে অজ্ঞেয়বাদ হিসাবে অভিহিত করা হয়। স্মৃতি, বেদান্ত, ন্যায়শাস্ত্র ও হিন্দু দর্শনে সুপণ্ডিত হয়েও বিদ্যাসাগর ষড়দর্শন গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, অতিশয় তত্ত্বঘেঁষা দর্শন বাস্তব জীবনে খুব কমই কাজে আসে।[৭৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির দর্শন চিন্তায় মূল্যবিদ্যা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ একটি আদর্শকে কেন্দ্র করে সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন। উপযোগবাদী আদর্শ তাদের মধ্যে বেশি ছিল। বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং সহবাস সম্মতি আইন প্রণয়ন এর পেছনে উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। মানবতাবাদ ছিল তাদের মূল উপজীব্য।

উনিশবিংশ শতাব্দীতে বঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের সঙ্কট প্রবলভাবে দেখা দেয়। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বাঙালি মুসমানেরা লালন করেনা, আবার আরবীয় সংস্কৃতিও নয়। ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়েও এরা ইসলামের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সঠিকভাবে পালন করেন। উত্তরাধিকার সংস্কৃতি বর্জনও করতে পারেনা। মুহম্মদ এনামুল হক এই ইসলামের নাম দিয়েছেন, ‘লৌকিক ইসলাম’। তিনি লিখেছেন,

> আঁটঘাট-বাঁধা শাস্ত্রীয় ইসলামের গন্ডীর বাহিরে আসিয়া, যে সকল সূফী ইসলামের সহিত এদেশীয় চিন্তা-ধারার যোগ ঘটাইলেন, তাঁহারাই সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের হৃদয় অধিকার করিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, বাঙ্গলার সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এমন এক প্রকারের নূতন ইসলাম জন্মলাভ করিল, যাহাকে ‘লৌকিক ইসলাম’ বলিয়া নাম দেয়া যায়। বাঙ্গালার এই লৌকিক ইসলামের রূপ অতি চমৎকার ও কৌতুকাবহ। ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম স্থান পাইয়াছে বৌদ্ধধর্ম্ম জায়গা করিয়া লইয়াছে, এবং আর্য্য, অনার্য্য ও বৈষ্ণব-বিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে।[৭৯]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ফলে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দ্বিধাবিভক্ত বঙালি হিন্দরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষায় তারা আলোকিত হয়। পিছিয়ে যায় বাঙালি মসিলম। কিন্তু এরাও পুনরুজ্জীবন চায়। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, “মুসলমানরা তো প্রাচীন ভারতের ছিলনা। সুতরাং তাদের বাদ দিয়ে ভাবা হয়। যাদের বাদ দেওয়া হলো তারাও চায় পুনরুজ্জীবন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের নয়। কারণ সেখানে তারা ছিল না। তারা চায় ইসলামের আদি পর্বের পুনরুজ্জীবন। তাদের বেলা ওঠা জাতীয়তাবাদ নয়। প্যানইসলামিজম।

[৭৭] বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৮, পৃ. ৪৭

[৭৮] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ৩৪

[৭৯] মুহম্মদ এনামুল হক, “বঙ্গে ‘লৌকিক ইসলাম’ - এর উদ্ভব ”, রায়হান রাইন (সম্পাদিত) *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ১৫৮

পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যেমন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হয় তখন প্যানইসলামিজম হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ।"[৮০] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিমের চিন্তা চেতনায় যুক্তিবাদী মতাদর্শ দেখা যায়। এধারার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন দেলওয়ার হোসেন (১৮৪০-১৯১৩)।[৮১] মুসলিম সমাজকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী করে তুলেন নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী। এরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এদের মন ছিল সুদুর আরবে। নবাব আবদুল লতিফের 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' উচ্চবিত্ত মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উর্দু, ফার্সি, ইংরেজিতে এই সভায় আলোচনা হলেও বাংলার স্থান ছিল না।[৮২] নবাব আবদুল লতিফের অনুরোধে মৌলভী কেরামত আলী জৌনপুরি (১৮০০-১৮৭৩) এক সভায় ইংরেজ শাসিত ভারত বর্ষকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষণা করেন।[৮৩] নবাব আবদুল লতিফের মত সৈয়দ আমীর আলীও মুসলামন সমাজকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু এরা কেউ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বলেন নাই। আহমদ ছফা লিখেছেন, "স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমির আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ যে সকল মুসলিম চিন্তানায়ক মুসলমানদের হয়ে কথা বলেছিলেন এবং চিন্তা করেছিলেন, মুসলমান সমাজের প্রকৃত দাবি কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে চিন্তা করার কোন অবকাশই পাননি। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সংস্কার বলতে তাঁদের মনে প্রভুত্ব হারানো উচুঁ কোটির মুসলমানদের কথাই জাগরুক ছিল।"[৮৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির দর্শনচর্চায় পাশ্চাত্যের আধুনিক দর্শন ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বেদ-বেদান্ত উপনিষদের প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির দর্শনচিন্তায় রয়েছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন বাঙালিরা কতক নিয়েছে আবার কতক বাদ দিয়েছে। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাদের দর্শনে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের প্রভাবই বেশি। বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ন, মহাভারত, ত্রিপিটক উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি দার্শনিকদের মনন জগতে অধিকক্রিয়াশীল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানেরা ইউরোপের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাঁদের চেতনা জগতে ছিল কোরান হাদিস। তাঁরা কোরান হাসিদকে অবলম্বন করেই এ অঞ্চলের মানুষের মুক্তি চেয়েছেন। হিন্দু এবং ব্রাহ্ম নেতারা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ত্যাগ করতে পারেনি তেমনি মুসলমানেরাও কুরান, হাদিস ত্যাগ করে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা চেতনা করতে পারেননি। কিছু ব্যতিক্রম হয়তো ছিল কিন্তু সে ব্যাতিক্রম সামনের কাতারে দাঁড়ায়নি।

---

[৮০] অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস*, পৃ. ৬৫, ৬৬

[৮১] সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি : ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট*, উনিশ শতকে মুসলিম সমাজচিন্তায় লোকায়ত ধারা- সালাহউদ্দিন আহমদ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ.১৮

[৮২] খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ সাহিত্য চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৬, পৃ : ৪০

[৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ : ৪১

[৮৪] আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৫

ইউরোপের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি দার্শনিকেরা সমাজের ভেতরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বাসা কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছেন। সমাজের উপর তলায় তাঁরা নাড়া দিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে যা নীচের দিকেও প্রবহমান। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি দার্শনিকেরা জ্ঞানকে মানব সেবায় কাজে লাগিয়েছেন। জ্ঞানচর্চার জন্য এরা দর্শন চর্চা করেননি। উপযোগিতার ভিত্তিতে অধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণের জন্য জ্ঞানচর্চা করেছেন। যে কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশুদ্ধ দর্শনচর্চার চেয়ে তারা সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক হিসাবে বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। দর্শনচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁদের মৌলিক অবদান রয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বাঙালি মুসলিমরাও দর্শনচর্চা শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ে দুই ধারায় দর্শনচর্চা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দর্শনচিন্তায় আধুনিক উইরোপীয় দর্শনের প্রভাব থাকলেও বেদ বেদান্ত উপনিষদের প্রভাব বেশি। অপরদিকে বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের দর্শনচিন্তায় ইউরোপীয় দর্শনের প্রভাব থাকলেও কোরান এবং হাদিসই তাঁদের দর্শনের মূল উৎস ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের দর্শনচিন্তায় তা দেখানো হয়েছে। জগৎ এবং জীবন জিজ্ঞাসায় মুসলিম দার্শনিকেরা কোরান এবং হাসিদকে মূলনীতি হিসাবে নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরাও ইউরোপীয় দর্শনদিয়ে প্রভাবিত হলেও জীবন জিজ্ঞাসা এবং জগতের রহস্য সন্ধানে তাঁরা কোরান এবং হাসিদকে ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে অতিমাত্রায় কোরান এবং হাদিসের উরপ নির্ভর করে জগৎ ও জীবনের রহস্য সন্ধান করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আবার কেউ কেউ ইউরোপীয় দর্শনের প্রভাবে স্বতন্ত্রভাবে জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যাখ্য বিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে বিংশ শতাব্দীর সাতজন প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালি মুসলিম দার্শনিকের দর্শনচিন্তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় দর্শনের মিথস্ক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শনচর্চা শুরু হয়। আবদুল মতীনের ভাষায়, "বৃটিশ শাসনামলে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের দার্শনিক চিন্তা একদিকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন আর অন্যদিকে মধ্যযুগীয় মুসলিম ধর্মতত্ত্বের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।"[১] বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ইউরোপীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত বাঙালি মুসলমানও বিংশ শতাব্দীতে দর্শনচর্চা করেছে।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আধুনিক শিক্ষার প্রসার দেরিতে হয়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাঙালি মণীষার মনন জগতে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব বিলম্বেই ঘটে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানেরা বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ধারায় দর্শনচর্চা শুরু করেন। জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, মূল্যবিদ্যা পাশ্চাত্য দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তায়ও দেখা যায়। দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলোতে বাঙালি মুসলমানও মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তাতে জ্ঞানের উৎপত্তি, পরিণতি, উৎস ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞানবিদ্যা, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতিক সত্তা নিয়ে অধিবিদ্যা এবং আদর্শ, মান বা Theories of Value নিয়ে মূল্যবিদ্যার আলোচনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানেরা জীবন ও জগৎ এর সামগ্রিক রূপ ও কাঠামো সম্বন্ধে কিছু মৌলিক প্রশ্ন বিচারসম্মতভাবে জানার চেষ্টা করেছেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানের যৌক্তিক আলোচনাই তাঁদের দর্শন। এই শতাব্দীতে বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দর্শনচর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন (১) খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫), (২) মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), (৩) আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০-১৯৮৫), (৪) আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪), (৫) দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯), (৬) সাইদুর রহমান (১৯০৯-১৯৮৭), (৭) আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) প্রমুখ।

এই অভিসন্দর্ভে উপরে উল্লিখিত সাতজন প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

---

[১] আবদুল মতীন, *দর্শন সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি,ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১১১

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

জীবন ও কর্ম

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫) অন্যতম। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন নিয়ে এম. এ পাশ করেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে দাখিল হইলাম। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল, বি. এ পরীক্ষা আসিল। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পরে উক্ত কলেজেই এম. এ পড়িতে থাকিলাম - বিষয় লইলাম Philosophy।"[১] শিক্ষা জীবন শেষে তিনি শিক্ষা বিভাগে চাকরিতে যোগদান করেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "প্রিন্সিপ্যাল স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ডিরেক্টর ক্রফট্ সাহেবের নিকট আমার অনুরোধ পত্র দিলেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ডিরেক্টর আমাকে অভয়বাণী দিয়া কিয়ৎকালের জন্য রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের Supernumerary teacher –এর পদে ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।"[২] কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করা অবস্থায় তিনি ডেপুটি ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ সময় তিনি শিক্ষকতা এবং শিক্ষা প্রশাসক হিসাবে চাকরি করেছেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনি প্রথম আই. ই. এস পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে শিক্ষা প্রশাসক হতে শিক্ষকতায় ফিরিয়ে আনা হয়। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসাবে চাকরি জীবন শুরু করেছিলেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন তিনি ১৯০৪ সালে।[৩] তিনি প্রথম বাঙালি মুসলিম প্রধান শিক্ষক। ১৯০৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগে ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর পদে ২৫০ টাকা বেতনে যোগদান করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁর বেতন ছিল ২০০ টাকা। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে থাকার সময় তিনি শিক্ষার্থীদের অসহযোগ আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ফলে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে ১৯১১ সালে। আহছানউল্লা শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে দেন নাই। পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে খানবাহাদুর উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন।[৪]

---

[১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা, ৮ম সংস্করণ ২০০৩, পৃ. ১১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[৪] ড. কয়েসউদ্দিন আহমদ, "খানবাহাদুর আহছানউল্লার জীবন ও কর্মের বর্ষপঞ্জী", *খানবাহাদুর আহছানউল্লা স্মারকগ্রন্থ*, ড. গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা , ২০০২, পৃ. ৩৪৭

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জন্ম সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামে। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি নলতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষায় তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। চাকুরি সূত্রে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। শিক্ষা প্রশাসক হিসাবে ১৭ বৎসর ছিলেন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের সুফি এবং পীরবাদ তাঁর চিন্তার মধ্যে রয়েছে। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমার সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, সরকারী কাজের মধ্যে থাকিয়া আমি আত্মিক শিক্ষার প্রচুর উপকরণ পাইয়াছিলাম। ঐহিক ও পারত্রিক শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল চট্টগ্রাম বিভাগ।"[৫] চট্টগ্রামে আধ্যাত্মিক জীবনের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, "চট্টগ্রামের আধ্যাত্মিক পারিপার্শ্বিকতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং এখানকার জনসাধারণের সাহচর্য আমি আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছিলাম। এখানকার মুখরা প্রকৃতি আধ্যাত্মিক চর্চার খুবই অনুকূল, তাই আমি দীর্ঘকাল স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এই দূর দেশে মানসিক তৃপ্তির সহিত অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।"[৬]

১৯২৯ সালে ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের আগে তিনি হজ্ব পালন করেন। চাকরি জীবন শেষে কলকাতায় মখদুমী লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে পুস্তকের ব্যবসা শুরু করেন। পুস্তক ব্যবসায় তিনি কবি, সাহিত্যিকসহ অনেকের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পাঠ্যের বই এবং অন্যান্য পুস্তক আমরা প্রকাশ করিতে লাগিলাম, দিকে দিকে আহ্ছানউল্লা বুক হাউসের সুনাম সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।"[৭] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিজেও লিখেছেন। চাকরি জীবনের শুরু থেকেই তিনি লেখা শুরু করেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা একাশি। ধর্মতত্ত্ব, নীতি ও উপদেশ, টিচার্স ম্যানুয়াল, আত্মজীবনী, পদার্থবিদ্যার উপর তাঁর গ্রন্থ রয়েছে। ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন সমাজ-শিক্ষক। লেখনী চালিয়ে তিনি সেই সমাজ-শিক্ষকের দায়িত্বই পালন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।"[৮] চাকরি জীবন শেষে তিনি সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কলকাতার অভিজাত এলাকা হিসাবে পরিচিত পার্ক সার্কাসে বিলাসবহুল বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। বাড়ি নির্মাণ বাবদ এক লক্ষ টাকার উপর খরচ হয়েছিল।[৯] এই বাড়িতে বেশিদিন তিনি থাকতে পারেননি। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রণমূল্য বেড়ে যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ঢাকার আহ্ছানউল্লা বুক হাউসের ক্ষতি হয়। ফলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার পুস্তক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসায়িক দেনা তিনি পরিশোধ করেন বাড়ি

---

[৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, পৃ. ৯২
[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
[৮] ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, "সমাজ-শিক্ষক আহ্ছানউল্লা", *খানবাহাদুর আহছানউল্লা স্মারকগ্রন্থ*, ড. গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), পৃ. ১১৮
[৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, পৃ. ১০০

বিক্রি করে।[১০] বাড়ি, ব্যবসা সব হারিয়ে তিনি কলকাতা ছেড়ে সাতক্ষীরা জেলার নলতায় এসে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। কলকাতা শহরের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, "কলকাতা শহরের কৃত্রিম আকর্ষণ আমার মিটিয়া গিয়াছে।"[১১] নলতায় ফিরে আসার বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, "১৩ বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য যে মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিলাম, এখন প্রায় ৬০ বৎসর পরে তথায় উপস্থিত হইলাম।"[১২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নলতায় অবসর জীবনে ঘরে বসে থাকেননি। তিনি শিক্ষা ও সমাজ সেবা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাঁকে কেন্দ্র করে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে। নানা কাজের পরামর্শ নেয়ার জন্য অনেকে তাঁর কাছে আসেন। তিনি লিখেছেন, "বাড়ি সংলগ্ন একটী মসজিদ আছে, উহাই আমার কর্মস্থল হইল।"[১৩] মানুষের কল্যাণের জন্য নলতায় তিনি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমত ধর্মীয় এবং সামাজিক কিছু কাজের মধ্যে মিশনের পরিধি সীমাবদ্ধ থাকে। মিশনের পরিধি বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে কর্মপরিধিও বাড়ে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "১৯৩৫ সালের ১৫ই মার্চ খুলনা জেলার নলতা গ্রামে 'নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, ২৪ পরগণা এমনকি সুদূর হবিগঞ্জেও মিশনের শাখা স্থাপিত হয়।"[১৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়ায় তা মোকাবেলার জন্য মিশনের উদ্যোগে খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে এবং মিশন থেকেই নলতায় লঙ্গরখানা চালু হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ছাড়াও তিনি পুকুর খনন, পোস্ট অফিস স্থাপন ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমি কলকাতায় স্থানান্তরিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় মেম্বর (Senator) মনোনীত হইলাম। পরে Syndicate -এ প্রবেশ করি। নির্বাচনে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল।"[১৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান রয়েছে। তিনি লিখেছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল সিনেটে উপস্থিত হইলে দারুণ বিরোধের সৃষ্টি হয়, পরে উহা বিবেচনার জন্য একটী স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। উহার মধ্যে আমি একজন মেম্বর ছিলাম এবং যতদূর সাধ্য উহার আবশ্যকতা সমর্থন করিয়াছিলাম।"[১৬] উল্লেখ্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কর্মজীবন তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনি শিক্ষা অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় তিনি চাকরি করেছেন। শেষ জীবন তাঁর সাধনার জীবন।

---

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭
[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
[১৪] খানবাহাদুর আহছানউল্লা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩
[১৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, পৃ. ৯৩
[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতা এবং শিক্ষা প্রশাসক হিসাবে তিনি অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। কর্মজীবনে শিক্ষা প্রশাসক হিসাবে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশের মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল। শিক্ষার জন্য স্কুল, কলেজ যথেষ্ট ছিল না। ১৯৪৭ সালের আগে কলকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। তারমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আবাসিক।

কর্মজীবনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম মুসলিম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এসময় তিনি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজশাহীতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উন্নয়নে তিনি কাজ করেছেন। রাজশাহীর মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা উল্লেখ করা যায়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "রাজশাহীতে তৎকালে মোছলমানদিগের মধ্যে একতার অভাব ছিল। দুইটী দল ছিল, কেহ কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করিত না, পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকিত। আমি পল্লীতে পল্লীতে সভা করিয়া একতার বীজ বপন করি।"[১৭] রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে সে সময় মুসলিম ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ছিল না। রাজশাহী শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে তিনি হোস্টেল নির্মাণ করার জন্য অর্থ-সাহায্য সংগ্রহ করেন। এ সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "আমি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীতে যোগদান করি। সেখানে নাটোর মহারাজার পক্ষ হইতে একটী হিন্দু ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু মোছলমান ছাত্রদিগের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই আমি রাজশাহী জেলার স্থানে স্থানে জন-সাধারণকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষার প্রস্তাব করি।"[১৮] রাজশাহী শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে হোস্টেল নির্মাণের জন্য এক হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।[১৯] এই অল্প অর্থে হোস্টেল নির্মাণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার সাথে জনসাধারণ সম্পৃক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে সরকারের সহযোগিতায় মুসলিম ছাত্রদের থাকার জন্য হোস্টেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

> পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন ছোট লাট Sir Bamfylde Fuler রাজশাহী পরিদর্শনে আসেন। রাজশাহী কলেজ পরিদর্শন শেষে কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করতে এলে হেডমাস্টার আহ্ছানউল্লা স্কুলটি দেখিয়ে মোসলেম হোস্টেলের অভাব জানান। লাট বাহাদুর স্কুলের জন্য একটি হোস্টেলের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এ কাজে ৭৫০০০ টাকা মঞ্জুর হয়। দোতলা

---

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[১৯] মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *খানবাহাদুর আহছানউল্লা : শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২১

হোস্টেল নির্মিত হলে লাট সাহেবের স্মৃতি রক্ষার জন্য এর নামকরণ হয় ফুলার হোস্টেল। ফুলার হোস্টেল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯০৯ সালে।[২০]

বর্তমানে ফুলার হোস্টেলটি রাজশাহী কলেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি এখন আর হোস্টেল নেই। এখন ফুলার হোস্টেল রাজশাহী কলেজের একাডেমিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রধান শিক্ষক থেকে খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা চট্টগ্রাম বিভাগের ইনস্পেক্টর পদে যোগদান করেন। তিনি লিখেছেন, "দুইটী বৎসর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পুনরায় আমার পূর্ব্ব অভিপ্রেত ইনস্পেকটিং লাইনে প্রবেশ করিলাম।"[২১] চট্টগ্রাম বিভাগে আহ্‌ছানউল্লা অনেক স্কুল কলেজ মাদ্রাসা স্থাপন করেন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন করেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ও নোয়াখালী হাইস্কুলগুলি আমারই তত্ত্বাবধানে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।"[২২] ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় তিনি ইন্টারমিডিয়েট সেকশন চালু করেন।

কলকাতায় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "কলিকাতার মোছলেম ছাত্রদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়। উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। হিন্দু সদস্যগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। আমি বলিলাম- হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজের যদি আবশ্যকতা থাকে, তবে মোছলেম কলেজের আবশ্যকতা নিশ্চয় আছে।"[২৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা ভূমিকা রেখেছেন। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফর কালে এদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জানায়। এর দুইদিন পর ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ সালে সরকার অফিসিয়াল কম্যিনিকের মাধ্যমে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেয়। সরকারি এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করে আইনজীবী ড. রাসবিহারী দাসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।[২৪] কলকাতা কেন্দ্রিক কিছু বুদ্ধিজীবীর বিরোধিতা সত্ত্বেও, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল সিনেটে উপস্থাপিত হলে দারুণ বিরোধের সৃষ্টি হয়, পরে উহা বিবেচনার জন্য একটী স্পেশাল

---

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১, ২২

[২১] খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, পৃ. ২৫

[২২] মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *খানবাহাদুর আহছানউল্লা : শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা*, পৃ. ১৯

[২৩] খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, পৃ. ৯৫

[২৪] Muhammad Abdur Rahhim, *The Muslim Society and Politics in Bengal A.D. 1757-1947,* The University of Dacca, Dacca, 1978, p. 139. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *খানবাহাদুর আহছানউল্লা : শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা*, পৃ. ২৫

কমিটী গঠিত হয়। উহার মধ্যে আমি একজন মেম্বর ছিলাম এবং যতদূর সাধ্য উহার আবশ্যকতা সমর্থন করিয়াছিলাম।"[২৫]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার উল্লেখযোগ্য অবদান হল পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বর প্রবর্তন। তিনি প্রথম এম. এ ও সম্মান শ্রেণীতে রোল নম্বর প্রবর্তনে ভূমিকা রাখেন। তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। রোল নম্বর প্রবর্তন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখা হইত। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, হিন্দু ও মোছলেম পরীক্ষার্থীর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব হইয়া থাকে। তজ্জন্য কোন পরীক্ষায় মোছলেম ছাত্র উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোছলেম পরীক্ষার্থী ১ম. ২য়, ৩য় স্থান অধিকার করিতে পারে, আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ সহজে প্রথম বিভাগেও স্থান পায় না। সাম্প্রদায়িক মনোভাব ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে বলিয়া অনেকে ধারণা করিতেন। যাহা হউক ভারতে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আমি সকল স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিলাম। প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইল, উত্তরের খাতায় কোথাও পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি নাই। কেবল পরীক্ষার্থীর ক্রমিক নম্বর (Roll Number) দেওয়া হয়। এই লইয়া আমি তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলাম এবং কতিপয় নিরপেক্ষ মেম্বরের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইলাম। বিরোধী পক্ষ এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে খাতায় পরিক্ষার্থীর নাম না থাকিলে শুধু ক্রমিক নম্বর দ্বারা কাজ চলিতে পারে না। ইহাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমরা তদুত্তরে বলিলাম যে, বর্ত্তমানে অনার্স, এম. এ পরীক্ষায় ছাত্র সংখ্যা খুব কম। সুতরাং পরীক্ষামূলকভাবে অন্ততঃ এই পরীক্ষায় নামের পরিবর্ত্তে ক্রমিক নম্বর দেওয়ার বিধি প্রবর্ত্তন করা হউক। বহু বাক বিতণ্ডার পর উহা গৃহীত হইল। ফলে কোন অসুবিধা দৃষ্ট হইল না। বরং মোছলেম পরীক্ষার্থীর মধ্যে কেহ কেহ উচ্চস্থান অধিকার করিল।[২৬]

পরবর্তী সময়ে এস এস সি এবং এইচ এস সি পর্যায়ে রোল নম্বর প্রবর্তন করা হয়। রোল নম্বর প্রবর্তনের পর নাম দেখে বেশি কিংবা কম নাম্বর দেয়ার প্রবণতা শিক্ষকদের মধ্যে কমে যায়।

দর্শনচিন্তা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দর্শন বিষয় নিয়ে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেছেন। দর্শনে তাঁর নিজস্ব জায়গা রয়েছে। জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, মূল্যবিদ্যা দর্শনের মৌলিক আলোচনার বিষয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার এসব বিষয়ে মৌলিক অবদান রেখেছেন। তাঁর গ্রন্থ এবং অসংখ্য চিঠিপত্রে বিচ্ছিন্নভাবে দর্শনচিন্তা রয়েছে। এসবের সমন্বিত রূপই তাঁর দর্শনচিন্তা। খানবাদুর আহ্ছানউল্লার দর্শনচিন্তার বর্ণনা দিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, "তাঁর সত্যিকার পরিচয় হচ্ছে আল্লামা ইকবাল কর্তৃক প্রদত্ত

[২৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, পৃ. ৯৫
[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩, ৯৪

মুসলিম দর্শনে।"[২৭] *সৃষ্টিতত্ত্ব*[২৮] এবং *ছুফী*[২৯] নিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দুটি গ্রন্থ রয়েছে। *ছুফী* গ্রন্থের সূচনা বক্তব্যে আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "ছুফী প্রেমবলে কিরূপে পরমাত্মা-জ্ঞান লাভ করে, এই পুস্তকে কেবল তাহাই আলোচ্য। জ্ঞান বা কর্ম্ম-মার্গের কথা এই পুস্তকে অঙ্গীভূত নহে।"[৩০] *সৃষ্টিতত্ত্ব* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম নিহিত। এই বিরাট বিশ্ব প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমের সান্ত প্রকাশ ও সৃষ্ট মানব তাঁহার অনন্ত শক্তির সান্ত প্রতিনিধি বা খলিফা।"[৩১] সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সুফিবাদ প্রধানত অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয়। জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনার মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দর্শনচিন্তা আলোচনা করা হবে।

জ্ঞানতত্ত্ব

দর্শনের অন্যতম আলোচনার বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব। জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) জ্ঞানের উৎস-বৈশিষ্ট্য শর্ত-সীমা, জ্ঞানের বৈধতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। দর্শনের ইতিহাসের মতই জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসও প্রাচীন। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দার্শনিকেরা জ্ঞানের উৎপত্তি, বৈধতা এবং যতার্থতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রিক দার্শনিকেরা জ্ঞানের উৎস, বৈশিষ্ট্য শর্ত সীমা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সোফিস্টরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে একমাত্র সঠিক জ্ঞানের মাপকাঠি হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। উপনিষদে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বকে জানবার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সক্রেটিস জ্ঞানকে বুদ্ধিজাত হিসাবে দেখিয়ে জ্ঞানের ব্যক্তি নিরপেক্ষ বস্তুগত চরিত্র স্পষ্ট করে তোলেন। *চারমিডিস সংলাপে* তিনি বলেছেন, "জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হলেই মানুষ সুখী হবে।"[৩২] ভারতীয় দর্শনে দেখা যায় অবিদ্যার কারণে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। যথার্থ জ্ঞানের ফলেই মানুষের মুক্তি অর্থাৎ সুখ লাভ সম্ভব।

জ্ঞানের উৎস-বৈশিষ্ট্য শর্ত-সীমা, জ্ঞানের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় দার্শনিকেরা বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ এবং স্বজ্ঞাবাদ নামে প্রধান কয়েকটি মতবাদের সৃষ্টি করেছেন। রেনেসাঁস উত্তর ইউরোপের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস। ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪), জর্জ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) জ্ঞানের উৎস হিসাবে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। লকের মতে অভিজ্ঞতা থেকেই সব জ্ঞান পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন অভিজ্ঞতাপূর্ব স্বতঃসিদ্ধ কোনো ধারণা নেই। বার্কলি লকের অভিমত অনুসরণ করে বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার

---

[২৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, "মহামানব আহ্ছানউল্লা", *খানবাহাদুর আহছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, ড. গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), পৃ. ৮৬

[২৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *সৃষ্টিতত্ত্ব*, আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৯, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৫

[২৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ছুফী*, আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা, দ্বিতীয় স্করণ ১৯৪৭, অস্টম সংস্করণ ২০০৮

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৩১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *সৃষ্টিতত্ত্ব*, পৃ. ৭

[৩২] *পেটোর সংলাপ*, সরদার ফজলুল করিম (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৫

করেছেন। স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) মতে আমাদের সমস্ত জ্ঞান আসে ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণা থেকে। হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ শেষ পর্যন্ত সংশয়বাদে পরিণত হয়। বুদ্ধিবাদীরা অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেননি। তারা বুদ্ধির কথা বলেছেন। ফরাসি দার্শনিক রেনে ডেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), হল্যাণ্ডের দার্শনিক বেনেডিক্ট স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) এবং গটফ্রিড উইলহেম লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে বুদ্ধিবাদ সমর্থন করেছেন। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধির সমন্বয় করে বিচারবাদ প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত অজ্ঞেয়বাদে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বজ্ঞাবাদীরা বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা কোনো কিছুকেই স্বীকার করেননি। তারা স্বজ্ঞার কথা বলেছেন। ফরাসি দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ (১৮৫৯-১৯৪১) আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে স্বজ্ঞাবাদের প্রধান এডভোকেট। ভাববাদী দার্শনিকেরা সাধারণত জ্ঞানের উৎস হিসাবে স্বজ্ঞার কথা বলেছেন। বার্কলি ভাববাদী দার্শনিক হয়েও স্বজ্ঞাবাদ সমর্থন করেননি। তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে অভিজ্ঞতাবাদ সমর্থন করেছেন।

ইউরোপীয় এবং ভারতীয় দার্শনিকদের মত বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম দার্শনিকরাও জ্ঞানের উৎস বৈশিষ্ট্য, শর্ত-সীমা এবং জ্ঞানের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লার দর্শনচিন্তায় জ্ঞানবিদ্যা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জ্ঞান বা এল্‌ম সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা লিখেছেন,

> এল্‌ম বলিতে বুঝিতে হইবে ঐ জ্ঞান, যাদ্বারা খোদার রহমানিয়তের পরিচয় পাওয়া যায়, যে জ্ঞান দ্বারা খোদার নৈকট্য লাভ করা যায়, যে জ্ঞান দ্বারা মানুষকে খোদার রঙে রাঙ্গাইতে পারা যায়, যে জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সংযোগ বা সাযুজ্য লাভ করা যায়, যে জ্ঞান দ্বারা তন্ময়তা হাছেল করা যায়, যে জ্ঞান দ্বারা স্রষ্টার প্রেমের নিদর্শন গোচরীভূত হয়, যে জ্ঞান দ্বারা মানুষ স্বীয় হাস্তির খবর ভুলিয়া গিয়া খোদার এককত্বের গভীরতম সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় - এককথায় যে জ্ঞান দ্বারা ইছলামের তাওহীদের গভীরতম প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৩]

খোদার নৈকট্য লাভের জন্য খানবাহাদুর আহছানউল্লা পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে চেয়েছেন। অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান হয় না। বুদ্ধিও আমাদের পূর্ণ জ্ঞান দিতে পারে না। বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানলাভের মাধ্যম হিসাবে তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য তিনি স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করেছেন।

খান বাহাদুর আহছানউল্লা লিখেছেন, "কেবল মানসিক জ্ঞান মানবকে পূর্ণত্ব দিতে পারে না। মানুষ দেহ, মন ও আত্মার সমষ্টি, যে জ্ঞান দ্বারা দেহ, মন ও আত্মা পুষ্ট হয়, সেই প্রকৃত জ্ঞান। যে জ্ঞান স্রষ্টা ও সৃষ্টির দূরত্ব নষ্ট করিয়া যোগ সাধনের সহায়তা করে, সে জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।"[৩৪] ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদের প্রতারিত করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুকে সবসময় সঠিকভাবে জানা যায় না। ইন্দ্রিয় মাঝে মধ্যে

[৩৩] খানবাহাদুর আহছানউল্লা, *সৃষ্টিতত্ত্ব*, পৃ. ১৫
[৩৪] খানবাহাদুর আহছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, পৃ. ১৫৮

প্রতারিত করে। সঠিক জ্ঞানের জন্য বুদ্ধিও যথেষ্ট নয়। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট যে সমন্বয়বাদী জ্ঞানের কথা বলেছেন তাও যথেষ্ট নয়। সমন্বয়বাদী জ্ঞনতত্ত্বে কান্ট শেষ অস্থা রাখতে পারেন নাই। তিনি অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। অজ্ঞেয়বাদ আমাদের পূর্ণজ্ঞান দান করেনা। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পূর্ণজ্ঞানলাভের কথা বলেছেন। সে জন্য তিনি ইউরোপীয় দার্শনিকদের বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বিচারবাদ এ ধরনের কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ দিয়েই প্রভাবিত হন নাই। তিনি স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করেছেন। দেহ, মন ও আত্মার পুষ্টির জন্য তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগ সাধনের কথা বলেছেন। এই যোগসাধন একমাত্র স্বজ্ঞার সাহায্যেই সম্ভব।

হেনরি বাগসোঁর স্বজ্ঞাবাদের সঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার স্বজ্ঞাবাদ এক নয়। হেনরি বার্গসোঁ স্বজ্ঞার সাহায্যে জ্ঞানলাভের কথা বলেছেন। আর খানবাহাদুর আহ্ছাউল্লা স্বজ্ঞার সাহায্যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে মিল দেখতে চেয়েছেন। তিনি খোদার সঙ্গে একত্র হওয়ার জন্য পার্থিব জগতের আকর্ষণ ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> খোদার একত্ব জ্ঞান পূর্ণ হয় না– যে পর্যন্ত আমরা পার্থিব আকর্ষণকে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করিতে না পারি, যে পর্যন্ত আমরা খোদাতালায়ার হাস্তিকে একমাত্র হাস্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারি, যে পর্যন্ত প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁহাকেই ইয়াদ না করি, যে পর্যন্ত তাঁহার চিন্তায় নিজেকে ডুবাইয়া তন্ময়তা লাভ করিতে না পারি, যে পর্যন্ত তাঁহাতেই বিদ্যমান থাকিয়া স্বীয় অস্তিত্বকে বিদায় দিতে না পারি।[৩৫]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এই পার্থিব জগতের সবকিছুকে ভুলে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের কথা বলেছেন। স্রষ্টার জ্ঞান একমাত্র পাওয়া যায় স্বজ্ঞার সাহায্যে। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় স্রষ্টাকে পাওয়া যায় না। বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেও সত্তার উপস্থিতি পাওয়া যায় না। পরম সত্তাকে পাওয়া যায় একমাত্র স্বজ্ঞার সাহায্যে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করে তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলনের পথ নির্মাণ করেছেন। সৃষ্টিকে দেখা গেলেও স্রষ্টাকে দেখা যায় না। স্রষ্টা নামের এই সত্তাকে পাওয়া যায় একমাত্র স্বজ্ঞার সাহায্যে। সত্তা অভিজ্ঞতা নির্ভর নয়। জন লকের সহজাত ধারণার সাহায্যেও পরম সত্তাকে পাওয়া যায় না।

স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পরম সত্তার সার্বভৌম শক্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সৃষ্টি স্বাধীন হলেও পরম সত্তার সঙ্গে মিলনেই তার পূর্ণতা। জ্ঞানের উৎস কি? এই প্রশ্নের চেয়ে খানবাহার আহ্ছানউল্লার কাছে জ্ঞান আমাদের কি কাজে আসে এই জিজ্ঞাসাই বড় ছিল। এদিক দিয়ে মনে হতে পারে তিনি জ্ঞানকে প্রায়োগিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বজ্ঞাকে ব্যবহার করা। স্বজ্ঞা তাঁর লক্ষ্য নয়, উদ্দেশ্য মাত্র। কারণ স্বজ্ঞার

---

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

সাহায্যে তিনি পরম সত্তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বজ্ঞার সাহায্যে সার্বিক জ্ঞান পাওয়া যায় না। স্বজ্ঞা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হয়। এ কারণেই বিজ্ঞানের জ্ঞান স্বজ্ঞা নির্ভর নয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জ্ঞানতত্ত্বরও বিজ্ঞান নির্ভর নয়।

অধিবিদ্যা

দর্শনের শাখাগুলোর মধ্যে অধিবিদ্যা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। "দর্শনের সঙ্গে তত্ত্ব-বিদ্যার সম্বন্ধ এত নিবিড় যে, অনেক সময় অনেকে দর্শন ও তত্ত্ব-বিদ্যাকে সমার্থক বলে মনে করে থাকেন।"[৩৬] দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায়, আত্মা, ঈশ্বর, দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনার বিষয়বস্তুকে অধিবিদ্যা হিসাবে অভিহিত করা হয়। ইংরেজি metaphysics শব্দের অর্থ করা হয়েছে, the branch of philosophy that deals with the nature of existence truth and knowledge.[৩৭] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু ঈশ্বর এবং আত্মা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ঈশ্বরে বিশ্বাসী বাঙালি মুসলমান। অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক সত্তার অসীম ক্ষমতায় তিনি আস্থাশীল। তিনি মনে করেন, প্রেম থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। সৃষ্টিকে তিনি প্রেমময় হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্রেমময় সৃষ্টিতত্ত্ব সমর্থন করে তিনি লিখেছেন, "প্রেমই ছিল সৃষ্টির মূলে এবং সেই প্রেমই সর্ব্বভূতে, সর্ব্বহাস্তিতে বিদ্যমান এবং এই প্রেমের বলেই সৃষ্ট রূহ সর্ব্বশেষে প্রেমময়ে মিলিত হইবে।"[৩৮] প্রেমের বশবর্তী হয়ে সৃষ্টিকর্তা শুধু বিশ্ব সৃষ্টি করেননি। তিনি বিশ্বের সকল কিছু প্রেমের আকর্ষণে সৃষ্টি করেছেন। প্রেমই একমাত্র সত্য। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "প্রেমময় আল্লাহ্ই বিশ্বকে সৃষ্টি করিলেন প্রেম-পরবশ হইয়া, আবার মানবকে সেবা করিবার জন্য বিশ্বের প্রত্যেক সত্তাকে নিয়োজিত করিলেন প্রেম-পরবশ হইয়া। তাই সহজেই অনুমিত হয় যে, এই বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে প্রেমময়ের গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে।"[৩৯] প্রেমের মহত্ব সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা লিখেছেন,

> প্রেম অমূল্য বস্তু, ইহার উপমা নাই। ইহা স্বর্গীয়, ইহা কিমিয়া (স্পর্শ-মণি) স্বরূপ। প্রেম যাহার হৃদয় স্পর্শ করে, তাহার অন্তরস্থ কৃত্রিম পদার্থ বিশুদ্ধ সুবর্ণে পরিণত হয়। দুষ্প্রবৃত্তি তাহা হইতে বিদায় গ্রহণ করে। সে মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করে না, বরং প্রিয়তমকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। প্রিয়তমও তাহাকে দেখিতে ভালবাসেন। প্রেমিক পার্থিব বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। তাহার হৃদয়ে প্রেমময়ের স্মৃতিই সর্ব্বদা জাগরূক থাকে।[৪০]

---

[৩৬] গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্য-সার*, অধুনা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ : ৩৮

[৩৭] *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Eight edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS.

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৩৯] প্রগুক্ত, পৃ. ১৮

[৪০] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ছুফী*, পৃ. ৬৪

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ঐশী প্রেমের কথা বলেছেন। তাঁর প্রেম মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার প্রেম। প্রেমিক স্রষ্টার প্রেমে তন্ময় হয়ে ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সব ব্যবধান ভুলে যায়। প্রেমিকের কাছে স্রষ্টাই একমাত্র সত্য। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি সম্পূর্ণ নয়। স্রষ্টার নাম জপ করাই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। আহ্ছানউল্লা বৈরাগ্যবাদ সমর্থন করেননি। স্রষ্টার প্রেমের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন,

> প্রেম শরীর, মন ও হৃদয়কে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মুগ্ধ করে। খালেছ প্রেমে স্বার্থের নাম ও গন্ধ থাকে না। আল্লাহ্‌র প্রেমিক হইতে হইলে, স্বার্থ ও অহংভাবকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হয়; তিনি যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; তিনি ব্যতীত অন্য চিন্তা দেল হইতে একেবারেই উৎপাটিত করিতে হয়।[৪১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মানবপ্রেম এবং ঐশী প্রেমের মধ্যে পার্থক্য দেখালেও তিনি স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টারই অংশ। স্রষ্টার প্রেমেই সৃষ্টি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য নেই।"[৪২] স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্দেশ্যবাদ সমর্থন করে। সৃষ্টি বিনা উদ্দেশ্যে হয়নি। স্রষ্টার প্রেমময় ইচ্ছায় সৃষ্টি। মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "খায়ের, খোদা মাটি হইতে মানুষ তৈরি করিলেন ও সেই মানুষের মধ্যে নূর, দীপ্তি বা শক্তি দম্‌ করিয়া দিলেন। ফলে মানুষ খোদায়ী (ঐশী) শক্তিতে শক্তিমান হইল।"[৪৩] মানুষ সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই মানুষকে সেবা করার জন্য অন্য সবকিছু সৃষ্টি। কিন্তু মানুষকেও বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অভিমত, জ্ঞানময় খোদা মানবকে কি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি কি বিনা উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বকে মানবের সেবকত্বে নিয়োগ করিয়াছেন? কখনই নহে।[৪৪] স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়ার জন্য সৃষ্টি হয়নি। স্রষ্টা অসীম। আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "মানুষকে শাস্তি দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, মানুষকে নিজের করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, যেন মানুষ প্রকৃত আত্মিক শক্তির অধিকারী হয়, স্বীয় হাস্তি ভুলিয়া খোদার হাস্তিকে ডুবিয়া যায়, খোদার সন্তুষ্টিভাজন হয়।"[৪৫] মানুষের মধ্যে খোদার অসীম শক্তির সসীম প্রকাশ। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রকাশ মাত্র। এ সম্পর্কে আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "রূহ বা জীবাত্মা (Soul) আল্লাহ্‌ বা পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত। রূহ সৃষ্ট, সুতরাং সসীম, ঐশী শক্তি স্ফূলিঙ্গস্বরূপ, যাহা আল্লাহ্‌ হজরত আদমের মধ্যে ফুৎকার বা দম করিয়া দিয়াছিলেন এবং মানব বংশপরম্পরাক্রমে লাভ করিয়াছে।"[৪৬] পরমাত্মা এবং মানবাত্মার মধ্যে

---

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
[৪২] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১১
[৪৩] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *সৃষ্টিতত্ত্ব*, পৃ. ১১
[৪৪] প্রগুক্ত, পৃ. ১০
[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

পার্থক্য করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "পরমাত্মা সর্বগুণের পূর্ণত্বের প্রকাশ। মানবাত্মা তাঁহারই ছাঁচে গঠিত ; সেও পূর্ণত্ব লাভের জন্য অনন্তকাল চেষ্টা করিবে।"[৪৭]

আল্লাহ্র প্রেমেই মানুষ সৃষ্টি। আল্লাহর দিকেই মানুষ আকৃষ্ট। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টি মিলতে চায়। পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলনেই সার্থকতা। এ সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "রূহ আল্লাহ হইতে নির্গত, সুতরাং নিষ্পাপ ও সদা আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট।"[৪৮] পরামাত্মা কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা আহ্ছানউল্লার সৃষ্টিতত্ত্বে পাওয়া যায় না। পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, "পরমাত্মা মঙ্গলময়, দোষশূন্য, কু-চিন্তার ও সু-চিন্তার অতীত।[৪৯] এ সম্পর্কে তিনি আরো লিখেছেন, "স্রষ্টা না হন জন্মিত, না হন জন্মদাতা। সৃষ্টির স্থান নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, স্রষ্টার স্থান সকল নির্দ্দেশ সকল সীমার অতীত।"[৫০] মানুষের সীমিত জ্ঞান দিয়ে অসীমকে সত্তাকে জানা সম্ভব নয়। অসীমকে যদি জানা নাই যায় তবে অসীম যে রয়েছে তা-ই বা কিভাবে উপলব্ধি করা যাবে। আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "মানুষ সসীম, তাই তাহার চিন্তার বেড়ও সীমাবদ্ধ। মানুষের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, খোদার জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, চিন্তার সীমার অতীত।"[৫১] মানুষের চিন্তা, জ্ঞান সীমাবদ্ধ হলে ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রেমের সম্পর্ক অসম হয়। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রেও সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার প্রেম অসম হয়। স্রষ্টা সৃষ্ট জীবের ভাল কর্মের পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। এজন্য মানুষকে কিছু শর্ত মানতে হবে। সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার প্রেমও কন্ডিশনাল হয়ে যায়। স্রষ্টার অসীম জ্ঞান, বুদ্ধি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কিভাবে জানলেন তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। এ ক্ষেত্রে তিনি দর্শনের চেয়ে বেশি বিশ্বাস নির্ভর হয়েছেন। আর এ কারণেই তিনি সৃষ্টি সম্পর্কে বিবর্তনবাদ প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন, "ইছলাম মানুষের ক্রমিক উন্নতি স্বীকার করে দুনিয়ার বুকে ও আখেরাতে, উভয়ত্র; কিন্তু Evolution theory বা বিবর্ত্তনবাদ পোষকতা করে না।"[৫২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর সৃষ্টিতত্ত্বের মিল পাওয়া যায়। প্লেটো *টাইসিয়াস* সংলাপে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। প্লেটো বলেছেন, "ঈশ্বর দ্বারাই জগতের সৃষ্টি। ঈশ্বর যেহেতু মঙ্গলময়, সেহেতু শাশ্বত দ্রব্যের অনুকরণে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর ঈর্ষাহীন হওয়ার কারণে তিনি প্রতিটি বস্তুকে যথাসম্ভব নিজের মতো করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।"[৫৩] সেন্ট অগাস্টিনের ঈশ্বর শুভ।[৫৪]

---

[৪৭] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ছুফী*, পৃ. ১৮
[৪৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *সৃষ্টিতত্ত্ব*, পৃ. ২১
[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
[৫৩] বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস[প্রাচীন ও ক্যাথলিক দর্শন : নির্বাচিত অংশ]* প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ১৩২
[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

স্পিনোজার মতে, "যা কিছু আছে সব ঈশ্বরের মধ্যে আছে, ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই থাকতে পারে না কিংবা ধারণা করা যেতে পারে না।"[৫৫]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সৃষ্টিতত্ত্বের স্রষ্টা মঙ্গলময়, করুণাময় এবং প্রেমময়। প্রেম থেকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব পাশ্চাত্য-প্রাচ্য কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের চিন্তা দিয়ে প্রভাবিত নয়। তাঁর প্রেমময় ঈশ্বর বিশ্বাস নির্ভর হলেও এ চিন্তা তাঁর নিজস্ব। তিনি মনে করেন, স্রষ্টা সবখানে আছেন, সবকিছু স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "যত ভূমণ্ডল, যত আকাশমণ্ডল আছে – সর্বত্রই খোদাওয়ান্দ করীম বিরাজমান। এমনকি যেখানে জমি নেই, পানি নেই, নক্ষত্র নেই সেখানেও খোদাওয়ান্দ করীম বর্ত্তমান। এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে ঐশী শক্তি নিহিত না আছে।"[৫৬] সর্বেশ্বরবাদ অনুসারে সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজমান। এ দিক থেকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সর্বেশ্বরবাদী। স্রষ্টার সর্বত্র উপস্থিতি সম্পর্কে আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বশক্তিময়, তিনি চিরজীবন্ত। তিনি আধার ও আধেয়, গুপ্ত ও প্রকাশিত, জাহের ও বাতেন ; তাঁহার মহিমা ও মাহাত্ম্য অপার ; তিনি প্রশংসার অতীত। তাঁহার গুণ অনন্ত।"[৫৭]

মূল্যবিদ্যা

মূল্যবিদ্যাকে আদর্শবিদ্যা, মানবিদ্যা বা Theories of Value নামে অভিহিত করা হয়। প্রায়োগিক দর্শনের আলোচনা মূল্যবিদ্যার আওতাভুক্ত। যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, রাষ্ট্রচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা, নারীবাদ নিয়ে মূল্যবিদ্যা আলোচনা করে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দর্শন চিন্তায় শিক্ষাচিন্তা এবং মানবতাবাদ বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি মূল্যবিদ্যার বিষয় হিসাবে শিক্ষাচিন্তা এবং মানবতাবাদ আলোচনা করেছেন।

শিক্ষাচিন্তা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষকতা করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষকতা এবং শিক্ষা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত গড়ে উঠেছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার গ্রন্থ, চিঠিপত্র এবং কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে

[৫৫] *স্পিনোজার নীতিবিদ্যা*, মহীউদ্দিন (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৪
[৫৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ৬
[৫৭] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ছুফী*, পৃ. ১৩

শিক্ষাচিন্তা রয়েছে। এগুলোর সমন্বতি রূপই তাঁর শিক্ষাচিন্তা। শিক্ষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও চৈতন্যের বিকাশ হয় এবং ইহা কুসংস্কারকে বহুল অংশে বিলুপ্ত করে এবং হীন, কলুষিতচিত্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে অমানুষিকতা হইতে উদ্ধার করে।"[৫৮] তাঁর মতে, "শিক্ষা ত্রিবিধ : শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।"[৫৯] শিক্ষা মানুষের ইহকাল সুন্দর এবং আনন্দময় করে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমটি চরিত্র গঠন আর দ্বিতীয়টি জীবিকা সংগ্রহ। তিনি প্রথমটিকে মুখ্য আর দ্বিতীয়টিকে গৌণ উদ্দেশ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষ যদি সত্যিকারে মানুষ হতে না পারে তাহলে শুধু জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টা বৃথা।[৬০] মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসাবে বিকশিত করা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে আহ্ছানউল্লার অভিমত হলো,

> মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর, মন ও আত্মা প্রত্যেকেরই পুষ্টিসাধন হইলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য হয়। উদ্ভিজ্জ বীজ যেমন বায়ু, জল ও সূর্য্যতাপ সাহায্যে ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, শিশুও সেইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাবলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে।[৬১]

পরিবার থেকে মানুষের শিক্ষা জীবন শুরু। সমাজ এবং দেশ থেকেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। সুস্থ পরিবার মানুষকে স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করে। অপরিণত বয়সে পরিবার থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে পরিণত বয়সে মানুষের জীবনে তার প্রতিফলন দেখা যায়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এ সম্পর্কে লিখেছেন, "গৃহ, সমাজ ও স্বজাতি সর্ব্বপ্রথম শিক্ষার স্থল। সমাজ যতই উন্নত হইবে, মাতৃভাষাতে যতই অধিকার জন্মিবে, শিক্ষার ততই পূর্ণতা হইবে।"[৬২]

শিক্ষার মাধ্যম ভাষা। মায়ের ভাষার সাহায্যে আমরা প্রথম জ্ঞান লাভ করি। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিকল্প কিছু নেই। আহ্ছানউল্লা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের উপর গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন, ''মাতৃভাষা দ্বারা আমরা শৈশবকালেই পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত চিন্তার ফল সহজেই লাভ করিতে পারি।"[৬৩] মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা তিনি স্বীকার করলেও উচ্চ শিক্ষা এবং মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি ইংরেজি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষাতেই বিশ্বের অধিকাংশ জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত। আহ্ছানউল্লা মনে করেন, "ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গভাষা ক্রমশ প্রসার প্রাপ্ত হইতেছে। যে ভাষা

---

[৫৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ১০৭
[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
[৬১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, "টীচারস্ ম্যানুয়াল", *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৪ পৃ. ৪২৫
[৬২] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ৫২
[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

পূর্ব্বের ইতর শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যে বঙ্গভাষা পণ্ডিতগণের নিকট পৈশাচী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বঙ্গভাষা এক্ষণে ইংরেজীর সাহায্যে ভারতবর্ষের অতি সম্মানিত ভাষার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।"[৬৪]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষাচিন্তায় বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের উন্নতির কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাঁর চিন্তায় বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি লিখেছেন, "বঙ্গীয় সমাজের গরিষ্ঠ অংশই মোছলমান। ইহারা শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনত এবং অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তবুও জীবন সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ইহাদিগকে পৃথিবীর অপর সকলের সমকক্ষ করিতে হইবে।"[৬৫] আহ্ছানউল্লা পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের শিক্ষার কথা বললেও তিনি হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম দিকে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ব্রিটিশ নীতিও এর পেছনে কাজ করেছে। কিন্তু মুসলিম সমাজ পিছিয়ে যায়। দেশের উন্নয়নের জন্য আহ্ছানউল্লা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন, "হিন্দু এবং মোছলমান শিক্ষা বিষয়ে সমকক্ষ না হইলে বঙ্গবাসী জীবনের কোন ক্ষেত্রে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।"[৬৬] শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ সব শ্রেণিকে সমান মর্যাদা দেয়ার কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে তার মন্তব্য হলো, "শিক্ষাযন্ত্র এমনভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন যাহাতে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে দেশের সর্বত্র জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরূপ গঠন করিয়া তুলিতে হইবে যেন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে শিক্ষাবিস্তার লাভ করিতে পারে।"[৬৭] পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়ার কারণ হল এ অঞ্চলের মুসলিমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুসলিম সমাজ মুখ ফিরিয়ে নেয়াই যে তাদের অধঃপতনের কারণ এই চিন্তা আহ্ছানউল্লার মধ্যে ছিল। নওয়াব আব্দুল লতিফ, আমির আলী মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার কথা প্রথম বলেন। আহ্ছানউল্লা আব্দুল লতিফের পথ অনুসরণ করেছেন। ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "ইংরেজী ভারতের একমাত্র সাধারণবোধ্য ভাষা। কেবল ভারতবর্ষ নহে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির সমাদর আছে।"[৬৮] ইংরেজি শিক্ষার উপর আহ্ছানউল্লা গুরুত্ব আরোপ করলেও ইসলামের আদর্শ থেকে মুসলিম সম্প্রদায় যেন বিচ্যুত না হয় সে দিকে সতর্ক থেকেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো, "ইংরেজী শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে, তবে তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন যেন এতদসঙ্গে ইছলামের আদর্শ সভ্যতা

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
[৬৭] প্রগুক্ত, পৃ. ৯৩
[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

এবং ধর্ম-প্রাণতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে।"[৬৯] মাদ্রাসায় আরবি, উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান যুগান্তকারী। সে সময় অধিকাংশ মুসলিম শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় পড়তো। তাই মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা চালুর ফলে মুসলমানরাও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করার সুযোগ পায়।[৭০] ইংরেজি তখন রাজ ভাষা। ইংরেজি ভাষা ছাড়া আরবি; উর্দু এবং মাতৃভাষা দিয়ে সরকারি চাকরি পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আরবি এবং উর্দু ভাষার ব্যবহারিক মূল্যও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে কম ছিল। সে জন্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ ব্যবহারিক মূল্যের ভিত্তিতে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

নীতি শিক্ষার উপর আহ্ছানউল্লা গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষাকে সমানভাবে দেখেছেন। তিনি মনে করেন ধর্মশিক্ষায় মানুষকে শিক্ষিত করতে পারলে নীতিশিক্ষা কার্যকর হবে। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, "নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মতত্ত্ব পরস্পর সংলগ্ন, যদি ধর্ম্মের প্রধান সত্যতা বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, এই বিরাট বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তা আছেন আর তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিরাজমান, সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বশক্তিমান এবং আমরা পরকালে কৃতকর্ম্মের জন্য দায়ী তাহা হইলেই আমরা চরিত্রের সাধুতার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে সচেষ্ট হইতে পারি।"[৭১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পূর্ব বঙ্গের উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেল। পূর্ব বঙ্গের সোনালী আঁশ পাট বিশ্বে সমাদৃত। ভারত সরকার এই পাটের শুল্ক রাজস্ব খাতে ব্যয় করে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পাটের শুল্ক পূর্ববঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ব্যয় করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন, "বঙ্গের উৎপন্ন পাটের শুল্ক হইতে যে অর্থাগম হয় তাহা ভারত সরকারের প্রাপ্য। ইচ্ছা করিলে ভারত সরকার এই শুল্কলব্ধ অর্থ এই শর্তে বঙ্গীয় সরকারকে দিতে পারেন যে এই অর্থ কেবল বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় করা হইবে।"[৭২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন ভাষা বিশুদ্ধ না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রকৃত জ্ঞানলাভ থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আমরা এক জীবনে প্রত্যক্ষজ্ঞান অল্পই লাভ করিতে পারি। আমাদের অধিকাংশ জ্ঞান অন্য ব্যক্তি বা পুস্তক হইতে সংগৃহীত। সমস্ত মানব জাতির উপার্জ্জিত জ্ঞান আমরা পুস্তক পাঠে জ্ঞাত হই, সুতরাং আমাদের অধিকাংশ জ্ঞান পুস্তকলব্ধ। প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য ভাষা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেবল অভিব্যক্তি বিশুদ্ধ হইলে চলিবে না, ভাবগুলিও প্রকৃত ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। ভাব প্রকৃত না হইলে ভাষাও প্রকৃত হইবে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা

---

[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
[৭০] মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *খানবাহাদুর আহছানউল্লা : শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা*, পৃ. ৬৫
[৭১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ১০৮
[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

করা কর্ত্তব্য। বস্তু সমক্ষে ছাত্রকে লইয়া বা তদভাবে ছাত্র সমক্ষে বস্তু আনিয়া পর্যবেক্ষণ করাইতে হইবে ও মৌখিক প্রশ্ন দ্বারা উহার প্রকৃত ভাব সংগ্রহ করাইতে হইবে। পরে ভাষা দ্বারা ঐ ভাব সম্যক্ ও যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করাইতে হইবে। ভাবগুলি অসম্পূর্ণ থাকিবে, এজন্য শিশুদিগকে সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃতি-পাঠ ও বস্তু-পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়।[৭৩]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিশু শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুর মন থাকে ইংরেজ দার্শনিক জন লকের ভাষায় সাদা কাগজের মত। এই বয়স খুব গুরুত্বপূর্ণ। আহ্ছানউল্লা শিশুর মানসিক এবং শারীরিক বয়স বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাদান করার কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, "শিশুর স্বভাব লক্ষ্য করিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে। উহার বাহ্যজ্ঞান, ধারণশক্তি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া শিক্ষককে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।"[৭৪] শিশু শিক্ষার জন্য তিনি কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির সমর্থন করে লিখেছেন, "বালক-বালিকাগণ উদ্যানে যেরূপ আমোদ-প্রমোদে ভ্রমণ করে, কিন্ডারগার্টেন স্কুলেও সেইরূপ আমোদ ও ক্রীড়ায় কালযাপন করিবে।"[৭৫] সমাজের মধ্যে নানা শ্রেণি পেশার লোকের বাস। এদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। শিশু শিক্ষা এবং যুবকের শিক্ষা এক রকম নয়। এ সম্পর্কে আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "শিশুর শিক্ষা, কুমারের শিক্ষা ও যুবকের শিক্ষার বিষয় ও প্রণালী কখনও একরূপ হইতে পারে না। শিশুতে মানসিক শক্তিগুলি কেবল বিকাশোন্মুখ, কুমারে বিকাশপ্রাপ্ত ও যুবকে পরিপুষ্ট।"[৭৬]

শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রায় সমার্থক। সুশিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষার্থী সৃষ্টি করতে পারেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষার জন্য শিক্ষকের গুরুত্ব উল্লেখ করে লিখেছেন,

কেবল পরিশ্রমী হইলে সুশিক্ষক হওয়া যায় না। যে প্রণালী অবলম্বন করিলে শিক্ষণীয় বিষয় সহজসাধ্য হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষা কষ্টসাধ্য হইলে কার্য্যকরী হয় না। যাহাতে শিক্ষকের বৃথা সময় নষ্ট না হয়, অথচ ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির উৎকর্ষ ঘটে, তৎপ্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা উচিত।[৭৭]

শ্রেণিকক্ষ এবং শিক্ষা উপকরণের উপর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা গুরুত্ব দিয়েছেন। স্কুলে তিনি লাইব্রেরী এবং মিউজিয়াম গড়ে তোলার কথা বলেছেন। ছাত্রনিবাসকে তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন।[৭৮] স্কুলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো, "প্রত্যেক স্কুলে একটি লাইব্রেরী (পুস্তকাগার) থাকা আবশ্যক। উহাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ব্যবহার্য্য পুস্তক থাকিবে। পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত নানাবিধ চিত্তাকর্ষক পুস্তকও রাখিতে হইবে।"[৭৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষার্থীদের দৈহিক এবং মানসিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন,

---

[৭৩] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, "টীচারস্ ম্যানুয়াল", *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪২৬
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮
[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯১
[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯১
[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯
[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯
[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮

> দেহ ও মন লইয়া মানব গঠিত। সুতরাং মানবের উন্নতির জন্য দৈহিক ও মানসিক উন্নতি উভয়ই সমভাবে আবশ্যক। দৈহিক শিক্ষার জন্য তাদৃশ যত্ন লওয়া হয় না। মানসিক উন্নতির জন্য সকলেই ব্যস্ত থাকে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। শারীরিক শিক্ষা দুইভাগে বিভক্ত (১) স্বাস্থ্যনীতি, (২) ব্যায়াম। কোন কোন বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক শিক্ষার বিশেষ নিকট সম্বন্ধ।[৮০]

উপনিবেশিক ভারতবর্ষে শিক্ষা বিভাগে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা চাকরি করেছেন। স্বায়ত্তশান, স্বাধীনতার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন কোন কিছুই লাভ করা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বায়ত্তশাসনের প্রথম সোপান হিসাবে উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, "স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি সুগঠিত করিতে হইলে আরও ব্যাপক রূপে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রবত্তি করিতে হইবে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বহুল বিস্তার না হইলে ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।"[৮১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বহুল প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারই বর্তমানে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি। শিক্ষা ব্যক্তি মানুষ এবং সামাজিক মানুষকে আলোকিত করে। এই আলোকিত মানুষই স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে বহুল পরিমাণে শিক্ষার প্রসারের ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের ফল আমাদের স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপ নেয়। মাওলানা আকরম খাঁ লিখেছেন, "মোছলেম শিক্ষা আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে মোছলেম জাতির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের আন্দোলনে পুরোপুরিভাবে রূপান্তরিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রাজনৈতিক আন্দোলনে না আসিলেও শিক্ষা আন্দোলনের গভীর প্রভাব তাঁহার উপর থাকিয়া যায়।"[৮২] শিক্ষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এদেশের মানুষ ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই। কাজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি পায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। বাঙালি স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষাচিন্তায় উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তব উপযোগিতা এবং ব্যবহারিক মূল্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি শিক্ষা উন্নয়নের কথা বলেছেন। সে জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের মধ্যে তিনি মানুষের কল্যাণ দেখেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে যে শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য নেই সে শিক্ষা তাঁর কাছে অর্থহীন। তিনি মনে করেন শিক্ষা মানুষকে শুধু স্বাক্ষর করে না, সক্ষমও করে।

---

[৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৩

[৮১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ১০০, ১০১

[৮২] মাওলানা আকরম খাঁ, ''খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'', *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, পৃ. ৭৪, ৭৫

মানবতাবাদ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমান। তিনি ধর্মে বিশ্বাস করতেন এবং ধর্ম পালন করতেন। ব্যক্তি জীবনে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন। চাকরি জীবন এবং পরবর্তী কর্মজীবনে তিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তাঁর এসব কর্ম কিছুটা ধর্ম বিশ্বাস থেকে কিছুটা মানব সেবার জন্য। কিন্তু তাঁর মানব সেবাও ধর্মানুমোদিত। "তাঁর জীবনের সিংহভাগ গণ-মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে অতিবাহিত হয়েছে। কর্মজীবনে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের বৈষয়িক মুক্তির পথ হিসেবে শিক্ষা-সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডে নিজেকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত রাখেন এবং এটাই ছিল তাঁর প্রাক-আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়।"[৮৩] ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমান হিসাবে তিনি ধর্মকে কেবল পরকালের মুক্তির সোপান হিসাবে দেখেননি। "তিনি বেহেশত কামনা করেন নি, বেহেশত লাভের কথা প্রচার করেন নি। তিনি পরমাত্মার সাথে মিলনের বা মহব্বত কামনা করেছেন।"[৮৪] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাঙালি মুসলমান সমাজের উন্নতি করলেও তিনি এ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম সবার কল্যাণ চেয়েছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা কথা বলেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন আহ্ছানিয়া মিশন।

মানুষের সেবা করাই আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্দেশ্য। মিশনের প্রাথমিক কাজ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মৃত দেহের সৎকার, কলেমাখানি, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ কার্য্যের দিকে মিশনের দৃষ্টি পড়িল। মিশন নিঃস্বার্থে পরোপকারে ব্রতী হইল।"[৮৫] নলতা মিশনের অনুকরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশন শুধু ধর্মীয় কাজে নয় ইহজাগতিক কাজও করে। আহ্ছানউল্লা লিখেছেন, "যেসকল স্থানে পুরুষানুক্রমে বিবাদ-বিসম্বাদ এবং আত্মকলহ প্রচলিত ছিল, মিশনকর্ম্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় সেখানে শান্তি সৃষ্টি হইল।"[৮৬] আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার এগারো বছর পর ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় বিষয়াদি ভারত ভাগকে ত্বরান্বিত করে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাঙালি মুসলমানের কল্যাণের জন্য কাজ করলেও তিনি ভারত ভাগের আগে ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করেননি। ভাষার সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> বঙ্গভাষা হিন্দু ও মুসলমানের নিকট সমভাবে আদরণীয়। বঙ্গভাষার উন্নতি উভয়েরই সমভাবে আকাঙ্ক্ষা। যখন উভয় জাতি স্ব স্ব মনোভাব আদান প্রদান করে, তখনই পরস্পরের সাহায্যে ভাষার উন্নতি হইতে থাকে। যে পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান পরস্পরের কুৎসা হইতে বিরত না হইবে, যে পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও মুসলমানী শব্দের সমবায় না হইবে, সে পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের উন্নতি সুদূরপরাহত।[৮৭]

---

[৮৩] মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *খানবাহাদুর আহছানউল্লা : শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা*, পৃ. ১১৯
[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
[৮৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, পৃ. ১০৭
[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮,
[৮৭] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ৩৮, ৩৯

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বঙ্গীয় মুসলমানের কল্যাণ কামনা করলেও তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধ পছন্দ করতেন না। বঙ্গের উন্নয়নের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলিম এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন,

> ভাই সকল! হিন্দু-মুসলমানী দ্বন্দ্ব আজ হইতে ভুলিয়া যাও; ''হিন্দু-বাঙ্গলা'' ''মুসলমানী-বাঙ্গলা'' এই পার্থক্যবোধক শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দাও; উভয়ের সাহায্যে বঙ্গভাষার আয়ত্ত বৃদ্ধি কর এবং ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতি দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন কর। আমিত্ব ছাড়িয়া দাও; এক মনে এক প্রাণে প্রেমময়ের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেম লইয়া জাতিনির্বিশেষে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন কর।[৮৮]

১৯৪৮ সালে নলতায় অনুষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন,

> পশ্চিম বঙ্গের মোস্লেম সম্প্রদায় জমিজমা বিক্রি করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পদার্পন করিতেছে, অন্যদিকে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে ব্যস্ত। ইহাতে দেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে তৃতীয় মহা-সমর আরম্ভ হইবে, যদি অনতিবিলম্বে অধিবাসীগণের মন হইতে আতঙ্ক দূরীভূত না হয়। বর্ত্তমান অশান্তির জন্য তীর্থ-ভ্রমণ বন্ধ হইয়াছে, রেল ও ষ্টীমারে যাতায়াত ভয়-সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে, স্কুল কলেজের ছাত্রগণ ভয়ে এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে দ্রুত ট্রান্সফার লইতেছে, ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে, উভয় রাষ্ট্র মধ্যে তুমুল বিরোধের বীজ উপ্ত হইতেছে।[৮৯]

দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু বিপন্ন মানুষের জীবন নিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ফলে হিন্দু মুসলিম বিরোধ নিয়ে তার উদ্বেগ ছিল। বঙ্গের এই হিন্দু মুসলিম হাজার বছর পাশাপাশি বাস করেছে। হিন্দু মুসলিম বিরোধ ছিল। কিন্তু এই বিরোধ মানুষের জীবন বিপন্ন করেনি। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের জীবন বিপন্ন করেছে। দেশ ভাগের আগে ভারতবর্ষের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের মানুষ সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। ফলে মানুষ আর শুধু মানুষ থাকে না। মানুষ হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক মানুষ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের প্রথম প্রকাশ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাংলা ভাষার পক্ষে 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "বঙ্গভাষা ব্যতিত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কী হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।"[৯০] আহ্ছানউল্লা রাজনীতি করেননি। রাজনীতি থেকে সারা জীবন নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তিনি এ অঞ্চলের মানুষের পক্ষে অবস্থান নিতে দ্বিধা করেননি।

---

[৮৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ৪০, ৪১

[৮৯] *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, *একাদশ খণ্ড*, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), পৃ. ৫৬৯

[৯০] খানবাহাদুর আহছানউল্লা, ''মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান'' নবনুর, প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা জানুয়ারি ১৯০৩। এই উদ্বৃতিটি মোহাম্মদ আবদুল মজিদের *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষা ও সমাজচিন্তা* গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *খানবাহাদুর আহছানউল্লা : শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা*, পৃ. ১৪৭

মো. ইকরাম হোসেন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অধ্যাত্মবাদ ও মানবকল্যাণে তাঁর অবদান* শীর্ষক পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভে দেখিয়েছেন, "খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মানবকল্যাণে যে স্বাক্ষর রেখেছেন তার ভিত্তি হল অধ্যাত্মবাদ।"[৯১] আহ্ছানউল্লার অধ্যাত্মবাদ ইসলাম ধর্মের অনুশাসেন আবৃত। তিনি দীর্ঘ সময় চট্টগ্রামে চাকরি করেছেন। চট্টগ্রামের সুফীদের জীবন ও কর্ম তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। সুফিদের খানকা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অনুকরণে অবসর জীবনে তিনি সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামে আহ্ছানিয়া মিশন স্থাপন করেছিলেন মানব সেবার জন্য।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার চট্টগ্রাম জীবনের সুফী প্রভাব পরবর্তী কর্মজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। দক্ষিণবঙ্গের সুফী প্রভাবেই তাঁর অধ্যাত্মবাদের সূচনা। চট্টগ্রামের অবস্থান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "দীর্ঘ ১৭টি বৎসর আমি এই অঞ্চলে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। ধন্য চট্টলবাসী, ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য তোমার মহব্বত ধন্য তোমার ভালবাসা।"[৯২] চট্টগ্রামের সুফী চিন্তা-চেতনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "চট্টলে কত মহাপুরুষের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানকার আধ্যাত্মিক পারিপার্শ্বিকতা কত পবিত্র। তাই বুঝি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাদেরই পদ-প্রান্তে আমাকে লালিত পালিত করিবার জন্য এই দূর দেশে অন্তরীণ স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন।"[৯৩] চট্টগ্রামের সুফী দরবেশদের প্রভাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মানব সেবার উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর কাছে সব মানুষই সমান। মানুষ হল তাঁর কাছে আত্মার আত্মীয়। তাঁর মানুষ প্রেমের মানুষ। মানুষই সবার বড়। এই মানুষকে রং দিয়ে, বর্ণ দিয়ে, ভাষা দিয়ে, ধর্ম দিয়ে বিভক্ত করা যায় না। এই মানুষকে সেবা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। মানুষকে মানুষ হিসাবে বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন,

> আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানিনা। শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ দেখিনা, ছোট বড় বুঝিনা সবাই শক্তিমান, দয়াময়, প্রেমময় স্রষ্টার সৃষ্টি, সবারই মধ্যে তাঁহার দান, তাঁহার নূর, তাঁহার এহ্ছান বর্ত্তমান। আমি কাহাকে ক্ষুদ্র বলিবো, কাহাকে কাফের ডাকিবো, কাহাকে ঘৃণা করিবো।[৯৪]

খানবাহাদুর আহ্ছাউল্লার কাছে ধর্ম শুধু প্রার্থনার বিষয় নয়। তিনি মনে করেন, ধর্ম মানব জীবনকে সুন্দর করে। উপাসনা এবং কর্মকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। মানুষের সেবাই স্রষ্টার ইবাদত। মানুষের মধ্যেই সব আছে। এই মানুষ স্রষ্টার প্রেম থেকে সৃষ্টি। মানুষকে ভালবাসলে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা যায়। স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য পাহাড়ে, আকাশে, সাগরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টাকে পাওয়া যায়। সৃষ্টির সেবাই স্রষ্টাকে পাওয়ার অন্যতম পথ। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ধর্মানুমোদিত মানবতাবাদে সৃষ্টির সেবার কথাই নানা আঙ্গিকে ভিন্ন মাত্রায় ঘুরে ফিরে বলা হয়েছে।

---

[৯১] মো. একরাম হোসেন, *খানবাহাদুর আহছানউল্লার অধ্যাত্মবাদ ও মানবকল্যাণে তাঁর অবদান*, অপ্রকাশিত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩, পৃ. ১৯২ অপ্রকাশিত।
[৯২] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন-ধারা*, পৃ. ১২০
[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দর্শনের প্রধান বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন। স্বজ্ঞার সাহায্যে তিনি পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলন কামনা করেছেন। পরমাত্মাকে দেখা যায় না। পরমাত্মাকে একমাত্র স্বজ্ঞার সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করে তিনি পরম সত্তার সার্বভোম শক্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন। জ্ঞানের উৎস, বৈশিষ্ট্য পরিণতি আলোচনা করার চেয়ে জ্ঞানের কার্যকারিতা নিয়েই খানবাহার আহ্ছানউল্লা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। অধিবিদ্যার অন্যতম বিষয় ঈশ্বর, আত্মা নিয়ে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সুফিবাদ দিয়ে তিনি প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মনে করেন পরমাত্মা থেকেই জীবাত্মার সৃষ্টি। জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলতে চায়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দর্শনচিন্তায় মূল্যবিদ্যা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মূল্যবিদ্যার অন্যতম বিষয় শিক্ষাচিন্তা এবং মানবতাবাদ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি শিক্ষকতা করেছেন এবং শিক্ষা উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছাড়া কোনো শিক্ষাই পূর্ণ হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানব জীবন সুন্দর করা। এই সুন্দর জীবনের জন্য শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা অপরিহার্য। মানবতাবাদ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মূল্যবিদ্যার অন্যতম আলোচনার বিষয়। মানবের সেবা করার জন্য তিনি আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানবকল্যাণে তিনি যে অবদান রেখেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল অধ্যাত্মবাদ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দর্শন গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন তিনি যুক্তির সাহায্যে পরমসত্তাকে প্রমাণ করার জন্য। অধিবিদ্যার বিষয়গুলোতে তিনি যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দর্শনে যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস প্রবল। ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দর্শন অনেকাংশে বিশ্বাস নির্ভর। বিশ্বাস দর্শন নয়। দর্শন যুক্তি-তর্ক এবং সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দর্শন যুক্তিহীন নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এই বিশ্বাস ছিল মানবতার কল্যাণে মানুষের কল্যাণে।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

জীবন ও কর্ম

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) পাবনা জেলার শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত ঘোরাশাল গ্রামে ১৮৯৯ সালে ২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম যথার্থ দার্শনিক কলাকৌশল, যুক্তিমালা ও পরিভাষা সহকারে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। জীবন-স্মৃতিতে তিনি লিখেছেন, "১৯১৪ সনের মার্চে শাহজাদপুর হতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেই এবং প্রথম বিভাগে পাশ করে বিভাগীয় স্কলারশিপ পাই।"[১] ১৯১৪ সালে তিনি রাজশাহী কলেজে আর্টসে ভর্তি হন। আর্টস থেকে তিনি গণিত ও রসায়ন নিয়ে ১৯১৬ সালে আই এ এবং ১৯১৮ সালে একই কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দর্শনে সম্মানসহ বি এ পাশ করেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার জ্ঞান পরবর্তীকালে তাঁর দর্শনচিন্তায় প্রতিফলন ঘটেছে। বি এ সম্মান শ্রেণিতে পড়ার সময়ে তিনি বিয়ে করেন এবং স্থানীয় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে তিনি এম এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এম এ শ্রেণিতে ভর্তি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমার ভগ্নিপতি হাজী কলিম উদ্দীন এবং শ্বশুর মৌলবী আলিম উদ্দীন আহমদ আমাকে এম এ পড়তে বাধ্য করেন।"[২]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে বাঙালি বিদ্বৎ সমাজের সংস্পর্শে আসেন মোহম্মদ বরকতুল্লাহ। ইব্রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, কবি শাহদাৎ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ, ফজলুল হক শেলবর্ষী, সৈয়দ ইমদাদ আলী, ডাক্তার লুৎফর রহমান, চৌধুরী ইয়াকুব আলী প্রমুখ বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিকে কেন্দ্র করে কলকাতায় মিলিত হতেন। এ সময় অর্থাৎ "১৯১৯ সালে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম করাচী সেনানিবাস হতে মুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন এবং এই সমিতি গৃহের একটি কামরায় আবাস নেন।"[৩] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ এঁদের সংস্পর্শে সাহিত্য-দর্শনচর্চা করেন। এই সময়েই তাঁর মধ্যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। তিনি দর্শন এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "সওগাতে

[১] *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

লিখতাম দার্শনিক প্রবন্ধ, আর মুসলিম ভারতে লিখতাম শেখ সা'দী, ওমর খাইয়াম ইত্যাদি ফার্সী কবিদের জীবনী ও কাব্যালোচনা।"[৪] এছাড়া কলকাতার অন্যান্য কাগজেও তিনি লিখেছেন।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ১৯২০ সালে দর্শন নিয়ে এম এ পাশ করেন। এম এ ক্লাসে দ্বিতীয় শ্রেণি থাকায় শিক্ষকতা করার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। এনিয়ে আক্ষেপ করে তিনি লিখেছেন, "ফাস্ট ক্লাস না পাওয়ায় আমার শিক্ষা বিভাগে চাকুরী মিলে নাই যদিও আমার বরাবরই ইচ্ছা ছিল শিক্ষা বিভাগে জীবন কাটিয়ে দেয়া। কোথাও একটা অস্থায়ী লেকচারারশিপও ভাগ্যে জুটলো না।"[৫]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগদানের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারেন নাই। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "দর্শনে ১২০ টাকা বেতনে একজন মুসলিম লেকচারার সেখানে নেওয়া হবে জেনে দরখাস্ত করলাম। তদবীর অভাবে কোনও ফলোদয় হলো না।"[৬] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ পাবনা জর্জ কোর্টে ওকালতি করেছেন। ১৯২৩ সালে তিনি চাকরিতে যোগদান করেন। ইনকাম-ট্যাক্স এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিভিন্ন জেলা শহরে চাকরি করেছেন। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি বাংলা একাডেমি গড়ে তুলেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ছিলেন শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি। রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় মোহম্মদ বরকতুল্লাহসহ শিক্ষার্থী-শিক্ষক মিলে ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশনের কাছে রাজশাহীতে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন করেছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন নামে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন রাজশাহী কলেজ পরিদর্শন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জী ছিলেন তার আহ্বায়ক। এই কমিশনের কাছে আমরা রাজশাহীর ছাত্র সমাজ শিক্ষকদের মারফত আবেদন জানাই রাজশাহীতে একটি স্বতন্ত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। কমিশন উহা অনুমোদন করেন। সেটি কার্যকরী হয় ১৯৫৩ সালে আযাদী লাভের পর। এই সময় আমি শিক্ষা বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারী। আমার হাত দিয়েই উহার খসড়া প্লান উপরে পৌঁছে।[৭]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার জন্য ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকারের সিতারায়ে-ইমতিয়াজ পুরস্কারে ভূষিত হন। বরকতুল্লাহর অধিকাংশ লেখায় দর্শনের ছাপ স্পষ্ট। *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থে তাঁর মৌলিক দার্শনিক চিন্তার রূপরেখা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "কলকাতায় বদলী হওয়ার পর আমার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুযোগ লাভ করি। ১৯৪০ সালে উহা *মানুষের ধর্ম্ম* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।"[৮] *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর *পারস্যের প্রতিভাসহ* অন্যান্য গ্রন্থে দার্শনিক চেতনা পাওয়া যায়। মোহম্মদ বরকতুল্লাহর প্রথম জীবনের

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০
[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০
[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮
[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

গ্রন্থ হল *মানুষের ধর্ম্ম*। শেষ জীবনে তিনি দার্শনিক রচনার চেয়ে ধর্মীয় গ্রন্থ রচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আমিনুল ইসলাম লিখেছেন "যৌবনে তাঁর রচনায় দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটলেও ক্রমশ তাঁর মানসজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং শেষ জীবনে তিনি দার্শনিক যুক্তিবাদিতার চেয়ে অনাবিল ধর্মনিষ্ঠার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।"[৯] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ *পারস্য প্রতিভা* রচনা করে লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই গ্রন্থটি তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহার দিয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "১৯২৪ সনে ফার্সী কবিদের সম্বন্ধে, আমার এই বই বের হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে একখানা উপহার দেই। কবিগুরু খুশী হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ভালই হলো এই জিনিষটাই আমার জানার বাকী ছিল।"[১০] বরকতুল্লাহর *নবীগৃহ সংবাদ*, *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ*, *কারবালা* এসব গ্রন্থে ধর্মীয় ভাবধারাই বেশি পাওয়া যায়।

দর্শনচিন্তা

বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহই প্রথম যিনি দর্শনের পরিভাষা এবং পাশ্চাত্যের দার্শনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় দর্শনচর্চা করেছেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের গণ্ডি অতিক্রম করে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করার মধ্যে দিয়ে মহাজাগতিক রহস্য অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। জগৎ ও জীবন, জড়প্রকৃতি ও মনোজগৎ, আত্মা ও পরমাত্মা, ইহলোক ও পরলোক ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্ন বরকতুল্লাহর রচনায় স্থান পেয়েছে। তাঁর এধরনের আলোচনা অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। বরকতুল্লাহর দর্শনচিন্তা সম্পর্কে হরিদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন, "তাঁহার লেখার মধ্যে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহার নিজের ধর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়।"[১১] নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা দুটিই মানব জীবনের সঙ্গে জড়িত। এ দু'টি দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ মানুষ সরলভাবে চিন্তা করে। যুক্তিবুদ্ধি এবং বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে দার্শনিক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করে বরকতুল্লাহ লিখেছেন, "দার্শনিক তাঁর চিন্তার সূক্ষ্মতার ভিতর দিয়া যে সত্য নিগূঢ়ভাবে উপলব্ধি করেন, জনসাধারণ স্থূলভাবে নানা আচারের ভিতর দিয়া সেই সত্যকে উদ্বোধন

---

[৯] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ৭২

[১০] *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)*, পৃ. ৩৬১

[১১] *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীহরিদাস ভট্টচার্য মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দর্শনচিন্তা সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ- *মানুষের ধর্ম্ম*, গ্রেট-ইস্ট লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ভূমিকা

করে।”[১২] মহাজাগতিক রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি ভাববাদের আশ্রয় নিয়েছেন। উপযোগবাদী নীতি অবলম্বন করে বরকতুল্লাহ সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ কামনা করেছেন। জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া হিসাবে বরকতুল্লাহ স্বজ্ঞার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরমসত্তার সাক্ষাৎ জ্ঞান পাওয়া যায় না। তাছাড়া বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানও পাওয়া যায় না। পরমাত্মা ও জীবাত্মা এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য ‘অতীন্দ্রিয় অনুভূতি’ স্বজ্ঞার উপর তিনি নির্ভর করেছেন। তিনি মনে করেন স্বজ্ঞার সাহায্যেই জ্ঞানলাভ করা যায়। জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনার মধ্যে দিয়ে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দর্শন আলোচনা করা হবে।

জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। জ্ঞানের উৎস, প্রকৃতি, শর্ত, সীমা ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করে। জ্ঞান কিভাবে অর্জন করা সম্ভব এ নিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, স্বজ্ঞাবাদ নামে প্রধান কয়েকটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি স্বজ্ঞাবাদ সমর্থন করে জ্ঞানতত্ত্বের নাম দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি। তাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তির অপর নাম স্বজ্ঞা (intuition)। স্বজ্ঞা বা (intuition) এর জার্মান শব্দ হচ্ছে *Anschauung* যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে দেখা বা দৃষ্টি।[১৩] জ্ঞান সম্পর্কে স্বজ্ঞাবাদ সমর্থন করার আগে তিনি বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের অপূর্ণতাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “দৃশ্যমান জগৎ বুদ্ধির সৃজিত একটি মানসিক চিত্র হইলেও উহা শুধু মানসিক নহে; উহা এক বাস্তব জগতের আলেখ্য। সেই বাস্তব জগৎ মায়া বা মিথ্যা নহে; উহা অতীব সত্য। উহার অস্তিত্ব মনের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির উপর নির্ভর করে না।”[১৪] আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধিবাদের সমালোচকরা দেখিয়েছেন জীবন শুধু বুদ্ধি দিয়ে চলে না। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ বুদ্ধিবাদের সমালোচকদের মত সমর্থন করে লিখেছেন,

> জীবন যদি শুধু বুদ্ধিবৃত্তির মুখাপেক্ষী হইত, তাহা হইলে উহার আয়ু অতি খর্ব হইত। কেননা প্রত্যেক আকস্মিক বিপদপাতেই জীবন ধ্বংসের মুখে ঢলিয়া পড়িত। এই জন্যই আধুনিক দার্শনিকদের মতে বুদ্ধিবৃত্তি জীবনের চালক নহে। জীবন নিজ ব্যসন, বাসনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, করুণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি নানা প্রেরণায় প্রমত্ত হইয়া যৌবনভারাকূলা অভিসারিকার মত

---

[১২] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা*, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪১

[১৩] Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, Routled, London, First Published 1946, Reprinted 1995. P. 681

[১৪] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ- *মানুষের ধর্ম্ম*, পৃ. ১৫৩, ১৫৪

ছুটিয়া নিশীথযাত্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে। বুদ্ধি তাহার অন্ধকার অরণ্য-পথের জন্য স্বল্প-বিস্তর কিরণ-রেখা মাত্র।[১৫]

মানব-জীবন বহু বিচিত্র। মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি, কাম-ক্রোধ, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায় না। এগুলোর জন্য জীবনে আরো বেশি কিছু প্রয়োজন। বরকতুল্লাহ লিখেছেন, "জীবনের বহু কাজ বুদ্ধির অগোচরে সাধিত হয়, এক কথায় জীবন যখন বুদ্ধির অনধিগম্য-কিছু, তখনই জীবন-রহস্য উদ্ভেদে বুদ্ধি যে নিতান্ত অসমর্থ, তাহা সহজেই অনুমেয়।"[১৬] জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্রাণী মাত্রই খুব বেশি বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল নয়। প্রাণীরা জীবনের অনেক কাজ সংস্কারবসত করে। শুধু সংস্কারের উপর নির্ভর করে মানব-জীবন চলতে পারে না। সংস্কার অনেকটা অভ্যাস। বুদ্ধি, সংস্কার এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে সমালোচনা করে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ অতীন্দ্রিয় অনুভবের সমর্থন করে লিখেছেন,

> বুদ্ধি-বৃত্তি ও সংস্কার ব্যতীত মানুষের ভিতর আরও একটি ক্ষমতা আছে, যাহাকে আমরা অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি (Intuition) বলিতে পারি। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীতও যে আমরা অনেক জিনিষ অনুভব করিতে পারি, তাহা প্রত্যেকেই মনে মনে বুঝিতে পারিতেছেন। এই যে আমি ভাবিতেছি, এই যে আমি জীবিত আছি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, এই যে আমি পূর্ব্বেও যে ছিলাম এখনও সেই আছি, এ সমস্ত জ্ঞান কোন ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে। উহা আমাদের ঐ ভিতরকার অনুভব শক্তির ফল। ভিতরকার স্বাভাবিক অনুভব শক্তি দ্বারাই আমরা নিজের অস্তিত্ব ও চেতনা সম্বন্ধে নিজে কৃতনিশ্চয়। আমাদের নিজ সত্তা ও বুদ্ধির সত্তা সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি (Intuition) ব্যতীত আর অন্য কোন প্রমাণ নাই।[১৭]

জ্ঞান সম্পর্কে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সমর্থন করে তিনি আরো বলেছেন, "অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আমাদিগকে যে শুধু আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবহিত করে তাহা নহে। আরও অনেক কিছু উহার সাহায্যে আমরা সময় সময় জানিতে পারি যাহা কোনও প্রমাণ পরখের অপেক্ষা রাখে না।"[১৮] বরকতুল্লাহর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে অতীত-বর্তমান, ভূত-ভবিষ্যত, সবকিছু সম্পর্কে জানা যায়। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিকট ভূত ভবিষ্যত বর্তমান বলিয়া কিছু সীমা নির্দ্দেশ নাই। উহা সকল কালের সকল দেশের যা কিছু বাস্তব তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে।"[১৯] অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মানুষের মধ্যে কিভাবে কাজ করে তার ব্যাখ্য বরকতুল্লাহ দিতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (Intuition) ভিত্তি কি, কোথা হইতে এ অনুভূতি আসে, কিরূপেই বা ইহা মানবের মানসক্ষেত্রে ভাসিয়া উঠে তাহা প্রমাণ দিয়া বুঝাইবার উপায় নাই।"[২০] জার্মান দার্শনিক ইমানুয়ের কান্টের অতীন্দ্রিয় সত্তার (noumena) সঙ্গে বরকতুল্লাহর অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তিকে তুলনা করা যায়। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে মোহম্মদ

---

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮, ১৫৯
[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

বরকতুল্লাহর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ধারণা মৌলিক। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি শক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

> প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে দুই একটি ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারা বা গৃহে বসিয়া বাহিরে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা বলিতে পারা, অতি নিম্নস্তরের সাফল্য। যাঁহারা আত্মিক সাধনায় বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের মনশ্চক্ষু এমনভাবে খুলিয়া যায় যে তাঁহাদের নিকট সকল কাল বর্তমানে পরিণত হয়, সকল দেশ সম্মুখীন মনে হয়, সকল পদার্থ স্বচ্ছ হইয়া আসে। পাঠক বুঝিতেছেন, এই মনশ্চক্ষুই অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি।[২১]

অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন মানুষকে তিনি অসীম ক্ষমতাবান মানুষ হিসাবে দেখেছেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "মানুষের অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি (Intuition) যখন পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাহার মনোজগৎ নাকি স্বর্গীয় আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। সেই আলোকে সে দেখিতে পায় তাহার নিজ স্বরূপ; অর্থাৎ বিশ্বলোকে তাহার স্থান কোথায়, বিশ্বের সহিত তাহার সংযোগ, অসীমে আর সসীমে কি যোগাযোগ, এ সমস্ত সে অনুভব করিয়া প্রাণে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।"[২২] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিশক্তিকে জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে বর্ণনা করলেও একমাত্র পথ বলেননি। বুদ্ধির গুরুত্ব তিনি স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন, "অভিজ্ঞতা দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞানকে পরবর্তী নূতন নূতন কার্য্যে সে প্রয়োগ করিতে পারে। বুদ্ধি ব্যতীত স্বভাবজাত (Spontaneous) ও বিশৃঙ্খল সংঘটনসমূহের ভিতর শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণ আশা করা যায় না। বিজ্ঞান চর্চ্চার নব নব পদ্ধতি ও উৎকর্ষ মানবের বুদ্ধি-বৃত্তিরই সৃষ্টি। লিপি-প্রণালীও এই বুদ্ধি-বৃত্তিরই বিস্ময়কর আবিষ্কার।"[২৩]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি শেষ পর্যন্ত জ্ঞান লাভের বাহন না হয়ে বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সুফি, পির, ফকির ও বাউলেরা সাধনার মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলনের কথা বলেছেন। মানবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যেও এদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান পাওয়া যায় না। এ কারণে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তির সাথে মরমীসাধকদের মতবাদের পার্থক্য খুব একটা দেখা যায় না। বরকতুল্লাহর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমিনুল ইসলাম লিখেছেন, "জ্ঞানের এই বাহন কোন আপতিকভাবে প্রাপ্ত কিংবা সহজলভ্য ব্যাপার নয় একে অর্জন করতে হয় সুকঠিন অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের, বরকতুল্লাহর ভাষায়, 'কঠোর তপস্যার মাধ্যমে।"[২৪] কঠোর তপস্যা ধ্যান-অনুধ্যান মরমীবাদকে সমর্থন করে। অনুশীলন, অধ্যয়ন, প্রজ্ঞার স্থলে 'অতীন্দ্রিয় অনুভূতি' জ্ঞান অর্জনের বাহন হতে পারে কি না সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

---

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
[২৪] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ৭৬

বরকতুল্লাহর জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতি শক্তি অর্থাৎ স্বজ্ঞা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক আবদুল হক লিখেছেন, “এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ভিত্তি কি এবং কোথা থেকে এ অনুভূতি আসে তা প্রমাণ দিয়ে বোঝাবার উপায় নেই, এই উক্তি তিনি পরমুহূর্তেই করেছেন, কিন্তু এই অনুভূতির উপরই তাঁর অটল আস্থা। বস্তুত চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি মরমীয়াবাদী। দর্শনালোচনা আরম্ভ করে এইভাবে তিনি কার্যত দর্শনকে বর্জন করেছেন, কেননা দর্শনের প্রধান কথা যুক্তি প্রমাণ। কোনো দর্শনই বিজ্ঞান ও তার যুক্তি প্রমাণকে উপেক্ষা করে অথবা তার বিরোধিতা করে দাঁড়াতে পারে না।”[২৫] বরকতুল্লাহ সম্পর্কে আবদুল হকের এই অভিমত আমিনুল ইসলাম খণ্ডন করে লিখেছেন, “দর্শনকে বর্জন করেছেন’, ‘বিজ্ঞান ও তার যুক্তি-প্রমাণকে উপেক্ষা’, করেছেন, একথা বলা বোধ করি সঙ্গত নয়। চিন্তার ক্ষেত্রে বরকতুল্লাহ ‘মরমীয়াবাদী’ আবদুল হকের এ কথা মেনে নিলেও তিনি বিজ্ঞান বিরোধী ছিলেন বলা যায় না। কারণ, বরকতুল্লাহ বিজ্ঞানকে বিসর্জন দেননি, বিজ্ঞানের প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন অকপটে।”[২৬]

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসে আস্থাশীল ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন মোহম্মদ বরকতুল্লাহ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরোধী ছিলেন না। প্রগতিবিরোধী হিসাবেও তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি ধর্মে বিশ্বাস করতেন আবার বিজ্ঞানের উপর আস্থাশীল ছিলেন। বিজ্ঞান এবং ধর্ম এ দুয়ের মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। *মানুষের ধর্ম্ম*, *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দর্শন চিন্তা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পরবর্তী রচনায় সে ধারা অব্যাহত ছিল এমন দাবি করা যায় না। “বিশ শতকের বিশ-ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে তিনি যে মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন এবং মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুক্তবুদ্ধি চর্চার অংশীদার হয়েছেন পঞ্চাশের দশকে এসে তা অব্যাহত থাকেনি।”[২৭] তাঁর পরবর্তী সময়ের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *কারবালা*, *নবীগৃহ সংবাদ*, *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ*, *হযরত ওসমান*, *বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা* এসব গ্রন্থে দর্শনচর্চা হয়েছে এমন দাবি করা যায় না। মুক্তবুদ্ধির উৎসাহ হিসাবেও গ্রন্থগুলোকে বিবেচনায় নেয়া কষ্টকর। প্রথম জীবনে তিনি দর্শন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা শুরু করেছিলেন। শেষ জীবনে এসে ধর্মীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে স্বজ্ঞার কথা বলে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানকে অস্বীকার করেছেন। স্বজ্ঞা ব্যক্তি নির্ভর। একেক ব্যক্তির কাছে স্বজ্ঞা একেক রকম। বিজ্ঞান ব্যক্তি নিরপেক্ষ। বিজ্ঞানের জ্ঞান সর্বজনিন। ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ হিসাবে বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করার প্রত্যয় নিয়ে তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে স্বজ্ঞার উপর আস্থা রেখেছেন।

---

[২৫] আবদুল হক, *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ১১০. আমিনুল ইসলাম এই উক্তিটি বাঙ্গালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। এই গ্রন্থ থেকেই এটি নেয়া হয়েছে। আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ৭৬

[২৬] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ৭৭

[২৭] সৈয়দ আজিজুল হক, *মন ও মনন*, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৯৬

অধিবিদ্যা

অধিবিদ্যার আলোচনার পরিধি ব্যাপক। প্রধানত যা প্রাকৃতিক নয় তা নিয়েই অধিবিদ্যা আলোচনা করে। দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব, জড়, মন, প্রাণ, ঈশ্বর, আত্ম, পরকাল ইত্যাদি অধিবিদ্যার এলাকাভুক্ত। ঈশ্বর, আত্মার উপস্থিতি প্রাকৃতিক জগতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ দু'টির উপস্থিতি মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনের অনেক জায়গা জুড়ে আছে এ দু'টি অতিপ্রাকৃতিক সত্তা। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ঈশ্বর এবং আত্মা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঈশ্বর এবং আত্মা সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে মোহম্মদ বরকতুল্লার অধিবিদ্যা সম্পর্কে মতবাদ পাওয়া যাবে।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উপর আস্থাশীল ছিলেন। ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কীয় তাঁর চিন্তা সুফিবাদ দিয়ে প্রভাবিত। সুফিরা নানা তরিকায় বিভক্ত। সব তরিকার মতবাদ একই রকম নয়। বাংলাদেশে প্রধানত চার তরিকার সুফি রয়েছেন। বঙ্গীয় সুফি মতবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাঁদের মূলনীতি অভিন্ন। তাঁদের উপাস্য এক। সুফিরা সর্বেশ্বরবাদী। সুফিবাদ অনুসারে ঈশ্বর সব স্থানেই আছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলনেই মুক্তি। পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলন, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার মিলন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলনের কথা উল্লেখ করে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ লিখেছেন, "পানির ধর্ম্ম যেমন নিষিক্ত করা, অগ্নির ধর্ম্ম যেমন দহন করা, মানুষের ধর্ম্ম তেমনি আপনার সত্যকার রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সসীমের গণ্ডি পার হইয়া অসীমের সহিত একাকার হওয়া।"[২৮] সুফিবাদের উদ্ভব পারস্যে। ইসলাম ধর্মের উদ্ভব আরবে। পারস্যের ঐতিহ্য এবং চিন্তার ইতিহাস প্রাচীন। আরবের সাথে পারস্যের চিন্তার পার্থক্য উল্লেখ করে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

> আরবেরা সেমিটিক সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা বহির্মুখীন। পারস্যবাসীরা আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহাদের চিন্তাধারা অন্তর্মুখীন। আরবেরা প্রত্যক্ষবাদী (Empirical) পারস্যবাসীরা ভাববাদী (Intuitional)। আরবেরা সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী (Dualistic); তাহারা সৃষ্টিকে স্রষ্টা হইতে পৃথক করিয়া দেখে, যেমন শিল্পী ও তাহার রচনা। পারস্যবাসীরা এ সম্বন্ধে একত্ববাদী (Monistic); তাহারা সৃষ্টির ভিতরই স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেন।[২৯]

ঈশ্বরের রূপ সবসময় এবং সব স্থানে একই রকম ছিল না। একই সময়ে একই স্থানে সব মানুষের চিন্তায় ঈশ্বর একই রকম নয়। ঈশ্বরবাদীদের সৃষ্টিকর্তা নিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। ভারতীয় সব দার্শনিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বরে বিশ্বাস একই রকম নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকেদের মধ্যে ঈশ্বর নিয়ে

[২৮] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, *মানুষের ধর্ম্ম*, পৃ. ২১
[২৯] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা*, পৃ. ৪৪

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীর কোন মতবাদই চিরস্থায়ী নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এক কালে যা আধুনিক কিছুকাল পরে তা আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে মানুষের চিন্তার পরিবর্তন হয়েছে। বরকতুল্লাহ্ মনে করেন, মানুষ নিজের প্রয়োজনেই ঈশ্বরকে নিজেদের মত করে সৃষ্টি করে নিয়েছে। সৃষ্টিকর্তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মানুষের ধারণা সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

> প্রাচীন বর্বরতার যুগে মানুষ যখন মানুষকে ক্ষমা করিতে জানিত না, শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতেই লোলুপ থাকিত, তখনকার শাস্ত্রে আল্লাহ্ কল্পিত হইয়াছেন ভীষণ দণ্ডদারীরূপে। তিনি যেন সর্বদা অপরাধীকে চরমদণ্ড দান করিবার জন্যই ব্যগ্র। তাঁহার নিয়মের কণামাত্র ব্যত্যয় হইলেই অপরাধীর উপর তাঁহার ভীমবজ্র নিপতিত হইবে ইহাই ছিল সে কালের প্রধান শিক্ষা। ক্রমে মানুষের ভিতর যখন সুকুমার বৃত্তিসমূহের উন্মেষ ঘটিল তখনকার আল্লাহ্ হইলেন দয়াল পিতা। আর তাঁহার প্রেরিত পুরুষ যীশু হইলেন দয়াল পিতার পুত্র। আরও পরবর্তী যুগে ইসলাম জগৎকে শুনাইল, আল্লাহ্ একাধারে দণ্ডধারী ও দয়াল, প্রতিপালক ও ন্যায়-বিচারক। ‘‘রাব্বিল আ’লামিন, আর্‌রহমানের রাহীম, মালেকে ইয়াওমেদ্দীন।” শেষ নবী তাঁহার ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, আল্লা’র ভীষণ রুদ্ররূপের ভিতর কোমল-মধুরতা, তাঁহার ন্যায়দণ্ডের পশ্চাতে ক্ষমার সুশীতল ছায়া।[৩০]

সুফি শ্রেষ্ঠ আইনাল হক নিজের মধ্যে স্রষ্টাকে দেখেছেন। স্রষ্টার সাথে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সুফিবাদের শেষস্তর বাকাবিল্লাহ। বাকাবিল্লাহর স্তরে পৌঁছে গেলে জাগতিক লোভ লালসার উর্ধ্বে মানুষ উঠে যায়। তখনই কেবল পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলন সম্ভব।

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস নিজেকে জানার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়কে নিজেকে জানার কথাই বলেছেন। মৈত্রেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেছেন, “যাহা দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিবনা, তাহা দ্বারা কি করিব?”[৩১] যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলেছেন, “আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ নিশ্চিতরূপ ধ্যান) করিতে হইবে। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত অবগত হওয়া যায়।”[৩২] যাজ্ঞবল্ক্যের এই উপদেশ দ্বারা বোঝা যায় তিনি মৈত্রেয়কে নিজেকে জানার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদের বাণী অনুসরণ করে বলেছেন, “আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবেনা, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।” মোহম্মদ বরকতুল্লাহ নিজেকে জানার মধ্যে দিয়ে শাশ্বত সত্যের উপলব্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন,

---

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[৩১] *উপনিষদ*, *অখণ্ড*, অতুলচন্দ্র সেন, সতীনাথ তত্ত্বভূষণ মহেশচন্দ্র (সম্পাদিত), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ.৭৩০

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩২

ঠিক আমি যেমন, তেমনই করিয়া আমি জগৎকে দেখি। এক কথায় আমাকেই জগতের ছত্রে ছত্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া সেই জগৎকে আমি বুঝিতে চেষ্টা করি। সুতরাং জগতের ভিতর শাশ্বতকে দেখিতে চাহিলেও নিজেকেও শাশ্বত করিতে হইবে - অর্থাৎ নিজের ভিতরকার শাশ্বতকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।[৩৩]

অসীমের সাথে সসীমের মিলনের জন্য এখানে বরকতুল্লাহ সসীমকে অসীমের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। সসীম নিজেকে জানলেই অসীমের সঙ্গে মিলন সম্ভব।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তাঁর ঈশ্বর অসীম ক্ষমতাবান এবং এই মহাবিশ্বের তিনিই একমাত্র অধিপতি। একেশ্বরবাদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "প্রত্যক্ষ অনুভূতির তাড়নায় ও পর্যবেক্ষণের নেতৃত্বে আমরা যে পথেই পরিক্রমণ করি না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিশেষে এক মননশীল ও সৃষ্টিধর্ম্মী চৈতন্যের এলাকায় আসিয়া পড়ি। একেশ্বরবাদ বা তৌহিদের সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই।"[৩৪] প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মানুসারে একেশ্বরবাদ উগ্রপন্থা নয়। কিন্তু উগ্রপন্থার সুপ্তাবস্থা একেশ্বরবাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়েও তাঁর ঈশ্বর অনেকটাই মানবিক এবং সর্বধর্মের ঈশ্বর। তিনি লিখেছেন, "ইসলাম ধর্ম বল, খ্রিস্টান ধর্ম বল, ইহুদী ধর্ম বল, সকল ধর্মের বাহিরের আবরণ ফেলিয়া দিলে এই সনাতন সত্যটুকুই কেবল অবশিষ্ট থাকে, এই বৈচিত্রময় পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ যে স্রষ্টার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, বিশ্বের প্রতি কার্যে প্রতি ঘটনায় যে মহাশক্তির স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, তাহার উপর নির্ভরই চরম ধর্ম এবং ইহাই সর্বজনীন ধর্ম।"[৩৫] বরকতুল্লাহ সকল ধর্মের সারকথা এক হিসাবে দেখালেও তিনি ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে আপোষহীন। সুফিবাদের পথ অনুসরণ করে তিনি যদিও পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার, সসীমের সাথে অসীমের, আশেকের সাথে মাশেকের মিলনের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ওয়াহাবী মতবাদ তাঁর চিন্তায় পরিত্যক্ত হয়নি। তিনি লিখেছেন,

বিশ্বমনের সহিত মানব মনের যদি কোনও পথ দিয়াই যোগাযোগ না থাকিত এবং মানব মন যদি বিশ্বমন হইতে কোনই প্রেরণা না পাইত, তবে মহাপুরুষদের দৃষ্টি অমন অন্তর্ভেদী হইত না এবং তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা অলৌকিক কার্যাবলী সাধিত হইত না। দরিদ্রা মরিয়মের নিঃসহায় সন্তান ঈসা (আঃ) অথবা নিরীহ আবদুল্লা'র পুত্র উম্মী মুহম্মদ (দঃ) যদি জীবনে বিশ্বমনের পরশপাথর দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইতেন তবে অর্ধ পৃথিবীর মানুষ এমন করিয়া তাঁহাদের নির্দেশ মানিয়া চলিত না।[৩৬]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় এখানে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর যুক্তির পথটি খুবই দুর্বল। যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তিনি বিশ্ব মনের সঙ্গে মানব মনের মিলনের কথা বলেছেন। তাঁর এই বিশ্বমন

[৩৩] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, *মানুষের ধর্ম্ম*, পৃ. ২৪, ২৫
[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
[৩৫] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা*, পৃ, ৩৪
[৩৬] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ- *মানুষের ধর্ম্ম*, পৃ. ২০৫, ২০৬

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এবং এই সৃষ্টিকর্তা ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। এই সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসের সৃষ্টিকর্তা। দার্শনিকের সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন।

বরকতুল্লাহর সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ তাঁর বিশ্বমন সর্বত্র বিরাজমান। এই বিশ্বমন সব-স্থানে অবস্থান করেন। সর্বেশ্বরবাদীদের মত বরকতুল্লাহর বিশ্বমন সর্বত্র বিরাজমান। বিশ্বমন সর্বত্র বিরাজমান হলেও তিনি বলেছেন স্রষ্টাকে জানা যায় না। জার্মান দার্শনিক কান্টের মত বরকতুল্লাহর স্রষ্টাও অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁকে জানার চেষ্টা চলছে। তিনি লিখেছেন, "মানুষ বিগত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া চিন্তার পথে বৃথাই চেষ্টা করিয়াছে; স্রষ্টার সম্বন্ধে কোনও যথার্থ ধারণায় এ যাবৎ তাহারা পৌঁছিতে পারে নাই।"[৩৭] স্রষ্টাকে যদি জানা নাই যায়, স্রষ্টাকে জানার চেষ্টা মানুষের যদি বৃথাই যায় তাহলে বিশ্বমনের সঙ্গে মানবমনের মিল কি করে হবে। বরকতুল্লাহর বিশ্বমন কি তাহলে স্রষ্টা নয়? বিশ্বমন ও স্রষ্টা কি ভিন্ন? বিশ্বমনের যে ব্যাখ্যা বরকতুল্লাহ দিয়েছেন তা স্রষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি উপমার সাহায্যে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ এবং মানব জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "একই বিদ্যুৎ প্রবাহ যেমন নগরীর লক্ষ প্রদীপের ভিতর দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে তেমনি একই মহাপ্রেরণা সমগ্র মানব সমষ্টির ভিতর দিয়া কোনও এক দূর লক্ষ্যের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই প্রেরণা মানবের ভিতর দিয়া আপনি বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাই মানবের বাঁচিতে এত সাধ।"[৩৮]

বিশ্বের আদি কারণ কি? বিশ্বের আদি কারণ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। গ্রিক দার্শনিকেরা জগতের আদি কারণ হিসাবে পানি, বায়ু, অগ্নি, সংখ্যা ইত্যাদি নির্ধারণ করেছিলেন। ভারতীয়দের মতে আদি কারণ পঞ্চভূত। যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুসারে ব্রহ্মাই বিশ্বের আদি কারণ। ব্রহ্মের ধারণা এবং স্রষ্টা প্রায় সমার্থক। বরকতুল্লাহর মতে স্রষ্টা বিশ্বের আদি কারণ। তাঁর স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকর্তা এক। বিশ্বাসী মুসলমানদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে অনুভূতি মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দার্শনিক ঈশ্বরও একই রকম।

আত্মা নিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু আত্মাকেন্দ্রিক। এজন্য ভারতীয় দর্শনকে অনেকে আত্মা সম্পর্কীয় দর্শন হিসাবেও অভিহিত করে থাকেন। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ আত্মা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকণা আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। যে যেখানে আছে সেখানের অবস্থান কেউ ছাড়তে চায় না। সুন্দর ভুবন কেউ ছাড়তে চায় না। বরকতুল্লাহ লিখেছেন, "বস্তুজগতের সাধারণ ধর্ম্ম আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সামান্য লোষ্ট্র খণ্ড যেখানে বসিয়া আছে সেখানে তুমি বসিতে পারিবে না। যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না কেন,

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮
[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

সে যেখানে আপন অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে সেখান হইতে সে সহজে নড়িবে না। তাহাকে সরাইতে চেষ্টা কর সে প্রতিরোধ করিবে।"[৩৯] জীব শুধু বেঁচে থেকে সন্তুষ্ট নয়, সে আপনাকে প্রসারিত করতে চায়। অনন্তকাল থেকে বাঁচতে চায়। তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জীব জগতের মানুষ অন্যতম। মানুষ শুধু এক জীবন বেঁচে থাকতে চায় না। অনন্তকাল বেঁচে থাকার চেষ্টা তার অবিরত। জীব জগতের অন্যান্য প্রাণী বংশ বিস্তার করে। তাদের সন্তান বাৎসল্য রয়েছে। কিন্তু মানুষ তার চেয়ে একটু বেশি। মানুষের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হচ্ছে আত্মা। বস্তুজগতের আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বরকতুল্লাহ আত্মা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন,

> অন্য প্রাণী হইতে মানুষের একটু পার্থক্য আছে। মানুষ শুধু জৈবশক্তির অভিব্যক্তি নয়, মানুষে আরও একটি নূতন শক্তির বিকাশ আছে। উহার নাম আত্মা। আত্মাও চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক। মরণ মানুষের দৈহিক জীবনে সমাপ্তি আনিয়া দেয়; কিন্তু আত্মা তারপরও বাঁচিয়া থাকিতে চায়। তাই মৃত্যুর পরপার সম্বন্ধে মানুষের এত জল্পনা কল্পনা।[৪০]

আত্মা কি? মানুষের মৃত্যু হলে আত্মা কোথায় যায়? আত্মার স্বরূপ কি? অধিবিদ্যক এসব প্রশ্ন দর্শনের শুরু থেকে আলোচনা হয়ে আসছে। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সাধারণত যে কেন্দ্র হইতে আমাদের সকল কর্মে প্রেরণা আসে, যেখানে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় এবং পূর্বাপরভাবে গ্রথিত হয়, উহাকেই আত্মা (Soul) বলা হয়।"[৪১] আত্মার সংজ্ঞা দেয়ার আগে তিনি আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে লিখেছেন,

> বাস্তবিক পক্ষে আত্মার স্বরূপ আজিও নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। উহা আমাদের মন হইতে স্বতন্ত্র কোনও সত্তা কিনা, অথবা উহা মনেরই একটা পূর্ণতর বা ঘনীভূত অবস্থা, উহা স্থূল কি সূক্ষ্ম, ভারী না ওজনহীন, ছায়াময় অথবা অশরীরী প্রাণময় স্বচ্ছ কোনও বস্তু (spirit) যাহা নিঃশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে প্রয়াণ করিতে পারে, এই সমস্ত প্রশ্নের আজ পর্যন্ত কোনও মীমাংসা হয় নাই।[৪২]

আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ সংশয় প্রকাশ করলেও তিনি আত্মার সংজ্ঞা দিয়েছেন। মৃত্যুর পর আত্মা দেহ ছেড়ে কোথায় যায়? এসব কল্পনা থেকে মানুষ পরকালের ধারণায় উপনীত হয়েছেন এবং আত্মার অমরত্ব কল্পনা করেছেন। ইসলাম ধর্মানুসারে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দিন মানুষের আত্মা নিজ নিজ দেহে অবস্থান করবে? তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বা তারো আগে যে সব মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেসব মানুষের আত্মা বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছে? দেহে আত্মার অবস্থান নিয়ে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ উদ্দেশ্যবাদীদের মত করেই বলেছেন, "জড় হইতে পৃথকভাবে, অথবা জড়দেহের বাসেন্দারূপে, আত্মাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি যদি গোড়ায় কোনও উদ্দেশ্য লইয়াই ইহা করিয়া থাকেন, তবে তাহার সেই উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য পুনরায় তিনি উহাকে দেহ নিবাসী

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১
[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

করিতে পারেন।"[৪৩] বরকতুল্লাহ উদ্দেশ্যবাদ সমর্থন করলেও বক্তব্য প্রকাশের মধ্যে সংশয়বাদের ছাপ স্পষ্ট। কারণ তিনি ধরে নিতে পারেন নাই যে, কেউ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আত্মার সৃষ্টি করেছেন। তারপরও দেখা যায় আত্মার অধিষ্ঠান হিসাবে উদ্দেশ্যবাদ সমর্থন করে তিনি লিখেছেন,

> ইয়োরোপে এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল পোপ ছাড়পত্র না দেন, তাহা হইলে মৃতের আত্মা কখনই স্বর্গধামে যাইতে পারিবে না। পাক ভারতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেইরূপ দুর্দ্দিন এখনও আসন গাড়িয়া আছে। মানুষ কবে বুঝিবে যে স্বর্গের যিনি মালিক তিনি তাহার অন্তরেই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে পাইতে হইলে পুরুত-ঠাকুর বা মোল্লা-দোপেয়াজীর কোনও প্রয়োজন নাই।[৪৪]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ আত্মা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলেও পরে তিনি উদ্দেশ্যবাদই সমর্থন নিয়েছেন। তাঁর এই মতের সমর্থন একটি হাদিসে পাওয়া যায়। একটি হাদিসে আছে,

> আমরা এক সফরে রাসুল (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম ও কয়েকজন দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, আল্লাহ মহানতম। তখন রাসুল (সাঃ) বলিলেন, তোমরা আরাম কর, কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া হয়রান হইওনা; যাহাকে ডাকিতেছো, তিনি বধির নহেন, তিনি শুনিতেছেন, দেখিতেছেন ও তোমাদের সাথেই আছেন; তোমরা যাহার উপাসক, তিনি তোমাদের উটের গলা হইতেও নিকটে।[৪৫]

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোতে দেখা যায় আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার কোন বিনাশ নেই। দেহের বিনাশের পরও আত্মা বেঁচে থাকে। আত্মা কোন স্থান দখল করে না। দেহ আত্মার আধার মাত্র। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ লিখেছেন, "মানবের বিশ্বাস, জীবন ও আত্মা এক নহে; জীবন বা জৈবশক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, আত্মা নিত্য।"[৪৬] আত্মা নিত্য হলে পরমাত্মাও নিত্য। মানবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই নিত্য হলে সমান হয়ে যায়। তাহলে মানবাত্মার পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যাওয়ার যে আকুল প্রচেষ্টা তার কোন অর্থ থাকে না। কিন্তু বরকতুল্লাহ লিখেছেন, "মৎস্য যেমন পানিতে জীবনের সার্থকতা অনুভব করে, উদ্ভিদ যেমন আলো ও বাতাসে স্বস্তি অনুভব করে, শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, আত্মাও তেমনই একমাত্র পরমার্থেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ মনে করে।"[৪৭] মোহম্মদ বরকতুল্লাহর মানবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে মিলনের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন সেখানেই উদ্দেশ্যবাদ সমর্থন করে। মানবাত্মার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন। তিনি উল্লেখ করেছেন, "জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ সুফী মতবাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ। অথচ কুরআন এ দুয়ের অভেদ কোনও ক্রমেই স্বীকার করে নাই। জীবাত্মা আল্লাহ দ্বারা সৃষ্ট এবং যাহা সৃষ্ট তাহার বিলয় আছে, ইহাই কুরআনের শিক্ষা। পক্ষান্তরে সুফীমতে মানবাত্মা পরমাত্মার অংশ হিসাবে অবিনশ্বর। মানুষের মৃত্যুর পর উহা কোনও এক শাশ্বত

---

[৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
[৪৫] স্যার আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী, *রাসুল (সাঃ) এর বাণী থেকে*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬, পৃ. ৬২
[৪৬] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ- *মানুষের ধর্ম্ম*, পৃ. ৭
[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

লোকে বাঁচিয়া থাকে। উহা বিলুপ্ত হয় না এবং আপন স্বাতন্ত্র্য বোধও হারায় না।"[৪৮] আত্মা সম্পর্কে বরকতুল্লাহ সুফী মতবাদকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সুফীবাদ গ্রহণ করার ফলে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা দুইই অবিনশ্বর হয়ে যায়।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ মন এবং আত্মার মধ্যেও পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে মন এবং আত্মা এক নয়। তিনি মনকে আত্মার উপর স্থান দিয়ে লিখেছেন, "মনের অবচেতন কোঠায় কত রকম স্মৃতি ও প্রজ্ঞা যে লুকান থাকে তাহা বলা যায় না। সেখানে কি ঘটে আর কি না ঘটে মন নিজেও তাহা জানে না। অথচ ইহাদের সমস্ত লইয়াই আত্মার এলাকা।"[৪৯] অধিবিদ্যার অন্যান্য এলাকা নিয়ে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ আলোচনা করেননি। আত্মা, পরমাত্মা এবং সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি অধিবিদ্যক আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক অধিবিদ্যক মতবাদ তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর অধিবিদ্যাকে ধর্মতাত্ত্বিক অধিবিদ্যা বলা হয়েছে এ কারণে যে তিনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র মতবাদ সৃষ্টি করতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে ঈশ্বর আত্মার ব্যাখ্যার সঙ্গে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর সৃষ্টিকর্তা, আত্মা অভিন্ন। এজন্যই তাঁর ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে অধিবিদ্যা বলা হয়েছে।

মূল্যবিদ্যা

মূল্যবিদ্যাকে আদর্শবিদ্যা, মানবিদ্যা বা Theories of Value নামে অভিহিত করা হয়। মূল্যবিদ্যার আলোচনার বিষয়গুলো প্রায়োগিক। নীতিচিন্তা এবং সমাজচিন্তা মূল্যবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ নীতি এবং সমাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীতি-নৈতিকতার কথা বলেছেন। সমাজচিন্তাও করেছেন প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই অধ্যায়ে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ নীতিচিন্তা এবং সমাজচিন্তা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর মূল্যবিদ্যা আলোচনা করা হবে।

নীতিচিন্তা

মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ নিয়ে পাশ্চাত্যের আদর্শগত নীতিবিদ্যা আলোচনা করে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকেরা নীতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় দর্শনের অন্যতম ভিত্তি নীতিতত্ত্ব। মধ্যযুগে এবং আধুনিককালে নীতিদর্শন নিয়ে দার্শনিকেরা আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিককালে পরানীতিবিদ্যা, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, ভূমি নীতিবিদ্যা, বাণিজ্য নীতিবিদ্যা, চিকিৎসা নীতিবিদ্যা, সাংবাদিক-নীতিবিদ্যা, অতিমানবীয় নীতিবিদ্যা (syborg ethics) ইত্যাদি নীতিবিদ্যার নতুন নতুন শাখা নীতিদর্শনের

---

[৪৮] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা*, পৃ, ৪৫
[৪৯] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ- *মানুষের ধর্ম*, পৃ. ২১৭

আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ নীতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথমে অগাস্ট কোঁৎতে (১৭৮৯-১৮৫৭), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩), হার্বাট স্পেন্সারের (১৮২০-১৮৯২) নীতিতত্ত্বের সমালোচনা করে তাঁর নীতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। হার্বাট স্পেন্সারের মৃত্যুর ছয় বছর পর মোহম্মদ বরকতুল্লাহর জন্ম। হার্বার্ট স্পেন্সার ডারউইনের বিবর্তনবাদ দিয়ে প্রভাবিত হন। তাঁর মতে নৈতিক ভালত্ব বা মন্দত্ব বিবর্তনের মতই গতিশীল। বিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে ডারউইনের মতবাদ স্পেন্সার অনুসরণ করেন। এই বির্বতনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সমাজ, রাষ্ট্র এবং নৈতিকতার ব্যাখ্যা করেন।[৫০] স্পেন্সারের মতানুসারে জগতের প্রতিটি প্রাণীই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করে। প্রাণীদের আচরণের মধ্যে খাপ খাইয়ে চলার প্রবণতা দেখা যায়। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা করে হার্বার্ট স্পেন্সার সম্পর্কে লিখেছেন,

> হার্বার্ট স্পেন্সার জীবনকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন সমাজের দিক হইতে, কিন্তু উহা যে আর এক বৃহত্তর সমষ্টির অংশ তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক আলোকপাত করেন নাই। তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic), তাই পরমাণুর (star dust) অতীত কোনও সত্তা আছে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি অনুকূল বা প্রতিকূল কোনও মতই ব্যক্ত করা নিরাপদ মনে করেন নাই। সেই স্তরটি ছাড়িয়া দিয়া তিনি পরমাণু হইতেই অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষতার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির উৎপত্তি বিবৃত করিয়াছেন। ফলে মানব জড় প্রকৃতির একটি অংশমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহার ভিতর চেতনা ও আত্মজ্ঞান কিরূপে কোথা হইতে আসিল, স্পেন্সার তাহা বলিতে পারেন না।[৫১]

স্পেন্সারের নীতিবিদ্যা তাঁর দর্শন থেকে আলাদা নয়। স্পেন্সার জড়বাদী। তিনি জীবনকে জড়ের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর নীতিতত্ত্ব এর ব্যতিক্রম নয়। বরকতুল্লাহর মতে "হার্বাট স্পেন্সার মানুষের সহজ ধর্ম্মকে হারাইয়া ফেলিয়া তাহার নৈতিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।"[৫২] স্পেন্সারের নীতিতত্ত্বে মানবিক গুণাবলি কম। যান্ত্রিকভাবে তিনি মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা করেছেন। সে কারণে স্পেন্সারের নীতিতত্ত্বকে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "হার্বাট স্পেন্সারের নীতিশাস্ত্র ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একই।"[৫৩] শরীরের সুখকেই স্পেন্সার সর্বসুখ বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁর এই সুখ যান্ত্রিক স্থূল সুখ। স্পেন্সার বিবর্তনবাদকে উপযোগবাদের সাথে যুক্ত করেছেন, বিবর্তনের ধারণার সাথে 'আনন্দ' এবং 'উপযোগী আবেগ' -এর ধারণাকে যুক্ত করে।[৫৪] স্পেন্সারের এই মতবাদও বরকতুল্লাহ সমর্থন করেননি।

---

[৫০] রাশিদা আখতার খানম, ''স্পেন্সারের নৈতিক বিবর্তনবাদ'', নীরুকুমার চাকমা (সম্পাদিত), *দর্শন ও প্রগতি* পঞ্চম বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা, জুন ১৯৮৮, পৃ. ৯

[৫১] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ- *মানুষের ধর্ম্ম*, পৃ. ২৭, ২৮

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৫৪] রাশিদা আখতার খানম, ''স্পেন্সারের নৈতিক বিবর্তনবাদ'', নীরুকুমার চাকমা (সম্পাদিত), *দর্শন ও প্রগতি*, পৃ. ১১

হার্বার্ট স্পেন্সারের নীতিশাস্ত্রের সমালোচনার পর মোহম্মদ বরকতুল্লাহ জন স্টুয়ার্ট মিলের মতবাদের সমালোচনা করেছেন। মিলের মতে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁর মতে স্বাস্থ্য একটা গৌণ লক্ষ্য। সুখ বৃদ্ধি করাই নীতিশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। মিলের সুখবাদের সমালোচনা করে বরকতুল্লাহ লিখেছেন, "যে মানব শুধু ঐহিক সুখকেই লক্ষ্য জানিয়া সাধনা করে সে যেমন ভ্রান্ত, মিল জীবনের অন্তরকার সত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভোগের দিকে লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করায় তেমনি ভ্রমে পড়িয়াছেন।"[৫৫] মিলের নীতিতত্ত্বের সমালোচনা করে বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

> মিল ভুলিয়া গিয়াছেন মানুষের ভিতরকার সেই শাশ্বত সত্য, সেই বিশ্বপ্লাবী প্রেরণা, যাহা প্রবঞ্চণা জানে না, সুখ-দুঃখের কড়া ক্রান্তি গণনা বুঝে না, পড়ন্ত জীবনের ভিতর দিয়া, জীবের আকাঙ্ক্ষা উদ্যমের ভিতর দিয়া উচ্চ হইতে আদর্শের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষ সেই শাশ্বতের পবিত্র স্পর্শে অমৃতের সন্তান বলিয়া গৌরবান্বিত। গমন পথে তাহাকে স্থগিত করিয়া এভাবে সুখ ও ভোগের উপলখণ্ড সংগ্রহে নিয়োজিত করাতে তাহার জীবনের কোন ধর্ম্ম, কোন সার্থকতা সম্পাদিত হয়।[৫৬]

মানুষের অন্তরের ধর্মের কথা বরকতুল্লাহ ঘোষণা করলেও শেষ বিচারে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেই হার্বার্ট স্পেন্সার এবং মিলের নীতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

> ধর্ম্মকে বাদ দিয়া নীতি যে দাঁড়াইতে পারে না স্পেন্সার ও মিলের নীতিশাস্ত্রের দৈন্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের কথা আমরা বলিতেছি না। মানুষের যাহা অন্তরের ধর্ম্ম, মানুষের জীবনের ভিত্তিভূমি নিষিক্ত করিয়া যে শাশ্বত প্রেরণা প্রবাহিত হইতেছে এবং যাহাকে জীবনের সর্ব্বাঙ্গে স্ফুট করিয়া তোলাতেই জীবনের সার্থকতা, - সেই চিরন্তন সত্যকে বাদ দিলে শুধু নীতিশাস্ত্র কেন, কোন শাস্ত্রেরই লক্ষ্য ও গতিপথ স্থির থাকিতে পারে না। সমাজনীতি বল, রাজনীতি বল, ব্যবহার শাস্ত্র বল, আর গীতি-চিত্র কলা-কবিতা বল, সকলই জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বাঁচিয়া আছে। জীবনকে যদি তাহার স্বভাবগত ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও, তাহা হইলে জীবনের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে সকল শাস্ত্রই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে।[৫৭]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী নীতিদার্শনিকদের নীতিতত্ত্বের সমালোচনা শেষে তাঁর নীতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম থেকে নীতিকে তিনি পৃথকভাবে দেখেন নি। তাঁর এই ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়। তিনি মানুষের মঙ্গলের ধর্মের কথা ঘোষণা করেছেন। মানুষের মঙ্গলকে তিনি বড় করে দেখেছেন। তাঁর এই মানুষ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক সফিস্টদের মত ব্যক্তি মানুষ নয়। সার্বিক মানুষের মুক্তির কথাই তিনি বলেছেন। সার্বিক মানুষের মুক্তির জন্য তিনি শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সত্যযুগকে আমরা পশ্চাতে রাখিয়া আসি নাই, উহা আমাদের সম্মুখে,– নিশ্চয় আমাদের সম্মুখে। সে যুগে সারা বিশ্বে হয়ত এমন এক বিরাট গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে যেখানে

---

[৫৫] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, *মানুষের ধর্ম্ম*, পৃ. ৩১
[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২, ৩৩

একের অধিকার আর অন্যের দ্বারা নিষ্পেষিত হইতে পারিবে না।"[৫৮] বরকতুল্লাহ সার্বিক মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং মানুষের কল্যাণের জন্য গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপর আস্থা রেখেছেন। এদিক দিয়ে বিবেচনায় মোহম্মদ বরকতুল্লাহর নীতিতত্ত্ব উপযোগবাদ সমর্থন করে। স্থূল সুখবাদের সাথে বরকতুল্লাহর পার্থক্য এখানে যে তিনি ধর্মকে বিসর্জন দেননি। ধর্ম-কর্মকে সমর্থন করে তিনি উপযোগবাদী নীতিতত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ তিনি অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ নয়, সমাজের সব মানুষের সুখই সমর্থন করেছেন। এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্র তাঁর নীতিতত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। গণতন্ত্র অধিক সংখ্যক মানুষের শাসন। এই অধিক সংখ্যক মানুষের শাসন সমাজের সব মানুষের মধ্যেই সুখ আনে, সমাজে শান্তি স্থাপন করে। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদকেও তিনি গ্রহণ করেননি। বিচারবাদী নীতিবিদের নৈতিক মতবাদ সম্পর্কে বরকতুল্লাহ কিছু না বললেও তাঁর ধর্মকেন্দ্রিক নীতিতত্ত্বের সাথে বিচারবাদীর নৈতিকতত্ত্বের মিল পাওয়া যায়। উভয়ের মতবাদের মধ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ছাপ রয়েছে। উভয়ের বিশ্বাস এবং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বিশ্বাসের স্থলে তারা প্রায় কাছাকাছি। সব বিচার শেষে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর নীতিচিন্তাকে ধর্মকেন্দ্রিক মানবিক নৈতিক মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

সমাজচিন্তা

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ দার্শনিক এবং সাহিত্যিক। তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধ এবং সাহিত্যের মধ্যে সমাজচিন্তার ছাপ স্পষ্ট। উপনিবেশিক শাসন কাঠামোর ভেতরে বরকতুল্লাহ বড় হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর চিন্তার জগৎ পরিপুষ্ট হয়েছে। মার্কসবাদ তখন প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম চিন্তাশীল মানুষের মনে এসব নাড়া দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের মনন জগতে ধর্ম একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এসময় ধর্মের মর্ম কথাকে বাদ আচার আনুষ্ঠানিকতাই কতক ক্ষেত্রে বেশি প্রধান্য পেয়েছে। ফলে ধর্মের নামে অধর্ম, কুসংস্কার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা সমাজের ভেতরে জমে কুসংস্কার দূর করে মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন একটি যৌক্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বরকতুল্লাহর সমাজচিন্তাও এর থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তিনি সমাজের একজন ক্রিয়াশীল মানুষ। সমাজের, রাষ্ট্রের

[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় তাঁর সমাজচিন্তার মূল উপজীব্য বিষয়। বিজ্ঞান এবং আধুনিক সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বরকতুল্লা তাঁর সমাজচিন্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রথমে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সমাজে বৈষম্য যে কমিয়ে আনা সম্ভব নয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর তিনি ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতবাদ দিয়ে যে মানব কল্যাণ সম্ভব নয় তাও বর্ণনা করেছেন। যুগে যুগে মানুষ সাম্যবাদের কথা বলেছে। যখন থেকে মানব বৈষম্যের শুরু তখন থেকেই মানুষ সাম্যের কথাও বলছে। দুর্বলকে রক্ষা করার জন্যই সাম্য। ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ প্রথম সাম্যের কথা বলেছেন। সৎ জীবনযাপন এবং অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ না করার কথা বলে বুদ্ধ সাম্যের কথাই বলেছেন। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ গৌতম বুদ্ধের প্রশংসা করে লিখেছেন, "গৌতম বুদ্ধ অহিংসার ভিতর দিয়া এক প্রকার সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কাহাকেও হিংসা না করা, কাহারও ক্লেশের কারণ না হওয়া, এই যে একটা জীবন প্রণালী, ইহাও এক প্রকার সাম্য।"[৫৯] গৌতম বুদ্ধের সাম্য চিন্তার প্রশংসা করলেও তিনি ইসলামকে বৌদ্ধ ধর্মের উপর স্থান দিয়েছেন।

সাম্যবাদের প্রশংসা করলেও তিনি মার্কসবাদ সমর্থন করেননি। সমাজের মধ্যে ধন বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য মার্কসের অবদানকে তিনি স্বীকার করেছেন। মার্কসবাদ গ্রহণ না করলেও বরকতুল্লাহ সাম্যবাদের পক্ষে কথা বলেছেন। 'সাম্যবাদ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "বিশ্বসাহিত্যে সাম্যবাদ একটী নুতন কথা নহে। মানুষের মন যখন হইতে সমষ্টির কল্যাণকে ছাড়াইয়া ব্যক্তির কল্যাণকে তাহার স্থানে আসন দান করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই সাম্যের আদর্শ সমাজের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে।"[৬০] পুঁজিবাদের সমর্থক তিনি ছিলেন না। আবার পুঁজিবাদকে একেবারে বর্জন করেননি। পুঁজিবাদের কল্যাণকর দিকগুলো তিনি গ্রহণ করেছেন।

সাম্যবাদের সংগ্রামের ইতিহাস প্রাচীন। ধন বৈষম্য থেকেই সাম্যবাদের সৃষ্টি। সৃষ্টির প্রথম যুগে দুর্বল শক্তিহীন মানুষের কোনো মূল্য ছিল না। সবল শক্তিমান মানুষ দুর্বলকে শাসন করতো। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> মানব সমাজের প্রাথমিক যুগে নিম্নস্তরের মানুষগুলির জীবনের কোন মূল্য ছিল না। যাহারা শক্তিমান ছিল, বাহুবলে অপর সকলকে পরাভূত করিতে পারিত, তাহাদের কল্যাণ, তাহাদের স্বার্থ-সুবিধাই ছিল অপর সাধারণের কাম্য। তারপর ক্রমে যখন শ্রেষ্ঠ মানুষের সংখ্যাও অনেক হইল, তখন তাহাদের দ্বারা একটা স্বতন্ত্র স্তর গঠিত হইল, অভিযাত সম্প্রদায়। আর যাহারা দুর্বল, তাহারা রহিল নিম্নে, তাহাদের সবাইকে লইয়া গঠিত হইল আর এক স্তর ; ইহারা হইল শ্রমিক সম্প্রদায়।[৬১]

---

[৫৯] *মোহম্মদ বরকতুল্লাহ-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)*, পৃ. ৪২৪
[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩
[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ মনে করেন কোনো মতবাদই পূর্ণ নয়। অসম্পূর্ণ মতবাদ দিয়ে সমগ্র মানবের কল্যাণ সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "যাহা আদর্শ, তাহা কখনও সম্পূর্ণ হয় না; বাস্তব হইয়া গেলে উহা আর আদর্শরূপে থাকিতে পারে না। সাম্যও একটা বিরাট আদর্শ ; উহা কখনও বিশেষভাবে বাস্তবতায় পরিণত হয় নাই।"[৬২] বরকতুল্লাহ মনে করেন বৃহত্তর আদর্শের বাস্তবায়নের জন্যই সমাজের পুনর্গঠন করতে হয়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "সমাজের পুনর্গঠন সেইখানেই সার্থক যেখানে উহা বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই হইবে উহার লক্ষ্য।"[৬৩]

মার্কসবাদ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বরকতুল্লাহ বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কথা বলেছেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও তিনি সমর্থন করেননি। রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন চিন্তা করার শক্তি লোপ পাবে এমন অভিমত ছিল বরকতুল্লাহর। তিনি লিখেছেন, "যেখানে মানুষ মাত্রই রাষ্ট্রের মজুর, উদরান্ন বা রোগশোকের বাবদ ষ্টেটই যেখানে তাহাদের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে, কেহকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না, সেখানে স্নেহ মায়া প্রীতি বা মহত্ব বিকাশের ক্ষেত্র কোথায়?"[৬৪] বরকতুল্লাহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের মানবিক সম্পর্কগুলো বিপন্ন হওয়ার যে আশঙ্কা করেছিলেন বাস্তবে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা ঘটে নাই। সমাজতন্ত্র যান্ত্রিক নয়। এটি ছিল শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা করার মতবাদ। যা বরকতুল্লাহ সাম্যবাদ প্রবন্ধে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি সাম্যবাদের উপর আস্থা রাখলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর আস্থা ছিল না।

মিল বেনথামের উপযোগবাদ তিনি গ্রহণ করেননি। বৃহত্তর মানুষের কল্যাণের কথা তিনি বলেছেন বৃত্তের ভেতরে থেকে। ইসলামের জীবন বিধানের মধ্যেই তিনি বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণ দেখেছেন। তাঁর বৃত্ত ছিল তাঁর চারপাশের পরিবেশ, সমাজ এবং ইসলাম। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেছেন কিন্তু বিপ্লবী চেতনাকে সমর্থন করেননি। বিপ্লবী তিনি ছিলেন না। সরকারি চাকরি করতেন। একদিকে তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করতে চেয়েছেন বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের জন্য। আবার তিনি বৃত্তের ভেতর থেকে ইসলামী চেতনার কথা বলেছেন। *কারবালা*, *নবীগৃহ সংবাদ* গ্রন্থ ইত্যাদি তারই প্রমাণ বহন করে।

বরকতুল্লাহ ধর্মকে যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেননি কিন্তু সাম্যের কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মানুষের সমাজ-জীবনে সাম্যনীতির এই যে ব্যক্তিত্বহরণকারী সর্বনাশা অভিসম্পাত নামিয়া আসিয়াছে, ইহা ধর্মের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযান হইলেও, ইহা আসিয়াছে ধর্মের অসারতার জন্য, পরন্তু ধর্মকে যাহারা এতকাল অসাধু উদ্দেশ্যে প্রয়োগ

---

[৬২] প্রগুক্ত. পৃ. ৪২৪
[৬৩] মোহম্মদ বরকতুল্লাহ- *মানুষের ধর্ম*, পৃ. ৮৭
[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

কারিয়াছে, তাহাদের পাপে।”[৬৫] ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বরকতুল্লাহর অবস্থান ছিল। তাঁর সাম্যবাদে ধর্ম থাকবে। ধর্ম থাকলে ধর্ম ব্যবসায়ীদের থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সমাজ-রাষ্ট্র থেকে কিভাবে ধর্ম ব্যবসায়ীদের আলাদা করা হবে তার বর্ণনা বরকতুল্লাহর সমাজ চিন্তায় পাওয়া যায় না।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ মুসলিম পরিবারে জন্ম। ধর্মীয় পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন। দার্শনিক প্রবন্ধ লিখে জীবন শুরু করলেও ইসলাম ধর্মের মূলনীতি তিনি কখনই বিসর্জন দেন নাই। ইসলাম ধর্মের ভেতরে থেকেই তিনি মানব কল্যাণের কথা বলেছেন। তাঁর সাম্যবাদ বিজ্ঞান মনস্ক ছিল না। তিনি যে সাম্যবাদের কথা বলেছেন তা ছিল সমতাবাদ। সভ্যতার শুরুতে দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য মানুষ সমতার কথা বলেছে। বিংশ শতাব্দীতে এই সমতা নীতি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া মোহম্মদ বরকতুল্লাহর সাম্যবাদ ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ভ্রাতৃত্বের নীতি থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

উপসংহার

বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রথম দর্শনের পরিভাষা এবং পাশ্চাত্যের দার্শনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় দর্শনচর্চা করেছেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের গণ্ডি অতিক্রম করে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করার মধ্যে দিয়ে মহাজাগতিক রহস্য অনুসন্ধান করেছেন। জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা দর্শনের মূল ভিত্তি। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ দর্শনের এই মৌলিক ভিত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় মোহম্মদ বরকতুল্লাহর মৌলিক অবদান রয়েছে। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ জ্ঞানতত্ত্বের নাম দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি। তাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তির অপর নাম স্বজ্ঞা (intuition)।

জ্ঞান সম্পর্কে স্বজ্ঞাবাদ সমর্থন করার আগে তিনি বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের অপূর্ণতাগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, বাস্তব জগৎ মায়া বা অবাস্তব নয়। বুদ্ধিবাদের সমালোচকরা তিনি বলেছেন জীবন শুধু বুদ্ধি দিয়ে চলে না। ইউরোপীয় দর্শনের বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনা করে তিনি স্বজ্ঞাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঈশ্বর, আত্মা, মন জগৎ ও জীবন, জড়প্রকৃতি ও মনোজগৎ, ইহলোক ও পরলোক ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্ন বরকতুল্লাহর অধিবিদ্যায় স্থান পেয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলনেই মুক্তি। পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলন, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার মিলন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলনের কথা মোহম্মদ বরকতুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। তিনি মন এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে মন এবং আত্মা এক নয়। তিনি মনকে আত্মার উপর স্থান দিয়েছেন। মূল্যবিদ্যায়

---

[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। নীতিচিন্তায় ধর্মকে সমাজ থেকে ভিন্ন করে দেখেননি। ধর্মকে তিনি যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সমাজচিন্তাতে দেখা যায়, সাম্যবাদকে তিনি গ্রহণ করলেও সমাজতন্ত্রী ছিলেন একথা বলা যায় না। ইসলামে সাম্য, মৈত্রি, ভ্রতৃত্বের আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হন নাই।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর জীবন দর্শনকে দুই পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম জীবনে তিনি দর্শনের প্রতি ছিলেন অনুরক্ত। শেষ জীবনে ধর্ম দিয়ে প্রভাবিত। এখানে যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসই প্রবল। জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় এর ছাপ স্পষ্ট। তিনি মনে করেন, মানুষের ধর্ম সত্যিকারের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সসীমের সঙ্গে অসীমের সহিত একাকার হওয়া। অসীমের সহিত সসীমের মিলনেই তিনি মানব মুক্তি হিসেবে দেখেছেন। ফলে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর প্রথম জীবনের দর্শনচিন্তায় ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। শেষ জীবনে তিনি ধর্ম নির্ভর দর্শন চর্চা করেছেন। এজন্য তাঁর শেষ জীবনের দর্শনচিন্তাকে ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দর্শন হিসেবে অভিহিত করা যায়। তবে বাংলাদেশে দর্শন চর্চায় মোহম্মদ বরকতুল্লাহর গুরুত্ব এখানে যে তিনিই প্রথম বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে দর্শনের পরিভাষা এবং দার্শনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চা শুরু করেছিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বর

জীবন ও কর্ম

আরজ আলী মাতুব্বরের (১৩০৭-১৩৯২) জন্ম বরিশাল শহর থেকে এগারো কিলোমিটার উত্তর পূর্বে চরবাড়িয়া ইউনিয়নের লামচরি গ্রামে। লামচরি গ্রামটি কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কথিত আছে ১১৬২ বঙ্গাব্দ থেকে এই গ্রামে মানববসতি শুরু হয়। লাকুটিয়ার রায়বাবুদের জমিদারের অধীনে ছিল লামচরি মৌজা। "গ্রামটি ছিল খুবই নীচু, বছরের অধিকাংশ সময়ই থাকত জলমগ্ন। তাই এর নামকরণ হয়- 'লামচরি' অর্থাৎ নীচু চর।"[১] নীচু চর স্থানীয় উচ্চারণে হয়ে যায় লামা চর। লামা চর থেকে লামচরি। নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত চরাঞ্চল। রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ না থাকাই স্বাভাবিক। প্রকৃতির বিরূপ অবস্থায় লামচরির বাসিন্দারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসতি গড়ে তুলেছিল। আরজ আলী মাতুব্বরের পরিবার এর মধ্যেই ছিল। জন্ম এবং পরিবারের বর্ণনা দিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

> বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে ৩ পৌষ, ১৩০৭ সালে আমার জন্ম। চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান (১৩১১)। অতঃপর বাকি করে জমি ও কর্জ-দেনার দায়ে বসত ঘর খানা নিলাম করিয়ে নেন সদাশয় জমিদার ও মহাজনরা ১৩১৭ ও ১৮ সালে। তখন স্বামীহারা, বিত্তহারা ও গৃহহারা হয়ে মা আমাকে নিয়ে ভাসতে থাকেন অকূল দুঃখের সাগরে। সে সময় বেঁচে থাকতে হয়েছে আমাকে দশ দুয়ারের সাহায্যে।[২]

আরজ আলী মাতুব্বর জন্ম তারিখ সম্পর্কে লিখেছেন, "মা বলেছেন আমার জন্ম ১৩০৭ সালের ৩ রা পৌষ।"[৩] সে সময় বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়নি। মা-বাবা যে তারিখ বলতেন অথবা স্কুলে নিবন্ধীকরণের সময় যে তারিখ লেখা হতো তাই জন্ম তারিখ হিসাবে ধরে নেয়া হতো। কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের স্কুল সার্টিফিকেটে জন্ম তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি। প্রকৃত জন্ম তারিখ এটি নয়।[৪] মওলানা ভাসানীর জন্ম তারিখ তিনটি পাসপোর্টে তিন রকম। অর্থাৎ প্রকৃত জন্ম তারিখ তিনি জানতেন না। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষ তাঁর জন্ম তারিখ জানতেন না। এ নিয়ে তাঁদের কোন সমস্যা হয়নি।

---

[১] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৯

[২] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ১৯০

[৩] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৩৯

[৪] আবৃত্তি সংগঠন স্বননের উদ্যোগে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের প্রথম জন্মদিন আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ কলাভবনের ১৫০ নং কক্ষে। এই অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্লাইড কেমিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং হাসান আজিজুল হকের বন্ধু অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম দাবি করেন আর যাই হোক ২ ফেব্রুয়ারি হাসানের জন্ম দিন নয়। হাসান আজিজুল হক শহীদুল ইসলামের বক্তব্য মেনে নিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে গবেষক উপস্থিত ছিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বরের পূর্ব পুরুষের বাড়ি বরিশাল জেলার কালিকাপুর ও ঝর্ণাভাঙা গ্রামে।[৫] আরজ আলীর পিতামহ আমান উল্লা মাতুব্বর লামচরি মৌজায় নতুন জেগে ওঠা চরে এসে বসতি স্থাপন করেন। অনেকেই তখন লামচরিতে এসে বাড়িঘর নির্মাণ করেন। আরজ আলী মাতুব্বরের পিতা এন্তাজ আলীর সময় চরটি জনবসতিপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়। কৃষিকাজ ছিল এই চরের বাসিন্দাদের প্রধান পেশা। এন্তাজ আলী মাতুব্বর কৃষি কাজ করতেন। আরজ আলী মাতুব্বর উত্তরাধিকার সূত্রে কৃষি জমি পেয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি আরজ আলী মাতুব্বর ধরে রাখতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর খাজনা দিতে না পারায় জমি নিলামে ওঠে। থাকার টিনের ঘরটিও নিলামে বিক্রি হয়ে যায়, তখন আরজ আলী মাতুব্বরের বয়স মাত্র চার বছর। চাষের জমি হাতছাড়া হয়ে গেলেও বাড়ি ভিটা ছিল আরজদের দখলে। আরজ আলী মাতুব্বরের মা প্রতিবেশীদের সাহায্য সহযোগিতায় ভিটার উপর ঘর নির্মাণ করেছিলেন। কৃষিজমি ও থাকার ঘর হারিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন সংগ্রামে নতুন মাত্রা যোগ হয়। প্রতিদিনের জীবন সংগ্রাম। খাদ্যের জন্য সংগ্রাম। বেঁচে থাকার সংগ্রাম। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম।

দৃঢ়চেতা আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন সংগ্রাম সংঘাত ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিকে তিনি হাসিমুখে বরণ করেছেন। প্রতিকূল পরিবেশের জন্য কখনও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কাছে মাথা নত না করে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, সমাধান করেছেন। সত্যের সন্ধান করেছেন। "ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী এবং লাজুক স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। মৃদুকণ্ঠে, ধীরে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতেন, যুক্তি উপস্থাপন করতেন। প্রতিপক্ষকে কখনোই হেয়জ্ঞান করতেন না। মনোযোগী শ্রোতা হয়ে অন্যের বক্তব্য শুনতেন। পরমতসহিষ্ণুতা তাঁর চরিত্রের বিশেষ একটি দিক ছিল।"[৬] তিনি কৃষিকাজ করতেন। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত সবধরনের কাজই তিনি করতেন। বসে থাকার মানুষ তিনি ছিলেন না। নিজের হাতে টিনের ঘর তৈরি করেছেন, জাল বুনে মাছ ধরেছেন, মাছ বিক্রি করেছেন, কাপড় বুনেছেন। নিজের জীবন সংগ্রামের বর্ণনা দিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

> জীবনের যাবতীয় গৃহ ও গৃহসরঞ্জামাদি নিজেই তৈরি করেছি ও করছি, এমনকি লাঙ্গল-জোঁয়াল এবং নৌকাও। আমার সংসার জীবনে কখনো কোন কাজ 'জানিনা' বলে অন্যের শরণাপন্ন হইনি। অথচ অর্থ-উপার্জনের জন্য কখনো অন্যের কাজ করিনি। আমার ছুতার কাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল-অর্থোপার্জন বা অর্থ বাঁচানো নয়, স্বাবলম্বী হওয়া। ফলতঃ যে কোন ধরনের কাজ - 'করতে জানা' এবং তা 'নিজ হাতে করা', এ দুটোতেই আমার মনের আনন্দ। রশি পাকানো, শিশি-বোতলের গলে 'যোত' লাগানো এমনকি ঝাঁটা নির্মাণকেও আমি গৌরবের কাজ মনে করি।[৭]

---

[৫]আইয়ুব হোসেন, *আরজ আলী মাতুব্বর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩
[৬]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
[৭]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৫৪

জমি মাপার কাজে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জমি মাপার কাজকে কৃষি কাজের সঙ্গে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। আদর্শিকভাবে তাঁর বিরোধীরাও এ-কাজের জন্য তাঁর উপর নির্ভর করতো। জাল বুনে মাছ ধরা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে মৎস্য শিকার করেছি। কিন্তু বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি 'জাল'। অনেকে মৎস শিকারে আগ্রহী হ'লেও শিকার-যন্ত্রনির্মাণে পারদর্শী নয়। হয়ত উহা কিনে নেয়, নতুবা অন্যকে দিয়ে বানিয়ে নেয়। কিন্তু মৎস শিকার অপেক্ষাও যন্ত্র নির্মাণে আমার আগ্রহ বেশি।
>
> ঝাকী, মইয়া, খোট, খুতুনী ইত্যাদি কতিপয় জাল আমাদের গ্রামের নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্র। কাজেই ওগুলোর বয়ন ও ব্যবহার প্রণালী সহজেই শিখতে পেরেছি। কিন্তু কতিপয় জাল বুনা শিখতে হচ্ছে আমাকে দূরাঞ্চলে গিয়ে।[৮]

আরজ আলী মাতুব্বর জীবনের সব কাজ নিখুঁতভাবে করেছেন। গ্রামে থেকেও তাঁর মন ছিল আধুনিক। জাল বোনা, ছুতারের কাজ, জমি মাপার কাজ থেকে শুরু করে পাখা তৈরি, ডাইনামো তৈরি পর্যন্ত করেছিলেন। নতুন কোন কিছু জানা এবং শেখার বিষয়ে তাঁর আগ্রহের শেষ ছিল না। শিখতে হবে এই ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনের অঙ্গীকার তা যে শিক্ষাই হোক।

প্রান্তিক মানুষ আরজ আলী মাতুব্বরের সঙ্গে ছিল নাগরিক মানুষের ঘনিষ্ঠতা। তিনি ঢাকায় আসতেন। কাজ শেষে আবার প্রান্তজনের কাছে ফেরত যেতেন। আরজ আলী মাতুব্বরের "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সাথে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দর্শন বিভাগের অনেক শিক্ষকের সাথে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। একবার দর্শন বিভাগে গেলে একজন শিক্ষক ড. কাজী নূরুল ইসলাম তাঁকে অনুরোধ জানান ছাত্রদের একটি ক্লাস নিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে। প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্লাস নেন তাঁদের উপর্যুপরি অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে।"[৯] ঢাকা কেন্দ্রিক মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের যোগাযোগ ছিল। এ সম্পর্কে সাইদুর রহমান লিখেছেন,

> প্রায় দু'দশক আগে ঢাকার মিলন সংঘের এক সভায় এক মহান ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মিলন সংঘ ঢাকার বিশিষ্ট প্রগতিশীল চিন্তাবাদীদের সংগঠন। এ সংগঠনে একজন পল্লীবাসীকে উপস্থিত দেখে আমি প্রথমে বিস্মিত এবং পরে অতিমাত্রায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর সাথে আলাপ করে বুঝতে পারলাম তিনি একজন প্রগতিবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাঁর মন মুক্ত এবং চিন্তা প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী। আমার বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষালাভ না করেও যথার্থ দার্শনিক হওয়া যায়। এমনি আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আরজ আলী মাতুব্বর। তাঁর বাড়ি বরিশাল। তিনিও বেকনের মত আমাদের মনকে কুসংস্কারমুক্ত করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এবং যেসব

---

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[৯] আইয়ুব হোসেন, *আরজ আলী মাতুব্বর*, পৃ. ৪১

কুসংস্কার দানা বেঁধে যুক্তিকে পঙ্গু করে দিয়ে আমাদের মনকে মোহাচ্ছন্ন করেছে, তার একটি তালিকাও তিনি তৈরি করেছেন। তালিকাটি অনন্য বটে।[১০]

আরজ আলী মাতুব্বরকে নাগরিক সমাজ প্রথমে স্বীকৃতি দিতে চায়নি। অনেকের ধারণা ছিল শহরের কোন বুদ্ধিজীবী ছদ্মনামে লিখছেন। তথাকথিত নাগরিক সমাজের এই দাবি টিকেনি। কিছুদিনের মধ্যেই লামচরির আরজ আলী মাতুব্বর নাগরিক সমাজের মধ্যে স্থান করে নেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, "আরজ আলী মাতুব্বরের সঙ্গে প্রথম যখন দেখা আমার তখন একটা প্রশ্ন জেগেছিল। নামটা কি তাঁর নাকি ছদ্মনাম প্রচ্ছন্ন কোনো ব্যক্তির? কিন্তু সে-জিজ্ঞাসায় কোনো জোর ছিল না, কেননা মানুষটিকে তো সামনাসামনিই দেখছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকর্মী কাজী নূরুল ইসলামের সঙ্গে এসেছিলেন, একটি বই নিয়ে।"[১১] আরজ আলী মাতুব্বরের সৃষ্টিকর্ম নিয়েও নাগরিক সমাজের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মত অনেকের কাছেই তাকে পরীক্ষায় উৎরাতে হয়েছে। এ নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরের কষ্টবোধ ছিল। কিন্তু তিনি হতাশ হননি। তাঁর আত্মসম্মান ছিল। আত্মসম্মানের কারণে তিনি বাল্যকালে বয়াতী হিসাবে বেড়ে ওঠার পাঠ সমাপ্ত করেছিলেন।[১২] আত্মাবিশ্বাসী ছিলেন তিনি। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

আজীবনকালের ভিক্ষা ও চুরি করা সম্পদটুকু মজুদ করে রাখা নিষ্ফল মনে করে জনগণের কল্যাণ কামনায় তা সাধারণ্যে দান করে দেবার প্রয়াসী হয়ে, তা দান করলাম *সত্যের সন্ধান* ও *সৃষ্টি রহস্য* নামক দু'খানা ক্ষুদ্র পুস্তকের মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রাজধানীর বুদ্ধিজীবী মহলের অনেকেই বই দু'খানা আমার দান বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁরা অনেকেই বলেছেন যে, পল্লীবাসী কৃষকরা নিরক্ষর হলেও সাধারণত ভালো মানুষ এবং বেশিরভাগই ঈমানধনে ধনী। তাদের মধ্যে এমনতর আনাড়ি লোক ও এ সমস্ত দানসামগ্রী থাকা অসম্ভব। এই বই নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিজীবী লোকের লেখা। হয়তো তিনি ধুরন্ধরী করে নাম দিয়েছেন একজন কৃষকের। বই দু'খানা লেখা আমার পক্ষে সম্ভব কি-না, তা যাচাই করার জন্য প্রাক্তন ডি. পি. আই. জনাব ফেরদাউস খান তো তাঁর ধানমন্ডির বাসায় আমাকে আমন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে রীতিমত পরীক্ষাই নিলেন ৩.১.১৯৭৬ তারিখে।[১৩]

আরজ আলী মাতুব্বর গ্রামে জন্মেছিলেন। গ্রামে থেকেছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন গ্রামে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, "আরজ আলী মাতুব্বর এই দরিদ্র, অল্পে সন্তুষ্ট ও অবরুদ্ধ সমাজেরই মানুষ। তিনি গ্রামেই থাকতেন। বরিশাল শহরে প্রায়ই গেছেন, তবে থাকেন নি এবং রাজধানী ঢাকায় এসেছেন কদাচিৎ। বৃত্তের ভেতরেই ছিলেন আসলে। কিন্তু সেখানে থাকতে সম্মত হন নি। বেরিয়ে এসেছেন মানসিকভাবে।"[১৪] গ্রামে

---

[১০]সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ১০

[১১]সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনজিজ্ঞাসা", *আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক গ্রন্থ*, মোজাফ্ফর হাসেন (সম্পাদিত), বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪৩

[১২] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২

[১৩]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৭২, ২৭৩

[১৪]আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, ভূমিকা, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

থেকেও নাগরিক জীবনের মত সাজানো গোছানো মাতুব্বরের জীবন। জীবনের কোথাও কোন ছেদ রেখে যান নাই। জীবনে অপূর্ণতা তাঁর ছিলনা। জীবনের প্রতিটি ছন্দ নিজের মত করে গড়েছেন। কারো কাছে হাত পাতেন নি। তবে একটি বইয়ের জন্য চৌদ্দ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন। এ ঘটনা এক দিন নয়, দু'দিনও নয়। জীবনের অনেকটা সময়ই একাজ করেছেন। হাত পেতেছেন বইয়ের জন্য। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বরিশাল থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব প্রায় ৭ মাইল। কাজেই যে কোন একখানা বই পড়ার জন্য আমাকে হাঁটতে হয়েছে প্রায় ১৪ মাইল। কেননা তখন কোনোরূপ যানবাহনের ব্যবস্থা ছিলনা আমাদের বরিশালে যাতায়াতের জন্য, নেই আজো। আর এভাবে বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেছি ১৩৪৪ থেকে ১৩৭৯ সাল পর্যন্ত।"[১৫] জ্ঞান এবং অর্জন এ দু'টোর ব্যাপারে আরজ আলী মাতুব্বরের আগ্রহের শেষ ছিল না। বরিশাল থেকে ঢাকায় আসতেন বিদ্বৎ সমাজের সঙ্গে দেখা করার জন্য। আবার লামচরিতে ফেরত যেতেন।

আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনে পারি না পারবো না এ শব্দগুলো প্রযোজ্য নয়। কৃষি কাজের পাশাপাশি জমি মাপার কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অর্থ উপার্জন করেছেন। নিজের সমাধিও তিনি নিজেই নির্মাণ করেছেন। চক্ষু দান করেছেন। শরীর দিয়ে গেছেন বরিশাল মেডিকেল কলেজে। সমাধির মধ্যে কাঁচের বয়ামের মধ্যে রয়েছে চুল, দাঁত ও নখ। ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যা উপার্জন করেছেন তা সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। ষাট বছর পরের উপার্জন দিয়ে মানুষের সেবা করেছেন। মানুষের কল্যাণে আরজ আলী মাতুব্বর, *সৃষ্টির রহস্য* ও *সত্যের সন্ধান* নামে দুটি গ্রন্থ রেখে গেছেন, গড়ে তুলেছেন লাইব্রেরি। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন।

আসাদ চৌধুরী বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচ্ছদ নামক এক অনুষ্ঠানে আরজ আলী মাতুব্বরকে দর্শকদের সামনে হাজির করেছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ক্যামেরা নিয়ে বরিশালে তাঁর গ্রামের বাড়ি লামচরি গিয়ে তার নানা রকমের, ধরনের ছবি তুলে নিয়ে এলাম। আমি সম্পাদনার আগে এর কিছুই দেখিনি - পরে যখন টিভি সেট এ দেখি, প্রথম দৃশ্যই ছিল, এই বয়সেও আরজ আলী মাতুব্বর লাঙল বাইছেন। গরু দুটোকে পাচনের ঘা মারছেন অথবা জমি মাপ-জোঁক করছেন। তাছাড়া লিখছেন, পড়ছেন, চুল আঁচড়াচ্ছেন এসব নিয়ে ফুটেজ বোধহয় অনেক বেশিই ছিল।"[১৬]

---

[১৫]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৭

[১৬]আসাদ চৌধুরী ,"জ্ঞানের জন্য, মানুষের জন্য নিবেদিত একটি মানুষ ", *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), পৃ. ৬৮

আরজ আলী মাতুব্বরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না বললেই চলে। প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যয়ন করে তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন নাই। প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বর্ণমালা আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু যেভাবে পড়লে শিক্ষিত হওয়া যায় আরজ মাতুব্বর পড়েছেন সেভাবে। আরজ আলী মাতুব্বরের জন্মস্থান বরিশালের লামচরিতে সে সময় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। লামচরি চরের বর্ণনা দিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, "১৩৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এখানে কোন হাট-বাজার, দোকান-পাট বা কোনরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা। তবে মসজিদ ছিল কয়েকখানা।"[১৭] লামচরি গ্রামে স্কুল, কলেজ না থাকলেও শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় বিত্তবানেরা বাড়িতে মুন্সি রেখে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেন। এ-সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

> আমাদের গ্রামে নিয়মিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলেও মুর্দা জানাজা, ফাতেহা ও মৌলুদ পাঠ, বিবাহের কলেমা, তালাক পড়ানো ইত্যাদি কাজের জন্য কেহ কেহ বাড়িতে মুন্সি ধরনের আলেম রাখতেন। তাঁরা সকাল-বিকেল কর্তার ছেলে-মেয়েদের বাংলা ও আরবী পড়াতেন বা মুখেমুখে কলেমা, ছুরা-কেরাত ও নামাজ শিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ পাড়া প্রতিবেশির ছেলে মেয়েদেরও পড়াতেন। এজন্য কাউকে নিয়মিত বেতন দিতে হত না।[১৮]

লামচরি চরে জনবসতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম দিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল। মক্তব-মাদ্রাসা স্থানীয় প্রভাবশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরুর বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন,

> দক্ষিণ লামচরি নিবাসী কাজেম আলী সরদার সাহেব-মুন্সি তাহের আলী নামক ঐ রকম একজন মুন্সি রেখে ১৩১৯ সালে তাঁর বাড়িতে একখানা মক্তব খোলেন এবং গ্রামের লোকদের ছেলে-মেয়েগণকে সেখানে পড়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান, আমার মাকেও। মক্তবের বেতন ও পুস্তকাদি কিনে দিতে মা অপারগ বলে জানালে সরদার সা'ব বল্লেন যে, তিনি আমার বেতন নিবেন না এবং এবছর পুস্তকও আবশ্যক হবে না। কেননা এবছর তালপাতা ও কলা পাতায়ই চলবে। সিদ্ধ তালপাতা ও খাগের কলম নিয়ে মক্তবে যেতে শুরু করলাম।
>
> প্রথম দিনে মুন্সি সা'ব একটা ছুঁচালো লোহা দ্বারা তালপাতায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ এঁকে দিলেন এবং পড়া বলে দিতে লাগলেন। আমি অন্যান্য ছেলেদের সাথে পড়তে শুরু করলাম। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পড়তে-লেখতে বছর খানেক কেটে গেল।[১৯]

এই মক্তবের মুন্সি ছিলেন তাহের আলী। তাঁর বাড়ি ছিল মূলাদিতে। লামচরির মক্তব বন্ধ করে দিয়ে তিনি একদিন বাড়িতে গেলেন। মক্তবটি বন্ধই রইল। মক্তব বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের প্রাথমিক

---

[১৭] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *তৃতীয় খণ্ড* , পৃ. ৩৯, ৪০
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
[১৯] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৪০

শিক্ষা, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ আয়ত্তের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হল। আরজ আলী মাতুব্বরের শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয় মুন্সি আব্দুল করিমের মক্তবে। এ সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

> ১৩২০ সালে স্থানীয় মুন্সি আবদুল করিম সা'ব তাঁর শ্বশুর আব্দুল মল্লিকের বাড়ীতে আর একখানা মক্তব খোলেন এবং পাড়ার লোকদের কাছে ছাত্র ভর্তির আমন্ত্রণ জানান। ছাত্রদের মাথাপিছু বেতন ধার্য করলেন চার আনা। পাড়ার অনেক ছেলে মক্তবে যেতে শুরু করল। কিন্তু আমার যাওয়া হল না, কেননা মা আমার বেতন দিতে পারবেন না। একদা মুন্সি সা'ব আমাদের বাড়িতে এসে মাকে বল্লেন যে, আমাকে তাঁর মক্তবে পড়তে দিলে তিনি আমার বেতন নিবেন না এবং পারেনত কিছু সাহায্য করবেন। মা রাজী হলেন এবং আমি মক্তবে যেতে শুরু করলাম। এ হলো আমার শিক্ষা জীবনের দ্বিতীয় বছর। 'বানান' ও 'ফলা' লেখা শুরু হল কলা পাতায়।[২০]

এই মক্তব থেকেই আরজ আলী মাতুব্বর সীতানাথ বসাকের আদর্শলিপি পড়তে শিখেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মক্তবে আমার অল্প কয়েক দিনের পড়া লেখার ফল ভাল দেখে আমার জ্ঞাতি চাচা মরহুম মহব্বত আলী মাতুব্বর সাব দুআনা পয়সা দিয়ে আমাকে একখানা 'আদর্শ লিপি' বই কিনে দিলেন।"[২১] মাতুব্বরকে বাল্যশিক্ষা বই কিনে দিয়েছিলেন তাঁর ভগ্নিপতি মরহুম অবদুল হামিদ মোল্লা। মুন্সি আব্দুল করিমের মক্তবটি বন্ধ হয়ে গেলে মুন্সি আহমদ দেওয়ানের মক্তবে আরজ আলী মাতুব্বর কিছুদিন পড়াশুনা করেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> ১৩২৩ সালে আমার জ্ঞাতি চাচা মহব্বত আলী দেওয়ান সা'ব আহম্মদ আলী দেওয়ান নামক ভাসান চর নিবাসী একজন মুন্সি রেখে তাঁর বাড়ীতে একটি মক্তব খোলেন। আমি ঐ মক্তবে ভর্তি হলাম। এখানে আমার পাঠ্য ছিল ''মক্তব প্রাইমারী'' নামক একখানা বই এবং গণিতে করণীয় ছিল মিশ্র চার নিয়মের অংক। কিন্তু আমার পাঠ্য পুস্তক খানার মাত্র ''আট পৃষ্ঠা'' পড়া এবং ''মিশ্র যোগ'' অংক কয়েকটি কষা হলে মক্তবটি বন্ধ করে দেওয়ান সা'ব দেশে গিয়ে আর ফিরে এলেন না।[২২]

মুন্সি আহমদ দেওয়ানের মক্তবটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যে আরজ আলী মাতুব্বরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। এরপর স্কুলের বই দেখে ছবি এঁকেছেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন। আবার ফিরে এসেছেন।

বই পড়ার প্রতি আরজ আলী মাতুব্বরের অদম্য আগ্রহ ছিল। হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই পড়েছেন। বাদ যায়নি কাগজের ঠোঙ্গা পর্যন্ত। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আমার মনে বড় রকমের একটা আফসোস ছিল এই যে, তখনো আমি বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দে পড়তে পারতাম না, অনেক শব্দই বর্ণবিন্যাস করে পড়তে হ'ত। এতে যে কোন একটি বাক্য অবিরাম না পড়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ার ফলে ওর অর্থ দুর্বোধ্য হ'ত। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দে পড়বার জন্য। বই কেনার সম্বল নেই বলে এপাড়া ওপাড়ার ছেলেদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া বই

---

[২০]প্রাগুক্ত, পৃ : ৪০-৪১
[২১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
[২২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

> সংগ্রহ করে পড়তে লাগলাম, পড়তে লাগলাম - পথে পড়ে থাকা টুকরো কাগজ কুড়িয়ে, এমনকি লবণ বাঁধা ঠোঁঙ্গার কাগজও। কোন রূপ লেখা থাকলেই তা হ'ত আমার পাঠ্য। ওতে কি লেখা, কোন বিষয় লেখা, উহা পাঠে কোন জ্ঞানলাভ হ'ল কি-না ইত্যাদি প্রশ্ন ছিল আমার অনাবশ্যক। তখনকার আমার পড়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধু - স্বচ্ছন্দে পড়বার ক্ষমতা অর্জন করা।[২৩]

আরজ আলী মাতুব্বর মাতৃভাষা স্বচ্ছন্দে পড়তে এবং লিখতে পারতেন। ইংরেজি ভাষাও পড়তে পারতেন। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি পড়তে ও লিখতে শিখেছেন। ইংরেজি ভাষা না জানলে জ্ঞানার্জন যে সম্পূর্ণ হয় না এ সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর অবগত ছিলেন। বাংলাদেশ সোসিও-ফিলসফিক হিউম্যানিস্ট গিল্ড আয়োজিত সেমিনারে বক্তৃতায় আরজ আলী মাতুব্বর উল্লেখ করেছেন, ''ইংরেজি ভাষার সাথে আমার পরিচয় নেই মোটেই। কায়ক্লেশে সহজ বাংলা ভাষা পড়ার অভ্যাস করেছিলাম আমাদের গ্রামের একজন পুঁথি পাঠকের কাছে, মোক্তল হোসেন ও সোনাভানের পুঁথি পড়ে। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার কোন সুযোগ আমার হয়নি কখনো। বাংলা ভাষার বেলায় না বললেও, আপনারা আমাকে ইংরেজি-মূর্খ বলতে পারেন স্বচ্ছন্দে। আমার কোন কোন লেখায় দু'চারটে ইংরেজি শব্দ দেখতে পারেন, তা অন্যকে দিয়ে লেখানো।''[২৪] এই ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের বিনয়। তিনি ভাল বাংলা গদ্য লিখতেন। তাঁর লেখায় ভুল শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। অর্থহীন বাক্য তাঁর রচনার মধ্যে দেখা যায় না। ইংরেজি ভাষা তিনি জানতেন। ভুল ইংরেজি বলেছেন এমন দৃষ্টান্ত আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনে পাওয়া যায় না। চাকরি কিংবা অন্য কোন সুবিধার জন্য তিনি অধ্যয়ন করেননি। সত্যিকারে জানার আগ্রহ নিয়ে তিনি পড়েছেন। লিখেছেন মনের তাগিদ থেকে। তাঁর লেখার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। নিজে যা উপলব্ধি করেছেন, যা বুঝেছেন, লিখেছেন তার চেয়েও কম। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে পরিমিতি বোধের ছাপ স্পষ্ট। জটিল বিষয়কে সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বলার ভঙ্গির মধ্যে সরল সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। কিন্তু বিষয়বস্তু সরল নয়। বিষয়বস্তুর গভীরতা অনেক।

আরজ আলী মাতুব্বর বই পড়তেন। যে কোন বই তিনি পড়তেন। প্রথমদিকে জ্ঞানার্জন তাঁর মুখ্য বিষয় ছিল না। স্বচ্ছন্দে পড়ার অভ্যাস করার জন্যই পড়তেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "শৈশবে লেখাপড়া শেখার প্রবল আগ্রহ আমার ছিল, কিন্তু কোন উপায় ছিল না। উক্ত সামান্য বিদ্যার জোরেই চুরি করে করে পড়েছি, জয়গুণ, সোনাভান, জঙ্গনামা, মোক্তল হোসেন ইত্যাদি পুঁথি এবং ভিক্ষা করে পড়েছি তৎকালে বরিশালে পড়ুয়া ছাত্রদের পুরোনো পাঠ্যবইগুলো।"[২৫] বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে সাধারণত লাইব্রেরি নেই। কোন গ্রামে যদি লাইব্রেরির মত কিছু থাকে সেটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে গড়ে উঠেছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের অফিস থাকলেও সেখানে লাইব্রেরির মত কিছু নেই। অধিকাংশ উপজেলায় পাবলিক লাইব্রেরি থাকলেও

---

[২৩]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬, ৪৭
[২৪]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭০
[২৫]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

সেগুলো সময়মত খোলা হয় না। লামচরি গ্রামে বই পত্র-পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা না থাকাই স্বাভাবিক। আরজ আলী মাতুব্বরকে বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি গিয়ে বই পড়তে হয়েছে। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বরিশালের পাবলিক লাইব্রেরীর সহিত পরিচয় আমার শৈশব কাল হতে। তখন আমার বয়স দশ কি এগারো বছর। লেখতে ও পড়তে শিখিনি। অথচ লাইব্রেরীতে যেতাম প্রায়ই। বই-পুঁথি পড়ার জন্য নয়, তিমি মাছের হাড় দেখতে।"[২৬]

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির সামনে তিমি মাছের একটি কঙ্কাল রাখা ছিল তাই দেখতে আরজ আলী মাতুব্বর যেতেন। তিনি লিখেছেন, "হাড় দেখেছি, আর দেখেছি - বহু লোককে বই-পত্র পড়তে। শুনেছিলাম যে ওটা সরকারি গ্রন্থাগার। যে কোন লোক ওখানে বসে বই পত্র পড়তে পারে। আমি লাইব্রেরীর বারান্দায় গিয়েছি বহুদিন কিন্তু ভিতরে যাইনি একদিনও। কেননা অভাব ছিল - কিছুটা দরকারের ও কিছুটা সাহসের।"[২৭] মানুষের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। আরজ আলী মাতুব্বরের প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণেই একদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে পড়তে গিয়েছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মনে পড়ে তখন ছিল ১৩৩০ সাল। একদা পাবলিক লাইব্রেরীতে গেলাম। তিমি মাছের হাড় দেখার জন্য নয়, বই পড়ার জন্য। স-সঙ্কোচে ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং টেবিলের ওপর পাঠকদের রেখে যাওয়া বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখলাম ও কিছু কিছু পড়লাম। অজানা-অচেনা লোক বলে আমাকে কেহ কিছু বলল না দেখে সাহস পেলাম।"[২৮] লামচরি গ্রাম থেকে বরিশালের দূরত্ব প্রায় সাত মাইল। আরজ আলী মাতুব্বর প্রথম দিকে বরিশালে অন্য কাজের জন্য গেলে লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ে আসতেন। কিন্তু এ অভ্যাস ত্যাগ করে এক সময় তিনি শুধু বই পড়ার জন্য বরিশালে যাওয়া শুরু করেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতে তিনি বই পড়ার উদ্দেশ্যে বরিশালে যেতেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> অন্য উদ্দেশ্যে বরিশাল গিয়ে সময় পেলে বই পড়া - এ নিয়ম পরিত্যাগ করে বই পড়ার উদ্দেশ্যে বরিশাল যাওয়া আরম্ভ করলাম ১৩৪০ সাল থেকে। কিন্তু এতেও অশান্তি কমলো না কেননা -পাবলিক লাইব্রেরীটি খোলা হয় বিকেল চারটায়। এতে সন্ধ্যা হবার পূর্বে (বারো মাসে গড়ে) বেলা থাকে মাত্র দুঘন্টা। পক্ষান্তরে - বরিশাল হতে লামচরি গ্রামের দূরত্ব প্রায় ছ-মাইল হেঁটে, আসতে সময়ও লাগে প্রায় দুঘন্টা। কাজেই সন্ধ্যায় বাড়িতে আসতে হলে বই পড়া যায় না, আর বই পড়তে হলে- যত ঘন্টা বই পড়া যায়, তত ঘন্টা রাত্রি হয় বাড়িতে আসতে। তথাপি আমি বই পড়েছি -সন্ধ্যা ছটা, সাতটাও কোন কোন দিন রাত আটটা পর্যন্ত এবং বাড়িতে এসেছি রাত আটটা, নটা, বা কখনো দশটায়। এতে

[২৬]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৯৮
[২৭]প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
[২৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

> হাঁটার জন্য কষ্ট বা নিসঙ্গতার জন্য আমার ভয় হতো না। কষ্ট হতো - শীত কালের রাতের শীতে, কালবৈশাখীর ঝড়ে এবং বর্ষা কালের বৃষ্টি ও জল কাদায় চলতে।[২৯]

লামচরি থেকে বরিশালে গিয়ে বই পড়া বেশ কষ্টের ব্যাপার। শারীরিক কষ্ট ছাড়াও আরো একটি বড় কষ্ট হল কোন একটি বইয়ের কয়েক পাতা পড়ার পর লাইব্রেরি বন্ধের সময় হয়ে যায়। দরকারি বইটি সবসময় কাছে থাকলে অথবা কিছু সময় কাছে রাখতে পারলে পড়তে সুবিধা হয়। বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির নিয়ম ছিল মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে থেকে সদস্য করা হতো না। আরজ আলী মাতুব্বর লাইব্রেরির সদস্য হতে চাইলেও কোন উপায় ছিলনা। কথায় বলে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। আরজ আলী মাতুব্বরও বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বই বাড়িতে নিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। তবে নিজে সদস্য হয়ে নয়। মিউনিসিপ্যাল এলাকার নাগরিক টুপি ব্যাবসায়ী ওয়াজেদ আলীকে সদস্য করে আরজ আলী মাতুব্বর লাইব্রেরি থেকে বই ইস্যু করতেন। এ-সম্পর্কে মাতুব্বর লিখেছেন, "বরিশালের পাবলিক লাইব্রেরী থেকে বই চুরি করে করে বাড়িতে এনে পড়তে শুরু করি ১৩৪৪ সাল থেকে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরের কোন পাঠককে তার বাড়িতে বই দেবার নিয়ম নেই বলে আমাকে বাড়িতে এনে বই পড়তে হয়েছে তৎকালীন টুপির ব্যবসায়ী জনাব ওয়াজেদ আলী তালুকদারের বেনামিতে।"[৩০] টুপি ব্যবসায়ী ওয়াজেদ আলী ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে গ্রামে চলে যাওয়ার পর বেনামিতে আরজ আলী মাতুব্বর পাবলিক লাইব্রেরির যে সদস্য হয়েছিলেন তাও বাতিল হয়ে যায়। এ-সম্পর্কে মাতুব্বর লিখেছেন, "তালুকদার সাহেব তাঁর ব্যবসায় বন্ধ করে গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ায় লাইব্রেরি হতে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। অগত্যা আমাকে লাইব্রেরি হতে আমার ডিপোজিট (৩.০০) টাকা তুলে আনতে হয় এবং বাড়ীতে এনে বই পড়া বন্ধ হয়ে যায়।"[৩১] বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি থেকে আপাতত বই সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলেও আরজ আলী মাতুব্বরের প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি।

বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের লাইব্রেরি, বরিশাল শঙ্কর লাইব্রেরি, বরিশালের ব্যাপটিস্ট মিশন লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে তিনি পড়েছেন। এসব লাইব্রেরি থেকে বই নেয়ার কাজে মাতুব্বরকে কেউ না কেউ সহযোগিতা করেছে। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়া সম্পর্কে মাতুব্বর লিখেছেন, "১৩৫৪-৫৫ সাল থেকে কিছু কিছু বই চুরি করে এনে পড়তে থাকি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ লাইব্রেরী থেকে। সে চুরির কাজে সাহায্য দান করেছেন ও করেন মাননীয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির

---

[২৯]প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮- ৯৯
[৩০]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ২৭২
[৩১]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৯৯

সাহেব। তিনি শুধু আমার চুরি কাজের সহযোগীই নন, আমার জীবন সাধনার যাবতীয় ফলাফলের তিনি সমঅংশীদার।"[৩২]

আরজ আলী মাতুব্বর কৃষিকাজ করতেন। কৃষি কাজ ছাড়াও তিনি আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সাংসারিক-পারিবারিক ও সামাজিক কাজ শেষে যে সময়টুকু পেয়েছেন তা ব্যয় করেছেন বই পড়া ও লেখার কাজে। আরজ আলী মাতুব্বরের দীর্ঘ জীবন দেখে অনুমান করা যায় তিনি জীবনের কোন সময় অপচয় করেন নি। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "নিয়মিত কৃষিকাজ ছাড়া অতিরিক্ত আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাজ আমাকে এ সময় করতে হয়েছে। যথা - ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ সালিসী বোর্ড, পল্লী মঙ্গল সমিতি ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ দিনে ও রাতে যথারীতি সম্পন্ন করতে গিয়ে সময়ের ঘাটতিটা সমস্তই পড়েছে আমার অধ্যয়নের ভাগে। তাই আশানুরূপ বই পড়া হয় নাই।"[৩৩]

আরজ আলী মাতুব্বর সব ধরনের বই পড়তেন। তবে বিজ্ঞানের বইয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "লাইব্রেরীর সমস্ত বিভাগের বই আমি সমান হারে পড়িনি। আমি পড়েছি মাত্র -ধর্ম, ইতিহাস, ভ্রমণ, জীবনী, উপন্যাস, দর্শন ও বিজ্ঞান এবং কিছু মাসিক ও বার্ষিক পত্র-পত্রিকা। তবে সবচেয়ে বিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যাই বেশী।"[৩৪] আরজ আলী মাতুব্বর বই ধার করে পড়েছেন। বই ক্রয় করেছেন। বই ক্রয়ের জন্য তাঁকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরিশ্রম করতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। বই পড়তে গিয়ে তিনি প্রথম **১৯২৩** সালে ব্যক্তিগত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই লাইব্রেরি তিনি সবার জন্য উন্মুক্ত করেছেন সমাজের অজ্ঞতা, অন্ধতা অজ্ঞানতা দূর করার জন্য। লাইব্রেরির সাহায্যে তিনি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত মানুষ। তিনি শিক্ষা নিয়েছেন জীবন থেকে। লাইব্রেরি ছিল তাঁর শিক্ষার অন্যতম স্থান। লাইব্রেরিকে তিনি পবিত্র স্থান হিসাবে চিহ্নিত করতেন। এ-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার। আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি বলেছেন, "দরিদ্র নিবন্ধন কোনো স্কুল-কলেজে গিয়ে বিদ্যা কিনতে পারিনি দেশের অন্যসব ছাত্র-ছাত্রীদের মতো। তাই কোনো স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা আমার শিক্ষাপীঠ নয়। আমার শিক্ষাপীঠ হলো লাইব্রেরি। আশৈশব লাইব্রেরিকে ভালোবেসে এসেছি এবং এখনো ভালোবাসি। লাইব্রেরিই আমার তীর্থস্থান। আমার মতে - মন্দির, মসজিদ, গির্জা থেকে

---

[৩২]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ২৭২
[৩৩]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ১০০
[৩৪]প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

লাইব্রেরি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।”[৩৫] আরজ আলী মাতুব্বর লাইব্রেরি ব্যবহার করেছেন। লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন। নিজের পারিবারিক লাইব্রেরি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। লাইব্রেরি থেকে বই সংগ্রহ করে পড়েছেন। প্রয়োজনীয় বই কিনেছেন। এভাবে তিনি ৯৬৬ খানা[৩৬] বই সংগ্রহ করে প্রথম লাইব্রেরি করেছেন। তাঁর লাইব্রেরি সাইক্লোনে উড়ে গেছে। বই হারিয়ে তিনি কেঁদেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আলমারী ছিলনা বলে বইগুলো রাখা হচ্ছিল আমার বৈঠকখানায় তাকে তাকে সাজিয়ে। ১৩৪৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ শুরু হল সর্বনাশা ঘুর্ণী ঝড়। আমার বৈঠকখানা নিল উড়িয়ে, তৎসহ বইগুলোও। পরের দিন মাঠে পথে পাওয়া গেল দু-একখানা ছেঁড়া পাতা। প্রায় বাইশ বছরের সাধনার ধন, হৃদয়ে রক্ত শুকিয়ে গেল। ব্যথা রোধ করতে পারিনি। যদিও প্রদাহটা আগের মত নেই, তথাপি হৃদয়ের ক্ষত আজও মোছেনি।[৩৭]

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের সবক্ষতি পুরণ করা সম্ভব হয় না। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনের উপর গভীর ছাপ ফেলেছে। তিনি লিখেছেন,

> যৌবনের যে উদ্দাম উৎসাহে পুস্তকাদি সংগ্রহ ও জলঘড়ী নির্মাণ করেছিলাম, সে যৌবন ও উৎসাহ আর ফিরে পাব না। কাজেই আমার কৃতকর্মেরও আর পুনরাবৃত্তি ঘটবেনা। অধিকন্তু বই-পুঁথিগুলোর মধ্যে এমন কতগুলো গ্রন্থ ছিল, যা এখন দুস্প্রাপ্য। যেমন সন্দ্বীপের ইতিহাস, শরলভূমি পরিমাপ, সহিদ নামা (পুঁথি) ইত্যাদি। বিশেষতঃ আমার সর্বস্বত্যাগ করেও পাব না মৃত মায়ের ‘ফটো’ খানা।[৩৮]

ঘূর্ণিঝড়ের পর আবার তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবন বিপন্ন করে, কিন্তু মানুষকে থামিয়ে দিতে পারে না। জীবনযুদ্ধের পাশাপাশি আবার তিনি বই সংগ্রহ করার কাজে লাগলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “মনের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা কমাতে না পেরে আবার পুস্তক সংগ্রহ শুরু করলাম। প্রায় ১৮ বছরের প্রচেষ্টায় পৌনে চারশ বই সংগ্রহ করলাম। কিন্তু ১৩৬৫ সালের ৬ই কার্তিক ঘটল ১৩৪৮ সালের ১২ই জৈষ্ঠের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বন্যায় আমার জীর্ণ কুঁড়ে ঘরখানা ভেঙ্গে পড়ল এবং বইগুলো উধাও হয়ে গেল।”[৩৯] আরজ আলী মাতুব্বর এর পর আবার বই সংগ্রহ করেছেন। এবার তিনি পাকা ঘর নির্মাণ করে লাইব্রেরি স্থাপন করেছেন। নিজের হাতে লাইব্রেরি ঘর নির্মাণের জন্য ইট ভেঙেছেন শ্রমিকদের সঙ্গে। লাইব্রেরির ঘর নির্মাণের ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সঙ্গে সবকাজে তিনি সমানভাবে অংশ নিয়েছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সব কাজেই অংশ নিতে হয়েছে আমাকে কুলি-মজুর, রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরদের সঙ্গে। কুলিদের সাথে ইট বহন করেছি এবং মজুরদের সাথে ইট ভেঙ্গে খোয়া বানিয়েছি। উদ্দেশ্য - এভাবে কায়িক শ্রমের দ্বারা কিছু অর্থ বাঁচাতে পারলে তা দ্বারা কিছু বই

---

[৩৫]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ২৭৩
[৩৬]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৭৩
[৩৭]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
[৩৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
[৩৯]প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

কেনা যাবে।”[৪০] লাইব্রেরি নির্মাণের জন্য আরজ আলী মাতুব্বরকে সমাজের বিত্তবানেরা সাহায্য-সহযোগিতা করেনি। সমাজের শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে এবং সহযোগিতায় আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। এ-সম্পর্কে মাতুব্বরের বক্তব্য হল,

> লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে স্থানীয় বিত্তবানদের আমি সহানুভূতি পাইনি। তবে মজুরদের সাহায্য পেয়েছি প্রচুর। তারা সকলেই লাইব্রেরীর কাজে মজুরী কম নিয়েছে, হয়তোবা কেহ মজুরী ছাড়াই কাজ করেছে। কিন্তু আমার বিত্তবান এক প্রতিবেশীর কাছে বাঁশ খরিদ করতে গিয়ে তাঁর দাবিকৃত ৫০ টাকার স্থলে ৪৯ টাকা মূল্য বলায় তিনি আমাকে বাঁশ দেননি। রাজমিস্ত্রী আ. মজিদ মুন্সী ও ছুতোর রাধাচরণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। যেহেতু তাঁরা তাঁদের কাজের মজুরীর অর্ধেক নিয়ে আমার লাইব্রেরীর নির্মাণকাজ সমাধা করেছেন। কাজেই এ গ্রামের মজুরদের কাছে আমি ঋণী, হুজুরদের কাছে নয়।[৪১]

সম্পদ বিক্রি করে তিনি লাইব্রেরি ঘর নির্মাণের অর্থ সংগ্রহ করেছেন। আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরির উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছেন, “দিনমজুরী করেছি মাঠে মাঠে আমিন রূপে। সেই মজুরীলব্ধ অর্থ দ্বারা কিছু ভূ-সম্পত্তি খরিদ করেছিলাম আমি ইতিপূর্বেই। গত বছর তা সমস্তই বিক্রয় করেছি। ক্রেতারাও প্রায় সবাই এখানেই আছেন। আমি সেই সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ সামান্য পুঁজি নিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের বিরাট কাজে হাত দিয়েছি।”[৪২]

আরজ আলী মাতুব্বরের সমস্ত কাজ নিয়ম মাফিক ছিল। যেন অংক কষে তিনি সব নির্ধারণ করতেন। আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরির দানপত্র সংক্রান্ত দলিলসমূহের অনুলিপি থেকে জানা যায়,

> আমার উর্ধতন ৫ (পাঁচ) পুরুষের দশ ব্যক্তির বয়সের গড় হিসাব করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহাদের প্রত্যেকের গড় পরমায়ু ছিল ৬০ (ষাট) বৎসর, তাই আমার বংশের রেওয়াজ মোতাবেক আমিও আমার পরমায়ু ৬০ (ষাট) বৎসর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম। উক্ত কল্পনার ভিত্তিতে ১৩৬৭ সালে আমার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে আমি আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘোষণাপূর্বক আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমার ওয়ারিশগণের মধ্যে (ফরায়েজ বিধান মতে) দান-বন্টন করিয়া দিয়া কৃষিকাজ তথা সংসারী কাজ পরিত্যাগপূর্বক আমি আমার পুত্রদের পোষ্য হইয়া জীবন যাপন করিতেছি।[৪৩]

আরজ আলী মাতুব্বর জীবনের সবকিছু দান করে গেছেন। নিজের শরীর দান করেছেন বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চোখ দান করেছেন। লামচরি থেকে থেকে আরজ আলী মাতুব্বরের লাশ বরিশাল মেডিকেল কলেজে নেয়ার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাও তিনি ব্যাংকে রেখে গেছেন। তাঁর অবর্তমানে

[৪০]আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড*, পৃ. ১৯৯, ২০০
[৪১]প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
[৪২] প্রগুক্ত, পৃ. ২০৫
[৪৩]প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

লাইব্রেরি কিভাবে পরিচালিত হবে তা সবকিছুই তিনি ঠিক করে গেছেন। এজন্য ব্যাংকে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানের ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বর চিন্তা করতে শুরু করেছেন একটি বিশেষ ঘটনার পর। এই ঘটনার আগে আরজ আলী মাতুব্বর কী চিন্তা করেননি। চিন্তা তিনি করেছেন। সব মানুষই চিন্তা করে। চিন্তাশূন্য কোন মানুষ নেই। মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী বলা হয় এ কারণে যে মানুষ চিন্তা করে। সব মানুষ চিন্তা করলেও কিছু কিছু মানুষের চিন্তা করার প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। চিন্তা করার পদ্ধতি আছে। আরজ আলী মাতুব্বর চিন্তা করার পদ্ধতি অনুসরণ করে চিন্তা করেছেন। তাঁর চিন্তার উন্মেষ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> ১৩৩৯ সালে আমার মা মারা গেলে আমি আমার মৃত মায়ের ফটো তুলেছিলাম। আমার মাকে দাফন করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মুন্সী, মৌলভী ও মুছল্লীরা এসেছিলেন, 'ফটো তোলা হারাম' বলে তাঁরা আমার মা'র নামাজে জানাজা ও দাফন করা ত্যাগ করে লাশ ফেলে চলে যান। অগত্যা কতিপয় অমুছল্লি নিয়ে জানাজা ছাড়াই মা'কে সৃষ্টিকর্তার হাতে সোপর্দ করতে হয় কবরে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ছবি তোলা দূষণীয় হলেও সে দোষে দোষী স্বয়ং আমিই, আমার মা নন। তথাপি কেন যে আমার মায়ের অবমাননা করা হল তা ভেবে না পেয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে মা'র শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদেহী আত্মাকে উদ্দেশ্য করে এই বলে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, 'মা ! আজীবন ছিলে তুমি ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। আর আজ সেই ধর্মের নামেই হ'লে তুমি শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য। সমাজে বিরাজ করছে এখন ধর্মের নামে অসংখ্য অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো - আমার জীবনের ব্রত হয় যেনো কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ অভিযান। আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেনো তোমার কাছে আসতে পারি।[৪৪]

আরজ আলী মাতুব্বরের মা ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। মায়ের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, "আমার মা ছিলেন অতিশয় নামাজী-কালামী একজন ধার্মিকা রমণী। তাঁর নামাজ-রোজা বাদ পড়া তো দূরের কথা, 'কাজা' হতেও দেখিনি কোনোদিন আমার জীবনে। মাঘ মাসের দারুণ শীতের রাতেও তাঁর তাহাজ্জদ নামাজ কখনও বাদ পড়েনি এবং তারই ছোঁয়াচ লেগেছিলো আমার গায়েও কিছুটা। কিন্তু আমার জীবনের গতিপথ বেঁকে যায় মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি দুঃখজনক ঘটনায়।"[৪৫] মায়ের মৃত্যুর পর আরজ আলী মাতুব্বর সত্যের সন্ধান করেছেন। *সৃষ্টি রহস্য* এবং *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থ দু'টি আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছিলেন মায়ের মৃত্যুর পর দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে। সমাজের মধ্যে কুসংস্কার, ব্যক্তি মানুষ এবং সামাজিক মানুষের জীবন বিপন্ন করে। আরজ আলী মাতুব্বর মায়ের মৃত্যুর পর কুসংস্কার দূর করে সমাজে আলো জ্বালাতে চেয়েছেন। তাঁর সত্যের সন্ধান সামাজিক মানুষকে অন্ধতা থেকে মুক্ত করেছে। শুধু তাই নয়

---

[৪৪]প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
[৪৫]প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

মানুষকে নতুন করে চিন্তা করতে শিখিয়েছে। মানুষের বিশ্বাসকে তিনি যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। যুক্তি বুদ্ধি এবং ঘটনার কার্যকারণ অনুসন্ধান ছিল তাঁর সত্য সন্ধানের পদ্ধতি।

অজানাকে জানার আগ্রহ ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের প্রবল। এই আগ্রহ থেকে তিনি কৃষিকাজের অবসরে নিজের চেষ্টায় পড়তে শিখেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আশৈশব প্রবল ছিলো আমার জানার স্পৃহা। তাই আমার মুরুব্বিদের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছি। কিন্তু জবাব যা পেয়েছি, তা মনঃপূত হয়নি। আধুনিক শিক্ষার্থীদের পুস্তকাদি পাঠ করে উপরোক্তরূপ কতিপয় বিষয়ের সন্ধান মনঃপূত সমাধান পেয়ে আমার পুস্তকপাঠের স্পৃহা আরো বেড়ে যায়। কিন্তু আর্থিক অভাবের দরুণ যথেচ্ছ পুস্তকাদি খরিদ করতে না পেরে বরিশালের পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য হয়ে সেখানে পুস্তকাদি পাঠ শুরু করি।[৪৬]

আরজ আলী মাতুব্বর পড়েছেন প্রচুর, লিখেছেন কম। মুহম্মদ শামসুল হক লিখেছেন, "মাতুব্বর সাহেব পড়াশোনা করতেন প্রচুর, ভাবনা-চিন্তা করতেন আরো বেশি, বলতেন কম, লিখতেন আরো কম।"[৪৭] জগৎ, জীবন এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টা নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন প্রচুর। অধীতবিদ্যা এবং সত্যের অন্বেষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি দর্শনের মৌলিক বিষয় অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব ও মূল্যবিদ্যা সম্পর্কে নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন। দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনচিন্তার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরা হবে।

দর্শনচিন্তা

সৃষ্টি রহস্য, *সত্যের সন্ধান*, *মুক্তমন*, *অনুমান* গ্রন্থে আরজ আলী মাতুব্বর জীবন জগৎ ইহকাল পরকাল ঈশ্বর আত্মা স্বর্গ নরক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থের দ্বিতীয় নাম *লৌকিক দর্শন*। *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "*সত্যের সন্ধান* বইখানা প্রণয়নকালে ইহার একটি উপনাম দেওয়া হয় *যুক্তিবাদ*। কিন্তু বর্তমানে সুধীমহল ও পুস্তকখানাকে 'দর্শন' শ্রেণীভুক্ত করায় ইহার উপনাম দেওয়া হইল *লৌকিক দর্শন*।"[৪৮] *সত্যের সন্ধান* প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এই তিনটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতে যাইয়া আমার মনে কতগুলি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে এবং হইতেছে।"[৪৯] আরজ আলী মাতুব্বর ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে

---

[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮
[৪৭] মুহম্মদ শামসুল হক, "কিছু স্মৃতি, কিছু কথা", আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *প্রথম খণ্ড*, পৃ. ১২
[৪৮] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, *প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৪৬
[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

চিন্তা করেছেন, পড়েছেন এবং লিখেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমার ভাবনার মৌলিক বিষয় থাকে তিনটি। যথা - জীব, জগত ও ঈশ্বর।"[৫০] জীব, জগত, ঈশ্বর ও আত্মা নিয়ে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার নামই দর্শন। *সৃষ্টি রহস্য* গ্রন্থে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

> জগত সৃষ্টি কে করিয়াছেন, এই প্রশ্নের সমাধান যত সহজে হইয়া গেল, কি দিয়া সৃষ্টি হইয়াছে, এই প্রশ্নের সমাধান তত সহজে হইল না। 'কে' ও 'কি দিয়া', এই উভয় প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিয়াছে 'দর্শন'। কিন্তু সকল দার্শনিক একমত হইতে পারেন নাই। উহাতে বহু দার্শনিক বহু মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। কেননা কোনো দার্শনিকই ধর্মজগতের আবহাওয়ার আওতার বাহিরের মানুষ ছিলেন না। তথাপি দার্শনিকগণ সাধারণত দুই শ্রেণীর– ধর্মীয় আওতাভুক্ত ও মুক্ত।[৫১]

মুক্তমনের মানুষ ছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর। বুদ্ধির মুক্তি ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ধর্মীয় অন্ধতা, কুসংস্কার তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি মুক্তভাবে যে কোন বিয়ষকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। মুক্তচিন্তার অন্যনাম দর্শন হিসাবে অভিহিত করা যায়। মুক্তচিন্তা এবং দর্শনের সম্পর্ক বর্ণনা করে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "মুক্তচিন্তার সাথে দর্শনের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এত যে এ দুটোকে প্রায় সমার্থক অর্থে ব্যবহার করা চলে।"[৫২] চিন্তার ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিক থেলিস থেকে শুরু করে প্লেটো অ্যারিস্টটল ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, পতঞ্জল সহ অনেকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে গিয়ে দর্শনের সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক যুগে বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ এবং অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক, বার্কলি, হিউম এবং বিচারবাদী দার্শনিক কান্ট স্বাধীন এবং মুক্তভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন মতের। এসব দার্শনিক কখনো কখনো পূর্বপক্ষ গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব মতবাদ সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানকালে দর্শনের নানামুখী শাখা-প্রশাখা-উপশাখার সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মুক্তচিন্তার ফলেই।

দর্শনের সঙ্গে প্রজ্ঞা ও সত্যের অনুশীলন যুক্ত। জর্জ বার্কলি, *A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "প্রজ্ঞা ও সত্যের অনুশীলন ছাড়া দর্শন আর কিছু নয়।"[৫৩] বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের আরজ আলী মাতুব্বর প্রজ্ঞা ও সত্যের অনুশীলন করেছেন। প্রজ্ঞা ও সত্যের অনুশীলনের সঙ্গে মুক্তচিন্তা আবশ্যক। মুক্তভাবে চিন্তা করা ছাড়া সত্যের সন্ধান করা যায় না। মুক্তভাবে চিন্তা করতে গিয়েই দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্ভব। এ সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, "ক্ষুধার্ত বলদ যেমন

---

[৫০] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ১০৫
[৫১] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৪০
[৫২] আনিসুজ্জামান, "দর্শন ও মুক্তচিন্তা", *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), পৃ. ৮৯
[৫৩] জর্জ বার্কলি, *মানুষের জ্ঞানসূত্র*, আবদুল মতীন (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১

রশি ছিঁড়িয়া অন্যের ক্ষেতের ফসলে উদরপূর্তি করে, মানুষের মনও তেমন ধর্ম-ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ছুটিয়া যায় এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।”[৫৪]

জীবন-জগৎ, পরকাল-ইহকাল, ঈশ্বর-আত্মা, স্বর্গ-নরক, সৃষ্টি-ধ্বংস ইত্যাদি দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর যৌক্তিকভাবে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। “পাঠশালায় যৎসামান্য লেখাপড়াকে সম্বল করে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর অনিবার্য কৌতুহল এবং খাড়া করেছেন এক যুক্তিবাদী জীবনদর্শন।”[৫৫] বস্তুবাদী চিন্তার ভিত্তি অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস সত্য, সুন্দর ও জ্ঞান নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে আলোচনা করেছেন। সক্রেটিসের লক্ষ্য ছিল সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণাগুলোর পরিবর্তে যুক্তিবাদী সমাজ গঠনের। আধুনিক কালে ফ্রান্সিস বেকনসহ আরো অনেকে যৌক্তিক পদ্ধতি ও যুক্তি দিয়ে মানুষকে সংস্কারমুক্ত করতে চেয়েছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের পদ্ধতিও যুক্তি ও বুদ্ধির।

বৈজ্ঞানিকতা ও যুক্তিবাদ আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা-চেতনার মূলমন্ত্র।[৫৬] আরজ আলী মাতুব্বরের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে সাইদুর রহমান লিখেছেন, “আরজ আলী মাতুব্বর প্রণীত *সত্যের সন্ধান* বইখানি পড়ে নিতান্তই বিমুগ্ধ হয়েছি। লেখক কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে দর্শন অধ্যয়ন করেন নাই। তথাপি দর্শনের প্রাচীন মূলতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এটা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত নিজস্ব দার্শনিক মানসিকতার অভিব্যক্তি।”[৫৭] অন্য দশজন মানুষের মত আরজ আলী মাতুব্বর বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, “দার্শনিকও একজন মানুষ। একটি বিশেষ কালে ও স্থানে তাঁর জন্ম। ব্যাপক অর্থে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই তিনি বেড়ে ওঠেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত চিন্তা-পদ্ধতি ও বাস্তব অবস্থার প্রতি তাঁর বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।”[৫৮] আরজ আলী মাতুব্বর জিজ্ঞাসাহীন কুসংস্কারগ্রস্ত অন্ধবিশ্বাস নির্ভর শিক্ষাবঞ্চিত গ্রামীণ সমাজে জন্মগ্রহণ করেছেন। সমাজের দায়দ্ধবতা থেকেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রশ্ন করেছেন। তাঁর এই জিজ্ঞাসা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম-দর্শনের। এবং দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলোও এই জিজ্ঞাসা থেকেই সৃষ্টি। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনচিন্তার বর্ণনা দিয়ে মুহম্মদ শামসুল হক লিখেছেন,

> তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন, কালী দর্শন, উপনিষদ কি, বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে বিবেকানন্দের জীবন দর্শনের সম্পর্ক কি, তিনি পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব কেন গ্রহণ

---

[৫৪] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৫৪
[৫৫] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন*, পৃ. ৯৯
[৫৬] আবদুল মতিন, “আরজ আলী মাতুব্বর স্মরণে”, *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ৮৬
[৫৭] সাইদুর রহমান, “সত্য প্রচারে সাধুবাদ”, *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ২৪
[৫৮] আনিসুজ্জামান, “দর্শন ও মুক্তচিন্তা”, *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, পৃ. ৯০

করলেন ইত্যাদি বোঝাতে লাগলেন। শঙ্কর রামানুজের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যার সঙ্গে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার পার্থক্য কোথায় – এটাও সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। আমি তাঁর কথা শুনতে শুনতে কাগজে নোট নিতে লাগলাম।[৫৯]

আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। সংশয় থেকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে থ্যালিস প্রথম জগতের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রচলিত ব্যাখ্যার পরিবর্তে একটি স্বাধীন যৌক্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। পিথাগোরাস, হিরাক্লিটাস, জেনো, পারমানাইডসসহ আরো অনেক গ্রিক দার্শনিক জগতের উৎপত্তি নিয়ে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। সেগুলো বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কাছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসা মনে হলেও তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক কালের দার্শনিক দেকার্ত সংশয়কে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে নিশ্চিত সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। দেকার্ত গণিতের নিশ্চিত সত্যগুলো নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। রেনে দেকার্তের মত আরজ আলী মাতুব্বর সংশয়কে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দেকার্ত লিখেছেন, "আমি ইউরোপের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্কুলগুলোতে পড়েছি যে সব জায়গায় আমি মনে করতাম জ্ঞানী ব্যক্তিদের থাকা উচিত যদি আদৌ পৃথিবীর কোথাও জ্ঞানী মানুষ থেকে থাকেন।"[৬০] দেকার্ত নিজের অস্তিত্ব ছাড়া সবকিছু নিয়ে সংশয় করা শুরু করলেও চার্চের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনা বিচারে মেনে নিয়েছেন। চার্চের মত নিয়ে তাঁর কোন সংশয় ছিল না। *ডিসকোর্স অন মেথড* গ্রন্থের ভূমিকায় দেকার্তের ধর্ম বিশ্বাসের বর্ণনা দিয়ে লরেন্স জে ল্যাফ্লুর লিখেছেন, "দেকার্তের মতে অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি সকল জ্ঞানের জন্য যথার্থ পদ্ধতি নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকলেও, সততার সঙ্গে হোক বা না হোক, চার্চের মতকে বিশ্বাস করতে হবে এটাই ছিল দেকার্তের মত।"[৬১] আরজ আলী মাতুব্বর ধর্মীয় মতকে বিনা বিচারে গ্রহণ করেননি। ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত করাই ছিল তাঁর দর্শনচিন্তার প্রধান লক্ষ্য। যেমন তিনি লিখেছেন আমি কে? প্রাণ কিভাবে দেহে আসা-যাওয়া করে? স্রষ্টা কি সৃষ্টি হতে ভিন্ন? পাপ-পুণ্যের ডায়রী কেন? ইত্যাদি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে প্রশ্ন করেছেন। সংলাপের ভঙ্গিতে যুক্তি, যুক্তি-খণ্ডন ও নতুন যুক্তি প্রয়োগ করে এক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর রচনায়।[৬২]

সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জনের লক্ষেই রাসেল লৌকিক বিশ্বাসের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরেরও লক্ষ্য ছিল সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জন করা। রাসেলের মতো আরজ আলী মাতুব্বরেরও প্রশ্ন ছিল এ জগতের এমন কিছু খুঁজে বের করা যা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না। দেকার্ত যেমন সংশয়ের মাধ্যমে দার্শনিক নিশ্চয়তা খুঁজে পেয়েছিলেন, আরজ আলী মাতুব্বরও

[৫৯] মুহম্মদ শামসুল হক, "কিছু স্মৃতি, কিছু কথা", আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮
[৬০] রেনে দেকার্ত, *ডিসকোর্স অন মেথড, জ্ঞানের পদ্ধতি বিষয়ে পর্যালোচনা*, ডা. পিনাকী ভট্টাচার্য (অনূদিত), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯১৪, পৃ. ২৯
[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
[৬২] ফেরদৌসী বেগম, *আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে মানবতাবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ২

> সংশয়ের আবরণ ভেদ করে সত্য জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। আর তারই ফলে আরজ আলী যৌক্তিক বিশ্লেষণ ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করতে রাজি নন।[৬৩]

আরজ আলী মাতুব্বর বৈজ্ঞানিক মতবাদের সমর্থক। বিজ্ঞানী মাত্রই বস্তুবাদী। গণিতকেও তিনি বস্তুবাদ হিসাবে অভিহিত করেছেন। গণিত এবং বিজ্ঞান ভাববাদ সমর্থন করে না। এ সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর *সৃষ্টি রহস্য* গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন,

> বিজ্ঞানীদের বলা হয় বস্তুবাদী এবং বিজ্ঞানকে বলা হয় বস্তুবাদ। আবার বিজ্ঞানকে বলা যায় গণিতের সহোদর, কেননা উভয়ের চরিত্র অভিন্ন। উহাদের কাহারো মধ্যে দয়া, মায়া, ক্ষমা, হিংসা, দ্বেষ, ইত্যাদি ভাবাবেগ নাই এবং উভয়েই সত্যের পূজারী, বস্তুজগতেই উভয়ের অস্তিত্ব। যেখানে কোন বস্তু নাই, সেখানে গণিতের প্রক্রিয়া বন্ধ, বিজ্ঞানের গবেষণা অচল। কাজেই গাণিতিকগণও বস্তুবাদী।[৬৪]

মানুষের জীবনে অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ভাববাদ নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। ভাববাদের সাথে বস্তুবাদের সংঘাত বিদ্যমান। চরম ভাববাদীও দৈনন্দিন জীবনে বস্তুর উপরই নির্ভর করে চলে। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, "বর্তমান যুগে মানব সমাজের এক বিরাট এলাকা অধিকার করিয়া আছে ধর্মীয় মতবাদ তথা ভাববাদ। কিন্তু উহার সংঘাত চলিতেছে বস্তুবাদের সাথে অহরহ। ধর্মীয় মতবাদ অপরিবর্তনীয়, চিরস্থির ও স্থবির। পক্ষান্তরে বস্তুবাদ পরিবর্তনশীল, চঞ্চল ও গতিশীল। তাই বস্তুবাদের চাঞ্চল্যের গায়ে পড়া আঘাতের ভয়ে ভাববাদ আত্মরক্ষায় উদ্বিগ্ন।"[৬৫] ভাববাদীরা ধ্যান করেন আর বস্তুবাদীরা নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় পরীক্ষাগারে গবেষণায় মগ্ন থাকেন। বস্তুবাদীদের গবেষণার সুফল ভাববাদীরা ভোগ করেন। চরম ভাববাদীও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকেন। বর্তমানকালে হার্টের রোগী বাইপাস সার্জারির পরিবর্তে তাবিজ-কবজের উপর কেউ নির্ভর করে না। পির ফকিরের দোয়া বহু আগেই গত হয়েছে।

আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনের ব্যবহারিক মূল্য বেশি। চিন্তার জন্য চিন্তা তাঁর কাছে বর্জনীয়। ভাববাদী দার্শনিকদের দর্শনের ব্যবহারিক মূল্য নেই। এ কারণেই ভাববাদ আরজ আলী মাতুব্বরের কাছে বর্জনীয়। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শন চিন্তার বর্ণনা দিয়ে ফেরদৌসী বেগম *আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে মানবতাবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা-চেতনার অনুসন্ধানে যে ধরনের দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকের কথাই বলে, সমকালীন প্রেক্ষাপটে যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।"[৬৬] আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনচিন্তার বর্ণনা দিয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "তিনি এমন একজন দার্শনিক যিনি নিজের স্বকীয় প্রতিভা বলে নিজের চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন করতে তো সক্ষম

---

[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[৬৪] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০০

[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

[৬৬] ফেরদৌসী বেগম, *আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে মানবতাবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা*, পৃ. ৭

হয়েছিলেনই, সেই সঙ্গে তিনি খুব সহজ ও বৈজ্ঞানিকভাবে নিজের চিন্তাধারাকে নিজের রচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করে অন্যদেরকে কুসংস্কারমুক্ত হতে সাহায্য করতেন।"[৬৭] হাসান আজিজুল হক আরজ আলী মাতুব্বরকে মৌলিক দার্শনিক হিসাবে আখ্যায়িত করে লিখেছেন, "মৌলিকভাবে ভাবনা করতে পারে এমন একজন মানুষকেই দার্শনিক বলতে পারি। এরকম মানুষ আরজ আলী মাতুব্বর।"[৬৮] গালিব আহসান খান আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শন মূল্যায়ন করে লিখেছেন, "আরজ আলী মাতুব্বর সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী যে রচনা রেখে গেছেন তা প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে বর্তমানের দর্শন চর্চার ধারার সাথে যুক্ত ছিল না, যদিও তবুও বিষয়বস্তুগতভাবে এবং আলোচনার ধরনের দিক থেকে তা দর্শনেরই অন্তর্গত।"[৬৯] তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষায় দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে আরজ আলী মাতুব্বরের মৌলিক অবদান রয়েছে।[৭০]

জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, মূল্যবিদ্যা আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনচিন্তা আলোচনা করা হবে। মাতুব্বরের নীতিচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা মূল্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা দর্শনের মৌলিক বিষয়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকগণ জ্ঞানের উৎস বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আধুনিক পাশ্চাত্যের দর্শনকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দর্শন হিসাবেও অভিহিত করা হয়। জ্ঞানের উৎস নির্ধারণ করতে গিয়ে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যের দার্শনিক দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ প্রমুখ বুদ্ধিবাদীগণ দার্শনিক বুদ্ধিকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে অভিহিত করেছেন। জন লক, জর্জ বার্কলি, ডেভিড হিউম প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস হিসাবে ধরে নিয়েছেন। জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় করে বিচারবাদ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর জ্ঞানের উৎস বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বাস্তববাদী দার্শনিক। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্জিত জ্ঞানকেই আরজ আলী মাতুব্বর একমাত্র জ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন। জ্ঞান, পুণ্য এবং বিশ্বাস এই তিনটিকে তিনি পৃথকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে জ্ঞান ব্যবহারিক। জ্ঞান পুণ্য বা

---

[৬৭] বদরুদ্দীন উমর, "মুক্ত মানুষ আরজ আলী মাতুব্বর", *আরজ আলী মাতুব্বর : চিন্তা জগৎ*, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদিত), নন্দিত, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৮

[৬৮] হাসান আজিজুল হক, *কথা লেখা কথা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪৭

[৬৯] গালিব আহসান খান, *দর্শনের প্রয়োজনীয়তা: একবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৫

[৭০] গালিব আহসান খান, *দর্শনের প্রয়োজনীয়তা: একবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩২

পরকালে শান্তি পাওয়ার কোন বিষয় নয়। মানুষের ইহজাগতিক সুখ-সুবিধার জন্যই জ্ঞান অপরিহার্য। তিনি লিখেছেন, "ইংরেজিতে একটি কথা আছে যে, জ্ঞানই পুণ্য (Knowledge is virtue)। কিন্তু যে বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মিল না, সে বিষয়ে পুণ্য কোথায়?"[৭১] পুণ্য-অর্জন জ্ঞান নয়। পুণ্য পরকালের জন্য। প্রত্যক্ষ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের উপর জ্ঞান নির্ভরশীল। বিশ্বাস এবং জ্ঞান এক নয়। কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বর বিশ্বাসকে জ্ঞান হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, বিশ্বাস অতীন্দ্রিয় সত্তায় নয়। আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা দেখি শুনি তাতেই বিশ্বাস করি। যাকে দেখা যায় না, জানা যায় না, যার উপস্থিতি নেই তার জ্ঞান সম্ভব নয়।

আরজ মাতুব্বরের বিশ্বাস প্রত্যক্ষ নির্ভর। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তিনি যা দেখেছেন তাকেই বিশ্বাস করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রয়েছে। বরং বলা হইয়া থাকে যে, জ্ঞানমাত্রই বিশ্বাস। তবে যে কোন বিশ্বাস জ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই জ্ঞান বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই খাঁটি বিশ্বাস। পক্ষান্তরে, যে বিশ্বাস কল্পনা, অনুভূতি, ভাবানুষঙ্গ বা কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা জ্ঞান নহে।"[৭২] অন্ধবিশ্বাস আরজ আলী মাতুব্বরের দৃষ্টিতে জ্ঞান নয়। তিনি মনে করেন, "যাহা খাঁটি বিশ্বাস, তাহা সকল সময়েই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা (Lesson Experience) প্রসূত, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা সর্বদাই বিশ্বাস্য। মানুষ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে তাহা তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করে এবং যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহাই বিশ্বাস করে।"[৭৩] আরজ আলী মাতুব্বরের দৃষ্টিতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তাই খাঁটি বিশ্বাস। খাঁটি বিশ্বাসই একমাত্র জ্ঞান। এ সম্পর্কে তিনি আরো লিখেছেন, "প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই দুটির উপর খাঁটি বিশ্বাস বা জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যে বিশ্বাসের মূলে প্রত্যক্ষ বা অনুমান নাই, অর্থাৎ যে বিশ্বাসের মূলে জ্ঞানের অভাব, তাহা খাঁটি বিশ্বাস নহে, অন্ধ বিশ্বাস। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই।"[৭৪] পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস জ্ঞান কিন্তু অলৌকিক-অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস জ্ঞান নয়। ধর্মীয় বিশ্বাস প্রত্যক্ষ এবং অনুমান সিদ্ধ নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসকে মাতুব্বর অন্ধ বিশ্বাস হিসাবে অভিহিত করে তিনি লিখেছেন,

> অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের অধিকাংশ তথ্য অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ নহে। এই জন্য ধর্মের অনেক কথায় বা ব্যাখ্যায় সন্দেহ থাকিয়া যায়। দ্বিধাহীন চিত্তে ধর্মীয় সকল অনুশাসনকে আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাই বিজ্ঞানের ন্যায়

---

[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

ধর্মের উপর সকল লোকের অটল বিশ্বাস হয় না। ধর্মকে সন্দেহাতীতরূপে পাইতে হইলে উহাকে অন্ধবিশ্বাসের উপর রাখিলে চলিবে না, উহা খাঁটি বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।[৭৫]

বাস্তববাদী দার্শনিক হিসাবে আরজ আলী মাতুব্বর বিশ্বাস করেন প্রত্যক্ষ এবং অনুমান নির্ভর জ্ঞানের উপর মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "যেখানে যে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান জন্মিতেছে, সেইখানেই বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে ; আর যেখানে যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয় হইতে ক্রমশ বিশ্বাস লোপ পাইতেছে। অর্থাৎ সন্দেহ জাগিতেছে।"[৭৬] আরজ আলী মাতুব্বর প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের একমাত্র উৎসহ হিসাবে দেখেছেন।

চার্বাক দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের মিল পাওয়া যায়। চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষণই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করা যায় তাই সত্য, আর যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তা মিথ্যা।[৭৭] যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তাকে আরজ আলী মাতুব্বর মিথ্যা বলেন নি। কিন্তু অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক শক্তি যাকে কখনোই প্রত্যক্ষ করা যায়নি এবং ভবিষ্যতেও যাবে না সে সবের ব্যবহারিক উপযোগিতাকে তিনি অস্বীকার করেছেন। চার্বাক দর্শনে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর আর কোন জগৎ নেই। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি মানুষের সমাপ্তি ঘটে। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্যকারিতারও সমাপ্তি ঘটে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটি ইন্দ্রিয় অকার্যকর থাকলে সে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষের যে জ্ঞান হওয়ার কথা থাকে তা হয় না। আরজ আলী মাতুব্বর প্রশ্ন তুলেছেন মৃত্যুর পর জ্ঞান থাকলে সেটা কি রকম? এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কোন একটির অভাব থাকিলে, ঐ ইন্দ্রিয়টির মাধ্যমে যে জ্ঞান হইতে পারিত, তাহা আর হয় না। যে অন্ধ বা বধির, সে আলো বা শব্দের জ্ঞান পাইতে পারে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুতে মানুষের দেহ নষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিও নষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পরে শরীর ও ইন্দ্রিয়বিহীন আত্মার জ্ঞান থাকিবে কি? থাকিলে কিরূপে থাকিবে?[৭৮]

মানুষের জ্ঞান পঞ্চইন্দ্রিয় নির্ভর। ভাববাদী দার্শনিকগণ পঞ্চইন্দ্রিয়ের বাইরে আরো একটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলেন। তারা এমন কথাও বলেন যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমাদের যে জ্ঞান দেয় তা ভ্রান্ত। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান এবং শব্দকে যথার্থ জ্ঞানে উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।[৭৯] ন্যায় দর্শনের যথার্থ জ্ঞানের চারটি

---

[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
[৭৭] সায়েদ আবদুল হাই, *ভারতীয় দর্শন*, পৃ. ১১
[৭৮] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬১
[৭৯] সায়েদ আবদুল হাই, *ভারতীয় দর্শন*, পৃ. ৪৪

উৎসের স্থানে সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দ যথার্থ জ্ঞানের উৎস হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শনে জ্ঞান মাত্রই শর্ত সাপেক্ষ। যথারীতি শর্তপূর্ণ হলেই জ্ঞান হয়। মীমাংসকগণ বিষয় বা বস্তু ছাড়া কোন জ্ঞান সম্ভব নয় বলে মনে করেন।[৮০] আরজ আলী মাতুব্বর অনুমান, উপমান এবং শব্দের জ্ঞান স্বীকার করেননি। তিনি বস্তুগত জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মার্কসীয় বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞান বস্তুগত। আমাদের চারপাশের বস্তুজগতই জ্ঞানের উৎস। মনের বাইরে বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। আরজ আলী মাতুব্বরের সঙ্গে মার্কসের স্থান এবং কালের দূরত্ব অনেক। একজন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশোনা করেছেন। পৃথিবীর উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আরেকজন বরিশালের দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম। নিজ চেষ্টায় স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন করেছেন। কালের এবং স্থানের দুরত্ব অনেক হলেও দুইজনই জ্ঞানের উৎস হিসাবে বস্তুর কথা স্বীকার করেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বরের জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট হল জ্ঞানকে তিনি ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করেন জ্ঞান মাত্রই ব্যবহারিক। অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক সত্তার জ্ঞান হয় না। অলৌকিক সত্তার কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই এমন সব বিষয়কে, সরাসরি অস্বীকার না করলেও তাদের ব্যবহারিক মূল্যের অর্থহীনতা ডায়ালগের আকারে যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর প্রমাণ করেছেন। অপ্রত্যক্ষিত ফেরেস্তাদের অস্তিত্ব নিয়ে মাতুব্বরের প্রশ্ন নেই। কিন্তু ফেরেস্তাদের দাপ্তরিক কার্যাবলির অর্থহীনতা তিনি যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রমাণ করে লিখেছেন,

> মেকাইল ফেরেস্তা নাকি বিশ্বপতির আবহাওয়া বিভাগও পরিচালনা করেন। কিন্তু এই বিভাগেও তাঁহার যোগ্যতা বা নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অতীতকালে যাহাই হইয়া থাকুক না কেন, বর্তমানে ব্যাপকভাবেই পৃথিবীতে খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের নেতাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত পতিত জমি আবাদ কার্যে মনোযোগ দিয়াছেন। কিন্তু সসীম ক্ষমতার জন্য সকল ক্ষেত্রে কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মেকাইল ফেরেস্তার অসাধ্য কিছুই নাই। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের সঙ্গে যদি সাহারা মরু প্রদেশের তাপ বিনিময় করিয়া যথারীতি বৃষ্টিপাত ঘটান যাইত, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ একর জমি চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনের যোগ্য হইত এবং তাহাতে দুনিয়ার খাদ্যসংকট কতকাংশে কমিয়া যাইত। মেকাইল ফেরেস্তা উহা করিতে পারেন কি না। যদি পারেন, তবে উহা তিনি করেন না কেন?[৮১]

আরজ আলী মাতুব্বর এধরনের অসংখ্য প্রশ্ন করে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর মতে, অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তার জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়

---

[৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
[৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

অভিজ্ঞতায় অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে জানা যায় না। যাকে জানা যায় না, যার উপস্থিতি নেই তার জ্ঞান সম্ভব নয়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে মানুষের কল্যাণে বস্তুগত জ্ঞান ছাড়াও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর নীরব ছিলেন। তাঁর এই নীরবতা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে সমর্থন করে না। তিনি জ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন মানুষের কল্যাণে। পৃথিবীকে সুন্দর ও আনন্দময় করার জন্য জ্ঞান অপরিহার্য। বস্তুগত জ্ঞান দ্বারাই মানুষের জীবন সরল ও সহজ হয়। এ জন্যেই আরজ আলী মাতুব্বর বস্তুর বাইরে সবকিছুকে অস্বীকার করেছেন।

জ্ঞানকে ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহার করে আরজ আলী মাতুব্বর সমাজ উন্নয়নের কথা বলেছেন। তিনি একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি নিজ উদ্যোগে জ্ঞানচর্চা করেছেন। লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছেন। লাইব্রেরির মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছেন। জ্ঞান মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করে। ব্যক্তি মানুষ কুসংস্কার মুক্ত হলে সমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা হয়। দারিদ্র্য দূর করার জন্যও জ্ঞানের প্রয়োজন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের ৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আয়োজিত আবুল হোসেন স্মরণ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় আরজ আলী মাতুব্বর বলেছেন,

> যে দেশে লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশু অনাহারে অস্থিকঙ্কালসার হয়ে সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একমুঠো অন্ন পাচ্ছে না, সে দেশের বিমানবিহারী হাজীদের নিজে উড়ে, টাকা উড়িয়ে হজব্রত পালনের কোনো সার্থকতা নাই। যে দেশের হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ মুক্তাকাশের তলে পথে-প্রান্তরে রাত কাটাচ্ছে, সে দেশে উপাসনামন্দিরে সাততলা মিনার তৈয়ারে কোনো সার্থকতা নাই।[৮২]

জ্ঞানকে তিনি মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। জ্ঞানের উদ্ভব এবং বিকাশ হচ্ছে মানব কল্যাণের জন্যই। মানুষের জন্যই জ্ঞান। কুসংস্কার মুক্ত না হওয়ার কারণেই মানুষ নিজ গৃহে ঈশ্বরকে না খুঁজে পাহাড়ে-পর্বতে সন্ধান করছে। মানুষ নিজেকে খোঁজে না খোঁজে ঈশ্বর। মানুষ নিজের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান না করে পাহাড়ে-পর্বতে সন্ধান করছে। ফলে মানুষ নিজেকে ভালোবাসে না। যে মানুষ নিজেকে ভালোবাসে না সে অন্যকেও ভালোবাসতে জানে না। কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন,

কে তুমি খুঁজিতেছ জগদীশ ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে;
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায়, ঋষি দরবেশ,

---

[৮২] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৮

বুকের মানিকে বুকে ধ'রে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।

সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে,[৮৩]

'মনের অস্থিরতা' কবিতায় আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

নির্দোষ জগৎপতি; জ্ঞানহীন লোক

সংকল্পোদোষেতে পায় পদে পদে শোক।[৮৪]

আরজ আলী মাতুব্বর মনে করেন, পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটির অভাব থাকলে, ঐ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না। যে অন্ধ বা বধির, তার আলো বা শব্দের জ্ঞান হয় না। মৃত্যুতে মানুষের দেহ নষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিও নষ্ট হয়। আরজ আলী মাতুব্বরের জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করে দেখা যায় তিনি পঞ্চইন্দ্রিয় নির্ভর বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের পক্ষে মত দিয়েছে। পঞ্চইন্দ্রিয় নির্ভর জ্ঞান অভিজ্ঞাতাবাদ সমর্থন করে। এ জন্য আরজ আলী মাতুব্বরকে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে অভিহিত করা যায়।

অধিবিদ্যা

দর্শনের শাখাগুলোর মধ্যে অধিবিদ্যা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। দর্শনের সঙ্গে অধিবিদ্যার রয়েছে নিবিড় সম্বন্ধ। এজন্য প্রাচীনকালে অনেকে দর্শন ও অধিবিদ্যাকে সমার্থক মনে করতেন।[৮৫] সরদার ফজলুল করিম *দর্শনকোষ* গ্রন্থে লিখেছেন,

> জীবন ও জগতের যে-কোনো সমস্যাই গোড়াতে দর্শনের আওতাভুক্ত থাকলেও দর্শনের মূল প্রশ্ন হিসাবে বিশ্বসত্তার প্রকৃতি, মানুষের জ্ঞানের ক্ষমতা অক্ষমতার প্রশ্ন, বস্তু ও ভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের চিন্তা প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায় বা যুক্তি এবং মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধের ভিত্তি ও তার বিকাশের প্রশ্নগুলি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত দর্শনের নিজস্ব আলোচনার বিষয় হিসাবে পরিণত হয়ে আসছে। দর্শনের এই মূল বিষয়কে মেটাফিজিকস্ অধিবিদ্যা বা পদার্থ-অতিরিক্ত বিদ্যা বলে অনেক সময় অভিহিত করা হয়।[৮৬]

---

[৮৩] কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫, পৃ. ৫৭
[৮৪] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩২
[৮৫] গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্য-সার*, অধুনা প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ৩৮
[৮৬] সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩১০

অধিবিদ্যাকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়। সাধারণত আত্মা, ঈশ্বর, দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতিক সত্তা নিয়ে দর্শনের যে শাখায় আলোচনা করা হয় সে শাখাকে অধিবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজি metaphysics শব্দের অর্থ করা হয়েছে, the branch of philosophy that deals with the nature of existence truth and knowledge.[৮৭] পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়গুলোকে অধিবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। অধিবিদ্যা সম্পর্কে গোবিন্দচন্দ্র দেব লিখেছেন,

> খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মহাপণ্ডিত আরিষ্টটল সে যুগের প্রচলিত সর্ববিদ্যার সার-সংগ্রহ প্রণয়নের চেষ্টা করেন। সেই গ্রন্থে ফিজিক্স বা পদার্থ-বিদ্যা আলোচনা করার পর তিনি তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা শুরু করেন। আর সেই জন্যেই মেটা অর্থাৎ পরবর্তী এই উপসর্গ ফিজিক্স বা পদার্থ বিদ্যার আগে যোগ দিয়ে আকস্মিকভাবে তত্ত্ব-বিদ্যার মেটা-ফিজিক্স নামকরণ আরিষ্টটল করেন।[৮৮]

অ্যারিস্টটলের ভাষায় অধিবিদ্যা হল, *meta ta phusika*.[৮৯] অধিবিদ্যাকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হলে এর একটি সাধারণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

> এ জগতের পেছনে কোনো শাশ্বত চিরন্তন সত্য আছে কি-না, থাকলে তা' এক না বহু, না এক হয়েও বহু এবং বহু হয়েও এক, তা'কি আমাদের চিত্তবৃত্তির মতো চেতন, বা বাহ্য ও স্থুল পদার্থের মতো অচেতন না জড়-চেতনের মধ্যবর্তী কোনো নিরপেক্ষ সত্তা তা' কি সপ্রাণ না নিষ্প্রাণ - এ সমস্ত প্রশ্ন দর্শনের যে এক বিশেষ শাখায় আলোচিত হয় তারই নাম তত্ত্ব-বিদ্যা বা মেটাফিজিক্স।[৯০]

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর অধিবিদ্যায় আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে যৌক্তিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মানব জীবনে অধিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের যৌক্তিক দৃষ্টবাদী দার্শনিকেরা অধিবিদ্যার অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। তাদের মতে অধিবিদ্যার আলোচনা কতগুলি অর্থহীন প্রশ্ন ও এর উত্তর দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁরা দেখিয়েছেন অধিবিদ্যার যাবতীয় বাক্যই অর্থহীন। অর্থহীন বাক্যের আলোচনাও অর্থহীন। আরজ আলী মাতুব্বর মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অধিবিদ্যার অর্থহীতা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অধিবিদ্যায় ব্যবহৃত বাক্যগুলো মানুষকে প্রতারিত করে। সামাজিক মানুষকে কুসংস্কারগ্রস্ত করতে সাহায্য করে অধিবিদ্যা।

আরজ আলী মাতুব্বর *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থটি, আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম, প্রকৃতি ও বিবিধ নামে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলো সবই অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয়। স্থান, কাল এবং শক্তি নিয়েও তিনি আলোচনা

---

[৮৭] *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Eighth edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS.
[৮৮] গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্য-সার*, পৃ. ৩৮
[৮৯] D. W. Hamlyn, *Metaphysics*, Cambridge university press, London, 1984, p. 1
[৯০] গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্য-সার*, পৃ. ৩৮

করেছেন। তাঁর *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রস্তাবের নাম 'ঈশ্বর বিষয়ক'।[৯১] জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে মাতুব্বর যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা দর্শনের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক থেকে মুসলিম দার্শনিক এবং আধুনিক যুগের দার্শনিকেরা আলোচনা করেছেন। ঈশ্বরের সাথে জীব ও জগতের সম্পর্ক নিয়ে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism), সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism), এবং সর্বধরেশ্বরবাদ বা ঈশ্বরবাদ (Panentheism or Theism) নামে মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরের সাথে জগৎ ও জীবনের সম্পর্ক নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেছেন সংলাপের আকারে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোতে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ দেখার পেছনে যেসব যুক্তি রয়েছে সেগুলো নিয়ে মাতুব্বর প্রশ্নাকারে বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজের মত উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহর রূপ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> জগতের প্রায় সকল ধর্মই একথা স্বীকার করে যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার ও সর্বব্যাপী। কথা কয়টি অতীব সহজ ও সরল। কিন্তু যখন হিন্দুদের মুখে শোনা যায় যে, সৃষ্টি পালনের উদ্দেশ্যে ভগবান মাঝে মাঝে সাকারও হইয়া থাকেন ও যুগে যুগে 'অবতার'রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া লীলা প্রকাশ করেন এবং যখন খৃষ্টানদের নিকট শোনা যায় যে, পরম সত্তা - 'ভগবান, মশীহ, পরমাত্মা' – এই ত্রিত্বে প্রকাশ পাইতেছে ; আবার যখন মুসলিম ধর্মযাজকদের নিকট শোনা যায় যে, আল্লাহতালা আরশে 'কুরছি'র উপর বসিয়া রেজওয়ান নামক ফেরেস্তার সাহায্যে বেহেস্ত, মালেক নামক ফেরেস্তার সাহায্যে দোজখ, জেব্রাইলের সাহায্যে সংবাদ এবং মেকাইলকে দিয়া খাদ্য বন্টন ও আবহাওয়া পরিচালনা করেন – তখনই ধাঁধায় পড়ে, বুদ্ধি বিগড়াইয়া যায়। মনে প্রশ্ন জাগিতে থাকে – নিরাকার সর্বশক্তিমান ভগবানের সৃষ্টি পালনে সাকার হইতে হইবে কেন? অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহত্ব প্রকাশে ত্রিত্বের আবশ্যক কি? সর্বব্যাপী আল্লাহতা'লার স্থায়ী আসনে অবস্থান কিরূপ এবং বিশ্বজগতের কার্য পরিচালনার জন্য ফেরেস্তার আবশ্যক কি?[৯২]

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণযোগ্য নয়। বিশ্বাসের উপর সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি নির্ভর করে। সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমান হলে তাঁর বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তরের প্রয়োজন থাকে না। ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজ করলে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য যানবাহনের প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, "সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজিত। তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য দূরে যাইতে হইবে কেন? আল্লাহতালা ঐ সময় কি হযরত (দ.)-এর অন্তরে বা তাঁহার গৃহে, মক্কা শহরে অথবা পৃথিবীতেই ছিলেন না?"[৯৩] তাছাড়া ঈশ্বর সর্বত্র সবসময়

---

[৯১] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৩
[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

থাকলে নাপাক বস্তু বলে কিছু থাকে না। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, "ধর্ম যদিও ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বে সন্দেহ করে না, কিন্তু একথাও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে না যে, জগতের যাবতীয় জৈব–অজৈব, পাক এবং নাপাক সকল বস্তুই ঈশ্বরে ভরপুর। বিশ্বাস যদি করিত, তবে নাপাক বস্তুকে ঘৃণা করিবার কারণ কি?"[৯৪] এক ধর্মে বিশ্বাসীদের নিকট যা পবিত্র অন্য ধর্মের নিকট তা নাপক। ঈশ্বরের উপস্থিতি সব স্থানে সবসময় থাকলে নাপাক, অপবিত্র, অচ্ছুতের মধ্যেও ঈশ্বর থাকার কথা। আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। আকাশ এবং জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। আরজ আলী মাতুব্বরের মতে,

> পৃথিবীর দ্রব্যাদির মধ্যে কতক দ্রব্য ধর্মীয় বিধানে নাপাক (অপবিত্র)। কিন্তু সে সকল কি আল্লাহর কাছেও নাপাক? যদি তাই হয়, তবে তাহা তিনি সৃষ্টি করিলেন কেন? আর যদি না হয়, তবে নাপাক অবস্থায় তাঁহার গুণগান করিলে তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিবেন কেন? বলা হয় যে, আল্লাহ সর্বত্র বিদ্যমান। যদি তাই হয়, তবে নাপাক বস্তুর ভিতরে আল্লাহ্‌র অবস্থিতি নাই কি?[৯৫]

ধর্ম বিশ্বাসীরা বলে থাকেন আল্লাহ্‌র অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে না। আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন কিছু না ঘটলে জীবের পাপ বা দোষ বলে কিছু থাকে না। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, "বলা হয় যে, আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে না। এমনকি গাছের পাতাও নড়ে না। বিশেষত তাঁহার অনিচ্ছায় যদি কোন ঘটনা ঘটতে পারে তাহা হইলে 'তাঁহার' সর্বশক্তিমান' নামের সার্থকতা কোথায়? আর যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই সকল ঘটনা ঘটে, তবে জীবের দোষ বা পাপ কি?"[৯৬] আল্লাহ সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন। তাঁর অনিচ্ছায় কোন কিছু হয় না। তাই যদি হয় তাহলে মানুষের পাপ-পুণ্য লিখে রাখার জন্য ফেরেস্তার প্রয়োজন কী? এ সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

> ধর্মযাজকেরা বলিয়া থাকেন, মানুষের পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের কাঁধে দুইজন করিয়া ফেরেস্তা বসিয়া আছেন। তাঁহারা আরো বলিয়া থাকেন যে, ঐ ফেরেস্তাদের রিপোর্ট অনুসারেই খোদাতা'লা মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন। বলা হয় যে, আল্লাহ্‌ সর্বদর্শী ও সর্বশক্তিমান। তবে মানুষের কৃত পাপ-পুণ্য তিনি কি নিজে দেখেন না? অথবা দেখিলেও মানুষের সংখ্যাধিক্যের জন্যই হউক অথবা সময়ের দীর্ঘতার জন্যই হউক, বিচার দিন পর্যন্ত উহা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই কি?[৯৭]

ফেরেস্তাদের সংখ্যা নিয়েও আরজ আলী মাতুব্বরের জিজ্ঞাসা ছিল। একজন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাঁধের ফেরেস্তা কি অন্য মানুষের কাঁধে যায় না কি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অবসরে থাকবেন? ইত্যাদি তাঁর জিজ্ঞাসা।

---

[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
[৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

ধর্মে বলা হয় ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু সর্বত্র বিরাজমান। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, “ঈশ্বর সদয়ও নহেন এবং নির্দয়ও নহেন। তিনি নিরাকার, নির্বিকার ও অনির্বচনীয় এক সত্তা। যদি তাহা নাই হয়, তবে পৃথিবীতে শিশুমৃত্যু, অপমৃত্যু, এবং ঝড়-বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাণহানিকর ঘটনাগুলির জন্য তিনিই কি দায়ী নহেন?”[৯৮] মৃত্যু পর কবরে আজাব নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, “আকস্মিক দুর্ঘটনায় বহুলোক মারা যায়, যাহাদের লাশ কবরস্থ হয় না। উহারা জলে-স্থলে ইতস্তত পড়িয়া থাকিয়া শিয়াল-কুকুর ও কাক-শকুনের ভক্ষ্য হয়। উহাদের গোর আজাব হয় না কি? হইলে কিরূপ হয়?”[৯৯]

আল্লাহ্ নিরাকার। প্রাণও দেখা যায় না। কিন্তু প্রাণের উপস্থিতি প্রমাণযোগ্য। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, “আল্লাহ’ নিরাকার এবং জীবের ‘প্রাণ’ও নিরাকার। যদি উভয়ই নিরাকার হয়, তবে ‘আল্লাহ্’ এবং ‘প্রাণ’ – এই দুইটি নিরাকারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?”[১০০] সুফি দর্শনে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টের মিলনই তাদের মূল কথা। সৃষ্টিতে বিলীন হয়ে যাওয়াই মুখ্য। মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। মনের মানুষের সাথে মিলন বাউল দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। এই মনের মানুষই পরমাত্মা।

আল্লাহ নিরাকার এবং মহাশক্তিধর। তিনি ইচ্ছা করলে সৃষ্টি করেন আবার ধ্বংসও করতে পারেন। আল্লাহ নিরাকার এবং আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেস্তাও নিরাকার। আরজ আলী মাতুব্বরের জিজ্ঞাসা ছিল, “আল্লাহ নিরাকার, চেতনাবিশিষ্ট ও কর্মক্ষম এক মহাশক্তি। পক্ষান্তরে নিরাকার, চেতনাবিশিষ্ট ও কর্মক্ষম আর একটি সত্তাকে ‘ফেরেস্তা’ বলিয়া স্বীকার করিলে আল্লাহ অতুলনীয় থাকেন কিরূপে?”[১০১] ফেরেস্তাদের সৃষ্টি নিয়েও আরজ আলী মাতুব্বরের জিজ্ঞাসা ছিল। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> কেহ কেহ বলেন যে ফেরেস্তারা নূরের তৈয়ারী। ‘নূর’ বলিতে সাধারণত বোঝা যায় যে, আলো বা রশ্মি। সাধারণ আলো অদৃশ্য নয়, উহা দৃশ্যমান পদার্থ। কিন্তু বিশ্বে এমন কতকগুলি বিশেষ আলো বা রশ্মি আছে, যাহা চক্ষে দেখা যায় না। যেমন - আল্‌ফা রশ্মি, কস্‌মিক রশ্মি, ইত্যাদি। বিজ্ঞানীগণ নানা কৌশলে ইহাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহাদের গুণাগুণও প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ উহার কোন রকম রশ্মির দ্বারা তৈয়ারী ফেরেস্তার সন্ধান পাইতেছেন না। ফেরেস্তারা কোন্ জাতীয় রশ্মির (নূরের) দ্বারা তৈয়ারী?[১০২]

ফেরেস্তাদের দায়িত্ব নিয়েও আরজ আলী মাতুব্বরের জিজ্ঞাসা ছিল। অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারলে তিনি কেন ধ্বংস করতে পারেন না। এ জন্য ইস্রাফিল নামক ফেরেস্তার শিঙ্গা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কেন? আজ্রাইলের বা প্রয়োজন কি? আজ্রাইলের সংখ্যাই বা কত? মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির

---

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
[১০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
[১০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
[১০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

সঙ্গে আজ্রাইলের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা? চাঁদের ফজিলত ইত্যাদি জিজ্ঞাসা ছিল মাতুব্বরের। জিজ্ঞাসাগুলোর মধ্যেই ছিল তার উত্তর।

দেশ এবং কাল অধিবিদ্যার একটি মৌলিক আলোচনার বিষয়। আধুনিক দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে দেশ এবং কালের ধারণা অভিজ্ঞতা থেকেই পাওয়া যায়। জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্টের মতে দেশ এবং কালের ধারণা অভিজ্ঞতাপূর্ব। আরজ আলী মাতুব্বর অভিজ্ঞতার সাহায্যে দেশ এবং কাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে স্থান অনাদি এবং অনন্ত। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই কোন না কোন সময়ে উৎপত্তি হইয়াছে। এমনকি পবিত্র *বাইবেল* গ্রন্থে সৃষ্টির দিন-তারিখও দেওয়া আছে। সে যাহা হউক, কোন কিছু বা সব কিছু সৃষ্টির পূর্বে – পদার্থশূন্য থাকিলেও যে 'স্থান' ছিল না তাহা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং বলিতে হয় 'স্থান অনাদি'।
>
> পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি সৃষ্টি হইয়া কোন 'স্থান'-এ অবস্থান করিতেছে এবং উহারা বিলয় হইলেও ঐ স্থানসমূহ থাকিবে। কেননা, শূন্যস্থান কখনও বিলয় হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয় যে, 'স্থান অনন্ত'।[১০৩]

স্থানের মত কালও অনন্ত অসীম। কালের কোন সীমা নেই। কাল এক মাত্রা বিশিষ্ট। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য কালকে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত হিসাবে ব্যবহার করি। বর্তমানকে অনেকে মানতে চায় না। কাল অনাদি এবং অনন্ত উল্লেখ করে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

> ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কোন এক সময়ে। কিন্তু 'সময়'কে সৃষ্টি করিয়াছেন কোন্ সময়ে, তাহার কোন হদিস পাওয়া যায় না। এরূপ কল্পনা করা মোটেই কষ্টকর নয় যে, এমন একটি সময় ছিল, যখন কোনরূপ সৃষ্টিই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে যে 'কাল' ছিল না, তাহা কল্পনা করা যায় না। কাজেই বলিতে হয় যে কাল 'অনাদি'। পক্ষান্তরে – মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইবার পর – কাল আর থাকিবে না, তাহাও মানব কল্পনার বাহিরে। সুতরাং কাল 'অনন্ত'।[১০৪]

স্থান এবং কালের মত শক্তিও অনন্ত। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, "কোন পদার্থ বা পদার্থের অনুপরমাণুও যেমন শক্তিহীন নয়, তেমন সৌরজগত, নক্ষত্র বা নীহারিকা জগৎ অথবা তাহারও বহির্দেশের কোথায়ও শক্তিবিরল জায়গা নাই। শক্তি কোন স্থানে সীমিত নয়। অর্থাৎ 'শক্তি অসীম'।"[১০৫] শক্তিকে আরজ আলী মাতুব্বর নিরাকার হিসাবে অভিহিত করেছেন। শক্তির কোন আকার নেই। শক্তির রূপান্তর আছে। আরজ আলী মাতুব্বরের জিজ্ঞাসা, সৃষ্টিকর্তার মত শক্তিও কি অনাদি, অনন্ত, নিরাকার? এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

---

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
[১০৫] প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৭

ঈশ্বর যেমন অনাদি, অনন্ত অসীম ও নিরাকার, তেমনই স্থান, কাল ও শক্তি – ইহারা সকলেই অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহারা কি সৃষ্টি না অসৃষ্ট। অর্থাৎ ঈশ্বর কি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না অনাদিকাল হইতে ইহারা স্বভাবতই বিদ্যমান আছে? যদি বলা হয় যে, ইহারা স্বভাবতই বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে ইহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে ; এবং যদি বলা হয় যে, ইহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি – তবে পরমেশ্বর 'স্থান'কে সৃষ্টি বলিলেন কোন স্থানে থাকিয়া, কালকে সৃষ্টি করিলেন কোন কালে এবং শক্তিকে সৃষ্টি করিলেন কোন শক্তির দ্বারা?"[১০৬]

স্থান, কাল এবং শক্তি নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরের জিজ্ঞাসার উত্তর ধর্ম এবং ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে পাওয়া সম্ভব নয়। কাল এবং ঈশ্বর উভয়ই অনাদি। আরজ আলী মাতুব্বরের জিজ্ঞাসা ছিল এমন কোন কাল নিশ্চয়ই ছিল যখন কোন সৃষ্টি ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "যখন হইতে ঈশ্বর আছেন, তখন হইতে কালও আছে। সেই 'অনন্ত কাল'–এর সাথে কয়েক হাজার বা কোটি বৎসর সময়ের তুলনাই হয় না। এমন এক কাল নিশ্চিয়ই ছিল, যখন কোনরূপ সৃষ্টিই ছিল না। সেই 'অনাদি কাল'কে আমরা বলিতে পারি 'অনাদি যুগ' বা 'অসৃষ্ট যুগ'। সেই অনাদি-অসৃষ্ট যুগে পরমেশ্বর কি করিতেন?"[১০৭]

অধিবিদ্যক বাক্যগুলোকে আরজ আলী মাতুব্বর সংলাপের আকারে যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে যৌক্তিকদৃষ্টবাদীরা ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্যে অধিবিদ্যার অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। যৌক্তিকদৃষ্টবাদীদের আগে দার্শনিকদের বক্তব্য ছিল অধিবিদ্যার জ্ঞান সম্ভব নয় এই কারণেই অধিবিদ্যা বর্জন করা উচিত। আরজ আলী মাতুব্বর দেখিয়েছেন অধিবিদ্যক বাক্যগুলো মানুষকে কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষে পরিণত করে। এ কারণেই তিনি অধিবিদ্যা বর্জনের কথা বলেছেন।

মূল্যবিদ্যা

আরজ আলী মাতুব্বর আদর্শ বা মানকে সামনে রেখে সমাজের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় চিন্তা করেছেন। আদর্শকে সামনে রেখেই তিনি কুসংস্কারমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ এসব মূল্যবিদ্যার আলোচনার বিষয়। মাতুব্বরের নীতিচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর মূল্যবিদ্যা আলোচনা করা হবে। প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন।

[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮, ৬৯

নীতিচিন্তা

মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ নিয়ে পাশ্চাত্যের আদর্শগত নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়। প্রাচ্যের নীতিতত্ত্ব মানুষের জীবন-ঘনিষ্ঠ। মানুষের জীবনের কল্যাণই প্রাচ্যের নীতিতত্ত্বের ভিত্তি। গৌতম বুদ্ধ মানুষের জীবনের শুধু শান্তি কামনা করেননি। তিনি জগতের সকল প্রাণীর সুখ কামনা করেছেন। জগতের সকল প্রাণীর সুখ কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার পথও দেখিয়েছেন। সুখবাদীরা সুখকে জীবনের চরম লক্ষ্য হিসাবে ধরে নিয়েছেন। উপযোগবাদীরা সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ কামনা করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল উপযোগবাদ সম্পর্কে লিখেছেন, "যাঁদের এ মতবাদ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন এপিক্যুরাস (Epicurus) থেকে বেনথাম (Bentham) পর্যন্ত সকল লেখকই উপযোগ সূত্রটি দ্বারা এ মতই বুঝিয়েছেন যে, উপযোগ সুখের বিপরীতধর্মী কিছু তো নয়ই, বরং উপযোগ বলতে সুখকেই বোঝায়, যে সুখ বেদনার অনুপস্থিতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।"[১০৮] উপযোগবাদ একটি নীতিতাত্ত্বিক আলোচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় উপযোগবাদীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেনথাম, জেমস মিল এবং জন স্টুয়ার্ট মিল। তাঁরা সুখকে তাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মননজগতে পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী চিন্তাধারা প্রভাব ফেলে। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ উপযোগবাদ দিয়ে প্রভাবিত ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে আরজ আলী মাতুব্বরের নীতিচিন্তায় উপযোগবাদী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনিও সর্বাধিক লোকের সুখ কামনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সমাজ কুসংস্কারমুক্ত হলে সুখ প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই সুখ কামনার আগে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা জরুরি।

মানুষ একা এককভাবে সুখী হতে পারে না। সমষ্টিগত মানুষের সুখই একক মানুষের সুখে পরিণত হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের সুখের জন্য সামাজিক সুখ প্রযোজ্য। সমাজে অসুখ থাকলে সে বিষে একক মানুষও আক্রান্ত হয়। আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের অসুখ দূর করার জন্য কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস মুক্ত সমাজ নির্মাণের জন্য কাজ করেছেন। তাঁর *সত্যের সন্ধান* এবং *সৃষ্টি রহস্য* সমাজের মধ্যে জমে থাকা কূপমণ্ডুকতা, অন্ধতা, কুসংস্কার মুক্ত করতে সহায়তা করেছে। *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থের উপসংহারে তিনি লিখেছেন, "আধুনিককালের অধিকাংশ মানুষ চায় কুসংস্কার হইতে মুক্তি, চায় সত্যের সন্ধান। ধর্মরাজ্যের যত্রতত্র

[১০৮] জন স্টুয়ার্ট মিল, *উপযোগবাদ*, হাসনা বেগম (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২১

অল্পাধিক কুসংস্কার স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। আবার সভ্য মানব সমাজে এমন কোন মানুষ নাই, যিনি কোনও না কোন ধর্মের আওতাভুক্ত নহেন। কাজেই এরূপ মানুষও অল্পই আছেন, যাঁহাদের কোনরূপ কুসংস্কার স্পর্শ করে নাই।"[১০৯] তারপরও সমাজে কিছু অগ্রগামী মানুষ থাকেন, যারা নিজে কুসংস্কার মুক্ত হয়ে সত্য প্রতিষ্ঠায় অন্যকে সহযোগিতা করেন। এরা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সত্য হিসাবে ধরে নিজে সমাজের মধ্যে জমে থাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে আলো ফেলেন। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ দিয়েই সমাজ আলোকিত হয়।

বিজ্ঞানের সুফল মানুষের জীবন সহজ ও সরল করেছে। বিজ্ঞান মানুষকে বস্তু নির্ভর করেছে। তারপরও ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বহু বিজ্ঞান নির্ভর মানুষও কুসংস্কারে নির্ভর করে। পাথরে-কবরে-তাবিজে বিশ্বাস, গঙ্গাস্নানে পাপস্খলন ইত্যাদি এর ব্যতিক্রম নয়। অতিপ্রাকৃতিক-অলৌকিক-অবৈজ্ঞানিক শক্তিতে বিশ্বাসের ব্যবহারিক মূল্য শূন্যের কোঠায় হলেও বহু মানুষ ভূতে-ভগবানে আস্থা রেখে সান্ত্বনা খোঁজে। অক্ষয়কুমার দত্ত একটি সমীকরণের সাহায্যে শুধু কুসংস্কার অর্থহীন নয়, প্রার্থনাকে অর্থহীন প্রমাণ করেছেন। তাঁর সমীকরণটি নিম্ন রূপ-

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য

অতএব

প্রার্থনা = ০

আরজ আলী মাতুব্বর প্রার্থনা এবং কুসংস্কার মুক্ত সমাজ নির্মাণের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। এ জন্য তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে কুসংস্কার থাকায় তা মুক্ত করার জন্য সংলাপের আকারে প্রশ্ন করেছেন। ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন নি। তাঁর অবস্থান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> কোন রকম গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় না দিয়া প্রত্যেক ধর্মকে যথাসম্ভব কুসংস্কারমুক্ত করা উচিত। কুসংস্কার ত্যাগ করার অর্থ 'ধর্মকে ত্যাগ করা' নহে। যদি কেহ কুসংস্কার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বলিতে চাহেন যে, কুসংস্কার ত্যাগ করিলে ধর্ম থাকিবে না, তাহা হইলে মনে আসিতে পারে যে, ধর্মরাজ্যে কি কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নাই? এ প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। আমাদের অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। প্রত্যেকটি ধর্ম থাকিবে মিথ্যার আবর্জনাবর্জিত ও পবিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১১০]

কুসংস্কার মানুষের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করে। ধর্মীয় কুসংস্কার ব্যক্তি মানুষের জীবন এবং সামাজিক মানুষের জীবন বিপন্ন করে। এ জন্যে যুগে যুগে ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও আনুষ্ঠানিকতার সংস্কার হয়েছে। আরজ

---

[১০৯] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৫

[১১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

আলী মাতুব্বর সামাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের জন্যই কুসংস্কার বর্জিত বিশুদ্ধ ধর্মের কথা বলেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> মানব সমাজে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিলো মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ধর্মগুলো মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই করছে বেশি, অবশ্য জাগতিক ব্যাপারে। ধর্মবেত্তারা সকলেই ছিলেন মানবকল্যাণে আত্মনিবেদিত মহান পুরুষ। কিন্তু তাঁরা তাদের দেশ ও কালের বন্ধনমুক্ত ছিলেন না। তাঁদের প্রবর্তিত সেকালের অনেক কল্যাণকর ব্যবস্থাই এ কালের মানুষের অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।[১১১]

গৌতম বুদ্ধ মানুষের দুঃখ থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। দুঃখ মুক্তির উপায় তিনি বের করেছেন। কিন্তু সংসার জীবন ফেলে মানবকল্যাণে জীবন উৎসর্গ করা বর্তমানকালে সমর্থনযোগ্য নয়। তাছাড়া ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষকে জরাগ্রস্ত করে সমাজকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়। কুসংস্কারগ্রস্ত সমাজে মানবতা-মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

মানবতা বা মানবতাবাদ সম্প্রতিকালে উচ্চারিত হলেও ধারণাটি পুরাতন। 'মানবিক উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে আরজ আলী মাতুব্বর বলেছেন,

> আজকাল 'মানবতা' বা 'মানবতাবাদ' কথাটার বড় ছড়াছড়ি। দেখেশুনে মনে হয় যে, কথাটা অতি আধুনিক কালের এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা। বস্তুত তা নয়। আজ পৃথিবীতে ছোট-বড়ো যতোগুলি ধর্মমত আছে, তার প্রত্যেকটি ধর্মই 'মানবতা'কে দিয়েছে প্রাধান্য। কাঙ্গালকে ভিক্ষা দাও, দীন-দুঃখীকে সাহায্য করো, দুস্থজনের সেবা করো ইত্যাদি বাক্যগুলো সব ধর্মেই বিদ্যমান। কিন্তু অনেক ধার্মিকের কাছে ধর্মাচরণ এখন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক অনুষ্ঠান-আরাধনায়ই সীমাবদ্ধ।[১১২]

সমাজের বেশিরভাগ মানুষের আনন্দের জন্যই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সাধনা অপরিহার্য। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল কুসংস্কারের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। আরজ আলী মাতুব্বর ছিলেন সত্য ও সুন্দরের পুজারী। তিনি মানুষের সুখের জন্য সত্য, ন্যায় ও কল্যাণ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

গ্রিক দার্শনিক সোফিস্টরা মানুষের মানবিক ও নৈতিক সমস্যাবলীর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তায় মানবিক এবং নৈতিক দিকের উপর গুরুত্ব বেশি। সক্রেটিসের জ্ঞানভিত্তিক নৈতিক সমাজের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের কুসংস্কারমুক্ত সমাজের পার্থক্য খুব বেশি নেই। সক্রেটিস প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানকে অভিন্ন মনে করেছেন।[১১৩] কুসংস্কার মুক্ত মানুষই কেবল জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান হতে পারে। আরজ আলী মাতুব্বর বিশ্বাস করতেন জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও কুসংস্কারমুক্ত মানুষই সমাজের সুখ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

---

[১১১] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৩

[১১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

[১১৩] ফেরদৌসী বেগম, *আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে মানবতাবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা* গ্রন্থে গ্রীক দার্শনিক থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তার মিল দেখিয়েছেন।

আরজ আলী মাতুব্বরকে ফেরদৌসী বেগম ‘পরার্থবাদমূলক নীতিবিদ’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[১১৪] পরার্থবাদের মূল বিষয় হল মানুষের কল্যাণ। “পরার্থপরতা শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জীবজন্তুর জগতেও এ ধরনের স্পৃহা দেখা যায়। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পরার্থপরতা হল সে ধরনের আচরণ যা পালন করতে গিয়ে সমাজের একজন সদস্য ত্যাগের অথবা ঝুঁকির বিনিময়ে অন্যদের উপকৃত করে।”[১১৫] আরজ আলী মাতুব্বর পরার্থপরতার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। তিনি সত্যের সন্ধানের জন্য জেলে গিয়েছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ আঠারো বছর কঠোর সাধনা করে ধর্মীয় কতিপয় অন্ধবিশ্বাসকে দর্শনের উত্তাপে গলিয়ে তা বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢেলে তার একটি তালিকা তৈরী করছিলাম প্রশ্নের আকারে ১৩৫৭ সালে। এ সময় স্থানীয় গোঁড়া বন্ধুরা আমাকে ‘ধর্মবিরোধী’ ও ‘নাখোদা’ (নাস্তিক) বলে প্রচার করতে থাকে এবং আমার সে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম ছেড়ে শহর পর্যন্ত। লোক পরম্পরায় আমার নামটি শুনতে পেয়ে তৎকালীন বরিশালের ল-ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তাবলীগ জামায়াতের আমীর জনাব এফ. করিম সাহেব সদলে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন ১৩৫৮ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার বাড়িতে এসে, এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বরিশালে গিয়ে তিনি আমাকে এক ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করেন ‘কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়ে।[১১৬]

আরজ আলী মাতুব্বর কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন না। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল না। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার জন্যই তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলে নির্যাতন করা হয়েছে। শাসক শ্রেণির অজ্ঞতার কারণেই আরজ আলী মাতুব্বর নির্যাতিত হয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আরজ আলী মাতুব্বর ৬০ বছর বয়সের পর যা আয় করেছেন তা মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন। ‘‘জীবনের ৬০ বৎসর পর্যন্ত অর্জিত সম্পত্তি তিনি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। পরবর্তী ২১ বছরে অর্জিত সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি উইল করিয়া জনকল্যাণমূলক কাজে দান করেন।’’[১১৭] তিনি মরণোত্তর চক্ষু দান করেছেন। মানবকল্যাণের জন্য তিনি তাঁর মৃতদেহটি দান করেছেন বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> মেডিক্যালে আমার দেহদানের কারণ মায়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আমার মরদেহটি দ্বারা মানবকল্যাণের সম্ভাবনা বিধানে আমার সজীব মনের পরিতোষ ও আনন্দলাভের প্রয়াসমাত্র। আমার মরদেহটির সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজের শল্যবিদ্যা শিক্ষার্থীগণ শল্যবিদ্যা আয়ত্ত করবে,

---

[১১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[১১৫] আকবর আলি খান, *পরার্থপরতার অর্থনীতি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৩, পৃ. ৩

[১১৬] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯১

[১১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

> আবার তাদের সাহায্যে রুগ্ন মানুষ রোগমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। আর এসব প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাকে দিয়েছে মেডিক্যালে শবদেহ দানের মাধ্যমে মানবকল্যাণের আনন্দলাভের প্রেরণা।[১১৮]

মৃত্যুর পর শবদেহটি বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে দেয়ার জন্য আরজ আলী মাতুব্বর প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংকে জমা রেখে গেছেন। এ সম্পর্কে অছিয়তনামায় তিনি উল্লেখ করেছেন,

> মৃত্যুর পরে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে আমার শবহেদটি পৌঁছাইবার ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে আমি বরিশাল জনতা ব্যাংক (চকবাজার শাখা একাউন্ট নং ৪১৫৮ তাং ২০.৭.৮২)-এ একটি সেভিংস একাউন্ট ফাণ্ড করিয়াছি এবং এতদুদ্দেশ্যে সেই ফাণ্ডে অন্যুন ৫০০.০০ টাকা সতত মজুত থাকিবে। আমার মৃতদেহটি লইয়া তোমাদের মেডিক্যাল কলেজে যাতায়াত খরচ ও ফটো তোলা ইত্যাদি যাবতীয় খরচ তোমরা সেই ফাণ্ড হইতে বহন করিবা এবং তোমাদের ইচ্ছা হইলে কাফন, সমাগতদের অভ্যর্থনা ইত্যাদি খরচও সেই ফাণ্ড হইতে বহন করিতে পারিবা।[১১৯]

নিজের মৃত্যু দিবসটি পালনের জন্য আরজ আলী মাতুব্বর ব্যাংকে অর্থ রেখে গেছেন। অছিয়তনামায় মৃত্যুদিবস পালনের নিয়মাবলির উল্লেখ রয়েছে।[১২০] আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তার সঙ্গে কর্মের এবং জীবনের সঙ্গে আদর্শের মিল রয়েছে। তাঁর জীবনযাপনের চিন্তা, কর্ম এবং আদর্শ একই সূত্রে গাঁথা। তিনি যা চিন্তা করেছেন তাই জীবনে অনুসরণ করেছেন। তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ এবং নীতিবান। আরজ আলী মাতুব্বরের ব্যক্তিগত সততা এবং কর্তব্যপরায়ণতার বর্ণনা দিয়ে আইয়ুব হোসেন লিখেছেন,

> তাঁর বাড়ি থেকে বরিশাল শহর প্রায় ১১ কিলোমিটারের পথ। যাতায়াত করতেন নৌকায় চেপে। সপ্তাহের অধিকাংশ দিন শহরে যেতেন লাইব্রেরীতে পড়াশোনা বা সমমনা লোকজনের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য। সচরাচর পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন মাঝি আমজাদ আলীর নৌকায় আসা যাওয়া চলতো। একারণে মাঝি তার যাবার এবং ফেরার সময় কিছুটা সময় দেখে নিত তিনি আসেন কিনা। একদিন মাঝি তার নৌকা যাত্রীতে ভরে গেলেও অপেক্ষা করছে তার জন্য। তিনি এলেন হন্তদন্ত হয়ে। নৌকায় চড়ে বললেন, আজ পকেটে কিন্তু একটি পয়সা নেই। বাকিতে নিয়ে যাবে? মাঝি সাগ্রহে সম্মতি দিলে উঠে বসলেন তিনি। বাড়ি ফিরে পড়াশোনায় মগ্ন হন। রাত দুটোর দিকে মনে পড়ে তার মাঝির কথা। হ্যারিকেন জ্বেলে নাতিকে (ফরিদ) ঘুম থেকে উঠিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ৩ কিলোমিটার দূরবর্তী মাঝির বাড়িতে। ভুলে গেলেন বলে বারবার ক্ষমা চাইলেন। মাঝি তো বিস্ময়ে হতবাক। ব্যক্তিগত সততার এমন বহু ঘটনার কথা জানা যায় তাঁর সম্পর্কে।[১২১]

সক্রেটিসের ন্যায়পরায়ণতা এবং কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে আরজ আলী মাতুব্বরের মিল পাওয়া যায়। সক্রেটিস মৃত্যুর সময় ক্রিটোকে মোরগের মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশই ছিল সক্রেটিসের শেষ কথা। এর পর তিনি আর কোন কথা বলতে পারেননি। ফিডো সংলাপে ক্রিটোকে সক্রেটিস বলেছিলেন,

---

[১১৮] প্রগুক্ত, পৃ. ২৪৬
[১১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
[১২০] প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ২৩২
[১২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮, আরজ আলী মাতুব্বরের রচনা সমগ্রের প্রথম খণ্ডের নিবেদনে আইয়ুব হোসেন মাতুব্বর সম্পর্কে উপরের মন্তব্যটি করেছেন।

"ক্রিটো এ্যাসক্লেপিয়াসের নিকট আমি একটি মোরগের ঋণে ঋণী রয়েছি। তুমি দয়া করে ঋণটি পরিশোধ করে দিও।"[১২২] আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর জীবনের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে গেছেন। প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংকে রেখে গেছেন। এমনকি মৃত্যুর পর শবদেহের যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্যও প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং অর্থ ব্যাংকে জমা রেখে গেছেন।

ফেরদৌসী বেগম আরজ আলী মাতুব্বরের নীতিচিন্তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "আরজ আলী মাতুব্বর প্লেটোর মতো ভাববাদী না হলেও নৈতিকতার আলোকে মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন।"[১২৩] মাতুব্বেরের চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু ছিল মানুষের মর্যাদা। তিনি মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুসংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছেন। কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষ কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করে। ফলে তার ভেতরের শক্তিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। সে নিজের কল্যাণও করতে পারে না, অন্যের সাহায্যেও আসে না। সে নিজের অজ্ঞতা দিয়ে অন্যকেও কুসংস্কারগ্রস্ত করে। এরা সমাজে অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়। আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষকে সত্যিকারের মানবিক মর্যাদা সম্পন্ন মানুষে পরিণত করতে চেয়েছেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় কুসংস্কারমুক্ত সমাজে আরজ আলী মাতুব্বর অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ কামনা করেছেন। আধুনিক-যুগের পাশ্চাত্যের উপযোগবাদীরও সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ কামনা করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরও উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের কথা বলেছেন। এজন্যই আরজ আলী মাতুব্বরের নীতিচিন্তাকে উপযোগবাদ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

রাষ্ট্রচিন্তা

আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম গ্রামে। বড় হয়েছেন গ্রামীণ পবিবেশে। থেকেছেন গ্রামে। শহরে এসেছেন প্রয়োজনে। প্রয়োজন শেষে গ্রামে ফিরে গেছেন। গ্রামই তাঁর দেশ। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ভেকের কাছে 'ডোবা'ই তার দেশ। কৃষকের 'দেশ' তার পল্লী এবং রাষ্ট্র-নেতার কাছে 'দেশ' তার গোটা রাষ্ট্র। আমার 'দেশ- সেবা' মানে 'রাষ্ট্র সেবা' নয়, পল্লী-সেবা।"[১২৪] আরজ আলী মাতুব্বর গ্রামীণ সমাজে বসবাস করেছেন। সমাজ সেবা করেছেন। সমাজের কল্যাণ কামনা করতে গিয়ে প্রথমে তিনি লাইব্রেরি স্থাপনের

---

[১২২] প্লেটো, *সংলাপ*, *প্লেটোর সংলাপ*, সরদার ফজলুল করিম (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ. ১২৬
[১২৩] ফেরদৌসী বেগম, *আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে মানবতাবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা*, পৃ. ২২
[১২৪] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩১

সাহায্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে গ্রামের মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে চেয়েছেন। গ্রাম তাঁর দেশ হলেও রাষ্ট্র কুসংস্কারমুক্ত না হলে গ্রামে রাষ্ট্রের প্রভাব থাকবেই। রাষ্ট্রের ভেতরেই গ্রাম। গ্রাম সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে তিনি রাষ্ট্র নিয়ে ভেবেছেন। রাষ্ট্র নায়ক না হলেও তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্রের কল্যাণ-অকল্যাণ শাসন-নির্যাতন তাকে ভোগ করতে হয়েছে। সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বরের যে উপলব্ধিই তা-ই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা।

স্বাধীন মতপ্রকাশের জন্য সক্রেটিসকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। রোমের ধর্মবিচারসভা (Inquisition) ১৬১৬ সালে প্রথমে গোপনে এবং ১৬৩৩ সালে গ্যালিলিওকে স্বাধীন মতপ্রকাশের দায়ে দণ্ডিত করেছিল। গ্যালিলিও তাঁর আবিষ্কারকে অমূলক বলে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে দণ্ড থেকে রক্ষা পান এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি আর কখনো এই মত ব্যক্ত করবেন না যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।[১২৫] গ্যালিলিও সরকারি চাকরি লাভ করেছিলেন। কারণ ‘‘গ্যালিলিও এবং লিওনার্দো দাবি করেন যে, তারা কামান ও দুর্গ নির্মাণের কলা-কৌশলের উন্নতি সাধনে সমক্ষম। একারণে তারা সরকারি চাকরি লাভ করেন।’’[১২৬] আরজ আলী মাতুব্বর সরকারি চাকুরে ছিলেন না। কৃষিকাজ করতেন তিনি। পাকিস্তান রাষ্ট্রে আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা ছিল অবরুদ্ধ। পাকিস্তান রাষ্ট্র মাতুব্বরের মত প্রকাশ করতে দেয়নি। গ্যালিলিওর মত মাতুব্বরও মুচলেকা দিয়ে শারীরিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য,

> *সত্যের সন্ধান*-এর পাণ্ডুলিপিখানার বদৌলতে সে মামলায় আমি দৈহিক নিষ্কৃতি পেলাম বটে, কিন্তু মানসিক শাস্তি ভোগ করতে হলো বহু বছর। কেননা তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, *সত্যের সন্ধান* বইখানি আমি প্রকাশ করতে পারবো না ও ধর্মীয় সনাতন মতবাদের সমালোচনামূলক অন্য কোন বই লিখতে পারবো না এবং পারবো না কোনো সভা-সমিতিতে-বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বমত প্রচার করতে। যদি এর একটি কাজও করি, তবে যে কোনো অজুহাতে আমাকে পুনঃ ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হবে। অগত্যা কলম-কালাম বন্ধ করে আমাকে বসে থাকতে হলো ঘরে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এভাবে নষ্ট হয়ে গেলো আমার কর্মজীবনের অমূল্য ২০টি বছর।[১২৭]

আরজ আলী মাতুব্বরের *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থটি রচনার ২২ বছর পর প্রকাশিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে *সত্যের সন্ধান* প্রকাশিত হয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে রাষ্ট্র না থাকলেও পাকিস্তান সরকার তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে প্রকাশ করতে দেয়নি। সে জন্য রাষ্ট্র সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর নীরব থেকেও রক্ষা পাননি। রাষ্ট্র তাঁকে নির্যাতন করেছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে নীরব থেকে তিনি ছিলেন সরব। তাঁর স্বাধীন চিন্তা ছিল

---

[১২৫] বার্ট্রাণ্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, *পুস্তক-৩*, প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ৪৪
[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
[১২৭] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯২

পাকিস্তান সরকারের ভীতির কারণ। এজন্য সরকার তাঁকে নির্যাতন করেছে। তাঁর মতপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে।

গ্রাম থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব। গোত্রভিত্তিক মানুষ প্রয়োজনে সমাজ গঠন করে এবং সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে আসছে আদিম কাল থেকেই।[১২৮] আরজ আলী মাতুব্বর মনে করেন আদিম কালের সমাজ ছিল ঘরোয়া সমাজ। তাঁর দৃষ্টিতে এককালে একটি বংশই ছিল একটি সমাজ। আবার কয়েকটি বংশ বা ক্লান একত্রিত হয়েও একটি সমাজ গড়ে উঠতো। তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। মানুষ ছিল প্রকৃতির রাজ্যে। প্রকৃতির রাজ্যে কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে একটি ট্রাইব গঠন করতো। ট্রাইবের প্রধানের নির্দেশই ছিল ট্রাইবের আইন। আরজ আলী মাতুব্বর মনে করেন, "কোনো কোনো সময় কতিপয় ট্রাইব একত্র হয়ে একটি বড় সমাজ গঠিত হতো, যাকে বলা হতো কনফেডারেসি অব ট্রাইব্স বা রাষ্ট্র।"[১২৯] রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে তিনি আরো লিখেছেন, "কোনো কোনো সময় নিজ ট্রাইবের সদস্যদের জীবন ধারণোপযোগী আহার্যের অভাব হলে তখন তারা পার্শ্ববর্তী ট্রাইবের উপর চড়াও হতো এবং জোরপূর্বক তাদের অঞ্চল দখল করতো । এভাবেও একাধিক ট্রাইব যুক্ত হয়ে জন্ম নিতো কোন কোন কনফেডারেসি অব ট্রইব্স বা রাষ্ট্র।"[১৩০]

রাষ্ট্র দার্শনিক হবসের (১৫৮৮-১৬৭৯) মতে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। শান্তি স্থাপনের জন্য তারা চুক্তি করে সিভিল সরকার বা রাষ্ট্র গঠন করে। "প্রকৃতির রাজ্যে সম্পদের কোনো ধারণা ছিল না, ছিল না কোনো ন্যায়বিচার বা অবিচার; ছিল শুধু যুদ্ধ।"[১৩১] ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের মতে, সমাজ গঠনের আগে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছে। "প্রকৃতির রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সুশীল সরকার বা সমাজ (civil government) গঠন করে।"[১৩২] জাঁ জ্যাক রুশো *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে লিখেছেন, "নাগরিকদের সমবায়ে গঠিত এমন সংস্থাকে প্রাচীনকালে একটা নগর বা নগর-রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করা হত। পুরাতন সেই অভিধার স্থলে আজ আমরা তাকে একটা রিপাবলিকান বা রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে অভিহিত করে থাকি। এবং এই সংস্থাকেই মানুষ তার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় 'রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করে।"[১৩৩] রাষ্ট্র সমাজ বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে সৃষ্টি। কিন্তু রাষ্ট্র মানুষকে শোষণ করছে। রাষ্ট্রকে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

---

[১২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০
[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০
[১৩০] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮১
[১৩১] বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস - ১*, প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ৫৯
[১৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
[১৩৩] জাঁ জ্যাক রুশো, *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, সরদার ফজলুল করিম (অনূদিত), মওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃ. ৩৭,৩৮

আদিম সাম্যবাদী সমাজেও ধর্ম ছিল। মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে ধর্ম প্রবর্তিত হলেও পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত ধর্ম দ্বারা মানুষ শোষিত হচ্ছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ধর্মকে শোষকের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে। পুঁজিবাদ পুরোহিততন্ত্রকে সমর্থন করে। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন,

> এ-কথাটি প্রথমেই স্বীকার্য যে, মানব-সভ্যতা বা সমাজ উন্নয়নের একটি মস্ত বড় ধাপ হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এর পূর্বে মানব সমাজে ন্যায়-নীতি যে ছিলো না, তা নয়। তবে তা ছিলো ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা স্বেচ্ছাধীন। সৎ ও অসৎ কাজের ব্যাপক ও পাকাপোক্ত ভাগাভাগি সুদৃঢ় হয় ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে। আদিম যুগের সেই পুরোহিততন্ত্রের আমল থেকে শুরু করে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে ধর্ম ও রাষ্ট্রের কঠিন শাসন।[১৩৪]

মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি করুক কিংবা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হোক আরজ আলী মাতুব্বর দেখিয়েছেন রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রথম থেকেই শাসক এবং শাসিতের ভাগ ছিল। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “কনফেডারেসি অব ট্রাইবস বা রাষ্ট্র গঠনের প্রক্কাল থেকেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। যথা – রাজা ও প্রজা, দাস ও প্রভু, শাসক ও শাসিত, ধনী ও ভিখারী ইত্যাদি বহুরূপে। বিশেষত এ সময় থেকেই উদ্ভব হয়েছিলো সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের।”[১৩৫] রাষ্ট্রকে মানবতাবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, “হাজার হাজার বছর পূর্বে আদিম যুগের রাষ্ট্র গঠনের প্রথম পর্যায়ে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, ধনতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র ইত্যাদি যে সমস্ত মানবতাবিরোধী তন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছিল, আজও তা বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশে।”[১৩৬] কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কথা আরজ আলী মাতুব্বর বলেছেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ থাকায়, তিনি মানুষের কল্যাণের কথাই বলেছেন।

রাজতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রে মাতুব্বরের আস্থা ছিল না। এসব তন্ত্রে-মন্ত্রে মানুষের কল্যাণ হয় না। স্বৈরতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ নির্যাতিত হয়। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রকে আরজ আলী অন্য মতবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মতবাদ মনে করতেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “জোর যার, মুল্লুক তার – এ নীতির উপর যে সমস্ত তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেসব তন্ত্রে তন্ত্রীদের সংখ্যা কোথাও বেশী নয়। কেননা, ওর কোনো তন্ত্রই বিশ্বমানবের বা সংখ্যাধিক্যের কল্যাণে নিয়োজিত নয়। তাই ওগুলোকে ‘মানবতন্ত্র’ বলা যায় না। কিন্তু গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রকে ‘মানবতন্ত্র’ বলা যায়। কারণ এ দুটো তন্ত্রই হচ্ছে বিশ্বমানবের পক্ষে কল্যাণকর।”[১৩৭] সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে আরজ আলী মাতুব্বর মানবকল্যাণ মুখী মতবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মনে করেন বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নামে চলছে বুর্জোয়াতন্ত্র। এ

---

[১৩৪] আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ..২৭৯
[১৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
[১৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
[১৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বর্তমানে রাজতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি স্বৈরতন্ত্র কোথাও প্রচলিত নেই বললেই চলে। কিন্তু প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে ওগুলোর যাবতীয় কাজই চলে আসছে ধনতন্ত্রীদল বা বুর্জোয়াদলের কারসাজিতে। গণতন্ত্রের নামে দেশে স্বৈরতন্ত্রই চলছে এখন – ছলে, বলে বা কৌশলে।"[১৩৮] তাঁর মূল্যায়নে সবচেয়ে ভাল শাসন ব্যবস্থা হল সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের মানসম্মত জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছিল। আরজ আলী মাতুব্বর কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রের অনুসারী। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মাতুব্বরের বক্তব্য হল,

> মানব সভ্যতা ও সমাজ উন্নয়নের প্রধান প্রধান ধাপগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্রকে বলা যায় চরম ধাপ। সাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এর মূলনীতি হচ্ছে – প্রত্যেকে নিজের 'সাধ্য' অনুসারে সমাজকে দেবে এবং নিজের 'প্রয়োজন' অনুসারে নেবে। এ সমাজে কারো কাজের অনিশ্চয়তা থাকবে না, ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে না, মেহনতী মানুষকে শোষণ করার মতো মালিক ও মুনাফাশিকারী দল থাকবে না, থাকবে না শ্রেণীগত বৈষম্যের বিশাল প্রাচীর।[১৩৯]

দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে আরজ আলী মাতুব্বর বড় হয়েছেন। পরিণত বয়সেও দারিদ্র্য তাঁর জীবন সংগ্রামে অবসান ঘটেনি। শ্রেণি বৈষম্য তিনি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। পুস্তক অধ্যয়ন করে তাঁকে শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। ফলে বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রের অনুসারী অনুরাগী। সমাজতন্ত্রকে তিনি মানবকল্যাণের একমাত্র মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর উদাত্ত ঘোষণা "সমাজতন্ত্র তথা 'সাম্যবাদ' হচ্ছে বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম।"[১৪০] তিনি মনে করতেন সমাজতন্ত্র ছাড়া আর অন্য কোন কিছু দিয়ে মানবের মুক্তি সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের জীবনকে সহজ করেছে। কিন্তু শুধু প্রায়োগিক বিজ্ঞান দিয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "শুধুমাত্র রকেট-রোবট ব্যবহার ও স্বর্গ-নরকের স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সমাজ উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা, তা ভেল্কি বই আর কিছু নয়।"[১৪১] সমাজ উন্নয়নের জন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবিক বিকাশও জরুরী।

আরজ আলী মাতুব্বর সংগ্রাম করেছেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। কুসংস্কারে আক্রান্ত মানুষ সমাজের ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক। এরা সমাজের বেশিরভাগ মানুষের কল্যাণের নামে অকল্যাণ ডেকে আনে, সমাজকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়। নতুনত্বকে মেনে নিতে এদের মন প্রস্তুত থাকে না। মানুষের কল্যাণের জন্যই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন আরজ আলী মাতুব্বর। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কুসংস্কারমুক্ত

---

[১৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
[১৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২
[১৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩
[১৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষের প্রয়োজন। আরজ আলী মাতুব্বর কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তৈরি করতে চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য।

উপসংহার

আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশের একজন মৌলিক দার্শনিক। তিনি দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর এ আলোচনায় মৌলিক দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় কিংবা ভারতীয় দর্শন অবলম্বন করে আরজ আলী মাতুব্বর দর্শনচর্চা করেন নি। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় দর্শন থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁর নিজস্ব। জ্ঞানতত্ত্বে আরজ আলী মাতুব্বরকে দেখা যায় তিনি জ্ঞানকে প্রায়োগিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি জ্ঞানের কথা বলেছেন। মাতুব্বর মনে করেন, পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কোন একটির অভাব থাকলে, ঐ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না। যে অন্ধ বা বধির, তার আলো বা শব্দের জ্ঞান হয় না। মৃত্যুতে মানুষের দেহ নষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিও নষ্ট হয়। পঞ্চইন্দ্রিয় নির্ভর জ্ঞান অভিজ্ঞতাবাদ সমর্থন করে। এ জন্য আরজ আলী মাতুব্বরকে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে অভিহিত করা যায়।

আরজ আলী মাতুব্বর *সত্যের সন্ধান* গ্রন্থটি, আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম, প্রকৃতি ও বিবিধ নামে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলো সবই অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয়। স্থান, কাল এবং শক্তি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর সংলাপের আকারে যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে অধিবিদ্যার অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। তিনি যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছেন অধিবিদ্যা মানুষকে কুসংস্কারগ্রস্ত করে। এ কারণেই তিনি অধিবিদ্যা বর্জনের কথা বলেছেন। অধিবিদ্যার বিষয়গুলো মানুষকে কুসংস্কারগ্রস্ত করে। কুসংগ্রস্ত মানুষ কল্যাণমুখী সমাজের প্রধান অন্তরায়।

মূল্যবিদ্যার আলোচনায় দেখা যায় আরজ আলী মাতুব্বর সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ কামনা করেছেন। আধুনিক-যুগের ইউরোপের উপযোগবাদীরাও সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ কামনা করেছেন। আরজ আলী মাতুব্বরও উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কুসংস্কারমুক্ত সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের কথা বলেছেন। এজন্যই আরজ আলী মাতুব্বরের নীতিচিন্তাকে উপযোগবাদ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। রাজতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রে আরজ আলী মাতুব্বরের আস্থা ছিল না। স্বৈরতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তিনি সমর্থন করেন নি। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রকে আরজ আলী মাতুব্বর শ্রেষ্ঠ

মতবাদ মনে করতেন। আরজ আলী মাতুব্বর সংগ্রাম করেছেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। কুসংস্কারে আক্রান্ত মানুষ সমাজের ও রাষ্ট্রের জন্য বিপদজ্জনক। মানুষের কল্যাণের জন্যই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন আরজ আলী মাতুব্বর। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষের প্রয়োজন। আরজ আলী মাতুব্বর কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তৈরি করতে চেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য।

আরজ আলী মাতুব্বরের অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা অযৌক্তিকতা এবং মূল্যবিদ্যার আলোচনায় দেখা যায় তিনি কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছেন। মানব সমাজের অগ্রগতির পরিপন্থি হলো কুসংস্কার। কুসংস্কার মুক্ত তিনি একটি সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। এই সমাজ নির্মাণের জন্য তিনি কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছেন। আরজ আলী মাতুব্বর খুব সহজ ও বৈজ্ঞানিকভাবে নিজের চিন্তাধারাকে নিজের রচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করে অন্যদেরকে কুসংস্কারমুক্ত হতে সাহায্য করেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বরের জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যার আলোচনায় দেখা যায় তিনি দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকের কথাই বলেছেন, সমকালীন প্রেক্ষাপটে যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তাঁকে আমরা ধর্মনিরক্ষে বস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। তিনি ভাববাদ এবং রহস্যবাদকে সংশয়ের চোখে দেখেছেন। আবার ধর্মকে তিনি সরাসরি বর্জন করেননি। কিন্তু ধর্মের মধ্যে যে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে সেগুলো বর্জন করেছেন। ধর্মের প্রধান বিষয় অতিপ্রাকৃতিক সত্তার উপর অস্থা স্থাপন। আরজ আলী মাতুব্বর অতিপ্রাকৃতিক সত্তার উপর আস্থা রাখেননি। তিনি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ নির্ভর অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের কথা বলেছেন। অভিজ্ঞতাভিত্তক জ্ঞাননির্ভর সমাজ নির্মাণ হলে সে সমাজ অবশ্যই কুসংস্কার মুক্ত হবে। এটাই ছিল আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনের মূল লক্ষ্য।

আবুল হাশিম

জীবন ও কর্ম

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি মুসলিম দার্শনিক আবুল হাশিম (১৯০৫ - ১৯৭৪) পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার কাশিয়াড়া গ্রামে এক রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মৌলভী আবুল কাশেম ও মোকাররমা খাতুনের সপ্তম সন্তান ছিলেন আবুল হাশিম। ছয় বছর বয়সে আবুল হাশিমের মায়ের মৃত্যু হয়। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজি স্কুলে থেকে তিনি ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেও পরে তিনি বর্ধমানে চলে আসেন এবং বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই এ পাশ করেন। এই কলেজ থেকেই তিনি ১৯২৮ সালে বি এ পাশ করেন। এবছর তিনি বিয়ে করেন এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বিয়ের কিছু দিন পর আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ ও আইন ক্লাসে ভর্তি হলাম।"[১] আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে পারেননি। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। বর্ধমান কোর্টের আইনজীবী গোলাম মর্তুজার অধীনে শিক্ষানবীশ আইনজীবী হিসাবে তিনি ১৯৩২ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথম মোকদ্দমায় তিনি জয়ী হয়েছিলেন। আইনজীবী থেকে তিনি সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। রাজনীতিতে প্রবেশের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, "১৯৩৬ সালে আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করি।"[২] রাজনীতি এবং আইন পেশা এক সঙ্গে চলতে পারে না বলে তিনি আইন পেশা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতেও তিনি টিকে থাকতে পারেন নাই। রাজনীতির উত্থান-পতনে শেষ জীবনে তিনি রাজনীতি থেকেও অবসর নেন। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকায় ইসলামিক একাডেমির পরিচালক। রাজনীতির মাঠ থেকে তিনি একাডেমির মধ্যে জীবন সীমাবদ্ধ রাখেন। এ-সম্পর্কে সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন, "পাকিস্তানে মার্শাল ল' বা সামরিক আইন জারি হওয়ার পরে আইয়ুব খানের আমলে ঢাকাতে একটি ইসলামিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। হাশিম সাহেব তার পরিচালক নিযুক্ত হন। তখন থেকেই দেশের সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।"[৩] ১৯৭৪ সালের ৬ অক্টোবর আবুল হাশিমকে ঢাকার পোস্তগোলা কবরস্থানে দাফন করা হয়।

---

[১] Abul Hashim, *In Retrospection,* m\s Subarna Publishers, Dacca, 1974, p. 11

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৩] সরদার ফজলুল করিম, ''স্মৃতিতে, শ্রদ্ধায় জনাব আবুল হাশিম', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ১৫৮

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন দেশ আত্মপ্রকাশ করে। ঔপনিবেশ মুক্ত স্বাধীন দুটি দেশের অন্যতম ভিত্তি ছিল ধর্ম। ধর্মের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষ দুই ভাগ হয়। দেশ ভাগের পর আবুল হাশিম ভারতে থেকে যাওয়ার জন্য বর্ধমানে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে আবুল হাশিমের বড় সন্তান বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন,

> দেশভাগের পর দেশ ত্যাগের কোন চিন্তা মাথায় না থাকায় আব্বা বর্ধমানে একটি বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ করেন ১৯৪৭ সালের শেষ থেকেই। সে বাড়ির কাজ শেষ হতে মনে হয় বছর খানেক সময় লাগে। বর্ধমানের ও গ্রামের কিছু জায়গা বিক্রি করে এবং অন্য কিছু টাকা নিয়ে সে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। আমরা ১৯৪৮ সালের শেষ দিকেই সে বাড়িতে উঠে গিয়েছিলাম। অবশ্য বাড়ির কাজ তখনো শেষ হতে বাকি ছিল। ১৯৫০ সালে বাড়ি বিক্রি করা পর্যন্ত বাড়ির কাজ শেষ হয়নি।[৪]

বর্ধমানের বাড়িতে তিনি থাকতে পারেননি। ১৯৫০ সালের বর্ধমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আবুল হাশিমের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ-সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়াতে আব্বা খুবই আঘাত পেয়েছিলেন, কারণ আমাদের সমগ্র পরিবারের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাপার ছিল না। আব্বার প্রায় সব বন্ধুই ছিলেন হিন্দু। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কারও কারও আচরণ সে সময় খুবই কুৎসিত ছিল।"[৫] বর্ধমানের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পরেও তিনি ভারতে থেকে যান। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পর আব্বা গ্রামে যাওয়াই ঠিক করলেন। চিরদিনের মত বর্ধমানের বাড়ির বাস উঠিয়ে, বাড়ি তালা বন্ধ করে আমরা গ্রামে চলে গেলাম। আব্বা মাঝে মাঝে কলকাতা যেতেন। একবার দিল্লি গেলেন। জওহরলাল নেহেরু এবং অন্যান্যদের সাথে দেখা করলেন। এরপর ঠিক করলেন দেশত্যাগ করে ঢাকা চলে যাবেন।"[৬] প্রায় শূন্যহাতে উদ্বাস্তু হয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। পরিবার চালানোর জন্য আয়ের কোন উৎস তাঁর ছিল না। পারিবারিক সম্পদ ছিল বর্ধমানে।

পাকিস্তান ছিল তাঁর আবেগের রাষ্ট্র। বাস্তবের সঙ্গে আবেগ বেশিরভাগ সময়েই মিলে না। বাস্তব কঠিন। ঢাকায় ছিল আবুল হাশিমের কঠিন জীবন। দেশ ভাগের ফলে আবুল হাশিম নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ১৯৫০ সালে বর্ধমান থেকে ঢাকায় আসেন। পিছনে ফেলে আসেন বর্ধমানের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন। পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ঢাকা কেন্দ্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। আবুল হাশিমের ঢাকায় অবস্থান সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> আবুল হাশিম সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ঢাকায়। তখন তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন, আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি আমাকে দেখেন না, কেবল আমার স্বভাবচরিত্র-মন-মগজ-মনন অনুভব উপলব্ধি করেছেন। মনে পড়ে ১৯৬০ সন থেকে সভায়-সেমিনারে যেসব বক্তৃতা দিয়েছি বা করেছি সেগুলো অনেকতায় বহু। সেসব সভায় তখন জনাব আবুল হাশিম ছিলেন বক্তা হিসেবে অপরিহার্যতায়

---

[৪] বদরুদ্দীন উমর, ''আমার পিতা'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ২৭৬

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

অনন্য। বলা চলে প্রগতিশীলদের সভায় তিনি বক্তা থাকবেনই। তাছাড়া সে সময়ে প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন ঢাকায় করগণ্য। বক্তা হিসাবে আমাকে তাঁর পাশেই বসতে হয়েছে, তিনি সিগারেট খেতেন। আমিও সিগারেটখোর। তাই প্রায়ই তাঁর সিগারেটে মুখাগ্নি করতে হত আমাকেই। সে-সুবাদেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপের শুরু। প্রায় দেড় বছরের আলাপে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পরে একদিন আকস্মিকভাবে তিনি আমাকে জানালেন যে এতদিন তিনি আমাকে পছন্দ করতেন না, আমার মন-মত পথ তাঁর কাছে গ্রাহ্য নয় বলে। এখন তিনি মত বদলেছেন আমার সম্বন্ধে। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন যে আমি ইসলামে আকৃষ্ট না হলেও মুসলিমদের ভালোবাসি।[৭]

আবুল হাশিম সৌখিন মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের সৌখিন মার্জিত পোশাক পরতেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনে ধুতি পাঞ্জাবি পরার কারণে নোয়াখালি জেলার আবদুল জব্বার খদ্দর আবুল হাশিমের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। এই অধিবেশনেই আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৮] আবুল হাশিম সঙ্গীত চর্চা করতেন। নাটক করেছেন। ফটোগ্রাফী করতেন। বাগান করেছেন। কুকুর পুষতেন। বর্ধমানের বাড়িতে অনেক জাতের গরু রেখেছিলেন। একোরিয়ামে নানা জাতের মাছ ছিল। জন্তু-জানোয়োর ও বাগান করতে গিয়ে তিনি প্রাণিবিদ্যার উপর পড়াশোনা করেছেন।[৯] সব ধরনের বই পড়া তাঁর অন্যতম শখ ছিল। শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি কমে আসলে তিনি অন্যের সাহায্য নিয়ে পড়তেন। শখের বর্ণনা দিয়ে আবুল হাশিম লিখেছেন,

আমার নানান রকমের সখ ছিল। ছবি সংগ্রহ ছিল আমার প্রথম শখ। স্বভাবত এর থেকে আলোকচিত্র গ্রহণের কৌশল ও পদ্ধতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ি। এরপর স্থিরচিত্র থেকে আমি চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ি। বিবাহ উৎসব, চড়ুই ভাতি ও বন্যাত্রাণ ইত্যাদি কার্যের ওপর কিছু চলচ্চিত্র আমার সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে। আমার পরবর্তী শখ ছিল কুকুর পোষা ও গরু ছাগল হাঁস মুরগীর খামার করা। আমার এসব শখের বস্তুর প্রত্যেকটির প্রাপ্ত তথ্যের জন্য আমাকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। আবার যখন হাঁস মুরগী ইত্যাদির শখ হলো তখন এসব ব্যাপারে ভালভাবে পড়াশোনা করতে হয়েছে। হাঁস মুরগীর ডিম দেওয়ার ব্যাপারে এক বই পড়তে গিয়ে জীববিদ্যা সম্পর্কীয় বেশ কিছু নির্দিষ্ট শব্দের সাথে পরিচিত হলাম। এর পর শুরু হলো জীববিদ্যার ওপর পড়াশোনা। ডারউইনের বিখ্যাত Origin of **Species** থেকে এই ধারণায় উপনীত হলাম যে, জন্মগত ঐতিহ্য পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব থেকে কোন জীবেরই পরিত্রাণ নেই। এর থেকে সমাজ বিজ্ঞান ও তার অন্যান্য শাখা, অর্থনীতি, রাজনীতি-শাস্ত্র, ইতিহাস ও আইনশাস্ত্রও পড়াশোনা শুরু করি। সমাজ বিজ্ঞান পড়ার সাথে সাথে দর্শনশাস্ত্রও পড়তে হয়েছে। এসব পড়তে গিয়ে বুঝলাম যে কোরানকে ভালভাবে বুঝতে গেলে দর্শনশাস্ত্র সমাজবিজ্ঞান, ও জীববিদ্যার ওপর একটা সুষ্ঠু ধ্যান ধারণা থাকা প্রয়োজন। এরপর আমি ইসলাম ও কম্যুনিজমের তুলনামূলক পড়াশোনায় উৎসাহী হয়ে পড়ি।[১০]

আবুল হাশিম সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং নিজের চেষ্টা ও দূরদর্শিতার কারণেই তিনি পৃথিবীর উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতেন।

[৭] আহমদ শরীফ, ‘‘একজন বড় মাপের মানুষ আবুল হাশিম’’, সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ৯৮

[৮] বদরুদ্দীন উমর, ‘‘আমার পিতা’’, সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ১৫৯

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০, ২৬৩

[১০] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি* , শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী (অনূদিত) নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৮, ১৯

দর্শন, সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি পড়তেন এবং উপলব্ধি করতেন নিজের মত করেই।

রাজনৈতিক জীবন

আবুল হাশিমের জন্ম রাজনৈতিক পরিবারে। এই পরিবারটি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রথম দিকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। আমলা, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ব্যবহারজীবী ও অন্যান্য পেশায় এই পরিবারের সদস্যরা তিন পুরুষ ধরে জড়িত ছিল।[১১] পারিবারিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আবুল হাশিম লিখেছেন, "আমার পিতামহ খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাংলাদেশে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয় তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই তা বর্জন করেন; কিন্তু তিনি তাঁর সন্তানদের ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করেন এবং আবদুল জব্বার পরবর্তীকালে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী হন।"[১২] ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিও এই পরিবারে ছিল। পরিবারের বর্ণনা দিয়ে তিনি আরো লিখেছেন, "আমি যদিও সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে জন্মেছিলাম ও লালিত হয়েছিলাম তথাপি আমাদের পরিবার বিরাট কোন জমিদারীর মালিক ছিলেন না।"[১৩] এই পরিবারের অধিকাংশ সদস্য চাকরীজীবী ছিলেন। কিন্তু আবুল হাশিমের পিতা রাজনীতি করতেন। আবুল হাশিমের পিতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর সরকারি চাকরি গ্রহণ না করে রাজনীতিতে যোগ দেন।[১৪] তাঁর পিতা ছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর একজন অনুরক্ত শিষ্য।[১৫] পিতার মৃত্যুর পর আবুল হাশিম রাজনীতিতে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এসময় তাঁর এক মামাতো ভাই বীরভূম থেকে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

আবুল হাশিম ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ছাত্র রাজনীতিকে তিনি পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমার ইস্কুল জীবন থেকে কখনও আমি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলাম না। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পরও আমি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখেছিলাম।"[১৬] বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি বর্ধমান মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমার গ্রামে বর্ধমান মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে মোহামেডান এসোসিয়েশনকে বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগে রূপান্তরিত এবং আমাকে তার সভাপতি

[১১] রফিক কায়সার, ''তিন পুরুষের রাজনীতি'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ২২৬
[১২] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ১৩
[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

নির্বাচিত করা হয়েছিল।"[১৭] আবুল হাশিমের পিতা বর্ধমান মোহামেডান এসোসিয়েশন সংগঠিত করেছিলেন। এই সংগঠনের তিনি সভাপতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সভাপতি হলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আবুল হাশিম ১৯৩৬ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পিতার শূন্য আসন থেকে ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।[১৮] ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আবুল হাশিমের রাজনীতিতে আসন স্থায়ী হয়।

১৯৩৭ সালে এম. এ ইস্পাহানীর বাসভবনে মোহাম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে আবুল হাশিমের সাক্ষাৎ হয়। জিন্না আবুল হাশিমকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে আসার আহ্বান জানান। জিন্নার আহ্বানে আবুল হাশিম মুসলীম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "সাধারণ সম্পাদকের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম আমি স্বয়ং এবং খাজাদের মনোনীত আবুল কাসেম। সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। আবুল কাসেম পেলেন মাত্র একাদশ ভোট এবং আমি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নির্বাচিত হলাম।"[১৯] আবুল হাশিম মৌলানা আজাদ সুবহানীর পরামর্শে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করেছিলেন। আজাদ সুবহানী ছিলেন আবুল হাশিমের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষাগুরু।

১৯৪২ সালে মৌলানা আজাদ সুবহানীর সঙ্গে আবুল হাশিমের পরিচয় হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে মৌলানা আজাদ সুবহানী বর্ধমানে এসেছিলেন। এ-সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন,

> ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে মৌলানা আজাদ সোবহানী বর্ধমানে আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং আমার বাসাতেই অবস্থান করলেন। মৌলানা আমাকে বললেন তিনি আমার কাছে বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন, 'আপনাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হতে হবে এবং বাংলায় মুসলীম লীগের মঞ্চ থেকে ইসলামের প্রায়োগিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে।' মৌলানার এ রকম প্রস্তাব আমার কাছে অদ্ভূত বলে মনে হলো।[২০]

মৌলানা আজাদ সোবহানী বর্ধমান থেকে চলে যাওয়ার পর আবুল হাশিম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে নির্বাচন করতে চান, সে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন। সোহরাওয়ার্দী প্রথমে রাজী ছিলেন না। এ-সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন,

> ১৯৪৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে আমি হোসেন শহীদ সুহরাওয়াদীর সাথে কলকাতায় সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি সিভিল সাপ্লাইর মন্ত্রী। আমি তাঁকে বললাম যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সাধারণ সম্পাদকের নির্বাচনে আমি প্রার্থী হতে চাই। তিনি বললেন, 'তা কিভাবে সম্ভব আপনার দৃষ্টি শক্তি খুবই ক্ষীণ'। আমি বললাম আপনি কি মনে করেন যে, রাজনীতি পাখি

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
[১৮] রফিক কায়সার, ''তিন পুরুষের রাজনীতি'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ২২৭
[১৯] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৪৬
[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

শিকার, যার জন্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। তিনি বললেন ঠিক আছে, চিন্তা করে দেখি। অবশেষে সুহরাওয়ার্দী আমার পদপ্রার্থীতা সমর্থন করলেন।[২১]

এ সময় থেকে আবুল হাশিমের দৃষ্টি শক্তি কমে আসছিল। অন্যের সাহায্য নিয়ে তিনি পড়তেন। তখনো পর্যন্ত একা একা চলাফেরা করতে পারতেন। আবুল হাশিম মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে মুসলীম লীগের সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ় করেন। মুসলিম লীগকে তিনি একটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করেন। তিনি জেলা পর্যায়ে সফর করেন এবং কমিটি গঠন করেন। মুসলিম লীগকে খাজা নবাবদের হাত থেকে উদ্ধার করে মুসলিমদের অধিকার রক্ষার রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আমি গভীর আগ্রহের সাথে মুসলিম লীগকে একেবারে গোড়া থেকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। শুরুতেই আমি বিজ্ঞপ্তি ও ইস্তাহার ছাপিয়ে জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দিতে লাগলাম কিভাবে তাঁদের জেলা সমূহে মুসলিম লীগকে সংগঠিত করতে হবে। প্রত্যেকটি জেলার নেতৃবর্গকে জেলা ও মহকুমার মুসলিম লীগ অফিস ও পার্টি হাউস স্থাপন করার জন্যে নির্দেশ দিলাম। আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলাম যে, কোন জেলা মুসলিম লীগ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন পাবেন না যদি না তাঁরা আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন।[২২]

মুসলিম লীগকে তিনি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করেছিলেন। আবুল হাশিমের সাংগঠনিক সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আবুল হাশিম সাহেব যে কুশল ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন তার নিদর্শন – বঙ্গদেশের লীগের সাধারণ সম্পাদক হবার পর খাজা নাজিমুদ্দিন-গোষ্ঠীর প্রায় পকেটের লীগকে গণভিত্তিক করায় তাঁর অভাবনীয় সাফল্য। অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে এ কাজ করা ১৯৪৬ খ্রীঃ নির্বাচনে বঙ্গদেশে লীগের অভূতপূর্ব সাফল্যের অন্যতম কারণ।"[২৩] মুসলিম লীগকে তিনি পকেট সংগঠন থেকে মুক্ত করে একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছিলেন।

> কলকাতার মুসলিম লীগ দফতরটিকে তিনি যেমন সুশৃঙ্খলভাবে সাজালেন, তেমনি ঢাকায় ১৫০ মোগলটুলিতে ১৯৪৪ সালে মুসলিম লীগের অফিস স্থাপন করেন। ঢাকার নবাবদের চোখের সামনে কলকাতা থেকে আসা আবুল হাশিমের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছিল তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিত্বের জন্য এবং ন্যাশনাল গার্ডের উঠতি তারকা নেতাদের এবং প্রগতিশীল কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন যুব-নেতাদের সমর্থনে।[২৪]

মুসলিম লীগের একজন সফল নেতা হয়েও তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে আসেননি। পাকিস্তানে তিনি আসতে চাননি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে লিখেছেন, "তিনি শামসুল হক সাহেবকে ঢাকা থেকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'কলকাতার কর্মীরাও অনেকে ঢাকা চলেছে, আমি পাকিস্তানে যাব না। তোমরা প্রেসটা ঢাকায় নিয়ে একে কেন্দ্র করে দলটা ঠিক রাখ, আর কাজ

---

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩, ৪৪
[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
[২৩] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ''আবুল হাশিম – এক স্বপ্নদ্রষ্টা রাজনীতিক'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ৮৩
[২৪] আসাদ চৌধুরী, ''আবুল হাশিম'', সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, ৩৯১

চালিয়ে যাও।"[২৫] মুসলিম লীগের পত্রিকা ছিল মিল্লাত। মিল্লাত পত্রিকার প্রেস ছিল এটি। বাংলাদেশের মানুষের চাঁদায় এই প্রেস স্থাপন করা হয়েছিল। দেশ ভাগের পর আবুল হাশিমের বর্ধমানে থকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান আরো লিখেছেন, "হাশিম সাহেব হিন্দুস্থানে থাকবেন, আমি চলে আসবো পাকিস্তানে। আমার বাড়িও পাকিস্তানে।"[২৬] কিন্তু আবুল হাশিম বর্ধমানে থাকতে পারেন নাই। ১৯৫০ সালে তিনি বর্ধমান থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

আবুল হাশিম ঢাকায় এসে ঢাকা কেন্দ্রিক বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও আবুল হাশিম ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের বৈঠকে আবুল হাশিম সভাপতিত্ব করেন।[২৭] এসময় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। তারপরও তাঁকে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ততার জন্য নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এ-সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন,

> ১৯৫২ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে ভোর রাত্রে তাঁর বাসা থেকে গ্রেফতার করে প্রথমে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে দুই এক দিন রাখার পর বদলি করেছিল সিলেট জেলে। সেখানে চার মাস তাকে রেখেছিল একটি সেলে। একজন দৃষ্টি শক্তিহীন মানুষকে একাকী একটি সেলে রাখা যে কত নিষ্ঠুর ব্যাপার সেটা বলাই বাহুল্য। তার ওপর তাঁর সেলটি ছিল কুষ্ঠ রোগীদের সেলের সংলগ্ন। জেলের একজন কয়েদি যাদেরকে বলা হতো 'ফালতু' তাঁর দেখাশোনা করতো। চারমাস পর জুন মাসে তাঁকে সিলেট থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ফেরত আনা হয় এবং সেখানে মওলানা ভাসানী, খয়রাত হোসেন, আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ, অজিত গুহ, সতীন সেন, মুনীর চৌধুরী প্রভৃতি ভাষা আন্দোলনে আটক অন্য বন্দিদের সঙ্গে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[২৮]

ঢাকা জেল থেকে ১৯৫৩ সালের জুন মাসে তিনি মুক্তি পান। ১৯৫২ সালে 'রাব্বানী পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আবুল হাশিম রাব্বানী পার্টিতে যোগ দেন এবং এই পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই পার্টি থেকে ১৯৫৪ সালে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "রাব্বানী পার্টি প্রকৃত অর্থে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না এবং ঢাকাতেও তার সাংগঠনিক কোন ভিত্তি ছিল না। সে কারণে এখানে নির্বাচনের কর্মী বলতে যা বোঝায় তার কিছুই বস্তুতপক্ষে থাকেনি। তাছাড়া অর্থের কোন সংস্থানও ছিল না। কাজেই যুক্তফ্রন্টের জোয়ারের মুখে নির্বাচনে যা হবার তাই হয়েছিল।"[২৯] আবুল হাশিম ঢাকা থেকে নির্বাচন করেছিলেন।

---

[২৫] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৯

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[২৭] আবদুল মতিন, ''একুশের সিদ্ধান্ত যেভাবে নেয়া হয়'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ১৭৬

[২৮] বদরুদ্দীন উমর, ''আমার পিতা'', সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ২৭৯

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কথা আবুল হাশিমই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন। বদরুদ্দীন উপর লিখেছেন, "আবুল হাশিমই ময়মনসিংহের এক সাধারণ জনসভায় যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট গঠনের কথা বলেছিলেন এবং তার জন্য প্রাথমিক কাজ করেছিলেন তার কোন উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না, যদিও তখনকার পত্র-পত্রিকায় তার রিপোর্ট ছিল।"[৩০] আবুল হাশিমের যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টে নেয়ায় রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টে যোগদানে বিরত থেকে এককভাবে নির্বাচন করে।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হয়। আবুল হাশিম তার আগেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। তারপরও বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করে। সরকারের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে পূর্বপাকিস্তানে যে আন্দোলন হয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আবুল হাশিম। সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তিনি বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছেন। এ-সম্পর্কে আনিসুজ্জামান লিখেছেন,

> পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্‌যোগে অনতিকাল পরে অনুষ্ঠিত 'মহাকবি স্মরণোৎসব' শীর্ষক অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিনে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে, ইসলাম ও পাকিস্তান আদর্শের নামে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত-বর্জনের ওকালতি করছেন, তাঁরা শুধু মূর্খ নন, বরঞ্চ দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত। তারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ, না বোঝেন ইসলাম। রবীন্দ্রচিন্তার সঙ্গে ইসলামী চিন্তার কোন বিরোধ নেই। নিজের জীবনে যাঁরা সর্বদা ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত, তাঁরাই বরীন্দ্রনাথকে ইসলাম বিরোধী প্রতিপন্ন করতে ব্যগ্র।[৩১]

দেশ ভাগের পর আবুল হাশিম ঢাকায় আসেন সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়। তিনি দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার মূলধারার রাজনীতির সঙ্গেও তিনি যুক্ত হতে পারেননি। আবুল হাশিমের শেষ জীবনের অবস্থা মূল্যায়ন করে সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ লিখেছেন, "দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় আবুল হাশিমের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এই নিদারুণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় তিনি বাধ্য হয়ে পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং দলের কনভেনর নিযুক্ত হন।"[৩২] পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান পূর্ব-পাকিস্তানে সফরে এসে আবুল হাশিমের বাসায় গিয়েছিলেন। আইয়ুব খান আবুল হাশিমকে ঢাকাস্থ ইসলামিক একাডেমির প্রথম পরিচালকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে আবুল হাশিমের জন্যই ঢাকায় আইয়ুব খান ইসলামিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি পাকিস্তান ইসলামিক আইডিওলজি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন এবং ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কনফেডারেশন মুসলীম লীগের প্রার্থী জেনারেল আইয়ুব খানকে পূর্ণ সমর্থন

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯
[৩১] আনিসুজ্জামান, ''আবুল হাশিম'', প্রগুক্ত, পৃ. সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়,* ৩৫৪
[৩২] সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ, ''আবুল হাশিম স্মরণে'', সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ১৭৪

করেছিলেন। আইয়ুব খানকে সমর্থন করায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবশিষ্টাংশের মৃত্যু ঘটে। এরপর তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে ইসলামিক একাডেমির একজন চাকুরে হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেন।

ইসলামিক একাডেমির চাকুরে জীবনে আবুল হাশিম রাজনীতি থেকে অবসর জীবনযাপন করলেও রক্তে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা প্রবহমান। আর সে কারণেই বাংলাদেশ যে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে পারবে না তা তিনি সুস্পষ্টভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন। এ-সম্পর্কে আবু নাহিদ লিখেছেন ''১৯৬৮ সালে ঢাকা প্রেসক্লাবে সৃজনী আয়োজিত সভায় আবুল হাশিম সাহেব তাঁর বক্তৃতায় যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলে দিলেন পাকিস্তান সরকার যেভাবে বাংলাদেশের জনগণের বিপক্ষে, বাঙালি জাতির বিপক্ষে কাজ করে যাচ্ছে তাতে তাঁর মনে হচ্ছে আমাদের এ অঞ্চলের মানচিত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং অচিরেই তা হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।''[৩৩] একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আবুল হাশিমকে দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক সরকার কোন বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়াতে পারেনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা আবুল হাশিমের বাসায় গিয়েছিল বক্তৃতা রেকর্ড করার জন্য কিন্তু তিনি রাজি হন নাই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে অস্ত্রের ভয় দেখালে তিনি বলেছিলেন,

> আপনারা তো জানেন আমি দেখতে পাই না অতএব আপনাদের কাছে অস্ত্র থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কী? যদি আমাকে হত্যা করতে এসে থাকেন হত্যা করে চলে যান। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আপনারা কি করছেন। আর সেটাই মনে হয় ভালো। রেডিওতে দেশের বর্তমান অবস্থায় বক্তব্য দেয়ার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই আমার নেই।[৩৪]

মুক্তিযুদ্ধের সময় আবুল হাশিম ঢাকাতেই ছিলেন কিন্তু বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন করেননি। দৃষ্টিশক্তিহীন একজন মানুষকে দিয়েও পাকিস্তান সরকার তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি।

দর্শনচিন্তা

আবুল হাশিম প্রথাগত দার্শনিক ছিলেন না। দর্শনের ছাত্র-শিক্ষক কোনটাই তিনি ছিলেন না। তাঁর বোধ-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা এবং যুক্তি প্রয়োগের কৌশল তাঁকে দার্শনিকদের আসনে বসিয়েছে। তিনি দর্শনের বই পড়েছেন। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের বইপত্রও তিনি পড়েছেন। শেক্সপীয়রের ভক্ত ছিলেন তিনি। শেক্সপীয়রের রচনাসমগ্র

[৩৩] আবু নাহিদ, ''আমার দেখা আবুল হাশিম'', সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ২৪৮

[৩৪] আবুল হাশিমের এই উদ্বৃতিটি আবু নাহিদের, ''আমার দেখা আবুল হাশিম'' শিরোনামের লেখা থেকে নেয়া হয়েছে। আবু নাহিদ, ''আমার দেখা আবুল হাশিম'', পৃ. ২৪৯

তাঁর বাসায় ছিল। বদরুদ্দীন উমর পিতার বই পড়া সম্পর্কে লিখেছেন, "রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি থেকে নিয়ে ভারতীয় দর্শন-বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, যোগ, বৈশেষিক ইত্যাদি দর্শনের ওপরে তাঁর পড়াশোনা ছিলো। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন।"[৩৫] মার্কসবাদের উপর আবুল হাশিমের পড়াশোনা ছিল। মার্কসের বই তিনি পড়েছেন। এ-সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন,

> মওলানা আজাদ সোবহানীর সাথে পরিচয়ের আগে থেকে এবং পরেও তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য পড়তেন। ক্যাপিটাল থেকে নিয়ে এ্যান্টিডুরিং ইত্যাদি বই তাঁর ছিল। নিজে তিনি এসব বই কিনতেন এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা সংস্থা National Book Agency -র বোম্বাই কেন্দ্র থেকে তাঁর কাছে মার্কস, এঙ্গেল্স, লেনিন, স্ট্যালিনের নানা বই ডাকযোগে আসতো সৌজন্য হিসাবে। তার কিছু কিছু আমার কাছে বহুদিন ছিল, এখনো কিছু আছে। মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব আমি তাঁর কাছেই শুনেছিলাম প্রথম। তিনি এসব নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করতেন।[৩৬]

জীবনের শুরুতেই তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের উপর মৌলিক গ্রন্থ পড়েছেন। ফলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। জীবন ও জগৎ নিয়ে তাঁর রয়েছে মৌলিক চিন্তা। *The Creed of Islam*[৩৭] আবুল হাশিমের মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে ইসলামী চিন্তাবিদ মৌলানা আজাদ সোবহানী লিখেছেন, "আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, মৌলিক সৃষ্টির দিগন্তে এই বইখানা একটি নতুন তারকা, যা শত শত বছরের ফাঁকে ফাঁকে আবির্ভূত হয়ে প্রজ্ঞা ও মৌলিক সৃষ্টির জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।"[৩৮] আবুল হাশিমের দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার মূল উৎসস্থল ও কেন্দ্রবিন্দু ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দর্শন।[৩৯] আমিনুল ইসলাম আবুল হাশিমের দর্শন চিন্তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "তাঁর মতে, যথার্থ দর্শন মাত্রই জীবন দর্শন, অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এমন একটি সামগ্রিক পরিশীলিত ধারণা যা সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করে চিন্তা ও কর্মকে।"[৪০] আবুল হাশিমের দর্শন চিন্তা সম্পর্কে আজাদ সোবহানী লিখেছেন, "এ দর্শন হচ্ছে রব্বানিয়াত-এর দর্শন যা জ্ঞান-চর্চার এক দুর্লভ ফল ও আল্ কুরআনের শিক্ষার সারমর্ম ও তাৎপর্য।"[৪১] আবুল হাশিম রাজনীতিবিদ হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত। রাজনীতিবিদ হয়েও তিনি একজন দার্শনিক। "তাঁর মধ্যে রাজনীতিবিদের চাইতেও অধিক স্থান জুড়ে ছিল একজন দার্শনিক।"[৪২] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আবুল

---

[৩৫] বদরুদ্দীন উমর, ''আমার পিতা'', সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ২৬২

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

[৩৭] Abul Hashim, *The Creed of Islam or the Revolutionary Character of Kalima,* Umar Brothers, Dhaka, 1950.

[৩৮] আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, মুসলিম চৌধুরী (অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১, পৃ. মুখবন্ধ

[৩৯] আমিনুল ইসলাম,*বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ৮০

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[৪১] আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. মুখবন্ধ

[৪২] মোহাম্মদ আবদুল গফুর, ''আমার দেখা দার্শনিক রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ৩৭০

হাশিমের দর্শনচিন্তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় ইসলামের রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই আমরা তাঁর কাছে পরিষ্কার ধারণা নিতে সমর্থ হয়েছি।"[৪৩]

আবুল হাশিম মৌলানা আজাদ সুবহানীর অনুসারী ছিলেন। আজাদ সোবহানীর পরামর্শে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। আজাদ সোবহানীর দর্শন চিন্তা আবুল হাশিমের মধ্যেও দেখা যায়। আজাদ সোবহানী সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন, "তিনি আমাকে রব্বানী দর্শনে দীক্ষিত করেছিলেন। রব্বানিয়াৎ শব্দটি স্রষ্টার গুণবাচক 'রব' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং বিবর্তক।"[৪৪] রব্বানীয় দর্শন থেকে আবুল হাশিমের চিন্তার পরিবর্তন হয়নি। রব্বানীয় দর্শনই তিনি প্রচার করেছেন। তাঁর সমস্ত দর্শন চিন্তার মূলে রয়েছে এই রব্বানীয় দর্শন।

আবুল হাশিম সমাজ ও রাষ্ট্রে একজন ক্রিয়াশীল মানুষ। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন অগ্রসর হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তাঁর দর্শনচিন্তা অগ্রসর হয়েছে। সমাজ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দার্শনিকের চিন্তার বিষয়বস্তু কখনো কখনো হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আবুল হাশিমের দর্শন চিন্তাও ব্যতিক্রম নয়। তাঁর দর্শন চিন্তায় সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

বিনা বিচারে কোন মতবাদই আবুল হাশিম গ্রহণ করেননি। মার্কসীয় দর্শনের বইপত্র পড়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল, কিন্তু মার্কসবাদ গ্রহণ করেননি। মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন, "কার্ল মার্কস অর্থনীতিতে সবচেয়ে মূল্যবান মৌলিক অবদান রেখেছেন। তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কীয় মতবাদ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি বা তাঁর বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের চিন্তা মোটেই মৌলিক নয়।"[৪৫] আবুল হাশিম অজ্ঞেয়বাদ, নিরীশ্বরবাদ এবং শূন্যতাবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। জ্ঞানতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এডিসনের বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার, শেক্সপীয়ার ও কালিদাসের মহাকাব্য, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, কার্ল মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে এসব মণিষীদের আবিষ্কার বাহ্যন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এ জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে আরো একটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। এর নাম স্বজ্ঞা। তিনি এই স্বজ্ঞাকে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন।

আবুল হাশিমের জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও মূল্যবিদ্যা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর দর্শনচিন্তার পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায়।

---

[৪৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, "আল্লামা আবুল হাশিম", সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ৩৪০

[৪৪] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৪৩

[৪৫] আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, মুসলিম চৌধুরী (অনূদিত), পৃ. ১৮

জ্ঞানতত্ত্ব

আবুল হাশিমের দর্শন চিন্তায় জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তিনি জ্ঞানের উৎস, পরিধি ও সীমা নিয়ে আলোচনা করেছেন। জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে এ. ডি উয্‌লী *Theory of Knowledge* গ্রন্থে লিখেছেন, "জ্ঞানতত্ত্ব হচ্ছে একটি অপ্রাকৃত নাম। জ্ঞানতত্ত্ব কেবল জানার প্রকৃতি এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত একটি মতবাদই নয় ; পূর্ণতার যদি কোনো দাবি এর থেকে থাকে, তাহলে একে অবশ্যই জানার পরিধি ও সীমা এবং এই সীমার বাইরে কি ঘটে এসব সম্পর্কিত একটি মতবাদ হতে হবে।"[৪৬] জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস ইন্দ্রিয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা জ্ঞান আহরণ করি। অভিজ্ঞতাবাদীদের এই মত। পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাড়াও আরো একটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যায়। এই ইন্দ্রিয়ের নাম স্বজ্ঞা। স্বজ্ঞাকে আবুল হাশিম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের মতই আরেকটি ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত করে লিখেছেন, "পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং এগুলোর অনুরূপ অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ - যেগুলো একত্রে স্বজ্ঞা নামে পরিচিত। সুতরাং স্বজ্ঞা সহজাত প্রবৃত্তি নয়, চক্ষু ও কর্ণের মত ইন্দ্রিয়।"[৪৭] স্বজ্ঞা ইন্দ্রিয় হলেও জড় বস্তুর মত স্বজ্ঞাকে জানা যায় না। স্বজ্ঞাকে উপলব্ধির সাহায্যে অনুভব করা যায়। "স্বজ্ঞা বহিরিন্দ্রিয়সমূহের আওতাভুক্ত নয়। তাই জড় দৃশ্যবস্তুর উপস্থিতি যেভাবে নির্ণয় করা যায়, সেভাবে স্বজ্ঞার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। স্বজ্ঞাকে সাক্ষ্যাৎভাবে অনুভব করতে হয়।"[৪৮] তিনি এই স্বজ্ঞারই নাম দিয়েছেন 'স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান'। স্বজ্ঞা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মত পর্যবেক্ষণ করে সঠিক জ্ঞান দিতে পারে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎস, স্বজ্ঞাও তেমনি। আবুল হাশিম লিখেছেন, "বহিরিন্দ্রিয় ও যন্ত্রের সাহায্যে বস্তু ও ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে মানুষ যেমন সত্যের অনুসন্ধান করে, তেমনি স্বজ্ঞা কিংবা অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকৃতির রহস্য প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে মানুষ সত্যের অনুসন্ধান করে।"[৪৯]

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলো স্বজ্ঞার সাহায্যে হয়েছে বলে আবুল হাশিম দাবি করেন। এসব আবিষ্কারের পেছনে বুদ্ধির ভূমিকা তিনি স্বীকার করেননি। আবুল হাশিম লিখেছেন, "নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এডিসনের বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার, শেক্সপীয়র ও কালিদাসের মহাকাব্য, ডারউইনের বির্বতনবাদ, কার্ল মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব এগুলোর কোনটিই আত্মমুখী যুক্তি ও বুদ্ধির অবদান নয়, এগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফল।"[৫০] এই উপলব্ধিই হচ্ছে স্বজ্ঞা। নিউটন সারা জীবন আপেল গাছ থেকে পড়তে দেখেছেন। তিনি হঠাৎই উপলব্ধি করেছেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই আপেল মাটিতে পড়ে।

---

[৪৬] A. D. Woozley, *Theory of Knowledge*, *জ্ঞানতত্ত্ব*, মো. আবদুর রশীদ (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৩
[৪৭] আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. ৫
[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

আবুল হাশিম স্বজ্ঞাবাদ প্রতিষ্ঠা করার আগে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সমালোচনা করেছেন। বুদ্ধি জ্ঞানের কোন বাহন নয়। তিনি লিখেছেন, "বুদ্ধি একটি অনুভব শক্তি নয়। বুদ্ধি বস্তু কল্পনা করে এবং অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।"[৫১] বুদ্ধি অনুমান নির্ভর বলে সঠিক জ্ঞানের বাহন নয়। বুদ্ধি বহিরিন্দ্রিয় নির্ভরশীল। বহিরিন্দ্রিয় আমাদের সবসময় সঠিক জ্ঞান দেয় না। ইন্দ্রিয় মাঝে মধ্যে আমাদের প্রতারিত করে। ইন্দ্রিয় অনেক সময় সঠিক সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। "বহিরিন্দ্রিয় জড় বিষয়বস্তু বা জড় দৃশ্যাবলী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মন ও ইচ্ছার মাধ্যমে তা বুদ্ধির কাছে প্রেরণ করে। যখন স্বজ্ঞা কার্যকরভাবে সতেজ ও সরল না থাকে, তখন এসব স্বীকৃত তত্ত্ব বুদ্ধির অনুমান ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি রচনা করে। মন সবসময় মুক্ত নয়। অধিকাংশ সময়ই মন অহম কিংবা পরার্থিতার ইচ্ছাশক্তির দাস।"[৫২] একারণেই বুদ্ধি সঠিক জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম নয়। বুদ্ধির অক্ষমতা সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন,

> বহিরিন্দ্রিয় মনের নির্দেশানুসারে তত্ত্ব সংগ্রহ করে আর ইচ্ছার বাসনা অনুযায়ী মন এগুলোকে একত্রে গ্রথিত করে ও একটি আকৃতি দান করে। ইচ্ছা তার প্রভু অহমিকা কিংবা পরার্থিতার বাসনা অনুযায়ী তার আত্মমুখী বিবেক ও ধারণা গঠন করে এবং যেসব তত্ত্ব ও আকৃতি দ্বারা এই বিবেক ও ধারণা গঠিত হয়, সে সব উপদানসহ এই বিবেক ও ধারণাকে বুদ্ধির কাছে প্রেরণ করে। বেচারা বুদ্ধি অনুগত ভৃত্যের মত জ্ঞানের এসব আত্মমুখী তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন মতবাদ ও নীতি সাধারণ সূত্রাকারে প্রকাশ করে।[৫৩]

অভিজ্ঞতার সাহায্যে সঠিক জ্ঞান পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্ণ জ্ঞান দেয় না। অভিজ্ঞতা বহিরিন্দ্রিয় নির্ভর। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ অনুভূতির একমাত্র উৎস নয়। বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা স্থূল ও জড় বস্তুর আকার আকৃতি দেখি। কিন্তু স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা পরিচিত হই বস্তু বা দৃশ্যের প্রকৃত বা আসল রূপের সঙ্গে। বহিরিন্দ্রিয়সমূহ আমাদের মনে সত্যের আপেক্ষিক ধারণা জন্মায়। কিন্তু স্বজ্ঞা আমাদের মনে বস্তুর পরম ও চরম স্বরূপের প্রতিফলন করে।"[৫৪] পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদীরা বুদ্ধিবাদকে বর্জন করেছেন। তাদের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞান লাভের একমাত্র বাহন। কিন্তু আবুল হাশিম জ্ঞানের বাহন হিসাবে বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেন নি। তিনি লিখেছেন, "মন যখন স্বজ্ঞার সংস্পর্শে আসে এবং স্বজ্ঞার দ্বারা আলোকিত হয়, তখন বুদ্ধি জড় পরিবেশের প্রভাব ও শাসন থেকে মুক্ত হয়ে প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি ধর্মী প্রতিভার জন্ম দান করে। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার উপর স্বজ্ঞার সর্বময় কর্তৃত্ব।"[৫৫] জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বিচারবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উভয়ের সমন্বয়েই আমাদের জ্ঞান হয়। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিক আবুল হাশিমের মতে বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞা এই

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

দুয়ের সাহায্যে আমাদের জ্ঞান হয়। স্বজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির সাহায্যে পূর্ণ জ্ঞান হয় না। স্বজ্ঞা এবং বুদ্ধির সমন্বিত জ্ঞানের অনুপস্থিতিতেই মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে। পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানের উৎপত্তি, উৎস সম্পর্কে বলা হলেও পূর্ণ জ্ঞানের অভাবে মানুষের জীবনে যে দুঃখ নেমে আসে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। ভারতীয় দর্শনে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ভারতীয় দর্শনে অবিদ্যাই আমাদের দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। আবুল হাশিম লিখেছেন,

> স্বজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি বিষয়কে জটিল করে, মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি করে এবং প্রকৃতির সঙ্গে অহরহ যুদ্ধরত কৃত্রিম মানবজাতি সৃষ্টি করে। স্বজ্ঞার সঙ্গে সমন্বিত বুদ্ধি প্রকৃত সুখ-শান্তি এনে দিতে পারে এবং মানুষের আদিম স্বভাবিক প্রতিভা অনুসারে বিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। স্বজ্ঞাহীন বুদ্ধি সৃষ্টি করবে যন্ত্র আর স্বজ্ঞাযুক্ত বুদ্ধি সৃষ্টি করবে মানুষ।[৫৬]

জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমালোচনা করে আবুল হাশিম লিখেছেন, "স্বজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিভিত্তিক ভাববাদের তথাকথিত পূজারীরা হিউম, মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপর বিশেষ জোর দেন; কিন্তু তাঁরা পয়গম্বর ও ঋষিদের নিয়ে বিদ্রূপ করেন। এই মনোভাব যুক্তি ও বুদ্ধির পক্ষে সম্মানজনক তো নয়ই বরং অপমানজনক।"[৫৭] আবুল হাশিম ভাববাদী দার্শনিক। তাঁর এই ভাববাদ ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একারণেই তিনি মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের প্রশংসা করলেও বস্তুবাদকে মেনে নিতে পারেননি। এটা আবুল হাশিমের সীমাবদ্ধতা নয়, তিনি এখানে যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসকে নির্ভর করে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। আর এজন্যই বহিরিন্দ্রিয়ের চেয়ে অন্তরিন্দ্রিয়ের গুরুত্ব শুধু তাঁর কাছে বেশি নয়, বহিরিন্দ্রিয়কে অন্তরিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছেন।

জ্ঞানের উৎস হিসাবে স্বজ্ঞার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ আবুল হাশিম করলেও বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞার গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। জ্ঞানের উৎস হিসাবে তিনি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংবেদন স্বীকার করে নিয়েছেন। সংবেদন জ্ঞানের প্রধান বাহন। বস্তুর সংবেদন না হলে জ্ঞান হয় না। আমাদের মনে বস্তুর পূর্বের কোন ধারণা থাকে না। জন লক এই শূন্য মনকেই সাদা কাগজের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৫৮] লকের মতে "আমাদের ধারণাসমূহের উৎস দুটি : (ক) সংবেদন এবং (খ) আমাদের নিজস্ব মনের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষণ, যাকে 'অন্তরেন্দ্রিয়' নামে অভিহিত করা যায়।"[৫৯] লকের এই অন্তেরেন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবুল হাশিমের স্বজ্ঞার তুলনা করা যায়। আবুল হাশিম পাশচত্য দর্শনের অনুরাগী হলেও তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট। তিনি বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞার মাধ্যমে সমন্বিত জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সুখ-

---

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
[৫৮] বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*-৩, প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ১১৯
[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

শান্তি চেয়েছেন। বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞার সাহায্যে যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ সত্যিকারের মানুষে পরিণত হয়।

জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হিসাবে আবুল হাশিম অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি ইন্দ্রিয় সংবেদনমূলক জ্ঞানকে বর্জন করেছেন। তিনি বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞার সংমিশ্রণ করেছেন। স্বজ্ঞাকে বুদ্ধির উপর স্থান দিয়েছেন। আবুল হাশিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের সাথে আল-গাযালীর জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের মিল পাওয়া যায়। আল-গাযালীর মতে, অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান হচ্ছে উচ্চস্তরের জ্ঞান। আবুল হাশিমও অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞানকে উচ্চস্তরে স্থান দিয়েছেন। আবুল হাশিমের মতে, "কুরআনের জ্ঞানই সর্বোচ্চ জ্ঞান।"[৬০] মানুষের ইচ্ছা শক্তির গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে "মানুষ ইচ্ছা করুক আর নাই করুক তার বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়। স্বজ্ঞার সহযোগিতায় অকপট সত্য-সন্ধানীর বুদ্ধি, পরিশেষে সক্রিয় স্বয়ম্ভু ও চিরন্তন আল্লাহকে তার সৃষ্টির মধ্যে পেয়ে থাকে।"[৬১] স্বজ্ঞাকে আশ্রয় করে আবুল হাশিম বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন। ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যই তিনি স্বজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অধিবিদ্যা

ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল জগতের উৎপত্তি পরিণতি ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতিক সত্তা নিয়ে অধিবিদ্যা আলোচনা করে। আবুল হাশিমের ঈশ্বর এবং পরকাল সম্পর্কে আলোচনাকে অধিবিদ্যা নামে অভিহিত করা হবে। নিম্নে আবুল হাশিমের অধি বিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ আলোচনা করা হলো।

বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনি বিভিন্ন মতবাদ দিয়েছেন। গ্রিক দার্শনিক থ্যালিস বলেছেন পানি জগতের আদি উপদান। বায়ু, অগ্নি, সংখ্যা ইত্যাদি বস্তুগত ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রিক দার্শনিকেরা জগতের আদি কারণ অনুসন্ধান করেছেন। ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেছেন পঞ্চভূতের সমন্বয়ে জগতের উৎপত্তি। আবার কেউ এই পাঁচ ভূতের সাথে আরো দুটি ভূত যোগ করে বলেছেন সাত ভূতের সমন্বয়ে জগৎ ও জীবের সৃষ্টি। এই মহাবিশ্বের আদি কারণ অনুসন্ধানে মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নেই। কেউ বস্তুকে কেন্দ্র করে জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। অতিপ্রাকৃতিক সত্তার উপর আস্থা স্থাপন করেও অনেকে জগতের উৎপত্তি পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আবুল হাশিম ইসলাম ধর্মের অনুসারি বিংশ শতাব্দীর একজন বাঙালি মুসলিম দার্শনিক। জগতের উৎপত্তি পরিণতি সম্পর্কে তিনি

[৬০] আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. ৩৫
[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

ইসলাম ধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই গ্রহণ করেছেন। ইসলামী মতে আল্লাহ জগতের স্রষ্টা এবং প্রতিপালক। আবুল হাশিমও মনে করেন এই বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি এই জগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছাতেই জগতের ধ্বংস হবে। বিশ্ব জগতের স্রষ্টা জগতের নিয়ন্ত্রকও। আল্লাহ এক তার কোনো শরীক নেই। আবুল হাশিম লিখেছেন, "আল্লাহ এক এবং তিনি বিশ্বের স্রষ্টা। স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস বিশ্ব প্রকৃতির ও বিশ্ব মানবের একত্ব ও অখণ্ডের ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস প্রকৃতির সেই নিয়মেরই সঙ্কেত দেয়, যে নিয়ম বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করে ও ঐক্যের সৃষ্টি করে।"[৬২] সাদা কালো সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমেরিকান বাঙালি সবই আল্লাহর সৃষ্টি। ব্রিটিশ, বাঙালি, জার্মানী সবই মানুষ। আর এই মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী হওয়ার কারণে আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল্য করে। মানুষকে অবজ্ঞা অবহেলা করে। মানুষ মানুষকে শোষণ করে।

মহান আল্লাহ শুধু মানুষ সৃষ্টি করেনি এই বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ইচ্ছাতে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। এই বস্তুজগত এবং জগতের অন্তর্ভূক্ত পদার্থ সকল তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি। পানি, বায়ু, অগ্নি তিনি সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় দার্শনিকদের পঞ্চভূতও আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যাই আবুল হাশিম গ্রহণ করে লিখেছেন,

> আল্লাহ মহাবিশ্বের স্রষ্টা। মানুষ সৃষ্টির সেরা, পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করবে ও তার নিয়ম-কানুন মেনে চলবে। এই নিয়ম-কানুনের দ্বারাই মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সৃষ্টির বাকী সবকিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে ও তার সুখশান্তি বৃদ্ধি করবে।[৬৩]

মানুষের নিজের কোনো স্বাধীনতা নেই। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে। আল্লাহর প্রশংসা করবে। আল্লাহ এবং মানুষের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। কোনো তৃতীয় পক্ষ এই সম্পর্কের মাঝে নেই। আবুল হাশিম লিখেছেন, "পৃথিবীতে অল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আল্লাহর গুণাবলী অনুশীলন করে এবং নিজের মধ্যে এসবের বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে উর্ধ্ব স্তর থেকে উর্ধ্বতর স্তরে উন্নীত করার সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই রয়েছে।"[৬৪] আবুল হাশিম মনে করেন মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। মানুষ নিজের অবস্থা থেকে নিজেকে অনেক উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারে। মানুষের মধ্যে অসম্ভব ক্ষমতা রয়েছে। যে ক্ষমতা মহান আল্লাহ মানুষকে দিয়েছে। আবুল হাশিম মনে করেন আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে মানুষ, "সহজাত প্রকৃতির কারণে

---

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

মানুষ সর্বদা আল্লাহর সন্ধানে রত রয়েছে।"[৬৫] মানুষ আল্লাহর দিকেই আকৃষ্ট হয়। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন,

> মানুষ ইচ্ছা করুক আর নাই করুক তার বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়। স্বজ্ঞার সহযোগিতায় অকপটে সত্যানুসন্ধানীর বুদ্ধি, পরিশেষে সক্রিয় স্বয়ম্ভু ও চিরন্তন আল্লাহকে তার সৃষ্টির মধ্যে পেয়েই থাকে। কিন্তু সরল অঙ্কের সম্পাদ্যের মত আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, একে অনুভব করতে হয়।[৬৬]

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ অনুভবের সাহায্য আল্লাহকে পেয়ে থাকে। আবুল হাশিম মনে করেন যোগ বিয়োগ করে অঙ্ক কষে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যেই আছেন। তিনি সৃষ্টি থেকে দূরে নন।

মৃত্যুর পর মানুষের অবস্থান নিয়েও নানা ভিন্নমত আছে। বস্তুবাদীরা মনে করেন মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে মানুষ মিলিয়ে যায়। অধ্যাত্মবাদীদের ব্যাখ্যা ভিন্ন। আবুল হাশিম ইসলাম ধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা দিয়েই মানুষের ভবিষ্যত অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে আসে এবং পরিশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যায়।"[৬৭] মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা আবুল হাশিম স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন আল্লাহ মানুষকে সৃজনশীল ক্ষমতা দিয়েছে। এই ক্ষমতার কারণেই মানুষ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের সৃজনশীল সৃষ্টি আল্লাহর মহত্বকে ছোট করে না। মানুষ শূন্য থেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহর গুণেই মানুষ সৃজনশীল হয়। আবুল হাশিম লিখেছেন,

> পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ সৃজনপ্রতিভার অধিকারী, কিন্তু তার সৃজনপ্রতিভা শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, কিংবা আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকৃতির যে-সব নিয়ম-কানুন বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে সে-সব নিয়ম-কানুন তৈরি করা, পরিবর্তন করা ও সংশোধন করার ক্ষমতা তার নেই। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন জানার এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে উপস্থিত ও প্রাপ্তব্য পদার্থ ও উপদান থেকে নতুন নতুন আকার-আকৃতি গঠন করার ক্ষমতার মধ্যেই তার সৃজন প্রতিভা সীমাবদ্ধ।[৬৮]

মানুষ শুধু আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিকে বিকশিত করতে পারে। ইসলামী মতে জগত একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ তার একটি উদ্দেশ্য। আবুল হাশিম লিখেছেন, "বিশ্ব-সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, এই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিকে সুন্দর থেকে করা। খেলাচ্ছলে আল্লাহ বিশ্ব সৃষ্টি করেন নি। সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে।"[৬৯] জগতে মানুষ স্থায়ী নয়। একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ এই জগতে এসেছে। মানুষের অনন্ত জগত পরকাল। আল্লাহ মানুষকে

---

[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
[৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
[৬৯] প্রাগুক্ত পৃ. ৫৪

পরীক্ষা করার জন্য এই জগতে পাঠিয়েছে। মানুষের কর্মফল দ্বারাই পরবর্তীকালে তার স্থান নির্ধারিত হবে। ইহকালের কর্মফল মানুষ পরকালে ভোগ করবে। আবুল হাশিম মনে করেন, "আল্লাহর ইচ্ছার উপর আত্মসমর্থন করা পূণ্য আর আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ।"[৭০] আল কুরানে বর্ণিত জীবন বিধান পালন করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান থেকে সরে যাওয়ায় পৃথিবীতে নানা অন্যায় অবিচার শুরু হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া মানুষের অন্য কোনো উপাস্য নেই।

আবুল হাশিমের অধিবিদ্যা আলোচনায় দেখা যায় তিনি আল্লাহর প্রশসংসা করেছেন। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি জীব। সেই হিসাবে আল্লাহকে স্মরণ করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী আবুল হাশিম ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেনি নি। পরকাল নিয়ে আবুল হাশিমের বর্ণনা ইসলাম ধর্মে বর্ণিত পরকালের ধারণাকে অতিক্রম করে যায় না। এই আলোচনায় দেখা যায় আবুল হাশিম যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে আবুল আবুল হাশিমের দর্শন ধর্মনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

মূল্যবিদ্যা

মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলো প্রায়োগিক দর্শনের অন্তর্ভূক্ত। আবুল হাশিম প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলো চিন্তা করেছেন। নির্দিষ্ট আদর্শের আলোকে তিনি এগুলো সমাজ মানসে প্রতিফলন দেখতে চেয়েছেন। নৈতিকচিন্তা এবং রাজনৈতিক চিন্তা মূল্যবিদ্যার আর্ন্তগত। আবুল হামিশের নৈতিকচিন্তা এবং রাজনৈতিক চিন্তা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর মূল্যবিদ্যা আলোচনা করা হবে।

নৈতিকচিন্তা

নীতিবিদ্যা একটি আদর্শগত বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।[৭১] নীতিবিদ্যার আলোচনার পরিধি ব্যাপক। পরানীতিবিদ্যার আলোচনা সমসাময়িক কালের নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তুতে গুরুত্ব হারিয়েছে। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা বর্তমানে নীতিবিদ্যার অন্যতম আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ থেকে নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তুতে ভূমি-নীতিবিদ্যা, প্রাণী-নীতিবিদ্যা, সামরিক-নীতিবিদ্যা ইত্যাদি নতুন শাখা নীতিবিদ্যার আলোচনায় এসেছে।

---

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[৭১] William Lillie, *An Introduction to Ethics*, University paperbacks, Methuen, London, First published 1948, Reprinted 1957, P. 2

সাইবর (Cyborg) নীতিবিদ্যা নতুন করে আলোচনায় এসেছে। মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই নীতিবিদ্যার আলোচনার পরিধি বাড়ছে।

সুখবাদ, উপযোগবাদ ইত্যাদি মতবাদ দিয়ে বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমান দার্শনিকেরা প্রভাবিত হয়েছেন। আবুল হাশিমের নীতিদর্শনেও এসবের উপস্থিতি রয়েছে। ভাল-মন্দ ইত্যাদি আর্দশ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। নীতিতত্ত্ব বা নৈতিকতা সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন, "ভাল-মন্দের যে জ্ঞান মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে তা-ই নীতিতত্ত্ব বা নৈতিকতা।"[৭২] আবুল হাশিম নীতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রথমেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন পাশ্চাত্যের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে তারা ডারউইনের বিবর্তনবাদ গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ডারউইনের যোগ্যতমের বিবর্তনবাদ সূত্রকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে পশ্চিমা দেশগুলিতে নীতিতত্ত্ব ও নৈতিকতার অধোগতি আরম্ভ হয়।"[৭৩]

মানুষের তৈরি নীতি-নৈতিকতাকে তিনি সমর্থন করেননি। তিনি মনে করেন মানুষ ভুল করে। ভুল মানুষের নীতিও ভুল। শুধু তাই নয় মানুষের সৃষ্ট নৈতিক শিক্ষার ফলেই দুঃখ-দর্দশা বাড়ছে। তিনি শূন্যতাপন্থী এবং জড়বাদীদের সমালোচনা করে ইসলামী নীতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই নীতিতত্ত্ব উদ্দেশ্যবাদ সমর্থন করে। তিনি লিখেছেন, "বিশ্ব সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, এই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করা। খেলাচ্ছলে আল্লাহ্ বিশ্ব সৃষ্টি করেননি।"[৭৪]

আল্লাহ থেকে সবকিছু সৃষ্টি একথা আবুল হাশিম স্বীকার করলেও তাঁর নৈতিক মতবাদ সর্বেশ্বরবাদকে সমর্থন না করে না। নৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি উদ্দেশ্যবাদ সমর্থন করেছেন। তিনি উদ্দেশ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যক্তিবাদকে সমর্থন করেছেন। সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তি বড়। ব্যক্তির জীবন দিয়ে সমষ্টির জীবন নিয়ন্ত্রিত। তিনি লিখেছেন, "ইসলামী জীবন-দর্শন অনুসারে ব্যক্তির বিবেক দ্বারাই সামাজিক বিবেক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত।"[৭৫] আবুল হাশিমের ব্যক্তি মানুষ সবকিছুর পরিমাপক নয়। তাঁর ব্যক্তি শুধুই ব্যক্তি। এই ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা সীমিত। ব্যক্তি মানুষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এসেছে। এই পৃথিবী তার স্থায়ী আবাসস্থল নয়। পৃথিবীতে ক্ষণিকের উপস্থিতি তাঁর স্থায়ী আবাসস্থল নির্ধারণ করবে।

---

[৭২] আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. ৫৩
[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৫

ইসলাম মানব-সৃষ্ট ন্যায় অন্যায়বোধ বাতিল করে দিয়ে আল্লাহ সৃষ্ট ন্যায়-অন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহর আইন সর্বোৎকৃষ্ট। কালিমার প্রভাবে আরবের বেদুঈনদের জীবনের নৈতিক উন্নতির প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন, "কালিমা বেদুঈনদের দান করলো মানব প্রকৃতি-সম্মত স্পষ্ট ও সর্বজনীন এক নৈতিক বিধান। এভাবে কালিমা তাদের চিন্তায় বিপ্লব ঘটায়, তাদের আচার-আচরণে নিয়মশৃঙ্খলা বিধান করে এবং তাদেরকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে।"[৭৬] কালিমা শুধু বেদুঈনদের জীবনকে উন্নত স্তরে নিয়ে যায়নি, সমগ্র মানব জাতীর জীবনেই পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আবুল হাশিম লিখেছেন, "কালিমা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈতিকতাকে স্বীকার করেনা, কিন্তু সর্বজনীন ভাল-মন্দ বোধের উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করে।"[৭৭]

আবুল হাশিম ইসলামী নীতিতত্ত্বের সাহায্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নৈত্তিক ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের সকল উপাদান অস্বীকার করে শুধু ধর্মের উপর নির্ভর করে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আবুল হাশিমের টান ছিল। তিনি দেশ স্বাধীনের পর ১৯৫০ সালে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং তাঁর নৈতিক চিন্তায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি পাওয়া যায়। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি মানুষের সকল উদ্ভাবন এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমানের উপস্থিতি দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করেছেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, নিউটনের আবিষ্কার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে। আবুল হাশিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি রচনা করতে গিয়ে শুধু আধুনিক বিজ্ঞান অস্বীকার করেননি সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অস্বীকার করে লিখেছেন, "যে মুহূর্তে মাটি খোঁড়ার জন্যে বা শিকারের জন্যে সে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করলো, সে মুহূর্তে তার বেহেশত হারালো আর এক কৃত্রিম জীবনে প্রবেশ করলো।"[৭৮] চাকা আবিষ্কার, আগুন, বিদ্যুত আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবন স্বাভাবিক হয়। ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা বহুলাংশে কমেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের শত শত বৎসরের সাধনার ফল। চাকা থেকে বিদ্যুত মানুষের সাধনায় লক্ষ বৎসর সময় লেগেছে। আবুল হাশিমের কাছে এসবের কোন গুরুত্ব নেই। এ জন্যই হয়তো আবুল হাশিমের দর্শনচিন্তাকে আবদুল হক মূল্যায়ন শেষে বলেছেন, অংশত ভবিষ্যৎমুখী হলেও অংশত অতীত মুখী।[৭৯] আবুল হাশিমের নীতিচিন্তাও অংশত অতীত মুখী এবং অংশত ভবিষ্যতমুখী। তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর এ চেষ্টা বাস্তবতা থেকে বহু দূরে ছিল। কারণ পাকিস্তান ছিল বাঙালি মুসলমানের আবেগের রাষ্ট্র।

---

[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
[৭৯] আবদুল হক, "আবুল হাশিম : রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মদর্শন", সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ৩৪৯

ধর্মচিন্তা

আবুল হাশিমের জন্ম মুসলিম পরিবারে। পারিবারিক ধর্মীয় অনুভূতি তাঁর মধ্যে ছিল। পারিবারিকভাবে আবুল হাশিম ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর মতে কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। পারিবারিক ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁর ধর্মচিন্তায় স্থান পেয়েছে। আবুল হাশিমের ধর্মশিক্ষার বিবরণ দিয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "ইসলাম বিষয়ক তাঁর পড়াশোনা তিনি মোটামুটি ইংরেজি মাধ্যমেই করেছিলেন অন্য পড়াশোনার সাথে সাথে। সে সময় ইসলামি সাহিত্য পড়াশোনা করলেও তাঁর প্রতি খুব বড় রকম ঝোঁক তাঁর ছিল না। সেটা এক পর্যায়ে দেখা দিল মওলানা আজাদ সোবহানীর সাথে তাঁর পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সাথে।"[৮০] আবুল হাশিম ধর্মচিন্তায় আজাদ সুবহানীর প্রভাব অপরিসীম। আজাদ সুবহানী সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন,

> তিনি আমাকে রব্বানী দর্শনে দীক্ষিত করেছিলেন। রব্বানীয়াৎ শব্দটি স্রষ্টার গুণবাচক 'রব' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং বিবর্তক। বাস্তব অর্থে রব্বানিয়াত বলতে বোঝায় স্রষ্টার নিয়ম অনুসারে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং বিবর্তনে মানব জাতির দৈহিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন যেগুলি প্রকৃতির মধ্যে আল কোরানে এবং পয়গাম্বর হযরত মহম্মদের (দঃ) জীবনে লক্ষণীয় ছিল।[৮১]

ইসলাম ধর্মের উপর পূর্ণ আস্থাশীল হয়েও আবুল হাশিম গৌতম বুদ্ধকে অন্যতম পয়গম্বর বলে মনে করতেন।[৮২] কিন্তু তিনি মনে করতেন বুদ্ধের বাণী পরবর্তী সময়ে সঙ্কলন হওয়ার কারণে বিকৃতি ঘটেছে। এ-সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন,

> মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদেরা বুদ্ধকে পয়গম্বর শ্রেণীভুক্ত করতে ইতস্তত করার অন্য একটি কারণ হল এই যে, বুদ্ধের বাণী আমরা বর্তমানে যেভাবে পেয়েছি, তাতে আল্লাহর অস্তিত্বের পরিষ্কার স্বীকৃতি নেই। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, বুদ্ধের মৃত্যর কয়েক শতাব্দী পরে তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তাই এটা সহজে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই কয়েক'শ বছরের মধ্যে আত্মমুখী ব্যাখ্যা ও প্রক্ষেপণ দ্বারা তাঁর বাণী সমূহ ভীষণভাবে বিকৃত হয়েছিল।[৮৩]

গৌতম বুদ্ধকে তিনি মহামানব হিসাবে আখ্যায়িত করে লিখেছেন, "মুসা, বুদ্ধ, ঈসা ও মুহম্মদ (তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) - এ চারজন ধারাবাহিকভাবে মানবজাতির মহান শিক্ষাগুরু।"[৮৪] আবুল হাশিম সব ধর্মের প্রবর্তককে শ্রদ্ধা করলেও তিনি মনে করেন, "ইসলাম এমন এক বিজ্ঞান যা দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।"[৮৫] ধর্মকে তিনি জীবনের খণ্ড প্রকাশ রূপে

---

[৮০] বদরুদ্দীন উমর, ''আমার পিতা'', *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), পৃ. ২৬২
[৮১] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৪৩
[৮২] আবদুল হক, ''আবুল হাশিম : রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মদর্শন'', *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, সৈয়দ মনসুর (সম্পাদিত), পৃ. ৩৪৮
[৮৩] আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. ৪৯
[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

দেখেননি, দেখেছেন সমগ্ররূপে। "ধর্ম সব বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। ইচ্ছা করুক আর নাই করুক, সৃষ্টির কোন কিছুই দ্বীন বা ধর্ম বা প্রকৃতির নিয়ম-কানুনের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না।"[৮৬]

স্থান-কাল পাত্রের উপর নির্ভর করে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস। উষ্ণ দেশের স্বর্গের বর্ণনা এবং শীত প্রধান দেশের মানুষের স্বর্গের ধারণা এক রকম নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যও বিদ্যমান। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য টেনে আবুল হাশিম লিখেছেন,

> ধর্ম সম্বন্ধে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ধারণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ধর্ম প্রাচ্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। এটা শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার ব্যপার নয়। এটা জীবনের এক অখণ্ড রূপ। আরবী দ্বীন ও সংস্কৃত ধর্মকে রিলিজিয়ন বলে তর্জমা করে ভুল করা হয়। বস্তুত রিলিজিয়ন, দ্বীন ও ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা নয়, বরং অপব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআনে আরবী 'দ্বীন'কে আল্লাহর ফিতরত বা প্রকৃতি এবং সুন্নাহ বা আল্লাহর আইন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৮৭]

আবুল হাশিমের মতে আল কুরআনের পর আর কোন আসমানী কিতাব মানব জাতির জন্য আসবে না। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বা আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে পবিত্র কুরআনই সর্বশেষ কিতাব।"[৮৮] আবুল হাশিম আসমানী ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে লিখেছেন,

> পবিত্র কুরআনের ওহী সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। এতে কেউ কেউ মনে করেন যে, আসমানী নির্দেশ লাভের প্রত্যক্ষ উৎস হিসাবে ধ্বনি স্বজ্ঞা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। উন্নত জীবনের অধিকারী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকবেন। তবে এটা হবে ওহী থেকে কিছুটা নিম্নস্তরের। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় ইলহাম।[৮৯]

ইসলাম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকতা এবং নিয়ম-কানুন নিয়ে আলেম ওলেমাদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের প্রথম যুগেই সৃষ্টি হয় চার মাযহাবের। আবুল হাশিম মনে করেন, খুলাফায়ে রাশেদিনের শেষ খলিফা হযরত আলী (রা.) মৃত্যুর পর থেকে ইসলামী আদর্শ ও মতবাদ ক্রমশ অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। ইসলাম ধর্মের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার ভার এমন সব লোকের উপর পড়েছে যারা ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।"[৯০] ইসলামকে তিনি একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসাবে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, "ইসলাম একটি বিজ্ঞান। এর বিষয় হচ্ছে মানুষ অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবন। ইসলাম যাতে আবার তার মহৎ ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য ইসলামের মানবিক ও অন্যসব মূল্যবোধকে পুনরাবিষ্কার করে তাকে আধুনিক পটভূমিতে স্থাপন করতে হবে।"[৯১]

---

[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
[৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

আবুল হাশিম পবিত্র কোরআন শরীফ তরজমা ও সম্পাদনা করেছেন। কোরআন শরীফ পড়ার পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, "কুরআন পড়ার পদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পবিত্র কুরআনকে এখন তোতা পাখীর মতই আবৃত্তি করা হয়, এর একছত্র না বুঝে কিংবা গুরুত্ব সহকারে বোঝার চেষ্টা না করে, মুখস্থ করা হয়।"[৯২] তিনি মনে করতেন কোরান পড়া যদি যায় তাহলে এর অর্থ অবশ্যই বোঝা যাবে। এটা মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোরআন অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, "আরোহ ও অবরোহ এই উভয় পদ্ধতিতে পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করা উচিত।"[৯৩] কোরান পাঠ শুধু পরকালে শান্তির জন্য নয়। মানব জীবনকে সুন্দর এবং সুস্থ রাখার জন্য কোরআনের জ্ঞান আবশ্যক। তিনি মনে করেন কালিমার শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যই মানুষের জীবনের এই অধোগতি। আবুল হাশিম ইসলামী খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কাজ করেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ইসলামের একজন অতি উৎসাহী প্রচারক হিসাবে আমি মুসলিম লীগ মঞ্চ থেকে ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মূলনীতিসমূহ এবং সেগুলো হযরত মুহম্মদ (দ:)-এর নেতৃত্বে ইসলামের খেলাফতে কিভাবে সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল তা প্রচার করতাম।"[৯৪]

আবুল হাশিমের ধর্মচিন্তা মুসলিম দাশনিকদের ধর্মচিন্তা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করে অতিপ্রাকৃতিক-অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করেছেন। অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বিশ্বের সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং পালনকর্তা। আবুল হাশিমের ধর্মচিন্তার সঙ্গে আশারিয়া মতবাদের মিল পাওয়া যায়। আশারিয়া মতবাদে সৃষ্টিকর্তা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। আশারিয়াদের এই মত আল-গাজ্জালী সমর্থন করেন। আবুল হাশিমের আল্লাহ সম্পর্কে ধারণাও একই রকম। আবুল হাশিমের ধর্মচিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি ধর্মের তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণের চেয়ে বিশ্বাসের দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্বের চেয়ে তিনি ধর্মের গুণাবলি ব্যাখ্যা করেছেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকায় তিনি তাত্ত্বিক দিকে অগ্রসর না হয়ে বিশ্বাসের সাহায্যে ইসলাম ধর্মের গুণাবলি এবং মহত্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এমন দাবি করা যায় না। যদিও তিনি শুরু করেছিলেন গৌতম বুদ্ধকে অন্যতম পয়গম্বর বলে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়নি।

---

[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৯৪] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৫৫

রাজনৈতিক চিন্তা

আবুল হাশিমের জন্ম রাজনৈতিক পরিবারে। তিনি রাজনীতি করেছেন। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। এ-অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য, অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের জন্য তিনি রাজনীতি করেছেন। মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সংগঠনকে তিনি গণভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। সংগঠন ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয় এই উপলব্ধি তাঁর মধ্যে ছিল। সংগঠনকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। মৌলানা আজাদ সুবহানীর পরামর্শে তিনি একজন সফল আইনজীবী থেকে রাজনীতিবিদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। আজাদ সুবহানীর রব্বানীয় দর্শনচিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে আবুল হাশিম ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন,

> লোকে গাল ভরা বুলি হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলে কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত অর্থ কি সে সম্বন্ধে তাদের ন্যূনতম ধারণা নাই। যে রাষ্ট্র তার নাগরিকের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে বিশ্বস্ততার সাথে রব্বানিয়াতকে কার্যে পরিণত করে তাকেই বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্র। বর্তমান পৃথিবীতে কোথাও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই।[৯৫]

আবুল হাশিম আদর্শ-ভিত্তিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এদেশের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করা। তিনি কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য রাজনীতি করেননি।[৯৬] যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় যাওয়া এবং টিকে থাকা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের পরিপন্থি। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বিশেষত্ব এখানেই। আবুল হাশিমের রাজনৈতিক জীবন ব্রিটিশ উপনিবেশিক ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

আবুল হাশিম নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য রাজনীতি করেছেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> ১৯৩৭ সালে কোলকাতায় এম. এ ইস্পাহানীর বাসভবনে আমি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাত করি। জিন্নাহ আমাকে বললেন যুবক, আমার পতাকাতলে এসো। উত্তরে আমি বলেছিলাম স্যার, আমি কেন প্রত্যেক নারী ও পুরুষ আপনার পতাকাতলে আসবে যদি আপনি তাদের জন্য উপযুক্ত লক্ষ্য নির্দেশ দিতে পারেন। যুবকরা চায় উন্মাদনা, আবেগ ও চাঞ্চল্য এবং কংগ্রেস তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে সেটা দিতে সক্ষম হয়েছে।[৯৭]

---

[৯৫] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৪৩
[৯৬] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, ''আবুল হাশিম স্মরণে'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ১৭১
[৯৭] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ২৭

আবুল হাশিম জিন্নাহর আহ্বানে মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই যোগদান সুখকর হয়নি। যদিও তিনি মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু মুসলিম লীগের ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি টিকে থাকতে পারেননি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানী উপনিবেশে পরিণত হয়। শেষ জীবনে আবুল হাশিম এই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুসলিম লীগকে নবাব, নাইট, প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের কবল থেকে মুক্ত করে গণভিত্তির উপর দাঁড় করানোর যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তার বাস্তবায়ন ঘটেনি। আশাহত হয়ে তিনি লিখেছেন, "জিন্নাহ মুসলিম লীগকে একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে গঠন করতে ইচ্ছুক এবং জিন্নাহর সে কথায় বিশ্বাস করে আমি মুসলিম লীগে যোগদান করলাম। কিন্তু আমি প্রতারিত হয়েছিলাম।"[৯৮] জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে যারা গণতান্ত্রিক এবং আদর্শভিত্তিক রাজনীতি খুঁজেছেন তারা প্রত্যেকেই আবুল হাশিমের মত রাজনৈতিকভাবে প্রতারিত হয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র রূপলাভ করে। ভারতবর্ষ থেকে অফিসিয়ালি ভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতার উচ্চাভিলাষ ভারতবর্ষের ললাটে কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দেয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা শক্তিশালী ভারতবর্ষ গঠনে বিরোধী ছিল। সাম্রাজ্যবাদ অনুগত কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলা ভাগের বিপক্ষে ছিলেন আবুল হাশিম। আবুল হাশিম, শরৎ বসুসহ আরো কিছু নেতা অবিভক্ত বাংলা গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতার উচ্চাভিলাষে তাদের অবিভক্ত বাংলা গঠনের পরিকল্পনা ফানুষের মত উড়ে যায়। বৃহৎবঙ্গ গঠনের চেতনা আবুল হাশিমেরা গণচেতনার স্তরে নিয়ে যেতে পারেননি। আবুল হাশিমের রাজনৈতিক জীবনে দেখা যায়, এ অঞ্চলে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বৃহৎবঙ্গ গঠনে তাঁর অবস্থান খুবই নিম্নস্বরের।

ভরতবর্ষে মুসলমানদের আলাদা আবাসভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে স্থান পায়। আবুল হাশিম মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। মুসলিম লীগের লাহোরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে এ. কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। আবুল হাশিম লিখেছেন, "ফজলুল হক মঞ্চে এসে ১৯৪০-এর বিখ্যাত প্রস্তাব

---

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

উপস্থাপন করলেন যা ইতিহাসে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত।"[৯৯] লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত হলেও ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের রূপরেখা লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে ছিলনা। লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র নির্মাণের কথা উল্লেখ ছিল। এ-সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন,

> লাহোর প্রস্তাব ছিল ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ গঠনের জন্য আন্দোলনের ভিত্তি। ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি হলো পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মির নিয়ে গঠিত উত্তর পশ্চিম ভারতে এবং অন্যটি বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত উত্তর পূর্ব ভারতে। একজন মুসলমান ও বাঙালি হিসেবে আমি নিজের স্বাধীনতা দেখেছিলাম লাহের প্রস্তাবে এবং ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে আমি আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলাম।[১০০]

এ-সময় কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না দ্বিজাতিতত্ত্ব উপস্থাপন করছেন। ভারতীয় মুসলমানদের তিনি তখন একমাত্র মুখপাত্র, সোল স্পোক্স্ম্যন।[১০১] আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েও জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। বহু জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন তিনি। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমি জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলাম না এবং বাংলায় আমি সেটা প্রচারও করিনি। আমি প্রচার করেছিলাম বহুজাতিতত্ত্ব। আমি মনে করি ভারতবর্ষ কোন একটি দেশ নয়। এ হলো একটি উপমহাদেশ। ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশ ও জাতির সমন্বয়ে গঠিত। আমার কাছে ইউরোপ বলতে যা বোঝায় ভারতবর্ষ বলতেও তাই বোঝায়।"[১০২] লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা ছিল।

১৯৪৬ সালে ৭ই এপ্রিল নির্বাচনে বিজয়ের পর জিন্নাহ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের নিয়ে এক সম্মেলনের আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পশ্চিমাংশ ও পূর্বাংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা নিয়ে একক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন জিন্নাহ। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম জিন্নাহর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কারণ লাহোর প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। লাহোর প্রস্তাবের স্টেটস কিভাবে স্টেট হয়ে গেল সে সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন,

> জিন্নাহ বললেন, 'ভালো, মওলানা সাহেব বহুবচন এস্ এর উপর চাপ দিচ্ছেন যেটি স্পষ্টত ছাপার ভুল।' আমি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানকে সভার কার্য্যবিবরণী পেশ করার জন্য অনুরোধ করায় তিনি সেটি পেশ করলেন এবং সেখানে জিন্নাহ তাঁর স্বাক্ষরিত বহুবচন এস্ দেখতে পেলেন। নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী বললেন, 'কায়েদে আজম আমাদের পরাজয় হয়েছে।' আমাকে উদ্দেশ্য করে জিন্নাহ বললেন, 'মওলানা

---

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
[১০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
[১০১] মফিদুল হক, ''আবুল হাশিম ও বাঙালির রাষ্ট্রসাধনা'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ৩৮২
[১০২] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৩৪

সাহেব আমি এক পাকিস্তান চাইনা, আমি চাই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি বিধান সভা। আপনি আমার প্রস্তাবটিকে এমনভাবে সংশোধন করতে পারেন কি যাতে করে লাহোর প্রস্তাবের অবমাননা না করে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।' আমি বললাম, 'তাহলে বিশেষণ পদ 'ওয়াজ' কেটে ফেলুন এবং অনির্দিষ্ট শব্দ 'এ' বসান যাতে আপনার প্রস্তাব এরূপ হয় 'আমাদের উদ্দেশ্য হলো উত্তর পশ্চিম ভারতে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাংলা এবং আসামকে নিয়ে উত্তর পূর্ব ভারতে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র।' জিন্নাহ এতে রাজি হলেন।[১০৩]

জিন্নাহ রাজি হলেও বাংলা ভাগ ঠেকানো যায়নি। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিম্ভুতকিমাকার সেই পাকিস্তান রাষ্ট্র টিকে থাকেনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এজন্য রক্ত দিতে হয়েছে। এই রক্তের ঋণ এখনো শোধ হয়নি।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের মধ্যে দিয়ে আবুল হাশিমের রাজনৈতিক চিন্তার প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। তিনি অবিভক্ত বাংলার স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। উদ্বাস্তু হয়ে তিনি বৃহৎবঙ্গের একাংশ স্বাধীন বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনের মধ্য ক্ষতচিহ্ন ছিল। তাঁর বৃহৎ বঙ্গ ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল। বহুজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করলেও তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে তিনি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "ইসলামী সমাজে মানুষের সামাজিক মর্যাদা পেশার দ্বারা নির্ণীত হয় না, ব্যক্তির গুণাবলি এবং সামাজিক কল্যাণে তার পৃষ্ঠপোষকতার মাপকাঠিতেই সেটা নির্ণীত হয়।"[১০৪] আবদুল হক আবুল হাশিমের রাষ্ট্রচিন্তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ছিল ইসলামভিত্তিক, অতএব স্বভাবতই তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হয়েও সেখানে থাকতে পারেননি। সেখানকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এর অন্যতম কারণ ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রধানত এই কারণেই তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে চলে আসেন এবং এখানকার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।"[১০৫]

আবুল হাশিমের ইসলামী রাষ্ট্র মঙ্গলময় রাষ্ট্র। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ মাঙ্গলিক রাষ্ট্র। নাগরিকদের নৈতিক ও পার্থিব মঙ্গল বিধান এর দায়িত্ব।"[১০৬] ইসলামী রাষ্ট্র বলতে আবুল হাশিম রব্বানীয়াতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "লোকে গাল ভরা বুলি হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলে কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত অর্থ কি সে সম্বন্ধে তাদের ন্যূনতম ধারণা নেই। যে রাষ্ট্রে তার নাগরিকের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে বিশ্বস্ততার সাথে রব্বানিয়াতকে কার্যে পরিণত করে তাকেই বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্র।"[১০৭] ইসলামিক রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার আগে তিনি

---

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[১০৪] আবুল হাশিম, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা*, পৃ. ১২

[১০৫] আবদুল হক, ''আবুল হাশিম : রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মদর্শন'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ৩৪৫, ৩৪৬

[১০৬] আবুল হাশিম, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা*, এ, টি, এম, আবদুল মতীন (সম্পাদিত), নূরুল ইসলাম (অনূদিত), ইসলামিক একাডেমি, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ. ৫

[১০৭] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ৪৩

গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "নাসিকা গণনার রাজনীতিকে বলা হয় গণতন্ত্র।"[১০৮] আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের এক ভোটে নির্বাচন পদ্ধতির তিনি বিরোধী ছিলেন। আবুল হাশিম আধুনিক ইউরোপের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে মদিনার শাসন ব্যবস্থার তুলনা করে লিখেছেন, "যা নিয়ে অতিমাত্রায় গর্ববোধ করা হয়, পশ্চিমা গণতন্ত্রের সেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে মদিনার সে কালের মুসলিম সমাজের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে তুলনা করা আর তুচ্ছের সঙ্গে মহামহিমের এবং কপটতা ও কৃত্রিমতার সঙ্গে সত্যের তুলনা করা একই কথা।"[১০৯] আধুনিক ইউরোপের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করে আবুল হাশিম ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর ইসলামী গণতন্ত্রের সাথে অভিজাততন্ত্রের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অভিজাতরা মিলে ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচন করবে। প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলোতে এই পদ্ধতি ছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ নাগরিকেরা ছিল উৎপাদক শ্রেণি। শাসক শ্রেণি অভিজাত। একের সাথে অন্যের পার্থক্য অনেক।

আবুল হাশিম একটি উপমার সাহায্যে অভিজাততন্ত্র সমর্থনে লিখেছেন, "দুধ ঘুঁটলে উপরে সর পড়ে। এভাবে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সবসময়ই সমাজের শীর্ষে অবস্থান করেন। তাই যদি উদ্দেশ্য সৎ হয় তবে নেতা নির্বাচন করার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না।"[১১০] আবুল হাশিমের নেতা নির্বাচন করার পদ্ধতিকে জামাত-ই-ইসলামি এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলের নেতা নির্বাচন করার পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে আবদুল হক লিখেছেন,

> জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে ঠিক নয়, ইসলামের প্রথম যুগে যে পদ্ধতিতে খলিফাবৃন্দ নির্বাচিত হতেন এবং মজলিস-ই-সুরার সহায়তায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন আল্লাহর খলিফা হিসেবে, সেই পদ্ধতিকে তিনি আদর্শ বিবেচনা করেছেন। আবুল হাশিমের এই মতবাদ জামাত-ই-ইসলামি এবং অন্যান্য ধর্মবাদী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক আদর্শের অনুরূপ বলা অসঙ্গত নয়।[১১১]

আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠান। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিয়ে শাসক শ্রেণি নির্বাচন করে। আবুল হাশিম এই পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেন সৎ নেতারা কর্তব্যের খাতিরে কেবল কর্তব্য করবে। এই ধরনের নেতৃত্ব ইউটোপিয়ান চিন্তায় কেবল সম্ভব। আবুল হাশিম ইসলামের প্রথম যুগে আরবের খলিফা নির্বাচন করার পদ্ধতি দিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছেন।

---

[১০৮] Abul Hashim, *The Creed of Islam or the Revolutionary Character of Kalima*, p. 104
[১০৯] আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. ৭৬
[১১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
[১১১] আবদুল হক, ''আবুল হাশিম : রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মদর্শন'', সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত) *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, পৃ. ৩৪৮

কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে চার খলিফা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন নাই। আরবে রাষ্ট্র তখনো প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। সময় অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তার জগতের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদক, শ্রমিক, অভিজাত সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক। শাসন ব্যবস্থায় সবার অংশগ্রণ নিশ্চিত করাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য।

আবুল হাশিম পুঁজিবাদের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু প্রথম জীবনে আবুল হাশিমের বৃহৎ বঙ্গের স্বপ্ন পুঁজিবাদকেই সমর্থন করে। পুঁজিবাদের সমালোচনা করে আবুল হাশিম লিখেছেন, "পুঁজিবাদ মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে।"[১১২] আবুল হাশিম পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করে ইসলামিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট ঘোষণা করে লিখেছেন, "সমাজতন্ত্রবাদ সম্পদের উপর মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা অস্বীকার করে সামাজিক মালিকানার অনুসারী। ইসলাম এই উভয় ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে অর্থনৈতিক সার্বজনীনতা শিক্ষা দেয়। এটাই এক কথায় আল্লাহর মালিকানা।"[১১৩] আল্লাহর মালিকানার ভিত্তিতে তিনি কালিমার জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সার্বভৌমত্ব বলতে তিনি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বুঝেন। আবুল হাশিমের রাষ্ট্রে মানুষের সার্বভৌমত্বের কোন গুরুত্ব নেই। তিনি লিখেছেন, "আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সব মানবিক প্রভুত্বের বন্ধন থেকে আরবদের মুক্তি দিয়েছিল এবং কালিমার নতুন জাতীয়তা তাদেরকে দিয়েছিল বিশ্ব নাগরিকত্বের অধিকার। কালিমার আদর্শ হচ্ছে রাজনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সর্বজনীন স্বীকৃতি।"[১১৪] আল্লাহর মালিকানা স্বীকার করে নিলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অস্বীকার করা হয়। সম্পদের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব না থাকলে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক 'কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য করবে' এই বাক্য শুনতে শ্রুতিমধুর হলেও গত একশত বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সফল হতে পারেনি। আবুল হাশিমের আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা এবং ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্বায়নের যুগে অপ্রাসঙ্গিক। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শাসন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আবুল হাশিমের রাষ্ট্রচিন্তার বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করা যায়।

উপসংহার

আবুল হাশিম মৌলানা আজাদ সুবহানীর রব্বানী দর্শনে দীক্ষিত ছিলেন। রব্বানীয় দর্শন থেকে আবুল হাশিমের চিন্তার পরিবর্তন হয়নি। মৌলানা আজাদ সোবহানীর পরামর্শে তিনি রাজনীতি করতেন। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি সমাদৃত ছিলেন। রাজনীতির মধ্যে দিয়েই তিনি দর্শনে প্রবেশ করেন। আমরা দেখেছি দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় আবুল হাশিমের মৌলিক

---

[১১২] আবুল হাশিম, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা*, পৃ. ৬
[১১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[১১৪] আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা*, পৃ. ১০১

অবদান রয়েছে। তিনি মনে করতেন বুদ্ধি অথবা অভিজ্ঞতার সাহায্যে পূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য তিনি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হিসাবে আবুল হাশিম অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি ইন্দ্রিয় সংবেদনমূলক জ্ঞানকে বর্জন করেছেন। তিনি বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞার সংমিশ্রণ করেছেন। স্বজ্ঞাকে বুদ্ধির উপর স্থান দিয়েছেন। আবুল হাশিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের সাথে আল-গাযালীর জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের মিল পাওয়া যায়। আল-গাযালীর মতে, অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান হচ্ছে উচ্চস্তরের জ্ঞান। আবুল হাশিমও অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞানকে উচ্চস্তরে স্থান দিয়েছেন। তিনি কুরআনের জ্ঞানকে সর্বোচ্চ জ্ঞান বলে জানতেন। মানুষের ইচ্ছা শক্তির গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করেছেন। স্বজ্ঞাকে আশ্রয় করে আবুল হাশিম বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন। ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যই তিনি স্বজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধিবিদ্যার বিষয়গুলো নিয়ে আবুল হাশিমের আলোচনায় দেখা যায় তিনি যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মনে করেন, আল্লাহ মহাবিশ্বের স্রষ্টা। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে আসে এবং মৃত্যুর পর পরিশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যায়। আবুল হাশিম রাজনীতি করেছেন অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের জন্য। কিন্তু তিনি গণতন্ত্র পছন্দ করতেন না। গণতন্ত্রকে তিনি নাসিকা গণনার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আবুল হাশিম পুঁজিবাদের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু আবুল হাশিমের বৃহৎ বঙ্গের স্বপ্ন পুঁজিবাদকেই সমর্থন করে। পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করে আবুল হাশিম ইসলামিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট ঘোষণা করেছেন। তিনি ইসলামিক রাষ্ট্রে আল্লাহর মালিকানার ভিত্তিতে কালিমার জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সার্বভৌমত্ব বলতে তিনি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বুঝেন। আবুল হাশিম ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ইসলামের চার খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি দ্বারাই তিনি নেতা নির্বাচনের পদ্ধতিকে সঠিক বলে মনে করতেন।

আবুল হাশিমের জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর দর্শনচিন্তা ছিল অংশত ভবিষ্যৎমুখী হলেও অংশতঃ অতীতঃ মুখী। তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর এ চেষ্টা বাস্তবতা থেকে বহু দূরে ছিল। কারণ পাকিস্তান ছিল বাঙালি মুসলমানের আবেগের রাষ্ট্র। আবেগ স্থায়ী হয়নি। পাকিস্তান রাষ্ট্রও টিকেনি। আবুল হাশিমের দর্শন শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে আশ্রয় নিয়েছে। ধর্ম থেকে তিনি মুক্ত নন। ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবুল হাশিমের জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি ধর্মাশ্রিত চিন্তা-চেতনা থেকে মুক্ত নন। সে জন্য আবুল হাশিমকে ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দার্শনিক হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে তিনি স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তিনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির সাহায্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

জীবন ও কর্ম

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আজরফ। বংশগতভাবে তাঁর নাম মোহাম্মদ আজরফ চৌধুরী। তিনি মোহাম্মদ আজরফ এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ দুই নামেই লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন।[১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯০৬ সালের ২৫ অক্টোবর সিলেটের সুনামগঞ্জের তেঘরিয়া গ্রামে জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম রওশন হুসনা বানু এবং পিতার নাম দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ চৌধুরী। জন্ম তারিখ নিয়ে তিনি বলেছেন, "আমার একাডেমিক জন্ম তারিখ অবশ্য ১৯০৮ সালের পহেলা জানুয়ারি।"[২] হাছন রাজা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের নানা এবং নানা শ্বশুর। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের পূর্বপুরুষ হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "১১২০ বাঙলা সালে আমাদের বংশের পূর্ব পুরুষ প্রেম নারায়ণ রায় চৌধুরী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মোহাম্মদ ইসলাম খান চৌধুরী বলে পরিচিত হন।"[৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বড় হয়েছেন সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থায়। তাঁর পরিবারও সামন্ত পরিবার। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আমাদের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ সামন্ততন্ত্রীয়। দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী পরিবেষ্টিত পরিবেশে ইস্কুলের মাষ্টাররা আসতেন আমাদের গৃহ শিক্ষক হয়ে। উনারা কানমলা দিলে বাড়ির ঝি-চাকরানীরা তেড়ে আসতো। কেউ কেউ গালি-গালাজও করতো। কী! ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা তো কম নয়; আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের মনিব তাদের গায়ে হাত তুলবে, কোথাকার এক রাঙ্গালের পুত।[৪]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯২৫ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম বিভাগ নিয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০ সালে তিনি বি এ পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দর্শন নিয়ে এম এ পাশ করেন। ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের তত্ত্বাবধানে তিনি Access to Reality শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে গোবিন্দচন্দ্র দেবকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

---

[১] কোন কোন গ্রন্থে দেওয়ান তিনি, মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন আবার কোন কোন গ্রন্থে তিনি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন। যেমন *জীবন দর্শনের পূর্ণগঠন* গ্রন্থে তাঁর নাম লেখা রয়েছে, মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০ । *আবার অতীত দিনের স্মৃতি*, *ধর্ম-দর্শন* ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর নাম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লেখা রয়েছে। বাংলাদেশ দর্শন সমিতির মুখপত্র দর্শন পত্রিকা তিনি মোহাম্মদ আজরফ নামে সম্পাদিত করেছেন। মোহাম্মদ আজরফ, (সম্পাদিত), *দর্শন*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৯, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা।

[২] মো. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, খোজরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০২, পৃ, ১৯

[৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *অতীত জীবনের স্মৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৮

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৩৭ সালে তিনি সিলেটের চৌধুরী একাডেমিতে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে কর্মজীবনের সূচনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সুনামগঞ্জ কলেজে তিনি যুক্তিবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা পড়াতেন। এই কলেজেই তিনি উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নরসিংদী এবং মতলব কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ঢাকার আবুযর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে তিনি ছিলেন খণ্ডকালীন শিক্ষক।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ দর্শন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। নজরুল ইনস্টিটিউটের জীবন সদস্য, নজরুল একাডেমির সভাপতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং বাংলা একাডেমির আমৃত্যু ফেলো ছিলেন তিনি। পাকিস্তান লিটারেরি সোসাইটির সম্পাদক, তমদ্দুন মজলিস ও ইকবাল সংসদের সভাপতি ও সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাকিস্তান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেস এবং সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। সঙ্গীত চর্চা ও সঙ্গীত রচনা করতেন কবিতাও লিখেছেন।

১৯৪৮ সালে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আসাম মুসলিম লীগে যোগদান করেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আসাম লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় তিনি জেলে গিয়েছেন। জমিদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি নানকার প্রথা সমর্থন করেননি। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বরকত, শফিক, রফিক, জব্বার শহীদ হওয়ার পর ভাষা আন্দোলন অগ্নিমূর্তিরূপে প্রকাশ পায়, তখন আমি সুনামগঞ্জ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলাম। আমার বাসা থেকেই ভাষা আন্দোলনের মিছিল বের হতো। এই মিছিলের উদ্যোক্তা ছিলেন পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পরিষদের সদস্য মরহুম আবদুল হক। তার ফলে আমি পাকিস্তান সরকারের বিরাগভাজন হয়ে গেলাম।[৫]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৪৯ সালে তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তমদ্দুন মজলিস ভাষা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

১৯৪৮ সালে সাপ্তাহিক *নওবেলাল* পত্রিকা প্রকাশিত হয় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সম্পাদনায়। ১৯৪৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে এক সভায় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন

[৫] মো. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, পৃ. ১৩৭

প্রধান বক্তা। এই সভায় তিনি, "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাপ্তাহিক *নওবেলাল* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ (৮ জানুয়ারি) সংখ্যায় রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের প্রবন্ধের খবর প্রকাশিত হয়।[৬] পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের পর পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে পাকিস্তানের শত্রু হিসাবে মনে করে।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ কর্মজীবনের সফলতার স্বীকৃতি হিসাবে একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লাহ স্বর্ণ পদক, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ স্বর্ণ পদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার, আন্তর্জাতিক ধর্ম ও শান্তি পুরস্কারসহ দেশে-বিদেশে বহু পুরস্কার লাভ করেছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী "দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন একুশ শতকের বাঙলার এক চমকপ্রদ বিস্ময়। তিনি যেমন ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী এক ক্ষণজন্মা পুরুষ, অন্যদিকে তাঁর কর্মজীবনও ছিলো নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর।"[৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের উদারতা ও মানববাদিতার বর্ণনা দিয়ে আবুল মাল আবদুল মুহিত লিখেছেন, "মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি কখনও বিসর্জন দেননি। কিন্তু সেই যাত্রাপথে তিনি ধর্মকে গ্রহণ করেন একটি আশ্রয় হিসাবে। তাঁর মতে, বিশ্বাস একটি আন্তজ্ঞানের বিষয়। চারদিকে অবিচার, বঞ্চনা, বিভেদ ও লুটপাট তাঁকে খুবই ব্যথিত করত। তাঁর কাছে মনে হয় এ থেকে মুক্তি দিতে পারে একটি ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা।"[৮] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছকে বাধা চিন্তায় স্থির ছিলেন না। পরিবর্তনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর জীবনেও এই পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথম জীবনে তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতেন না। তিনি যে নাস্তিক ছিলেন অথবা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তবে তাঁর প্রথমদিকের চিন্তাচেতনাকে অনেকেই অজ্ঞেয়বাদ হিসাবে অভিহিত করেছেন। শেষ জীবনে তিনি ইসলাম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতিও ছিলেন সহিষ্ণু। এটাও এক ধরনের পরিবর্তন।[৯]

দর্শনচিন্তা

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ দর্শন পড়েছেন, অধ্যাপনা করেছেন। দর্শন নিয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণা রয়েছে। শৈশব থেকেই দর্শন তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল। এ-সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "কৈশোর থেকেই দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আমার প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত আমাকে

[৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতির মণিকোঠায়*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১১০
[৭] এম. মতিউর রহমান, *বাঙলার দার্শনিক মনীষা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২০৭
[৮] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতির মণিকোঠায়*, পৃ ১১১
[৯] এম. মতিউর রহমান, *বাঙলার দার্শনিক মনীষা*, পৃ. ২০৮

ব্রহ্মাচার্যে দীক্ষা দেয়ার পরে ধর্ম ও দর্শন এই উভয়বিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার প্রতি আমার ঝোঁক দেখা দেয়, যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।"[১০] দর্শন বিষয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নেওয়ার মূলে ছিল সত্য লাভের জন্য আমার আকুল পিপাসা। ন্যায় শাস্ত্রের পরীক্ষাগুলোতে আমি সবসময়ই আশি থেকে নব্বই পর্যন্ত নম্বর পেতাম। তাতে আমার ধারণা জন্মেছিল, দর্শনের পরীক্ষায়ও আমি এভাবেই কৃতকার্য হব।[১১]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বক্তব্যের মধ্যে দর্শনচিন্তার ছাপ স্পষ্ট। তিনি দর্শনের গ্রন্থ লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন। নিজেকে তিনি দর্শনের ছাত্র হিসাবেই অভিহিত করতেন। এ-সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমি এখনও চিন্তা করছি এবং আমার এই চিন্তার ফল বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছি। কাজেই একেবারে পাকাপোক্ত দার্শনিক যেমন প্লেটো, এ্যারিস্টটল, এঁদের মতো স্থান আমার নয় এবং আমাকে এখনও আমি নিজে দর্শনের পাঠ গ্রহণকারী শিক্ষার্থী হিসাবেই মনে করি।"[১২] মুক্তমনের স্বাধীন চিন্তার মানুষ সৃষ্টির জন্য দর্শন অপরিহার্য বলে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "দর্শনের লক্ষ্য সুষ্ঠু চিন্তার বিকাশ ঘটানো এবং এমন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ স্বীয় মত পোষণ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে।"[১৩] দর্শনকে তিনি জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মনে করতেন। জীবনের প্রয়োজনে দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। জীবনকে বাদ দিয়ে দর্শনের কথা চিন্তাই করা যায় না। মানবজীবনকে সুন্দর ও সুখকর করাই দর্শনের লক্ষ্য। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ভাষায়, "যে দর্শনের সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই সে দর্শন যত উচ্চ পর্যায়েরই হোক না কেন, তার পরিণতি আকাশ-কুসুমে পর্যবসিত হতে বাধ্য।"[১৪] প্রাচীনকাল থেকে মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধানে দর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দর্শন চর্চাকেই তখন জ্ঞানচর্চা বলে ধরে নেয়া হত। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন, প্রাচীনকালে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাকেই জ্ঞানের পথ বলে মনে করা হতো।[১৫] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শনচিন্তার বর্ণনা দিয়ে ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "দর্শন তাঁর কাছে জীবনবিচ্ছিন্ন কোন তত্ত্বচিন্তা নয় বরং তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে যথার্থ দার্শনিক জিজ্ঞাসার মূল রয়েছে মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। অন্য কথায়, তত্ত্বজিজ্ঞাসা মানুষের সহজাত।"[১৬]

---

[১০] মো. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, পৃ. ২৫
[১১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *অতীত জীবনের স্মৃতি*, পৃ. ৬৪
[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
[১৩] মো. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, পৃ. ৩৩
[১৪] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ভাববাদ যুগে যুগে*, হিমি বুকস এন্ড বুকস, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৭
[১৫] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ৯
[১৬] আনিসুজ্জামান, ''দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ'', শাহেদ আলী (সম্পাদিত), *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ*, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সম্বর্ধনা কমিটি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৪- ৩৫

বাংলাদেশে দর্শনচর্চার প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এদেশের দর্শনকে তিনি পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের নিজস্ব দর্শনের উপরই এদেশের কল্যাণ নিহিত। এদেশের সমাজ সংস্কৃতির আলোকেই দর্শন সৃষ্টি করতে হবে। পাশ্চাত্যের দর্শন দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের কণ্যাণ হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দর্শন বিভাগের উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এদেশে পাশ্চাত্য দর্শন চর্চা শুরু হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিদ্বজ্জন সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে গুরুত্বহীনভাবে পড়ানো হয় ভারতীয় দর্শন। ভারতীয় দর্শনের চর্চাও খুব একটা হয়নি। ভারতীয় দর্শনে বাংলাদেশে বিদ্বজ্জনের সংখ্যাও কম। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ দর্শন নামে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে দর্শনচর্চার বিকাশের জন্য, এদেশের দর্শনের ইতিহাস জানা আবশ্যক বলে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘‘পাশ্চাত্যের আগ্রাসন থেকে আমাদের দার্শনিক চিন্তাকে রক্ষা করতে হলে আমাদের দেশের দর্শনের ইতিহাসকে আরো বিস্তৃত করতে হবে।’’[১৭] দর্শনকে তিনি মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এ-সম্পর্কে বাংলাদেশ দর্শন সমিতির মুখপত্র ‘দর্শন’ এর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার অবতরণিকায় লেখা রয়েছে,

> বর্তমানে দর্শনের চর্চা আমাদের বিদ্যানিকেতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য জনসাধারণ দর্শন চিন্তার ফল থেকে বঞ্চিত। দর্শনকে আবার জনপ্রিয় করে তুলতে ফলিত দর্শনেরও প্রয়োজন। দার্শনিক সূত্রগুলো কিভাবে মানবজীবনের মান উন্নয়নে কার্যকরী হতে পারে তার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে হবে। এ জন্য দর্শনচর্চাকে জনপ্রিয় করে তোলা দরকার।[১৮]

বাংলাদেশে দর্শনচিন্তার ইতিহাস ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসের মতই প্রাচীন বলে মনে করেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “এ উপমহাদেশে দর্শনচর্চা কিন্তু নতুন কিছু নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলে দর্শনচর্চা ছিল এবং বলা যায় সগৌরবে ছিল।”[১৯] মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলিম দর্শনের চর্চা হয়েছে। এ-সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন,

> আমাদের এদেশে প্রথম পর্যায়ে যাঁরা ইসলামি দর্শনের আলোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেহতত্ত্বের সঙ্গে ইসলামি মারেফতি ধারার যোগসাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁর মধ্যে সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞান চৌতিশা*, নিয়াজের *যোগ কলন্দর*, আবদুল হাকিমের *চারি মোকামভেদ* প্রভৃতি পুস্তক বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে যাঁরা আত্মতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব থেকে বিশ্বতত্ত্বে বা পরমতত্ত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে লালন শাহ, দেওয়ান

---

[১৭]মো. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, পৃ. ৩১

[১৮] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, (সম্পাদিত), ‘‘দর্শন’’ প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৯, পৃ. অবতরনিকা-খ

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

> হাসন রাজা ও শেখ ভানুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে লালন শাহ ছিলেন দ্বৈতবাদী, হাসন রাজা ছিলেন জীবনভিত্তিক সর্বেশ্বরবাদী।[২০]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্লেটো, অ্যারিস্টটল, লক, বার্কলি, হিউম, ডেকার্ত, স্পিনোজা, হেগেল, মার্কস এবং গান্ধীবাদকে সমালোচনা করে নিজস্ব দর্শন গড়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, "এ যাবত যে সব মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে, তাতে মানব জীবনের কোন বিশেষ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, তারই আলোকে গোটা জীবনের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য হয়েছে প্রয়াস। যদিও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নামে তারা জগতে প্রচারিত তবুও তাদের মধ্যে রয়েছে অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি।"[২১] মুসলিম দর্শনের প্রতি অনুরাগী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করতেন, জগতের কোন মতবাদই চিরন্তন সত্য নয়। সব মতবাদই একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি। বিশেষ পরিস্থিতিতে মতবাদের সৃষ্টি হয়। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বুদ্ধি কোন কালে থাকে আবদ্ধ, আবার কোন কালে মুক্ত। বুদ্ধি কোন কালে ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করে আড়ষ্ট হয়, আবার ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।"[২২]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী দার্শনিক মতবাদগুলো যুক্তি দিয়ে সে সব মতবাদের অসঙ্গতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দর্শনচর্চার শুরুর দিকে তিনি হেগেলীয় ভাববাদ দ্বারা আকৃষ্ট ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বিশ্বাস ও যুক্তির সমন্বয় করার চেষ্টা করেন।[২৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শনচিন্তার সারকথার বর্ণনা দিয়ে আখতার-উল-আলম লিখেছেন,

> দর্শনচর্চা করতে গিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ শুধু আধুনিক দার্শনিক চেতনার অঙ্গনে নিজের বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃস্টান, ধর্মের ভাববাদী দর্শনের চর্চাও তিনি করে গেছেন সমানভাবে। তবে ইসলামের মর্মমূলে যে তৌহিদী দর্শন তার চর্চাই হচ্ছে আজরফ ভাইয়ের সকল দর্শন চর্চার সারকথা।[২৪]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জ্ঞানতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রচিন্তা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর দর্শনচিন্তার পূর্ণরূপ পাওয়া যাবে।

জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা দর্শনের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল জ্ঞানের উৎস-বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। "প্রাচীনকালে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাকেই জ্ঞানের পথ বলে মনে করা

---

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
[২১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৮২, পৃ. ৫৮
[২২] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৩৯
[২৩] শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ, ''অধ্যক্ষ আজরফের দর্শন চিন্তার প্রায়োগিক মূল্য'', আবদুল হামিদ মানিক (সম্পাদিত), *আল-ইসলাহ*, ৭৪ বর্ষ, সপ্তম-দশম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট, পৃ. ৮৬
[২৪] আখতার-উল-আলম, ''সবার প্রিয় আজরফ ভাই'', শাহেদ আলী (সম্পাদিত), *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ*, পৃ. ৫৬

হত।”[২৫] প্রাচীন পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা আধুনিক দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শন, সাহিত্য ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের মধ্যে জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ ও বিচারবাদের মধ্যে অসঙ্গতিগুলো আলোচনা করে তিনি তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মনে করেন, প্রাচীনকালের দার্শনিকরা সঠিক জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারেনি। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> থেলিস (Thales) থেকে যে চিন্তার সূত্রপাত হয়, প্লেটো বা এরিস্টটলের চিন্তায় তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। প্লেটো ও এরিস্টটলের পরবর্তীকালে এপিকিউরিয়ান (Epicurean) বা স্টোয়িক (Stoic) মতবাদে জ্ঞানবিদ্যা বা নীতিবিদ্যার আলোচনাকে পূর্ববর্তী চিন্তাধারার কোন কোন বিশিষ্ট দিকের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়। সে যুগের সর্বশেষ জ্ঞান-সাধনার ফলস্বরূপ পাওয়া যায় সন্দেহবাদ (Scepticism) ও সংকলনবাদ (Eclecticism)। ওগুলো জ্ঞানের রাজ্যে তৎকালীন মণীষীদের ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।[২৬]

জ্ঞান একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। শুরুতে গ্রিক দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষিত জ্ঞানকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান বলে ধরে নিয়েছেন। জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান সংবেদন। সংবেদন ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব। “জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে সংবেদন ও ধারণার দুটো উপাদান। সংবেদনের মধ্যে রয়েছে দুটো দিক। একটি হচ্ছে সংবেদনের ক্রিয়ার দিক, অপরটি হচ্ছে সংবেদনের বিষয়বস্তুর দিক।”[২৭] আবার অভিজ্ঞতার সাহায্যেও পূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যায় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিজ্ঞতায় ত্রুটি থাকে। তাই পঞ্চইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান মানবজীবনের জ্ঞানের একমাত্র উৎস নয়। এ-সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, “দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র মাত্রেই অবগত আছেন, দর্শনের কোন কোন শাখা মোটেই – পঞ্চইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়, দর্শনশাস্ত্রে যাকে বলা হয় (Rationalistic) বা বিচার-বুদ্ধিমূলক জ্ঞান, তা বহুলাংশে ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ।”[২৮] কেবল বুদ্ধি মানুষের সন্তোষজনক জ্ঞান দিতে পারে না। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, “শুধু বুদ্ধিজাত সিদ্ধান্তেরও নানাবিধ বৃত্তির সন্তোষ বিধান কল্পে গঠিত প্রকল্পের পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কর্তব্য। বুদ্ধির কারসাজিতে এখন পর্যন্ত মানুষ যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে – তাতে কেবল বুদ্ধিই সন্তোষলাভ করেছে। মানব জীবনের আরও নানাবিধ বৃত্তি বা প্রবৃত্তি তাতে সন্তোষলাভ করেনি।”[২৯] অভিজ্ঞতার সাহায্যে পূর্ণজ্ঞান পাওয়া যায় না। এ-সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মন্তব্য, “অভিজ্ঞতাকে বা যুক্তিকে যে কোন পদ্ধতিকেই জ্ঞান লাভের

---

[২৫] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, পৃ. ৯
[২৬] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, পৃ. ৩৯
[২৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ভাববাদ যুগে যুগে, পৃ. ১৭
[২৮] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, পৃ. ১২
[২৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম*, পৃ. ৬৪

মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করি না কেন, - অভিজ্ঞতা বা যুক্তি যে আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করতে পারে,– সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনে।"[৩০]

বিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্পূর্ণভাবে আস্থা রাখেননি। তিনি লিখেছেন, "বিজ্ঞানের জ্ঞানই জ্ঞানের একমাত্র পথ নয়। বিচার-বুদ্ধির বাইরে, বোধির মাধ্যমে জ্ঞানলাভ সম্ভব।"[৩১] জ্ঞানের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক রয়েছে। যা সত্য তাই জ্ঞান। আবার যে বিষয়ে জ্ঞান হয় তাই সত্য। বিজ্ঞান জড়বাদ সমর্থন করে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ভাববাদী মুসলিম দার্শনিক। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "জড়বাদী দর্শনে জ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি ভূয়োদর্শন অথবা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান।"[৩২] বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেন, "জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বোধি, বিচারবুদ্ধি ও ভূয়োদর্শনের যথাযথ স্থান নির্দেশ করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করলেই জ্ঞানের পথ হয় সুগম। মানুষ সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে হয় ধন্য।"[৩৩] জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট অভিজ্ঞতাবাদ এবং বুদ্ধিবাদের সমন্বয় সাধন করে বিচারবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ কান্টের অভিজ্ঞতাবাদ এবং বুদ্ধিবাদের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি গুরুত্বহীন মনে করেননি, কিন্তু একমাত্র জ্ঞানের উৎস বলে স্বীকারও করেননি। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের উৎস হিসাবে প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দ প্রমাণ প্রমেয় কোন কিছুই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ গ্রহণ করেননি।

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অনেক জ্ঞান সংবেদন থেকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বস্তু জগতের বাইরেও মানুষের অনেক কিছু থাকে। যেগুলো সংবেদনের উপর নির্ভর করে চলে না। এ-সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেছেন, ''মানুষের জ্ঞান কেবলমাত্র সংবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সংবেদনপ্রসূত জ্ঞান থেকে মানুষ তার প্রত্যাহিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছু গ্রহণ করে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে।"[৩৪] সংবেদনলব্ধ জ্ঞানকে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অস্বীকার করেননি, কিন্তু সংবেদনকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে মেনে নেননি। যৌক্তিকদৃষ্টবাদীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রত্যাখান করে লিখেছেন, "যৌক্তিক বাস্তবতাবাদের (Logical positivism) মধ্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকেই জ্ঞানের একমাত্র রূপ বলে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে সেই প্রত্যয়শীলতাই আবার অন্য রূপ ধরে দেখা দিয়েছে।"[৩৫]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন মানুষ সবরকম জ্ঞানলাভের ক্ষমতা রাখে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "এ দুনিয়ার সমস্ত কিছুর জ্ঞান মানবের পক্ষে সম্ভবপর; জ্ঞানের পথে মানুষের কোন

---

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
[৩৫] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ধর্ম ও দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৬৪

প্রতিবন্ধকতা নেই-জ্ঞানের চরম পরিণতিতে মানুষ আবিষ্কার করবে নিয়ম শৃঙ্খলা-এইটেই ইসলামী জীবন-দর্শনের গোড়ার কথা।”[৩৬] জ্ঞানের সঙ্গে শ্রদ্ধার বিষয়টি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যোগ করে লিখেছেন, “জ্ঞানের মাধ্যম সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা না থাকলে, জ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধেও কোনো শ্রদ্ধা থাকতে পারে না এবং তাকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি নে।”[৩৭]

সংবেদনকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে মেনে নেওয়ার ফলে আমাদের ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে নানা সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> বর্তমানকালে জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে কেবলমাত্র সংবেদনকেই স্বীকার করার ফলে আমাদের জীবনে এক ভীষণ সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা আমাদের জীবনে নৈতিক আইন কানুন ব্যতীত চলতে পারিনা। এগুলির কার্যকারিতা ব্যতীত আমাদের জীবন অচল হয়ে পড়ে। অথচ এ নীতি সংক্রান্ত কোনো বিধি বা বিধান সংবেদনলব্ধ নয়। এগুলির উৎপত্তিস্থল আমাদের মানসে ক্রিয়াশীল –স্বজ্ঞা বা Intuition। এই স্বজ্ঞা ব্যতীত প্রক্ষোভ আমাদের জীবনে নানা সময় কার্যকরী থাকে।[৩৮]

জ্ঞানের উৎস হিসাবে স্বজ্ঞার গুরুত্ব দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন স্বজ্ঞার সাহায্যেই সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজাই প্রথম স্বজ্ঞাকে সর্বোচ্চ মাধ্যম বলে স্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “আধুনিক দর্শনে স্পিনোজাই সর্বপ্রথমে স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের একটা পৃথক এবং সর্বোচ্চ মাধ্যম বলে গণ্য করেছেন।”[৩৯] কিন্তু স্পিনোজার স্বজ্ঞা সম্পর্কে মতবাদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ গ্রহণ করেননি। জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্টের স্বজ্ঞা সম্পর্কীয় মতবাদও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অনুকরণ করেননি। হেনরী বার্গসোঁর স্বজ্ঞাবাদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সমর্থন করলেও গ্রহণ করেননি। বার্গসোঁর সমালোচনা করে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, “স্বজ্ঞা সম্বন্ধে তার এত উচ্চ ধারণা থাকলেও তিনি স্বজ্ঞা সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত নির্দেশ আমাদের দিয়ে যেতে পারেননি। আমাদের বুদ্ধি-উত্তর জীবনে স্বজ্ঞাকে লাভ করতে হলে তিনি আমাদের স্মরণজাত সবকিছুকে মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তা কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে তার কোন বাস্তব উদাহরণ প্রদর্শন করেননি।”[৪০] স্বজ্ঞা সম্পর্কে পাশ্চাত্য এবং প্রতীচ্য দার্শনিকদের মতবাদ আলোচনা করে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর নিজস্ব স্বজ্ঞাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মনে করেন, স্বজ্ঞা জ্ঞান লাভের একটি প্রক্রিয়া। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে স্বজ্ঞার সাহায্যে সত্য জ্ঞান লাভ করা যায়। স্বজ্ঞা সম্পর্কে দার্শনিকদের মতবাদ মূল্যায়ন করে তিনি লিখেছেন, “দার্শনিকদের বর্ণনা থেকে আমরা স্বজ্ঞা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করি তাতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়; স্বজ্ঞা জ্ঞানের এক পৃথক

---

[৩৬] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম*, পৃ. ৮৩
[৩৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ৬৫
[৩৮] মো. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, পৃ. ১০০
[৩৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ভাববাদ যুগে যুগে, পৃ. ২৯-৩০
[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

রূপ। স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান সরাসরি লাভ করা যায়, তবে কোন মধ্যবর্তী অবস্থা নেই এবং তাকে প্রমাণ করারও কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এ জ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞাতার পক্ষে জ্ঞাত বিষয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করা সম্ভবপর হয়।"[৪১]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন বিশ্বের সব সৃষ্টির মূলে স্বজ্ঞা কাজ করে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকেও তিনি স্বজ্ঞাজাত বলে মনে করেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> বর্তমান কালে স্বজ্ঞা বা Intuition নিয়ে যে সব আলোচনা হচ্ছে তাতে দেখা যায় স্বজ্ঞার মাধ্যমেই এই বিশ্বের সবগুলো আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নীতি পঞ্চেন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে অথবা যুক্তির প্রয়োগের ফলে আবিষ্কৃত হয়নি। একটা আপেলের পক্ষে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আমরা তাকে বোঁটা থেকে মাটির পানে ধাবিত হতে দেখি কিন্তু তার এবংবিধ কর্মের কোন কারণ নির্ণয় করতে পারিনে। নিউটন তার স্বজ্ঞার আলোকে তাকে পৃথিবীর আকর্ষণ বলে নির্ণয় করেন। পরবর্তীকালে গণনার সাহায্যে এ-প্রকল্প আরও দৃঢ়তর হয়। তেমনি আইনষ্টাইনও স্বজ্ঞার মাধ্যমে আপেক্ষিকতাবাদের নীতি আবিষ্কার করেছিলেন।[৪২]

স্বজ্ঞার গুরুত্ব স্বীকার করলেও তিনি বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেননি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> জ্ঞানকে শুধু পঞ্চেন্দ্রিয়জাত সীমার মধ্যে আবদ্ধ করলে – জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ পাওয়া যায় না। তেমনি জ্ঞানকে শুধু বুদ্ধি অথবা বোধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেও জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত হয়না। পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি ও বোধির অনুশীলনের ফলে যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক আকারে জ্ঞান দেখা দেয়,– তারই ভিত্তিতে এ বিশ্ব জগত বা স্থিতি সম্বন্ধে যে প্রকল্প গঠন করা হয় সে প্রকল্পই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক সন্তোষ দানে সমর্থ।[৪৩]

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসাবে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দিলেও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন বোধিলব্ধ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে স্বজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "কোরআনের জ্ঞান হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) লাভ করেন বোধির মাধ্যমে। তাকে অন্যান্য বোধিলব্ধ জ্ঞান থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে বলা হয় প্রত্যাদেশ। সে জ্ঞান প্রয়োগ বা যুক্তি বিরোধী নয়। সে জ্ঞানলাভ সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।"[৪৪] প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞান সকল মানুষ লাভ করতে পারে না। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, "মানুষের জীবনকে সর্বাবস্থায় সুসমঞ্জস ও সুস্থ করার জন্য এ প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞানের ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। তা থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ কিভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সে সম্বন্ধে রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশ। তবে প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞানের আর যে বিশেষ প্রয়োজন নেই, তা হযরত মোহাম্মদ

---

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[৪২] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, পৃ. ৩৪, ৩৫

[৪৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম*, পৃ. ৬৩

[৪৪] প্রাগুক্ত পৃ. ৭০

(সঃ) বাণী থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়।"[৪৫] প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞান, ঐতিহাসিক জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন,

> প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞান ব্যক্তি-বিশেষের জীবনেই গৃহীত হয়। তিনি তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও মহানুভবতার কল্যাণে সে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য করেন। এ জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ধারিত হতে পারে কেবলমাত্র তার প্রায়োগিক মূল্য (Pragmatic value) দ্বারা। অপরদিকে, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপকরণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এ জগতে, মানুষের সমাজে, রাষ্ট্রে বা সভ্যতায় যা ঘটছে তা ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তো বটেই, সমষ্টির পক্ষেও সে জ্ঞান আহরণযোগ্য। মানব জীবনের অভিজ্ঞতার খাতায় সে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি ইন্দ্রিয়জ দত্তি (Data) বা উপকরণ। তাকে মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ বা পরীক্ষণ (Experiment) করতে পারে। তার প্রায়োগিক মূল্যও নির্ধারিত করতে পারে। প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই।[৪৬]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "পরম সত্তা আল্লাহ্ তাঁর প্রকাশের এক স্তরে নূর-ই-মুহম্মদী নামে যেমন প্রকাশিত, তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে পঞ্চেন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করে মানুষ যখন রাসূলে আকরাম জনাব আহমদ মুস্তফার নির্দেশিত পন্থায় সত্যিকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তখন সে আদর্শ-মানবের জীবনধারা তার জীবনে সম্পূর্ণ রূপায়িত করেই পরম সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়।"[৪৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের বর্ণনা দিয়ে আনিসুজ্জামান লিখেছেন,

> দেওয়ান আজরফ পাশ্চাত্য ও পাশ্চ্য দর্শনের বিভিন্ন জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করে জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলেছেন। তিনি পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এককভাবে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, এমনকি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেন নি বরং ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ক এ সবকটি মতকেই একই সাথে বিবেচনায় নিয়েছেন এবং ওয়াহীর আলোকে এগুলোকে সমন্বিত করে গ্রহণ করেছেন।[৪৮]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে কেবল স্বজ্ঞা, বুদ্ধি বা বিচারকে গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেন এদের একটিকে গ্রহণ করলে বা একটির দিকে ঝোঁক বেশি হলে মানব সমাজের ক্ষতি হয়। তিনি মনে করেন, "জ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্বজ্ঞা, বিচার-বুদ্ধি ও প্রয়োগের যথাযথ স্থান নির্দেশ করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করলেই সত্যিকারের জ্ঞানলাভের সুযোগ ও সুবিধা হয়, মানুষ সত্যের সংগে পরিচয় লাভে হয় ধন্য।"[৪৯] কিন্তু পাশ্চাত্য এবং প্রতীচ্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ আলোচনা করে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ স্বজ্ঞা নির্ভর জ্ঞানের কথা বলে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তাঁর কাছে আল কোরআনের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এ জন্য তাঁর স্বজ্ঞাবাদ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। বিশ্বাস এবং দর্শন

---

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ, ৭০
[৪৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, পৃ. ২২
[৪৮] আনিসুজ্জামান, ''দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ'', শাহেদ আলী (সম্পাদিত), পৃ. ৩৪
[৪৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খুলনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ৫

এক বিষয় নয়। বিশ্বাসে যুক্তির স্থান নেই। যুক্তিকে নির্ভর করেই দর্শন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। যা দর্শনের চেয়ে ধর্মতত্ত্বের কথাই বেশি বলে।

অধিবিদ্যা

অধিবিদ্যা দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। দর্শনের সঙ্গে অধিবিদ্যার রয়েছে নিবিড় সম্বন্ধ। এজন্য প্রাচীনকালে অনেকে দর্শন ও অধিবিদ্যাকে সমার্থক মনে করতেন। সাধারণত আত্মা, ঈশ্বর, দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতিক সত্তা নিয়ে দর্শনের যে শাখায় আলোচনা করা হয় সে শাখাকে অধিবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়গুলোকে অধিবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। এ জগতের পেছনে কোনো শাশ্বত চিরন্তন সত্যের প্রকাশ কিনা, শাশ্বাত সত্যের স্বরূপ কি ইত্যাদি অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয়বস্তু।

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক দেওয়ার মোহাম্মদ আজরফ অধিবিদ্যায় আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে যৌক্তিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। দেওয়ার মোহাম্মদ আজরফের অধিবিদ্যায় ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। সংক্ষেপে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের অধিবিদ্যার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হল।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছে। মানুষের মধ্যে দিয়ে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার প্রকাশ। আল্লাহ শুধু মানুষ সৃষ্টি করেনি এ দুনিয়া সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রতিটি ধুলিকনা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আল্লাহ্‌ এ দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা বলে প্রত্যেকটি গুণের সঙ্গে তাঁর এ সৃষ্টির গুণ অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। তিনি রহীম (দয়ালু)। তবে অন্য কোন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে তিনি দয়ালু নন। তাঁরই সৃষ্টি এ মখলুকাতে তিনি দয়ালু। তেমনি তিনি আস্‌সাত্তার অর্থাৎ আচ্ছাদনকারী। তবে তাঁর এ গুণ তাঁর সৃষ্ট দুনিয়াতেই প্রকাশিত হচ্ছে। তেমনি তিনি আদিল অর্থাৎ ন্যায় বিচারক। তবে তাঁর এ বিচারও তাঁরই সৃষ্ট জগতে কার্যাকরী। তাই দেখা যায় প্রত্যেকটি গুণের পটভূমিকায় আল্লাহর সৃষ্টিধর্মী গুণ 'খালিক' নামক গুণ বিদ্যমান।"[৫০]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছুর উৎস। আল্লাহ্‌ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পথেই মানবের মুক্তি। তিনি লিখেছেন, "ইসলামী চিন্তাধারার মূল উৎস আল-কুরআন। কুরআনের সূরা থেকেই আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা গ্রহণ

---

[৫০] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, পৃ. ১১০

করা হয়েছে। এ আল্লাহ্‌র ধারণা থেকে ইসলাম জগতে অন্যান্য মূল্যমানের উৎপত্তি হয়েছে।"[৫১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজফ ইসলামী জীবন বিধানের উপর আস্থাশীল ছিলেন। ইসলামের বর্ণিত জীবন বিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। ইসলাম জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেনি। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের প্রতি তিনি ছিলেন পূর্ণআস্থাশীল। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> ইসলামের মধ্যে আমরা এমন এক একেশ্বরবাদের সন্ধান পাই, যাতে আল্লার ধারণার সঙ্গে কোনো কিছুকেই সমান বলে গ্রহণ করা যায় না। আল্লার কোনো অবতারের ধারণাও ইসলামের কাছে সহনীয় নয়। তাঁর ব্যক্তিগত সত্তার ও অস্তিত্বের মধ্যে তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর সম্বন্ধে আস্থাবান লোকদের কাছে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে তাঁর পক্ষে কোনো মধ্যবর্তীর প্রয়োজন নেই।[৫২]

ইসলাম যে জীবন বিধান এ-কথাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে, উপমার সাহায্যে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম বাস্তব জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ইসলাম মানব-জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করেনি। এতে অধ্যাত্মিক ও জাগতিক বলে দু'টো বিভাগ নেই। ইসলামে জীবনকে ধারণা করা হয়েছে এক অখণ্ড সামগ্রিক সত্তা হিসাবে।"[৫৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যুক্তির সাহায্যে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর দর্শনচর্চার মূলেও রয়েছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ। কুরআনে আল্লাহর যে সার্বভৌমত্ব রয়েছে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাই যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন,

> আত্মা যেমন একটি আধ্যাত্মিক দ্রব্য (spiritual substance) তেমনি কাল্‌বও একটি আধ্যাত্মিক দ্রব্য। আধ্যাত্মিক দ্রব্য কোন স্থান-কালে অবস্থান করে না। আত্মার কোন দৈহিক (physical) অধিষ্ঠান নেই। জড় দেহ ব্যতিরেকে আত্মা অস্তিত্বশীল হতে পারে। একইভাবে, আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসাবে কাল্‌ব কোন জড় দেহে (physical body) অবস্থান করতে পারে না বা জড়পিণ্ড হতে পারে না।[৫৪]

আল্লাহ, খোদা, ঈশ্বর ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের বিশ্বাসের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। পারিবারিক ধর্মবিশ্বাস তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। ফলে আল্লাহ্‌ বা আত্মা সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা কোনো নতুনত্ব দান করে না। সাধারণ মানুষ যেভাবে আল্লাহ, আত্মা ও পরকাল নিয়ে যে ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফও তাই করেছেন। তবে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের বিশেষত্ব এই যে তিনি যুক্তির সাহায্যে অতিপ্রকৃতিক সত্তাগুলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ, ঈশ্বর বা পরমাত্মার ব্যাখ্যা ধর্মদর্শনে সবসময় একরকম হয়নি। ধর্মের ঈশ্বর আর দার্শনিকদের ঈশ্বরের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। চিন্তার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়,

---

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

[৫২] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ৪২

[৫৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, পৃ. ১২৪

[৫৪] মো. গোলাম দস্তগীর, ''দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ'', আ. ফ. ম. উবায়দুর রহমান (সম্পাদিত), *উপমহাদেশীয় দর্শন : বিশ শতকীয় প্রয়াস*, পৃ.৭৩-৭৪

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা অথবা পরমসত্তা নিয়ে ভেবেছে। পাশ্চাত্য দর্শনের জনক থেলিসের বহু পূর্ব থেকেই মানুষ ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা করছে। সেমেটিক ধর্মগুলোর মধ্যে জরথুস্ত্রবাদে ঈশ্বরকে আহুরা মাজ্‌দা বলা হয়। ইহুদী ধর্ম এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী। Old Testament – ঈশ্বরের নাম হচ্ছে 'যেহোবা'। যেহোবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং পরিচালক। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। তিনি শূন্য থেকে জগত সৃষ্টি করেছেন। খ্রিষ্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা Old Testament এর অনুরূপ। এখানে ঈশ্বর অনন্ত, অসীম, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ। গ্রীক দার্শনিক থ্যালিস মনে করতেন সকল বস্তুর মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান। পিথাগোরাস বলতেন আমরা ঈশ্বরের সম্পত্তি। প্লেটো *টাইমিয়াস* সংলাপে উল্লেখ করেছেন, ঈশ্বর দ্বারাই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা মতে, ঈশ্বর এক। ঈশ্বরের কোনো সৃষ্টি নেই। তার কোনো মৃত্যু নেই। আল ফারাবি (৮৭০-৯৫০) আল্লাহর অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ কি তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে তিনি মনে করেন প্রত্যেক মানুষের পক্ষে যতটুকু সম্ভব আল্লাহর কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের দেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। স্পিনোজা মনে করতেন যা কিছু আছে সব ঈশ্বরের মধ্যে আছে। জার্মান দার্শনিক লাইবনিজের ঈশ্বর হল মনাডের মনাড।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ঈশ্বর ইসলাম ধর্মে বর্ণিত আল্লাহ্। তিনি আল্লাহ্ অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন নাই। ইউরোপীয় দর্শনিকদের ঈশ্বর চিন্তায় যেমন নতুনত্ব পাওয়া যায় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ঈশ্বর সেরকম কিছু নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও শেষ বিচারে তিনি বিশ্বাসের দারস্থ হয়েছেন। বিশ্বাসকে তিনি যুক্তির উপর স্থান দিয়েছেন। ফলে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের অধিবিদ্যা বিশ্বাস নির্ভরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দর্শনের মৌলিক বিষয় যুক্তি। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে আরো অধিকতর বিশ্বাসে পরিণত করেছেন। ফলে তাঁর দর্শনও বিশ্বাস নির্ভর দর্শনে পরিণত হয়েছে।

মূল্যবিদ্যা

রাজনৈতিক চিন্তা মূল্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাজনৈতিক চিন্তাকে তাঁর মূল্যবিদ্যা হিসাবে অভিহিত করা হবে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ শিক্ষকতা শুরু করার আগে রাজনীতি করতেন। রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং নেতা ছিলেন। রাজনৈতিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর বাবা দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ আলী চৌধুরী সিলেট জেলা কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং খিলাফত কমিটির নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। এ-সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, "১৯২১ সালে দেশের সর্বত্র নন-কোঅপারেশন আরম্ভ হল। আব্বা তাতে যোগদান করেন এবং জেলা কংগ্রেস

ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং খিলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।"[৫৫] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসাবে আসাম আইন সভার উচ্চ পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আসামে 'বাঙ্গাল খেদা' অভিযানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি জেল খেটেছেন। জেল জীবনের বর্ণনা দিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, "জেলে প্রবেশ করতেই পূর্বতন কয়েদী আমাদের ফুলের মালা দিয়ে সম্বর্ধনা করল। কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, মুসলীম লীগ জিন্দাবাদ ধ্বনিতে শিলচর জেল মুখরিত হয়ে উঠে।"[৫৬] জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি নানকার বিদ্রোহ সমর্থন করেছিলেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ রাজনীতি থেকে সাংবাদিকতা এবং পরে শিক্ষকতা করেছেন। রাজনৈতিক দলের থেকে দূরে থাকলেও তিনি একটি রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী ছিলেন। ইসলামী সমাজ গঠনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। ইসলামী সমাজবাদ ছিল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ।[৫৭] ইসলামী সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, সভা-সেমিনারে বক্তব্য রেখেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> ১৯৪৭ - এর ভারত বিভাগের পরবর্তীকালে আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত ছিলাম না সে জন্য তখন থেকে আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করে এসেছি। তবে ভারত বিভাগের পূর্বে ও পরেও আমি আমাদের দেশে ইসলামি সমাজ গঠন করার উদ্দেশ্যে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি এবং এদেশে ইসলামি সমাজবাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে কয়েকখানা পুস্তকও প্রকাশ করেছি।[৫৮]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের এ-সব প্রবন্ধ এবং গ্রন্থের মধ্যে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা স্পষ্টভাবে রয়েছে। তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, বক্তব্য, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রচিন্তা তুলে ধরা হল।

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, "সমাজ থেকেই রাষ্ট্র গঠিত হয়। সমাজের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলেই তা রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায়। আবার রাষ্ট্র গঠিত হলে তার সত্তা সমাজ থেকে পৃথক ও সাশ্রয়ী হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের আধিপত্য সমাজকে বাধ্য হয়েই স্বীকার করে নিতে হয়, কিন্তু উল্টো দিকে সমাজের প্রাধান্য সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মেনে নেয় না।"[৫৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সামাজিক চুক্তি মতবাদ গ্রহণ করেনি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কোন মতবাদই তিনি সমর্থন করেননি। মার্কসবাদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> মার্কসবাদ কেবল কম্যুনিজম নয়, মানব-সভ্যতার প্রত্যেকটি বিকাশের ধারাও মার্কসবাদের অন্তর্গত। মার্কসবাদে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছুই নেই। মার্কসবাদের প্রদ্ধতির প্রয়োগই মার্কসবাদের

---

[৫৫] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *অতীত জীবনের স্মৃতি*, পৃ. ৩১

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[৫৭] মো. গোলাম দস্তগীর, ''দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ'', আ. ফ. ম. উবায়দুর রহমান (সম্পাদিত), *উপমহাদেশীয় দর্শন : বিশ শতকীয় প্রয়াস*, পৃ.৭৫

[৫৮] মো. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, পৃ. ৯২

[৫৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, পৃ. ৬৬

> সারতত্ত্ব। এই প্রয়োগের অনুসরণে যদি আমরা প্রবৃত্ত হই, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে মার্কসবাদকে উন্নত করা, বিস্তার করা ও পুনঃপরীক্ষা কেবল সঙ্গতই হবে না - হবে অবশ্যই-কর্তব্য।[৬০]

কিন্তু দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মার্কসবাদ গ্রহণ করেননি। মার্কসবাদ আলোচনা করে তিনি ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন। শোষণ মুক্তির জন্য তিনি ইসলামী সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "অর্থনৈতিক শোষণ থেকে সমাজ বা জনসাধারণকে মুক্তির সন্ধান দিতে না পারলে কিছুতেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভবপর হবে না।"[৬১] তিনি মনে করেন ইসলামী মানবতাবাদই একমাত্র মানবতাবাদ। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই মানবতাবাদও প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি লিখেছেন, "প্রকৃত ইসলামী সমাজব্যবস্থা মানবতাবাদেরই এক রূপ। মানব জীবনকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক রাখার জন্য এ দুনিয়ায় যে ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল তারই নাম ইসলাম এবং তা মানবতাবাদের এক রূপ।"[৬২] ইসলামি আদর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন। ইসলাম ধর্মের আলোকে তিনি তাঁর ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি মনে করেন বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি রাজনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র গড়ে ওঠা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মানুষের আদি সত্তায় রয়েছে তার অহংবোধ ও স্বার্থপরতা। সেই আদি মানবের চলা-ফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিন্তাধারায় অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে - তার কাজ-কর্মে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।"[৬৩]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ রাষ্ট্র বলতে ইসলামী রাষ্ট্র বুঝিয়েছেন। ইসলামী সমাজ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আল্লার সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয় ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র।"[৬৪] ইসলামী মতবাদ ছাড়া অন্যসব মতবাদকে স্বীকার করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ইসলামী সমাজে আল্লাহ অত্যন্ত ব্যাপক (very comprehensive) এক ধারণা। জ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম-নীতি বা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এটা এক স্বতঃসিদ্ধ। আল্লাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর রাজ্যকে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ইসলামপন্থীদের কর্তব্য।"[৬৫] ব্যক্তি জীবন শুদ্ধ হলে সমাজ জীবনও পবিত্র হয়। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। এ-সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেছেন,

> ব্যষ্টি জীবনে ইসলামের রূপায়ণ না হলে সমষ্টি বা সমাজ জীবনে তার রূপায়ণ সম্ভবপর হবে না। এজন্য সর্বপ্রথম নিজের জীবনে ইসলামের সবগুলো নীতিকে রূপায়িত করে অন্য মানুষকে সে

---

[৬০]দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম*, পৃ. ৫৩
[৬১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *অতীত জীবনের স্মৃতি*, পৃ. ২২৩
[৬২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩
[৬৩] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম*, পৃ. ৩৩
[৬৪] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, পৃ. ৬৭
[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

পথে আহ্বান করলে তারা নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। যদি একটি মাত্র ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সে রাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অপরাপর রাষ্ট্রও পুনর্গঠন হবে। ফলে সারা বিশ্বে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।[৬৬]

ইসলামে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের জন্য কোন পৃথক আইন নেই।[৬৭] ব্যক্তি থেকেই সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ইসলামে ব্যক্তির জন্য সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য একই আইন। তাছাড়া ইসলামের আবির্ভাবকালে রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম ছিল। তখন সমাজই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করতো। আরবের গোত্র প্রধানদের নির্দেশই ছিল আইন। রাষ্ট্র বলতে গোত্র নিয়ন্ত্রিত এলাকাই বোঝাত। ইসলামি রাষ্ট্রে আদর্শের বর্ণনা দিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, "ব্যক্তি যেমন আল্লাহর আদর্শে জীবন গঠন করবে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রও গঠিত হবে আল্লাহ্‌র আদর্শেই। ইসলামের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রে আদর্শরূপে গড়ে তোলা।"[৬৮]

ব্যক্তি জীবনে ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের সবগুলোর আদর্শের প্রতিফলনের কথা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বললেও তিনি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলনের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, "দুনিয়ার বুকে সত্যিকার ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র বা সরকার গঠন করার জন্যই ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন।"[৬৯] মুসলমানদের দ্বারা ইসলামি রাষ্ট্র গঠিত হয়। ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচালক নির্বাচন করা হয় মুসলমানদের মধ্যে থেকে। পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালক নিয়োগ করা হবে। ইসলামি রাষ্ট্রের কর্ণধার খলিফা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর ইসলাম বিরোধী কোন কার্যকলাপ তিনি করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে ডিক্টেটরের সঙ্গে খলিফার সাদৃশ্য থাকলে তিনি ঠিক ডিক্টেটর নন। খলিফা জনসাধারণের মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না।[৭০]

ইসলামি রাষ্ট্রে উৎপাদন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী রাষ্ট্রে সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ্। ধন সঞ্চয় ইসলামি রাষ্ট্রে সমর্থন করা হয় না। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, "আইন-কানুন থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষের মধ্যে অযথা সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে তাহলে প্রয়োজনবোধে খলিফা বা আমির ধনীদিগকে দরিদ্রের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন।"[৭১] তাছাড়া ইসলামী নীতি অনুসারে জীবন-যাপন করলে কোন অবস্থায়ই মানুষের হাতে পুঁজি সৃষ্টি হতে পারে না। যাকাত ব্যতীতও নানাবিধ দান সবসময়ই ধনী ব্যক্তিকে করতে হবে।[৭২] ইসলামী রাষ্ট্রে সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি থাকবে না।

---

[৬৬] মো. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, পৃ. ১০৯, ১১০
[৬৭] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম*, পৃ. ৯৮
[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
[৬৯] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, পৃ. ৬৭
[৭০] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, পৃ. ১৮
[৭১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম*, পৃ. ১২৮
[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

“দুনিয়ার সব কিছুর স্বত্ব স্বামীত্ব আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করার ফলে যাতে মানুষের পক্ষে মানুষকে পীড়নের কোন সুবিধা না থাকে, তার জন্য রেবা বা সুদ প্রথাকে ইসলাম গোড়াতেই বাতিল করে দিয়েছে।”[৭৩]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্যান ইসলামিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> প্যান ইসলামিক আন্দোলন তাই মুসলিমদের জন্য শুধু অতি প্রয়োজনীয় নয়, তার প্রয়োজন রয়েছে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। তার জন্য প্রত্যেকটি মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রের পক্ষে তৎপর হওয়া উচিৎ। কেননা এ সফলতা লাভ হলে কেবল মুসলিম জাহানেরই উন্নতি হবে না - সমগ্র জাহানের মানুষের উন্নতি হবে- মানুষ নানাবিধ অস্বাভাবিক চাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।[৭৪]

প্যান ইসলামিক আন্দোলন বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধিকারের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, “আমরা প্যান ইসলামিজমের যে স্বপ্ন দেখছিলাম তা বাস্তবায়িত হতে হলে অর্থনৈতিক স্বাধিকার লাভ করা প্রয়োজনীয়।”[৭৫]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মানবতাবাদ ও নীতিচিন্তার মূলে রয়েছে ইসলাম। ইসলাম ধর্মের নীতি আদর্শের আলোকে তিনি মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের সকল উপাদানকে অস্বীকার করে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। সে কারণে পাকিস্তান টিকেনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা ইউটোপিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। রাষ্ট্রের খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতিতে জনমতের প্রতিফলনের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণই নেতা নির্বাচন করে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের রাষ্ট্রচিন্তায় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপাদানগুলো অনুপস্থিত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তাও তিনি গ্রহণ করেননি। যে ইসলামিক রাষ্ট্রের কথা তিনি বলেছেন তা ইতিহাস সম্মত নয়, কাল্পনিক।

উপসংহার

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনা শেষে বলা যায় তিনি ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। দর্শনচর্চার প্রথম দিকে তিনি হেগেলের ভাববাদ দিয়ে প্রভাবিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজস্ব ভাববাদী দর্শন গড়ে তুলেন। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন ইসলামের একেশ্বরবাদ সমর্থন করার জন্য। স্বজ্ঞা ব্যক্তি নির্ভর। স্বজ্ঞার জ্ঞান এককে

[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
[৭৪] মো. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, পৃ. ১১০
[৭৫] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *অতীত জীবনের স্মৃতি*, পৃ. ২১৮

ব্যক্তির কাছে একেক রকম। বিজ্ঞানের জ্ঞান স্বজ্ঞা নির্ভর নয়। স্বজ্ঞার সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞান কিছুটা অতীত মুখীও। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন, আল কোরআনের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতে, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছে। মানুষের মধ্যে দিয়ে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ শুধু মানুষ সৃষ্টি করেননি এ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা বললেও তিনি মার্কসবাদ গ্রহণ করেন নি। শোষণ মুক্তির জন্য তিনি ইসলামী সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের দর্শনের বিশেষত্ব এই যে তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির এবং আবেগের সঙ্গে বিবেকের সংমিশ্রণ করেছেন। কিন্তু ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদের সমন্বয় করতে পারেন নি। তিনি যুক্তি দিয়ে, নানা উপমার প্রয়োগ করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে তাঁর দর্শন খানিকটা ধর্মতত্ত্বে পরিণত হয়েছে।

সাইদুর রহমান

জীবন ও কর্ম

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক সাইদুর রহমান (১৯০৯-১৯৮৭) কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার রসুল্লাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। শিক্ষা জীবনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯১৮ সালে তিনি রসুল্লাবাদ প্রাইমারি স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়েছিলেন। সাইদুর রহমান লিখেছেন, "১৯১৮ সালে নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি পাওয়ার পর শ্যামগ্রাম মোহিনী কিশোর হাইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই ক্লাস থ্রিতে। আমার বাড়ি কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার রসুল্লাবাদ থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে। সে সময় শ্যাম গ্রাম ছিল উচ্চবর্ণ কুলীন হিন্দুদের গ্রাম।"[১] প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। প্রথম বিভাগে তিনি মেট্রিক পাশ করেছেন। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে থেকে আই এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগ পেয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আই এ পরীক্ষায় তাঁর স্থান ছিল একশততম। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> দর্শনের প্রতি বারবার আগ্রহ থাকলেও ঢাকায় এসে প্রথমে দর্শন বিভাগে ভর্তি হইনি। প্রথমে ভর্তি হয়েছিলাম অর্থনীতিতে। তখন অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান একই সঙ্গে ছিল। কেন জানি এই বিষয়ের প্রতি আমার মন খুব একটা টানেনি। তাছাড়া অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রদের এখনকার মতো এতো কদর ছিল না। এরপর কয়েকদিন ম্যাথমেটিক্স বা অংকের ক্লাস করি। কিন্তু ড. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম তখন ছিলেন ম্যাথমেটিক্সের ছাত্র। এম. এ' তে তিনি ফাস্ট ক্লাস পেতে ব্যর্থ হন। তাঁর মতো মেধাবী ছাত্রকে এভাবে ব্যর্থ হতে দেখে আমি আর অংক নিয়ে পড়াশোনা করার ভরসা পেলাম না।[২]

অর্থনীতি এবং অংক ছেড়ে দিয়ে সাইদুর রহমান ভর্তি হন দর্শন বিভাগে। ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষক নিখিল চন্দ্র সেন সাইদুর রহমানকে দর্শন পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। দর্শন বিষয়ে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ১৯৩১ সালে তিনি বি এ (সম্মান) এবং পরের বছর এম. এ পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

এম. এ পাশ করার পর সাইদুর রহমান ১৯৩২ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। সম্মান শ্রেণি এবং এম.এ তে প্রথম শ্রেণি থাকায় সাইদুর রহমানের চাকরি পেতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

---

[১] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, যায়যায়দিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

> ১৯৩২ সালে দর্শনে এম. এ পাশ করি। ফাস্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। তারপর সেপ্টেম্বরের দিকে রাজশাহী সরকারি কলেজে চাকরির জন্য দরখাস্ত করি। চাকরির জন্য অবশ্য ওপেন কম্পিটিশনে নামতে হয়েছিল। সে সময়ে মুসলমান প্রার্থীদের থাকতো অনার্সসহ বড়জোর সেকেন্ড ক্লাস। কিন্তু আমি ফাস্ট ক্লাস হওয়াতে অবাধেই নির্বাচনে প্রথম হয়ে গেলাম। কলেজের পৃন্সিপাল ছিলেন ডাব্লিউএ জেংকিন্স। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন।[৩]

সাইদুর রহমান ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসের চার তারিখে রাজশাহী কলেজে যোগদান করেন। রাজশাহী কলেজে চাকরি তাঁর সুখকর হয়নি। সে সময় রাজশাহী কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। সাইদুর রহমান লিখেছেন, "হিন্দুদের সবাই আমাকে মেনে নিতে পারেনি। তারা চেষ্টা করতে থাকলো আমাকে কিভাবে সরানো যায়। তাতে সফলও হলো। আমাকে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে বদলি করে দেয়া হয়। সেটা এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে কোনো মুসলমানের প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। ফলে আমার চাকরি না থাকার মতোই অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো।"[৪] আবুল হাশিমের বাবা ছিলেন তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সহযোগিতায় সাইদুর রহমান রাজশাহী কলেজে পুনরায় ফিরে আসেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমার চাকরির ব্যাপারে নাজিমুদ্দীন সাহেব উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর রাজশাহী কলেজে যাতে আবার যোগ দিতে পারি সে ব্যবস্থা তিনি করলেন। তবে ছুটির মধ্যে চাকরির কন্টিনিউটি পাইনি।"[৫] রাজশাহী কলেজে সাইদুর রহমান শিক্ষার্থীদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। রাজশাহী কলেজের তিনি ছাত্র ইউনিয়নের ইনচার্জ নিযুক্ত হওয়া ছাড়াও শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারি ছিলেন। সাইদুর রহমানের উদ্যোগে প্রথম রাজশাহী সরকারী কলেজে ক্যাম্পাসে ঈদুল আযহায় গরু কোরবানি হয়েছিল।

১৯৪১ সালে সাইদুর রহমান রাজশাহী কলেজ থেকে বদলি হয়ে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে যোগদান করেন। ইসলামিয়া কলেজে থাকা অবস্থায় ১৯৪৩ সালে তিনি বেকার হোস্টেলের সুপারিটেন্ডন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "কলকাতার ওয়েলেসলি স্কোয়ার বেকার হস্টেল ছিল বাংলার মুসলমান ছাত্রদের প্রধান হস্টেল। কলকাতায় যেসব মেধাবী ছাত্র পড়তে যেতো তারা সবাই ওই হস্টেলেই থাকতো।"[৬] সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বেকার হোস্টেলের ছাত্র। সাইদুর রহমান ছিলেন ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষক। বেকার হোস্টেলের শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে সাইদুর রহমান লিখেছেন, "ছাত্র হিসাবে শেখ মুজিব তেমন মেধাবী না হলেও রাজনীতিতে বিশেষ করে

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

সংগঠক হিসেবে সে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। সে যে একদিন জননেতা হবে সেটা তখন থেকেই আঁচ করা যাচ্ছিল।"[৭] ছাত্র রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেও শিক্ষকের সঙ্গে ছিল একই রকম ঘনিষ্ঠতা। বঙ্গবন্ধু প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার গাড়ি পাঠিয়ে শিক্ষককে বঙ্গভবনে নিয়ে যেতেন। দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের আগে বঙ্গবন্ধুকে সাইদুর রহমান অভিভাবকের মতই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "১৯৭৫ সালের ২৫ জুন গণভবনে মুজিবের সঙ্গে আমার কথা হয়। চারদিকের পরিস্থিতি সুবিধার নয়, বাতাসে অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের গন্ধ ভাসছে। তাই মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছিলাম ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে এমন অরক্ষিত অবস্থায় না থেকে সরকারি বাসস্থানে যথাযথ নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করার।"[৮] বঙ্গবন্ধু শিক্ষকের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলেছিলেন, "আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সে জন্যই এ সকল দুশ্চিন্তা পোষণ করছেন।"[৯] ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকান্ডের পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক বজায় ছিল।

ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি সাইদুর রহমান শিক্ষা দপ্তরের স্পেশাল অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হচ্ছে। দুর্ভিক্ষের কবলে রাস্তায় পড়ে রয়েছে নিরন্ন মানুষের লাশ। তারমধ্যে ধর্মের নামে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় মরছে মানুষ। সাইদুর রহমান চৌদ্দই আগস্টে ছিলেন কলকাতায়। তিনি লিখেছেন, "আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সংবাদে আনন্দিতই হয়েছিলাম। কিন্তু দুর্দিন পর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেলে সেই আনন্দের রেশ মিলিয়ে গেল। আগের বছর ডাইরেক্ট একশন ডে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ব্যাপক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল এ দাঙ্গা তারচেয়েও বেশি ভয়াবহ মনে হলো।"[১০] দেশভাগের পর কলকাতা থেকে সাইদুর রহমানকে বদলি করা হয় চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে। চট্টগ্রাম থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয় শিক্ষা বিভাগের স্পেশাল অফিসার করে ঢাকায়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "শিক্ষা বিভাগে স্পেশাল অফিসার হিসেবে ঢাকায় চলে আসার পর আমার ওপর তিনটি দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্বগুলো হলো - উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের খসড়া আইন তৈরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক পুনর্বাসন।"[১১] দেশ ভাগের পর কলকাতার বেশিরভাগ মুসলিম ছাত্র ঢাকায় চলে আসে। এসব ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা দেখা দেয়। ছাত্ররা স্বাধীন দেশে থাকার জায়গা দাবি করে। সাইদুর রহমান লিখেছেন, "ছাত্রদের দাবি গুরুত্ব না পাওয়ায় তখন জাস্টিস সাহাবুদ্দীনের জন্য যে বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা তারা দখল করে নেয়। এতে

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
[৯] প্রাগুক্ত, ১২৬
[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০, ৫১
[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

তৎকালীন সরকারের টনক নড়ে।"[১২] ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধান করার পর তারা জাস্টিসের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল।

দেশ ভাগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ শিক্ষক ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব প্রতিষ্ঠানেই হিন্দু শিক্ষকের সংখ্যা ছিল বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং দার্শনিক হরিদাশ ভট্টাচার্য ১৯৪৭ সালেই দেশ ত্যাগ করেছেন। হরিদাস ভট্টাচার্যের মত অনেকেই দেশ ত্যাগ করেন। মেয়েদের স্কুলগুলো শিক্ষক শূন্য হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে সাইদুর রহমান লিখেছেন,

> সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষকই ছিলেন হিন্দু। দেশ বিভাগের পর তারা ঢাকায় থাকতে খুব একটা ভরসা পাচ্ছিলেন না। তারা ঢাকা ত্যাগ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে হঠাৎ করে শূন্যতা সৃষ্টি হবে ভেবে তারা যাতে ঢাকাতেই থেকে যান সে জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করি। তবে বড় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল মেয়েদের স্কুল নিয়ে। শিক্ষিকারা বলতে গেলে সবাই ছিলেন হিন্দু। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় তারা একযোগে দেশ ত্যাগ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় অচলাবস্থা দেখা দেয়।[১৩]

স্কুল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার ব্যাপারে ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস নেতা ভবেশচন্দ্র নন্দী ও লীলা রায়ের অবদান স্মরণীয়। সাইদুর রহমান লিখেছেন, "ভবেশ চন্দ্র নন্দী এবং লীলা রায়ের সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরায় চালু করতে সক্ষম হই।"[১৪] ভবেশচন্দ্র নন্দী পেশায় ছিলেন উকিল। রাজনীতি করার অভিযোগে ব্রিটিশ আমলে তিনি ছাব্বিশ বছর জেল খেটেছেন। জেলে থেকেই তিনি এম. এ পাশ করেছেন। ভবেশচন্দ্র নন্দী সম্পর্কে সাইদুর রহমান লিখেছেন, "নিজের স্বার্থ ভুলে, অপরের কল্যাণে চিন্তা করার শিক্ষাটা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। সমাজ সেবা, মানব সেবা এবং দেশের কল্যাণ যে মানুষের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত, তিনি তার জীবনের মাধ্যমে সেই শিক্ষাই সকলকে দিয়ে গিয়েছেন।"[১৫] ভবেশচন্দ্র নন্দীর শিক্ষা সাইদুর রহমান জীবনে ও কর্মে অনুসরণ করেছেন।

পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি মুসলমান সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেও স্বপ্ন ভঙ্গ হতে তাদের সময় লাগেনি। ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সন্দেহ-অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির উপর আস্থা হারাতে থাকে এ অঞ্চলের মানুষ। মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু হয়। ছাত্র-শিক্ষক সবাই এই আন্দোলনে যে যার অবস্থান থেকে অংশ নেয়। ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৫৩ সালে

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

সাইদুর রহমানকে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে বদলি করা হয় সিলেট সরকারি কলেজে। তিনি লিখেছেন, "ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রীর নির্দেশে আমাকে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে সিলেট ট্রান্সফার করে দেয়া হয়। একই কারণে এর আগে আমাকে শিক্ষা বিভাগের স্পেশাল অফিসারের পদ থেকে ঢাকা কলেজের অধ্যাপকের পদে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।"[১৬] সিলেটে সাইদুর রহমান ছিলেন দুই বছর। সিলেটে তিনি একাই থাকতেন। তাঁর বাসার কাজকর্ম করে দেয়ার জন্য একজন মহিলা ছিল। এ-সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন,

> একদিন প্রাতঃভ্রমণ সেরে ঘরে ফিরে দেখি, সে তখনো আসেনি। আমি ওর না আসার কথাই ভাবছিলাম, এমন সময় সে এসে হাজির। আমি তার দেরি করার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মেয়েটি জানালো, তার বাড়ির পাশে এক মহিলা সন্তান প্রসবের অবস্থায় আটকে গেছে। বাচ্চার শুধু মাথা বেরিয়ে আছে। সে আরো জানালো, মহিলাকে শাহ জালালের দরগার পানি, আবে জমজমের পানি পর্যন্ত খাওয়ানো হয়েছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তার মতে, মহিলা আর বাঁচবে না।
>
> আমি ওদের প্রতিবেশি আজিজ সাহেব, মোদাসসের আলীদের চিনতাম। তারা মহিলার কোনো সাহায্যে এগিয়ে এসেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করে জানলাম, না, প্রসবিনীর সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি এবং প্রতিদিনের মতো তারা সকালে কোরআন তেলওয়াতে ব্যস্ত।[১৭]

প্রসবিনী এই মহিলাকে সাইদুর রহমান মাতৃসদনে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। সন্তান ও মা সুস্থ হয়ে ফিরে আসে বাড়িতে। প্রসবিনী এই মহিলা ছিল স্থানীয় এক রিকশা চালকের স্ত্রী।

সিলেটের প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সঙ্গে সাইদুর রহমানের ছিল সুসম্পর্ক। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "সিলেটে যাওয়ার পর সরকার বিরোধী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে আমার বেশি সময় লাগেনি। সিলেটের তরুণ ও প্রগতিশীল যুবনেতা শরফুদ্দিন আহমদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দ্রুত গড়ে ওঠে।"[১৮] এ সময় তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসার প্রিয় সহচর ছিলেন। তাঁকে ভাসানীর *এন্টি স্টেট ব্রেইন ট্রাস্ট* বলে মনে করা হতো।[১৯] শিক্ষার্থীদের থেকে দূরে রাখার জন্য পাকিস্তান সরকার সাইদুর রহমানকে ফিরিয়ে আনে ডিপিআই অফিসে অরফানেজ অফিসার হিসাবে ঢাকায়। এই পদে থেকে তিনি এতিমখানাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা কারিকুলাম সংযুক্ত করেন। অরফানেজ অফিসার হিসাবে থাকার সময় **১৯৫৫** সালে তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডন থেকে অর্গানাইজেশন এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ফারদার এডুকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। **১৯৫৮** সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং যোগদান করেন ইডেন মহিলা কলেজে।

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

১৯৬০ সালে সাইদুর রহমান যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। হাসপাতালে থাকার সময় পরিবারের সদস্য ছাড়াও শুভানুধ্যায়ী শুভাকাঙ্ক্ষিরা তাঁকে দেখতে যেতেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "হাসপাতালে এক খণ্ড কোরআন শরিফ নিয়ে আমার শাশুড়ি আমাকে দেখতে এসেছিলেন আর ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী আসেন তিন বস্তা বই নিয়ে। তার মধ্যে অনেকগুলো বই ছিল যক্ষ্মা সংক্রান্ত। কি কি কারণে যক্ষ্মা হয়, যক্ষ্মা হলে কি কি করতে হয় এবং সেরে গেলে কি কি করতে হয় এসব বিষয় ছিল বইগুলোতে।"[২০] এই বইগুলো তিনি হাসপাতালে দান করেছেন এবং আরো কিছু বই সংগ্রহ করে হাসপাতালে একটি লাইব্রেরি স্থাপনের কাজে সহায়তা করেছেন।

জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে সাইদুর রহমান ১৯৬৩ সালের ৭ জুলাই যোগদান করেন এবং ১৯৬৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর চাকরি থেকে অবসর নেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর ৬ মাস। তিনি লিখেছেন, "জগন্নাথ কলেজের আদর্শ হিসেবে *কর্ম-শক্তি-প্রগতি* প্রচলন করেছিলাম। কলেজ ভবনের শীর্ষে বড় সাইজের একটা ঘড়ি টানানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু জাপান থেকে বড় সাইজের অটোমেটিক ঘড়ি আনতে ব্যর্থ হওয়ার পর কলেজ শীর্ষে ঘড়ির বদলে কর্ম-শক্তি-প্রগতি টানানো হয়।"[২১] সাইদুর রহমানের এই উদ্যোগের কড়া সমালোচনা করে তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকাগুলো লিখেছিল, কর্ম-শক্তি-প্রগতির মধ্যে ইসলামের শান্তি ও শিক্ষার কথা নেই। জগন্নাথ কলেজে দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকদের অভাব দূর করার জন্য কলেজে বি এস সি কোর্স চালু করেন। কারণ দেশভাগের পর অধিকাংশ স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক ভারতে চলে গিয়েছিল। তাঁর সময়েই এই কলেজে নাইট শিফট চালু হয়েছিল। ফলে জগন্নাথ কলেজে ছাত্র সংখ্যা অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিগুণে পরিণত হয়। ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার সময় ছাত্র-শিক্ষকদের সহযোগিতায় তিনি কলেজ ক্যাম্পাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজ প্রাঙ্গণে রিলিফ ক্যাম্প খোলার সিদ্ধান্ত নিই। ছাত্র-শিক্ষকদের সহযোগিতায় এই রিলিফ ক্যাম্প খোলার অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে প্রায় ১৫ হাজারের মতো নর-নারী এসে আশ্রয় নেয়। কলেজের পানি সাপ্লাই নিজস্ব ছিল। পোস্ট অফিসও ছিল সেখানে। চারদিকে উঁচু প্রাচীর থাকায় কলেজ প্রাঙ্গণ দূর্গের মতো সুরক্ষিত ছিল। তারচেয়ে বড় কথা হলো, কলেজের ছাত্ররা ক্যাম্পে আশ্রয়গ্রহণকারীদের পাশে এসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর ফলে ক্যাম্পের ওপর মহল বিশেষের হামলার ইচ্ছা থাকলেও সাহস ছিল না। কলেজের ছাত্ররা ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জীবন রক্ষার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল।[২২]

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

জগন্নাথ কলেজের ক্যাম্পে সে সময় অনেক খ্যাতিমান প্রগতিশীল মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কিছু অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল মানুষ এই ক্যাম্প পরিচালনায় সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। প্রাদেশিক গর্ভনর মোনায়েম খানও ক্যাম্প পরিদর্শন করে যাবতীয় সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাইদুর রহমান "১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি দর্শন বিভাগে বেশ কয়েক বছর খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।"[২৩] ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন তিনি। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েলর দর্শন বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল ভাবধারা ছড়িয়ে দেয়া। তিনি সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন গ্রহণ করেননি। সাইদুর রহমানের বেতনের সমুদয় অর্থ দিয়ে এবং তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষ ফাউন্ডেশন গঠন করেছে। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> ১৯৭৩ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে বেতন দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু আমি বেতন নিতে অস্বীকৃতি জানাই। বেতন গ্রহণের বদলে বরং ঐ টাকা দিয়ে আমি একটা ফাউন্ডেশন গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। এই ফাউন্ডেশনের মূলমন্ত্র হল মানবকল্যাণের প্রবণতা সকলের মাঝে জাগিয়ে তোলা এবং পারলৌকিকতার চেয়ে ইহকালকেই প্রাধান্য দেয়া, যেহেতু পরকাল ইহকালেরই প্রতিফলন। এই ফাউন্ডেশন গঠন করার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যে পরিবেশ ও আমরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একদিকে আমরা যেমন পরিবেশের সৃষ্টি করি তেমনি অন্যদিকে আমরাই পরিবেশকে এমনভাবে রূপান্তরিত করতে চাই যাতে মানবতার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে। আর এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক।[২৪]

অধ্যাপক সাইদুর রহমানের ইচ্ছা অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৫ সালে 'সাইদুর রহমান ফাউন্ডেশন' গঠন করে। নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি ঢাকায় তেঁজগাও মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজে তিনি ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অবৈতনিক অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাইদুর রহমান অনেক বাঙালি নর-নারীর বিয়ের ঘটকালি করেছেন। শিক্ষকতা জীবনের প্রথমে দরিদ্র মুসলিম ছাত্রদের বিয়ের ব্যবস্থা করে শ্বশুরের টাকায় পড়াশোনা চালিয়ে নেয়ার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি অন্যান্য কাজের ফাঁকে বিয়ের ঘটকালি করে আনন্দ উপভোগ করেছেন।

---

[২৩] প্রদীপ রায়, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৫১

[২৪]সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, পৃ. ১২২, ১২৩

দর্শনচিন্তা

সাইদুর রহমান ছিলেন দর্শনের মেধাবী ছাত্র। দর্শন বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। দর্শনের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর দর্শন বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা গড়ে উঠেছে। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষক নিখিলচন্দ্র সেন সাইদুর রহমানকে দর্শন পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য সহযোগিতা করেছেন। সাইদুর রহমান দর্শন বিভাগে পড়েছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ‘‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় দর্শন আমাকে দারুণভাবে পেয়ে বসেছিল। এই দর্শনের প্রভাবে আমার বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল।”[২৫] দর্শন বিভাগে ভর্তির পর দর্শনকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, “দর্শন আমার প্রিয় বিষয় হতে সময় লাগলো না। দর্শন চর্চায় বেশ মনোযোগী হয়ে পড়ি। গৃক দর্শন আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিকেরা গৃক দর্শনকে খুবই উর্বর করে তুলেছিল।”[২৬] দর্শন বিষয়ে সাইদুর রহমান লিখেছেন কম। কিন্তু দর্শনের সঙ্গেই ছিল তাঁর বিচরণ। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে আজ যদি পেছনের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, আমার জীবনের অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে দর্শনের জগতে বিচরণ করে।”[২৭] দীর্ঘ সময় দর্শনের ক্ষেত্রে বিচরণ করে সাইদুর রহমান দর্শনের সংজ্ঞা দিয়ে লিখেছেন, “দীর্ঘকালব্যাপী বিভিন্ন ব্যক্তি সুষ্ঠু সুন্দর জীবন সম্বন্ধে যে চিন্তা ভাবনা ও আন্দাজ অনুমান করে গেছেন সেগুলো সম্পর্কে মানব জ্ঞানের যে একটা সুস্পষ্ট শাখা রয়েছে তাকে দর্শন নামে অভিহিত করা হয়।”[২৮] দর্শনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো, “অতীত জীবনের কার্য্যাবলীর সমগ্র ইতিহাস শাস্ত্র, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের তিনটি স্তরের সঙ্গে বিষয়াশয় যুক্ত হয়ে যে শাস্ত্রের জন্ম তার নাম দর্শন।”[২৯] যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থান কাল পাত্র ভেদে সামাজিক সমস্যা ভিন্ন। দর্শন সামাজিক সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে জীবনকে সুন্দর, সার্থক ও আনন্দময় করে গড়ে তোলে। সে জন্য যুগে যুগে, কালে কালে দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। “সামাজিক সমস্যা বিভিন্নমুখী, তার সমাধানও বিভিন্ন। এ-কারণে দার্শনিক মতবাদও বিভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ বা কোন যুগ বিশেষের দর্শন সৃষ্টি হয় তৎকালিন সমাজ ব্যবস্থায়।”[৩০]

---

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
[২৭]সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ, ৫২
[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
[২৯] প্রগুক্ত, পৃ. ২০
[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

সাইদুর রহমান পাশ্চাত্যের ভাববাদী দার্শনিকদের মতবাদের সমালোচনা করে নিজের দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্লেটোর ভাববাদ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে লিখেছেন, "প্লেটো দর্শনকে অনুধ্যানে রূপান্তরিত করেন। সমাজের উপরতলার সুবিধাভোগীদের অবসর বিনোদনের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় দর্শন এ সময়ে।"[৩১] তাঁর দৃষ্টিতে ভাববাদী দর্শন কল্পনাবিলাস মাত্র।[৩২] বাস্তববাদী দর্শনকে তিনি সমর্থন করেছেন। সাইদুর রহমান মনে করেন, "গোড়ায় দার্শনিকদের লক্ষ্য ছিল পৃথিবী সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, কি করে এটাকে পাল্টাতে হবে, তারই নির্দেশ দান।"[৩৩] গ্রিক দার্শনিক থেলিস, এনাক্সিম্যান্ডার, এনাক্সিমিনিস প্রমুখ মাইলেসীয় দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কার্ল মার্কসের মতে জগতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেয়ে জগৎকে পরিবর্তন করাই দর্শনের প্রধান কাজ। দর্শন সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সাইদুর রহমানের চিন্তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মার্কসবাদ দিয়ে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন কিন্তু মার্কসবাদ গ্রহণ করেননি।

সাইদুর রহমান জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেল সম্পর্কে লিখেছেন, "হেগেল একদিকে যেমন একটি অত্যন্ত প্রগতিপন্থী বিশ্বের পরিকল্পনা পেশ করলেন অন্যদিকে তেমনি সেটারই অবসান ঘটালেন এক স্থিত অনন্ত ঐশীতত্ত্বের আমদানি করে। সামাজিক অবস্থা বা পরিবেশের পরিবর্তনের মধ্যে ব্যক্তির করণীয় যে কিছু রয়েছে এটার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি হেগেল।"[৩৪] যৌক্তিকদৃষ্টবাদীদের দর্শনও সাইদুর রহমানের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাঁর দৃষ্টিতে ভাষা বিশ্লেষণের নামে যৌক্তিদৃষ্টবাদীরা দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "নিও পজিটিভিজমের মূল কথা হল যে, মৌলিক সমস্যাগুলোর কোনটাই নেই দর্শনের মধ্যে। বিজ্ঞানের যা বক্তব্য সেটার যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণের মধ্যেই একান্তভাবে দর্শনের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ রাখা উচিত – এই জাতীয় মতামত দর্শনশাস্ত্রের মূলোচ্ছেদ করবারই সমতুল্য।"[৩৫]

অস্তিত্ববাদ মানুষের সমস্যাবলি সমাধানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করেন সাইদুর রহমান। কিন্তু মানুষের বাস্তব সমস্যাবলি সমাধান কল্পে অস্তিত্ববাদ যে পথ নির্দেশ করেছে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে, মানুষের প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে তিনি মনে করেন।[৩৬] এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "অস্তিত্ববাদ অবশ্য আজকের দিনের খুব জরুরি প্রশ্নগুলো উপক্ষো করে না। কিন্তু সমাধানের

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
[৩২] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, পৃ. ১৭০
[৩৩] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ২৩
[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
[৩৬] প্রদীপ রায়, ''সাইদুর রহমান'', *উপমহাদেশীয় দর্শন: বিশ শতকীয় প্রয়াস*, আ. ফ. ম উবায়দুর রহমান (সম্পাদিত), পৃ. ৯০

যে সংকেত দিয়েছে তা মানব সভ্যতার, ইতিহাসের প্রগতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।”[৩৭] প্রয়োগবাদকেও সাইদুর রহমান যথার্থ মতবাদ হিসাবে সমর্থন করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে, “মানব সভ্যতা যে উন্নততর নৈতিক মনের প্রতি ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে প্রয়োগবাদ সেটার সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করতে চায় না।”[৩৮] সাইদুর রহমানের মতে নব্যবস্তুবাদ কতকটা অন্তর্মুখী আশাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩৯] পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিক ও মতবাদের সমালোচনা করে সাইদুর রহমান নিজস্ব দর্শন দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মতে, যুগের চাহিদা অনুসারে দর্শনের সৃষ্টি হয়। তাই প্রাচীনকালের দর্শনের সঙ্গে আধুনিককালের দর্শনের পার্থক্য। মধ্যযুগের দর্শন তেমনি স্বতন্ত্র। ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্যের দার্শনিক পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সাইদুর রহমান লিখেছেন,

> দর্শন সর্বকালের সর্বযুগেরই বিষয়বস্তু। সমস্ত মতান্তর সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক জগৎ ও পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা মানুষের মধ্যে যত প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে প্রায় তত প্রকারই দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে। ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপে এই বিশ্বজোড়া মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে বার বার, এবং এগুলোই সাধারণ অর্থে দর্শন নামে পরিচিত।[৪০]

সমাজ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবনকে সহজ সরল করতে দর্শন সাহায্য করে। সমাজকে বুঝতে এবং সমাজে মানুষের অবস্থান এবং অন্য প্রাণীদের অবস্থান নিয়েও দর্শন আলোচনা করে। সাইদুর রহমানের ভাষায়, “পৃথিবী এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বা রীতিনীতি কিভাবে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে সাহায্য করে দর্শন।”[৪১] সাইদুর রহমান প্রগতির দর্শনের কথা বলেছেন। প্রগতির দর্শনের সাহায্যে তিনি মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন। প্রগতির দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছেন, “প্রগতির দর্শন হলো শান্তির দর্শন যার লক্ষ্য ব্যাপক শিক্ষার প্রসার, অবাধ জ্ঞানের বিস্তার, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, সর্বস্তরের মানুষের জন্যে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার, সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া এবং সর্বোপরি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।”[৪২] সাইদুর রহমান জীবনবিচ্ছিন্ন, সমাজবিচ্ছিন্ন, মানুষের সমস্যাবলি থেকে বিচ্ছিন্ন দর্শনকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। দর্শন বিমূর্ত বিষয় নয়। তাঁর মতে দর্শন মানবজীবনের পথ নির্দেশ, সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত, সমাজ

---

[৩৭] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, ৩২
[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
[৪০] প্রাগুক্ত, ২৫
[৪১] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ২৭
[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

পরিবর্তনের হাতিয়ার; দর্শন মানেই মানবসেবায় নিবেদিত, মানবকল্যাণে উৎসর্গকৃত ধ্যান-ধারণা যা একটি প্রগতিমুখী সমাজের সন্ধান দেবে।[৪৩]

সাইদুর রহমানের দর্শনচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। তিনি মানুষকে বড় করে দেখেছেন। বাহ্যিক প্রদর্শনী অর্থে তিনি মানুষকে দেখেননি। তিনি মানুষকে দেখেছেন হৃদয়ের টানে।[৪৪] গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাস ব্যক্তি মানুষকে বড় করে দেখেছেন। ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্তকে তিনি সবার উপর স্থান দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, "মানুষই সবকিছুর পরিমাপক, যা আছে তাই সত্য, এবং যা নেই তা সত্য নয়।"[৪৫] ব্যক্তি মানুষই সবকিছুর পরিমাপক। চণ্ডিদাসের বিখ্যাত উক্তি,

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

সাইদুর রহমানও মানুষকে সবার উপর স্থান দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষই সবকিছু করতে সক্ষম। মানুষ দেবতাও নয় আবার পশুও নয়। মানুষ নিজের চেষ্টায় দেবতার আসনে যেতে সক্ষম। আবার পশুর পর্যায়েও যেতে পারে।[৪৬] *শতাব্দীর স্মৃতি* গ্রন্থের প্রকাশকের কথায় সাইদুর রহমানের সন্তান শফিক রেহমান বাবা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, "হাসপাতালে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও তাকে ঈশ্বরের নাম নিতে বলা হলে তিনি অর্ধচেতন অবস্থায় ডান হাত দিয়ে নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝাতে চান যে, ঈশ্বরের অবস্থান মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।"[৪৭] এ-সম্পর্কে মোগল সম্রাট আকবরের দ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে আকবরের ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। মুরাদ পিতার কাছে জানতে চান, সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া উচিত কিনা? আকবর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'যে নির্বোধ মনে করে শারীরিক কসরৎ করলেই ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়, সে পথ বন্ধ করে দিলে তার ঈশ্বরকে স্মরণ করাই সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে'।[৪৮] পরিণত বয়সে সাইদুর রহমান ঈশ্বর সম্পর্কে সম্রাট আকবরের মতকে সমর্থন করেছেন বলেই মনে হয়।

প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রে দার্শনিক রাজার কথা বলেছেন। সাইদুর রহমান দর্শন সমৃদ্ধ সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। দর্শন সমৃদ্ধ সমাজই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। তাঁর মতে, দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা ছাড়া কোন জাতি বড়

---

[৪৩] প্রদীপ রায়, ''সাইদুর রহমান'', *উপমহাদেশীয় দর্শন: বিশ শতকীয় প্রয়াস*, আ. ফ. ম উবায়দুর রহমান (সম্পাদিত), পৃ. ৯২

[৪৪] সিদ্দিকুর রহমান, ''দার্শনিক সাইদুর রহমান'', সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, পৃ. ১৮৭

[৪৫] বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* - ১, ড. প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ৭৪

[৪৬] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ১৬

[৪৭] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, প্রকাশকের কথা

[৪৮] Amartya Sen, *The Argumentative Indian,* Penguin Books, 2005. p. 291

হতে পারে না।[৪৯] যে মানুষ অন্য মানুষের কল্যাণ কামনা করে না সে মানুষ বড় হতে পারে না। কোন জাতির মধ্যেও যদি বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ না ঘটে সে জাতিও বড় হতে পারে না।

সাইদুর রহমান তাঁর দর্শনের নাম দিয়েছেন কল্যাণ দর্শন। কল্যাণ দর্শনের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন,

> জীবন সংগ্রামের লক্ষ্য হবে কল্যাণময় নবীন পরিবেশের সৃষ্টি। এ পরিবেশের ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির কল্যাণই পাবে সমধিক গুরুত্ব, আর তা পালন করবে সমবায় ও সমবেত জীবনযাত্রার পদ্ধতি। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার হবে অবসান, বিলুপ্ত হবে অন্ধ সংস্কারের অনুশাসন। বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভের সাধনা হবে এহেন পরিবেশ সৃষ্টির বাহক, কল্যাণ সাধনের মানসিকতা করবে জন্মলাভ।[৫০]

দর্শন বিমূর্ত বিষয় নয়। দর্শনকে যারা বিমূর্ত বিষয় হিসাবে অখ্যায়িত করেন তারা মানব কল্যাণে দর্শনের ভূমিকাকে অস্বীকার করেন। পাশ্চাত্যের কোন কোন দার্শনিক এবং দার্শনিক সম্প্রদায় দর্শনকে বিমূর্ত বিষয়ে পরিণত করেছেন। মানব জীবনের কল্যাণে তাঁরা দর্শনকে কাজে লাগাননি। এমন কি কোন কোন দার্শনিক মানুষের কল্যাণের চেয়ে ভাষার ব্যবহার এবং শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে দর্শন রচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিক সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদকে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে শুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। সাইদুর রহমান মানব কল্যাণ পরিপন্থি দর্শনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষের কল্যাণ। তাই সাইদুর রহমানের দর্শনচিন্তার মূল্যায়ন শেষে বলা যায়, তাঁর কল্যাণ দর্শন যথার্থ অর্থেই একটি মৌলিক চিন্তা যা বাংলাদেশের কল্যাণের জন্যে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেবে।[৫১] সাইদুর রহমানের জ্ঞানতত্ত্ব, এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনার মধ্যে তাঁর দর্শনচিন্তা নিচে আলোচনা করা হলো।

জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনের মৌলিক আলোচনার বিষয়। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি মুসলিম দার্শনিক সাইদুর রহমানের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থে জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। জ্ঞানকে সাইদুর রহমান শক্তি হিসাবে অভিহিত করেছেন। এ-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, “জ্ঞানই শক্তির উৎস। জ্ঞানের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার ক্ষমতা। বিজ্ঞানের জ্ঞানই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে।”[৫২] প্রত্যক্ষণ, শব্দ, অনুমান, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণের উপর বিজ্ঞানের জ্ঞান

---

[৪৯] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ৫৪
[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
[৫১] গালিব আহসান খান, *দর্শনের প্রয়োজনীয়তা: একবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ৩৫
[৫২] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ১৩

নির্ভর করে। অপার্থিব-অলৌকিক বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করে না। বস্তুজগতই বিজ্ঞানের বিচরণ ক্ষেত্র। সাইদুর রহমান বিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর আস্থাশীল। তিনি মনে করেন বিজ্ঞানের জ্ঞানই মানুষকে সত্যের পথে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। পৃথিবীর শৈশবস্থা থেকে আজকের এই অগ্রগতির পেছনে রয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কল্যাণেই মানুষ সভ্যতা গড়ে তুলেছে। সাইদুর রহমান বার্ট্রান্ড রাসেলের উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "আনন্দময় মঙ্গলময় সুখী সুন্দর জীবন ভালবাসা ও জ্ঞানের ভিত্তির উপরই গড়ে উঠতে পারে।"[৫৩] এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "চিরকাল পৃথিবীর মহান দার্শনিকেরা জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা দ্বারা তাড়িত হয়ে অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান চালিয়ে রহস্যের পর রহস্য উন্মোচন করে মানব জাতির জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে চলেছে। মনে হয় এই প্রক্রিয়া অন্তহীন। জ্ঞানের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে মানুষের সুখের সম্ভাবনাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।"[৫৪] জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করলে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে আর কোন বাধা থাকে না। কিন্তু জ্ঞান সবসময় মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় না। সাইদুর রহমান লিখেছেন, "জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ যদি ব্রতী হয়, মহত্ত্বের সাধনায় মানুষ যদি অটল থাকে, লব্ধ জ্ঞানকে মানুষ যদি সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক সমস্ত কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ করে, তাহলে এই মাটির পৃথিবীতে মানব জীবন অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত সম্পদের আধার হয়ে উঠতে পারে।"[৫৫]

মানব সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। গোত্র ভিত্তিক মানুষ থেকে বর্তমানে বিশ্বায়নের মানুষে পরিণত হয়েছে। মানুষ জন্ম শাসন করেছে, মৃত্যু শাসনের চেষ্টা করছে। সাইদুর রহমান আশা করেছেন মানুষ কোন এক সময় মৃত্যুকে শাসন করবে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "এমন একটা ক্ষীণ আশা আমার করতে ইচ্ছা করে যে, জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মানবজীবন একদিন হয়তো মুক্তি পাবে; আমি সেদিন বেঁচে থাকব না, কিন্তু আমার প্রজাতি বেঁচে থাকবে এবং প্রতিটি মানুষ সেদিন হয়তো হবে অনন্ত জীবনের অধিকারী।"[৫৬] সাইদুর রহমান জ্ঞানকে ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে জ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য নেই সেই জ্ঞান তাঁর কাছে অর্থহীন। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানচর্চা তাঁর কাছে বিলাসিতা মাত্র। তাছাড়া আমরা কোন জ্ঞান অর্জন করতে চাই, জ্ঞান মানুষের কি কাজে লাগবে তাও নির্ধারণ করা উচিত।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে সাইদুর রহমান অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ, বিচারবাদ গ্রহণ করেননি। তিনি সংশয়বাদ সমর্থন করেছেন। সংশয় তাঁর কাছে অতি মূল্যবান। যার সংশয় নেই তার কোন জিজ্ঞাসা নেই।

---

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
[৫৪] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, পৃ. ১৬৭
[৫৫] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ৫৫
[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

জিজ্ঞাসা ছাড়া বদ্ধ জলাশয়ে স্থবির বিষয়ের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান অর্জনের জন্য ভয়শূন্য, মুক্তচিন্তার অধিকারী হতে হয়। সাইদুর রহমান সংশয়ের সমর্থনে লিখেছে,

> সংশয় শব্দটা আমার খুবই প্রিয়। কিন্তু অনেকেই একে ভয় করেন কেন, তা জানি না। আমি অবশ্য সংশয়কেই জীবনের অবলম্বন করে নিয়েছি এবং আমার জীবনের চলার পথে সংশয় আমাকে দিয়েছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। আমার সংশয় জিজ্ঞাসারই নামান্তর মাত্র। জীবনে কোনো জিজ্ঞাসা না থাকলে জীবন হয়ে পড়ে অর্থহীন ও স্থবির। সংশয় থাকলেই চিন্তা আসে এবং চিন্তা করা যায়। সংশয় বা জিজ্ঞাসা না থাকলে অজানাকে জানার ঔৎসুক্য জন্ম নেয় না। সত্যি কথা এই যে, সংশয় দর্শনেরই জনক। যে মানুষের সংশয় নেই তার কোনো দর্শনও নেই।[৫৭]

সাইদুর রহমান মনে করেন সংশয় থেকে শুধু দর্শনের সৃষ্টি হয়নি, বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে সংশয় থেকেই। সংশয় না থাকলে মানুষ পুরানো বিশ্বাস, সংস্কার আঁকড়ে ধরে। জিজ্ঞাসাহীন মানুষ ভুতে-ভগবানে, তাবিজে-কবজে-কবরে বিশ্বাস করে। সমাজ তখন এগিয়ে যায় না। সাইদুর রহমান মনে করেন, “আমাদের সমাজে তাত্ত্বিক সংশয় এখনো অনাদৃত। আমাদের সমাজে যাঁরা আছেন তাঁদের অধিকাংশেরই তাত্ত্বিক সংশয় নেই। তাই সমাজ প্রগতির পথে আজও এগুতে পারছে না।”[৫৮]

মানুষের কল্যাণের জন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে। সংশয় থেকেই এসব হচ্ছে। সাইদুর রহমান সংশয়কে এত বেশি আপন করে নিয়েছিলেন যে নিজের বাড়ির নাম তিনি দিয়েছিলেন সংশয়। শিক্ষক হয়ে কিভাবে তিনি বাড়ির মালিক হলেন এই নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। তিনি লিখেছেন, “আমার সংশয় মালিকানায়।”[৫৯] আমাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে সংশয় কাজ করে। সংশয় ছাড়া কোন মানুষ চলতে পারে না। তারপরও মানুষ সংশয়ের উপর আস্থা রাখে না। অতিপ্রাকৃতিক-অলৌকিক শক্তির উপর আস্থা রাখে। সংশয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে সাইদুর রহমান লিখেছেন,

> আমাদের বর্তমান জীবনের নানান ক্ষেত্রেই ছোট ছোট কতো সংশয়ই না রয়েছে। পরীক্ষায় পাসের হার বেড়ে গিয়েছে। এখন ডিগ্রির ছড়াছড়ি। আর ডিগ্রি পেলেই চাকরি। এসব ডিগ্রির মূল্য কতোখানি? সংশয়। এসব চাকরির নিরাপত্তা কতোখানি? সংশয়। খাদ্যে ভেজাল, না নির্ভেজাল? সংশয়। তেলের অভাব। রেল-স্টিমার-বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে কি? সংশয়। খবরের কাগজে প্রতিদিন নানা রকমের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাঠের পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিজের জীবন সম্বন্ধে সংশয়। ওই সংশয়ের ফলে তারা খুঁজে বেড়ায় নিরাপত্তা। মোটকথা, যেমন তত্ত্বের ক্ষেত্রে তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও আমরা হরেক রকমের সংশয় দিয়ে ঘেরা।[৬০]

---

[৫৭] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, পৃ. ১৬৪
[৫৮] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ৪৯
[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫
[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

মানুষের মনে সংশয় থাকলেও সংশয়ের উপর সে আস্থা রাখতে পারে না। পুরানো বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখে নিরাপদ নিশ্চিন্ত শান্তি খোঁজে ইহকাল এবং পরকালে।

সংশয়বাদের উদ্ভব ঘটে প্রাচীন গ্রিসে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকের মধ্যে প্রথম সংশয়বাদের ছাপ দেখা যায়।

> খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রিক সমাজ যখন সামাজিক অস্থিরতায় সংকটগ্রস্ত তখন প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে সংশয় এবং অস্বীকারমূলক একটা মনোভাবের জন্মলাভ করে। প্রাচীন সংশয়বাদের শক্তিশালী প্রকাশ ঘটে পিরহো, আরসেসিলাস, কারনিয়াডিস, ইনিসিডেমাস, সেক্সটাস, এপিকিউরাস এবং অপরাপর দার্শনিকদের মধ্যে।[৬১]

সফিস্টদের চিন্তার মধ্যেও সংশয়বাদের বীজ নিহিত ছিল। তাঁরা প্রচলিত গ্রিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আধুনিক দর্শনের জনক ফরাসি দার্শনিক ও গণিতবিদ রেনে ডেকার্ত (১৫৯৬ - ১৬৫০) নিশ্চিত জ্ঞানলাভের জন্য সংশয়বাদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সবকিছু নিয়ে সংশয় শুরু করেন। সবকিছু নিয়ে ডেকার্ত সংশয় প্রকাশ করলেও নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে তিনি সংশয় প্রকাশ করেননি। সাইদুর রহমান বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ না হলেও সমাজের বহু মানুষের মঙ্গল চেয়েছেন সে জন্য তিনি সংশয়বাদ গ্রহণ করেছেন।

সংশয়কে সাইদুর রহমান চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করেননি। সংশয় তাঁর পদ্ধতি। পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতবাদ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে তিনি তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছেন। সমাজের মধ্যে প্রগতির সৃষ্টির জন্য তিনি সংশয়বাদের পক্ষ নিয়েছেন। বিজ্ঞানমনস্ক এবং আধুনিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মানুষকে তিনি অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত করার জন্য সংশয় পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুক্ত মানুষ ছাড়া মুক্ত সমাজ গড়া যায় না। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যও সংশয় অপরিহার্য। যে মানুষের সংশয় নেই সে মানুষ দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্মাণ করা যায় না। অতিপ্রাকৃতিক-অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাসী মানুষ কানা গলিতে আটকে থাকে। এরা আলো দেখতে পায় না। এদের সংশয় নেই। সাইদুর রহমানের ভাষায় এদের জ্ঞানও নেই।

অধিবিদ্যা

দর্শনের শাখাগুলোর মধ্যে অধিবিদ্যা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। দর্শনের সঙ্গে অধিবিদ্যার রয়েছে নিবিড় সম্বন্ধ। এজন্য প্রাচীনকালে অনেকে দর্শন ও অধিবিদ্যাকে সমার্থক মনে করতেন। সাধারণত আত্মা,

---

[৬১] সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন কোষ*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৬, পৃ, ৩৪৫

ঈশ্বর, দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব, জগতের মূল উপদান কী ইত্যাদি নিয়ে দর্শনের যে শাখায় আলোচনা করা হয় সে শাখাকে অধিবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের মন ও বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অধিবিদ্যা আলোচনা করে। জগতের আদি উপদান কি? ঈশ্বর কি অস্তিত্বশীল, মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? আত্মা কি শাশ্বত চিরন্তন, মানুষের মৃত্যু হলে আত্মা কোথায় যায়, মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার সম্পর্ক কী ইত্যাদি নিয়ে অধিবিদ্যা আলোচনা করে। সত্তা কি এক না বহু এসবের আলোচনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অধিবিদ্যক প্রশ্নগুলো আলোচনা হচ্ছে। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় দার্শনিকদের মত বাংলাদেশের দার্শনিকরাও অধিবিদ্যার বিষয়গুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। অধিবিদ্যা সম্পর্কে বাঙালি দার্শনিকদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক সাইদুর রহমান অধিবিদ্যায় আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে যৌক্তিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মানব জীবনে অধিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উথাপন করেছেন। পাশ্চাত্যের যৌক্তিক দৃষ্টবাদী দার্শনিকেরা ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্যে অধিবিদ্যার অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। তাদের মতে অধিবিদ্যার আলোচনা কতগুলি অর্থহীন প্রশ্ন ও এর উত্তর দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁরা দেখিয়েছেন অধিবিদ্যার যাবতীয় বাক্যই অর্থহীন। অর্থহীন বাক্যের আলোচনাও অর্থহীন। সাইদুর রহমান মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অধিবিদ্যার অর্থহীতা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অধিবিদ্যায় ব্যবহৃত বাক্যগুলো মানুষকে প্রতারিত করে। সামাজিক মানুষকে কুসংস্কারগ্রস্ত করতে সাহায্য করে অধিবিদ্যা।

সাইদুর রহমান তাঁর দর্শনের নাম দিয়েছিলেন কল্যাণ দর্শন। সমাজের, রাষ্ট্রের তিনি কল্যাণ চেয়েছেন। এই কল্যাণের জন্যই সমাজ থেকে তিনি অধিবিদ্যক বিষয়গুলো বর্জন করেছেন। বাস্তববাদী দার্শনিক হিসাবে সাইদুর রহমান মনে করতেন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর বিশ্বাস রাখা মোটেই কাম্য নয়। তিনি লিখেছেন, “মানুষের মঙ্গল সাধন ছাড়া কোন অতি-প্রাকৃত শক্তির ভজনা আমাদের কাম্য নয়।”[৬২] সাইদুর রহমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তবে তাঁর ঈশ্বরচিন্তা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। তাঁর ঈশ্বর অসীম ক্ষমতাবান ঈশ্বর নয়, ঈশ্বর সৃষ্টি কর্তাও নন। ঈশ্বরকে তিনি মানব কল্যাণে ব্যবহার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ নিজের প্রয়োজনে অতি প্রাকৃতিক শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করেছে। যখন মানুষের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান সীমিত ছিল তখন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষ আস্থা স্থাপন করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আসমানী শক্তির উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে মাটির পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

[৬২] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ১২

করেছে। মানুষের ক্রমাগত চেষ্টার ফলেই জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে। মানুষ চাকা আবিষ্কার থেকে শুরু করে অতিমানব সৃষ্টি পর্যন্ত করেছে। পশু-পাখি ক্লোন হচ্ছে। হয়তো মানব ক্লোনও এক সময় সম্ভব হবে। ফলে মানুষের জন্ম, মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য হলেও পরিবর্তন হবে।

ধর্মের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ঈশ্বর। সৃষ্টিকর্তা না থাকলে ধর্ম আর ধর্ম থাকে না। সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোতে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা দেখা যায়। সাইদুর রহমান লিখেছেন, "মানুষর জীবনকে কল্যাণময়ী সুন্দর ও সুখী করার জন্য ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ধর্ম শুধু এ জগতের মঙ্গল সাধনা করে ক্ষান্ত থাকে নি। পরকালের সুখ শান্তির দিয়েছে এক বড় প্রলোভন। এ জীবনকে মনে করেছে ক্ষণিকের মায়া। পরকালের মঙ্গলের সাধনায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে দিয়েছে সমধিক গুরুত্ব।"[৬৩]

সাইদুর রহমান সুখ-সমৃদ্ধ জীবনের জন্য ইসলাম ধর্মের মর্মকথা উপলব্ধি করেছেন। তিনি মনে করতেন সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন অপরিহার্য। পরকালের ভয় দেখিয়ে যারা ইহলোকে সুখে সমৃদ্ধিতে থাকেন তিনি তাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরকাল ধর্মের মূল্য উদ্দেশ্য। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোতে পরকালই মূখ্য। স্বর্গ, নরক এ-সবের প্রলোভন এবং ভয় ইত্যাদি ধর্মের প্রধান বিষয়। সাইদুর রহমান মানবের ইহলোকেব কল্যাণের জন্যই ধর্মের কথা বলেছেন। অবশ্য তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মত সমর্থন করে বলেছেন, জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। শেখ ফজলল করিম লিখেছিলেন,

কোথায় স্বর্গ?
কোথায় নরক?
কে বলে তা বেশি দূর।
মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক
মানুষেতে সুরাসুর।

সাইদর রহমানের ঈশ্বর প্রেম মানব প্রেমের সমান। মানুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন। তাঁর ঈশ্বর কোনো পাহাড়-পর্বতে, নদীতে সাগড়ে বা মহাশূন্যে থাকে না। তিনি থাকেন মানবের মধ্যে। মানবের সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। মানুষকে অবজ্ঞা অবহেলা করে, মানুষকে শোষণ বঞ্চনা মধ্যে রেখে, দারিদ্র সীমারেখার নীচে মানুষের অবস্থান নিশ্চিত করে ঈশ্বরের আরাধনা করার কোনো অর্থ হয় না।

---

৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

সাইদুর রহমান ইসলাম ধর্মের উপর আস্থা রেখেছেন। ইসলাম ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের পরিপন্থি মন্তব্য করলেও ইসলামের প্রগতিশীল দিকটি তিনি প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> হযরত মুহম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম তাঁর পূর্বনবীদের প্রচারিত ইসলামের মত প্রাচীন হলেও জীবন সম্বন্ধে এর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ নতুন এবং ভিন্নতর। প্রাচীন ধর্মসমূহ যেখানে মানুষের জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল, মুহম্মদ (সঃ) সেখানে মানুষের জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য এই পৃথিবীর বাস্তব ও প্রাকৃতিক বস্তুর উপর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন।[৬৪]

সাইদুর রহমানের অধিবিদ্যা আলোচনায় দেখা যায় আপতদৃষ্টিতে তিনি যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে অধিবিদ্যার অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু মানবকল্যাণের জন্য মানবজীবনে অধিবিদ্যার উপস্থিতি মেনে নিয়েছেন। যেমন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান বর্জনের কথা বলেছেন কিন্তু ধর্মের সাহায্যে মানবকল্যাণ করার কথাও বলেছেন। সাইদূর রহমানের মূল্যবিদ্যা আলোচনার সময় ধর্মচিন্তায় এ সম্পর্কে কিছু বিবণ দেয়া হয়েছে।

মূল্যবিদ্যা

মূল্যবিদ্যা দর্শনের মান বা মূল্যবিষয়ক আলোচনা। মূল্যবিদ্যাকে প্রায়োগিক দর্শন বলা হয়। সাইদুর রহমান বাস্তাববাদী দার্শনিক। তাঁর দর্শনের মূল্যবিদ্যা অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে। ধর্মচিন্তা, নীতিচিন্তা ও নারীবাদ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সাইদুর রহমানের মূল্যবিদ্যা এই অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হবে।

ধর্মচিন্তা

সাইদুর রহমান বাঙালি মুসলমান। মুসলিম পরিবারে পারিবারিক ধর্মীয় পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন। ছোট বয়স থেকে তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি ছিলেন কোরানে হাফেজ। মসজিদে ইমামতি করেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “অল্প বয়সেই কোরআন শরীফ মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ক্লাস সিক্স-এ পড়ার সময় থেকে অনেকবারই গ্রামের মসজিদে ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে নামাজের সময় ইমামতি করেছি।”[৬৫] বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাইদুর রহমান বিশ্বাসী মানুষ থেকে যুক্তিবাদী

---

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
[৬৫] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, পৃ. ১৩৩

মানুষে পরিণত হন। অধীত বিদ্যা এবং চিন্তাশক্তি বিকাশের ফলে সাইদুর রহমানের মধ্যে যুক্তিবাদ বিকশিত হয়। তিনি ভাল ফার্সি জানতেন। ফার্সিতে দখল দেখে সাইদুর রহমানকে স্কুলের মৌলভি সাহেব মাদ্রাসায় পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সাইদুর রহমান স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান তিনি অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর মন ছিল সংস্কারমুক্ত।

পূর্বতসিদ্ধ কোন ধারণা নিয়ে সাইদুর রহমান ধর্মচিন্তা করেননি। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি ধর্মকে দেখেছেন তাঁর বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা থেকে। ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে ধর্মের সৃষ্টি হয়, যখন মানুষের জঠরে ছিল শুধু ক্ষুধা, অন্তরে ছিল ভয় বিহ্বলতা এবং চিন্তাধারায় ছিল ভয়ঙ্কর রকমের আন্তকেন্দ্রিকতা।"[৬৬] ভয় এবং অবলম্বনহীন মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ধর্মের সৃষ্টি করেছে। সাইদুর রহমান লিখেছেন, "গোড়াতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের যখন কোন জ্ঞানই ছিল না, তখন ধর্ম তাকে পরিচালনা করেছে, পথ নির্দেশ করেছে।"[৬৭] কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস শিথিল হয়েছে। অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরতা কমেছে। তারপরও প্রাকৃতিক শক্তিকে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে কিছু মানুষ আত্মতুষ্টি লাভ করে। সাইদুর রহমানের ভাষায়, "বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের এই যুগে যদিও অজস্র দেবদেবীর নির্বাসন ঘটেছে তবু শেষ অজানা রহস্যকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে ধর্ম।"[৬৮] ধর্মীয় বিশ্বাস চিরন্তন নয়। যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান-আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তন হয়েছে। সাইদুর রহমান লিখেছেন, "বিজ্ঞান ও দর্শনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে শুধু তাই নয়, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন উত্তরোত্তর মানুষের জ্ঞান-বৃদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে- ধর্ম সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।"[৬৯]

সমাজের অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ সাইদুর রহমানের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকায় তিনি ধর্মের উদ্ভবের মধ্যেও কল্যাণই দেখতে পেয়েছেন। তিনি মনে করেন, "মানুষের জীবনকে কল্যাণময়ী সুন্দর ও সুখী করার জন্যে ধর্মের আবির্ভাব।"[৭০] মানুষের কল্যাণার্থে ধর্মের আবির্ভাব হলেও শুধু আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর ধর্ম, ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। এ সম্পর্কে সাইদুর রহমানের স্পষ্ট বক্তব্য, "সকল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ। মানুষের কল্যাণের সাধনার ধর্মের জন্ম, কিন্তু

---

[৬৬] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ১৬
[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

অপরদিকে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই সাধন করেছে সমধিক।"[৭১] ধর্ম মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। মানুষে মানুষে বিভেদ কমিয়ে আনে। হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার, কপটতা, অসাধুতা ধর্মে নেই। সাইদুর রহমান মনে করেন, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণেই মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বেড়েছে। ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে খুন করেছে। ধর্মের নামে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। নারী-পুরুষের উপর নির্যাতন হচ্ছে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার কারণেই। 'ধর্মমোহ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
> অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।[৭২]

সাইদুর রহমান অন্ধভাবে কোন কিছু গ্রহণ করেননি। যুক্তি দিয়ে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের জন্য আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর ধর্ম অনেকাংশে দায়ী। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "অত্যধিক সংস্কার-প্রীতি জন্ম দেয় গোঁড়ামি, সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে বিভেদ, হিংসা, দ্বেষ ও বিদ্বেষ। মানুষ ভুলে যায় ধর্মের মূল লক্ষ্য, মানুষের ঐক্য আর তার কল্যাণ।"[৭৩] ধর্মকে সাইদুর রহমান জীবনধারণের সহায়ক হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর ধর্ম প্রগতির সঙ্গে পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, "ধর্ম আমাদের জীবনধারণে সহায়ক ও পথনির্দেশক। কাজেই অবস্থার পরিবর্তনের সাথে ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ধর্ম তার নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে থাকবে। নতুবা তার নিগুঢ় উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"[৭৪]

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সাইদুর রহমানের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ইসলাম ধর্মকে তিনি বিশ্বের সকল সমস্যা সমাধানের মূলমন্ত্র বলে মনে করে লিখেছেন,

> ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দান করেছিল। কিন্তু অধুনা সমাজের অবস্থা ভিন্নতর। মানব গোষ্ঠী শতধা বিভক্ত। সবাই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরস্পরকে শোষণের নীতি অনুসরণ করছে। কাজেই আজ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত মানব সমাজের সাম্য ও মৈত্রী স্থাপনের ভিত্তির ওপর। উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, অভুক্ত মানব গোষ্ঠীর সকল ন্যায্য মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দান করতে হবে। জনগণকে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের সকল পরিকল্পনা ইসলামের মূল নীতিরই বাস্তবায়ন বলে আমরা বিশ্বাস করি। ইসলাম সাম্যের ধর্ম।[৭৫]

ইসলাম ধর্মকে তিনি মানব মুক্তির অবলম্বন হিসাবে দেখেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপরও গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম। তাইতো ইসলাম যেমন লক্ষ্যস্থলের কথা বলেছে তেমনি সেখানে পৌঁছবার পথ-নির্দেশও দিয়েছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে এটা এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবে। তাছাড়া

---

[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
[৭২] *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনমুদ্রণ পৌষ ১৪০২, পৃ. ২০৬
[৭৩] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ. ১৭
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
[৭৫] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ, ৪৮

তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত নিয়ম-কানুনও প্রবর্তন করে ইসলাম।"[৭৬] ইসলাম ধর্ম অন্য সব ধর্মের মানবকল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ আদর্শগুলোকে আত্মস্থ করে আধুনিক ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সাইদুর রহমানের ভাষায়, "বিবর্তন ও রূপান্তরের ধারায় পনেরো শত বৎসর পূর্বে প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়ে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, এবং বিশেষ দেশ-কালে এ-ধর্ম প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ববর্তী যাবতীয় ধর্মের মর্মকে আত্মস্থ করে নিয়ে, আল্লাহর পিতৃত্বকে অস্বীকার করে, মানুষের ভ্রাতৃত্বের উপর জোর দিয়ে ইসলাম নবুয়তের পরিণতি প্রচার করলো।"[৭৭]

ইসলাম ধর্মকে মানব মুক্তির সনদ হিসাবে দেখলেও তিনি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। তিনি মনে করেন প্রগতির সঙ্গে ইসলাম বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে ইসলাম।[৭৮] এ-সম্পর্কে আক্ষেপ করে তিনি লিখেছেন,

> আজকের পৃথিবী নিশ্চিতভাবে গতকালের পৃথিবী নয় – চৌদ্দশত বছর আগের পৃথিবী তো নয়ই। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে পরিবর্তন আসেনি; বরং এক জায়গাতে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমান নিজেদের ধর্ম পদ্ধতিতে যেমন কোন পরিবর্তনকে আমন্ত্রণ জানায় নি, তেমনি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার কোন চেষ্টাও করেনি।[৭৯]

তিনি ইসলামকে প্রগতিশীল ধর্ম হিসাবে দেখেছেন। তিনি মনে করেন ইসলাম প্রগতিশীল হলেও পরবর্তী সময়ে এই ধর্ম প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে এসেছে। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "ইসলাম ইহলৌকিক জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মানুষের মধ্যে ঐক্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিয়েছে। প্রগতিকামী ও কল্যাণধর্মী মানুষের এটাই আদর্শ। বড়ই পরিতাপের বিষয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলমানগণ ইসলামকে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার না করে পরিণত করেছে প্রতিক্রিয়ার আধারে।"[৮০] সাইদুর রহমান বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের মত ধর্মও প্রগতিশীল। ধর্ম কোন স্থির বিষয় নয়। ধর্ম স্থির হয়ে গেলে তখন তার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট হয়ে যায়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "দর্শন ও বিজ্ঞানের মত ধর্মও প্রগতির পথ অনুসরণ করছে। ইহুদি, খ্রীস্টান ও ইসলাম এ সাক্ষ্যই বহন করে। পৃথিবীর যে-কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসও এ-কথা প্রমাণ করবে।"[৮১] ইসলাম ধর্মের উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থাশীল ছিলেন সাইদুর রহমন। *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy* নামে তিনি বই লিখেছেন।

---

[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬- ৫৭
[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮- ৩৯
[৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
[৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, “In the new background of Pakistan, Islamic Philosophy, as a branch of study, has acquired additional weight and interes”.[৮২]

বাঙালি মুসলমান হিসাবে সাইদুর রহমান পিছিয়ে বাঙালি মুসলিমের অগ্রগতির কথা সর্বাগ্রে উচ্চারণ করতেন। মুসলমানের সমাজের উন্নতি ও প্রগতির অন্তরায় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> মুসলমানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুসন্ধিৎসাকে আত্মস্থ করেনি, অন্তরের সুপ্ত জীবন জিজ্ঞাসা জাগতে দেয়নি। ফলে তারা পরিণত হয়েছে দৃষ্টিহীন, যুক্তিহীন প্রতিক্রিয়াশীলে। পৃথিবীর দেশে দেশে তারা আজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দারিদ্র্য-পীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত, আত্মকলহে লিপ্ত, উন্নতি-বিমুখ, আলস্যপরায়ণ, সম্ভাবনাহীন জাতিতে। তারা আজো ইহলোকের উন্নতির প্রশ্নকে গৌণ বিবেচনা করে এবং পরলোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় বিভোর থাকে। তারা বিজ্ঞান চর্চায় বিমুখ, আধুনিক দর্শনের অধ্যয়নে অনীহ এবং পরিবেশের ও সমাজের পরিবর্তন ও প্রগতি সাধনে নিশ্চেষ্ট। তারা হয়ে আছে অদৃষ্টবাদী এবং ভুলে আছে কোরানের এই শিক্ষাটিও যে, যতক্ষণ না মানুষ নিজেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট ও তৎপর হয়, ততক্ষণ আল্লাহ কারো অবস্থা পরিবর্তন করে দেননা। যে দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রগতিশীল, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হতে পারে, সে-দিকে মুসলমান দৃষ্টিপাতই করেনা। এ সত্য জীবন ধরে নানা সময়ে নানাভাবে উপলব্ধি করেছি, মর্মে মর্মে অনুভব করেছি।[৮৩]

বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রগতির ছোঁয়া লাগেনি। বিজ্ঞান চেতনার এখানে প্রসার ঘটেনি। তুক-তাক-তাবিজ-কবজ-কবরে বাঙালি মুসলমানের আস্থা অনেক। ধর্মের মর্ম কথার চেয়ে তাদের কাছে আচার-আনুষ্ঠানিকতা অনেক বড়। সাইদুর রহমান বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কথা বলেছেন। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস নির্ভর হওয়ায় বাঙালি মুসলমান সমাজ এগুতে পারছে না। বাঙালি মুসলমান সমাজে বিজ্ঞান নির্ভর জ্ঞানের প্রসার ঘটেনি। এ-সম্পর্কে সাইদুর রহমান লিখেছেন,

> বহুদিন ধরে উপলব্ধি করছি যে, বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল সংস্কার এবং সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রয়োজন; আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন এবং জগতের প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে সংহতি স্থাপন করে বাঙালি মুসলমানের আজ অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থার অন্বয় স্থাপন করতে হবে। এটা করতে পারলে এ জাতি উন্নত ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে অবশ্যই সক্ষম হবে। অন্যথায় দুর্দশা, দারিদ্র্য, বিপর্যয়, পরনির্ভরতা, আত্মকলহ, অস্বাস্থ্য ও অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় আছে বলে ভাবতে পারিনা।[৮৪]

সাইদুর রহমান বাঙালি মুসলমান হয়েও অন্ধভাবে আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর ধর্মকে মেনে নেননি। বিচার-বিশ্লেষণ ও যৌক্তিকভাবে তিনি ধর্মকে গ্রহণ করেছেন। প্রদীপ রায় সাইদুর রহমানের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, “একজন স্বাধীন, মুক্তমনের অধিকারী ও কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হয়েও সাইদুর রহমান ধর্মের প্রতি

---

[৮২] Syedur Rahaman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Mullick Brothers, Dhaka, 4th Edition, 1970.

[৮৩] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ, ৫৭, ৫৮

[৮৪] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, পৃ. ১৭৩

ছিলেন পরিপূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল। তবে তিনি ধর্মের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, প্রথাবদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোকে তিনি ধর্মকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।”[৮৫]

শিক্ষাচিন্তা

সাইদুর রহমান শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। শিক্ষাচিন্তা নিয়ে সাইদুর রহমান আলাদাভাবে কোন গ্রন্থ, প্রবন্ধ লিখেননি। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও শিক্ষা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিক্ষাচিন্তা পাওয়া যায়। এগুলোর সমন্বিত রূপই তাঁর শিক্ষাচিন্তা হিসাবে বিবেচিত হবে।

সাইদুর রহমানের কর্মজীবনের শুরু রাজশাহী কলেজ থেকে। রাজশাহী কলেজে তিনি বাঙালি মুসমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বাস্তবমুখী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখন শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। আর্থিক অনটনও ছিল। মুসলিম ঘরের ছেলেরা শহরে পড়তে আসলেও অর্থাভাবে অনেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারেনি। সাইদুর রহমান এসব শিক্ষার্থীকে লজিং ঠিক করে দিয়ে এমন কি কখনো কখনো বিয়ে দিয়ে শ্বশুরের টাকায় পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> রাজশাহী কলেজে ছাত্রদের সুবিধার জন্য সব রকম সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। কোনো ছাত্রের জন্য জায়গীর থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া, পড়াশোনার খরচ চালাতে পারে সে জন্য বিয়ে পর্যন্ত ঠিক করা, কারো জন্য আবার স্টাইপেন্ড, যেভাবে পেরেছি তাদের সাহায্য করেছি। পড়াশোনার ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে ছিল। তাই তখন মুসলমান ছাত্রদের সাহায্য করাটাকে জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলাম।[৮৬]

রাজশাহী কলেজ থেকে সাইদুর রহমান বদলি হয়ে যান কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তিনি বেকার হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। দুর্ভিক্ষাবস্থাতেও তিনি হোস্টেলে ছাত্রদের উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় হোস্টেলের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বাংলার শিক্ষামন্ত্রী তমিজউদ্দিন আহমদের কাছে গেলে জনাব মন্ত্রী ছাত্রদের আলু সিদ্ধ করে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ব্যর্থ হয়ে খাদ্যমন্ত্রী সোহরাওয়াদীর সঙ্গে দেখা করে তিনি ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত চালের ব্যবস্থা করেন। সোহরাওয়ার্দী সিভিল সাপ্লাই থেকে হোস্টেলের ছাত্রদের

---

[৮৫] প্রদীপ রায়, ‘‘সাইদুর রহমান’’, *উপমহাদেশীয় দর্শন: বিশ শতকীয় প্রয়াস*, আ. ফ. ম উবায়দুর রহমান (সম্পাদিত), পৃ. ৯২
[৮৬] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, পৃ. ২১

জন্য নিয়মিত চাল সংগ্রহ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৮৭] ছাত্রদের কল্যাণে স্টুডেন্ট ব্যাংক চালু করেছিলেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বেকার হোস্টেলের ছাত্রদের ভালোর জন্য একটি *স্টুডেন্ট ব্যাংক*-ও চালু করেছিলাম। সেখানে অভিভাবকরা এসে তাদের ছেলে বা ছাত্রদের জন্য টাকা-পয়সা জমা রেখে যেতেন। ছাত্ররা প্রয়োজন বোধে সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতিক্রমে টাকা উঠিয়ে খরচ করতে পারতো।"[৮৮]

দেশ ভাগের পর ঢাকায় সাইদুর রহমানকে শিক্ষা বিভাগের স্পেশাল অফিসার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "শিক্ষা বিভাগের স্পেশাল অফিসার হিসেবে ঢাকায় চলে আসার পর আমার ওপর তিনটি দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্বগুলো হলো - উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের খসড়া আইন তৈরি, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্রদের আবাসিক ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক পুনর্বাসন।"[৮৯] উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জন্য সাইদুর রহমানের সুপারিশ তৎকালীন পাকিস্তানের শাসক শ্রেণির মনঃপূত হয়নি। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে এনে অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে সাইদুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব লাভের পর বর্তমান ঢাকা বোর্ড অফিসের পূর্বদিকে কয়েকটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। সেগুলো ছাত্রদের হোস্টেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ছাত্রদের থাকার জন্য সেমি-পার্মানেন্ট শেড নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।"[৯০]

দেশ ভাগের পর সাইদুর রহমানের সবচেয়ে বড় অবদান হলো দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রাখা। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কটে অচল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কারণ সে সময় স্কুল, কলেজ এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষক ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তারা প্রায় সবাই ঢাকা ত্যাগ করে প্রতিবেশি দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সাইদুর রহমান এ সময় স্কুল-কলেজগুলোকে সচল রাখার জন্য কাজ করেন। সাইদুর রহমানের সঙ্গে কংগ্রেস নেতা ভবেশচন্দ্র নন্দী এবং লীলা রায় মেয়েদের স্কুলগুলো সচল রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

ডিপিআই অফিসে অরফানেজ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালনের সময় সাইদুর রহমান দেশের এতিমখানাগুলো পরিচালনা ও সংস্কারের দায়িত্ব অর্জন করেন। এতিমখানাগুলোর পরিচালনা কমিটিতে সাধারণত দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই থাকতেন। এসব ব্যক্তিদের সন্তানেরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও

---

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮
[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
[৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

এতিমখানাগুলোতে তথাকথিত ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল।[৯১] সাইদুর রহমান এতিমখানার ছেলেদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তখনকার সময়ে এতিমখানাগুলোতে ইসলামি শিক্ষার নামে কি পড়ানো হয় তার বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন,

> সে সময় এতিমখানাগুলোতে তথাকথিত ইসলামি শিক্ষা যে কি জিনিস ছিল তার একটা নমুনা দিচ্ছি। নোয়াখালির এক এতিমখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম আমার আগমন উপলক্ষে ছয়টি তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। ছেলেরা আমাকে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পড়ে শোনালো। সবাই বাঙালি, কৌতূহলবশত ওদের মুখে একটি বাংলা কবিতার আবৃত্তি শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাদের কেউ-ই একটি বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতে সক্ষম হয়নি।[৯২]

এতিমখানার অনাথ ছেলে-মেয়েরা পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। যেমন টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমের পরিচালিকা প্রতিমা মুৎসুদ্দী ছিলেন প্রবর্তক সংঘের একজন অনাথ ছাত্রী।[৯৩] প্রতিমা মুৎসুদ্দীর মত অন্যরাও সুযোগ-সুবিধা পেলে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন। সাইদুর রহমান চট্টগ্রামের প্রবর্তক সংঘে হিন্দু অনাথ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সঙ্গে মুসলিম অনাথ ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। প্রবর্তক সংঘে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি কর্মমুখী ব্যবহারিক জ্ঞানও অর্জন করতো।

শিক্ষা বিভাগের চট্টগ্রামের বিভাগীয় ইন্সপেক্টর হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় সাইদুর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের জন্য তিনি একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। সাইদুর রহমান লিখেছেন, “তাদের মাঝে একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলাম। যাতে করে তারা আধুনিক শিক্ষা সংস্পর্শে আসার এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।”[৯৪] বিভাগীয় ইন্সপেক্টর পদে সাইদুর রহমানের নিয়োগের সময় ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী বিরোধিতা করেছিল তারাই আবার বদলির সময়ও বিরোধিতা করেছিল। কারণ সাইদুর রহমান বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি তাঁদের শত্রু নন। শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে তিনি তাদের কল্যাণই চান।

সাইদুর রহমান নারী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সমাজের অর্ধেক নারী। সমাজ উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষা অপরিহার্য। মেয়েদের স্কুল স্বল্পতার জন্য তিনি কো-এডুকেশনের উপর গুরুত্বারোপ করতেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

---

[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

> চট্টগ্রামে বিভাগীয় ইন্সপেক্টর থাকার সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের পড়াশোনা বা কো-এডুকেশনের প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছিলাম। কেননা নারীকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু তখন গ্রামে মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে স্কুল করা নানান দিক থেকে বেশ অসুবিধার ছিল। তাই নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যে স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা বেশি ছিল তাদেরকে বেশি গ্রান্ট বা সাহায্য দিতাম। এ কারণে অনেক সময় অনেক স্কুলে আমার ইন্সপেকশনের সময় দেখা গেছে, ঘরের মেয়েদের এবং অল্প বয়সের বউদের স্কুলে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তবে এর ফলে ঘরের মেয়েরা কুসংস্কার ভেঙে বাড়ির বাইরে আসার সুযোগ পেতো।[৯৫]

জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি এই কলেজের আধুনিকায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। জগন্নাথ কলেজের দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি সান্ধ্যকালীন বি এস সি কোর্স চালু করেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার পেয়েই রাতের বেলায় ছাত্রদের বি এস সি পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। ফলে সারা দেশে স্কুলগুলোর জন্য বি এস সি শিক্ষকের যে চাহিদা ছিল, দুই বছরের মধ্যে তা বেশ পূরণ হয়েছিল।"[৯৬] দেশ ভাগের পর স্কুলের বি এস সি শিক্ষকরা প্রায় সকলেই নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ফলে স্কুলগুলোতে বিজ্ঞানের শিক্ষকের অভাবে বিজ্ঞান পড়ানো বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। তাছাড়া জগন্নাথ কলেজে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী থাকলেও বিজ্ঞানের আসন ছিল মাত্র ৩০ জনের। সাইদুর রহমান জগন্নাথ কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হেলথ কার্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহশিক্ষা ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনও তিনি করেছিলেন জগন্নাথ কলেজে। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমার সময়ে জগন্নাথ কলেজে পুনরায় সহশিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। বৃটিশ আমলে ড. শৈলেন ভট্টাচার্যের সময়ে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে তা বন্ধ হয়ে যায়। কলেজে এসেই এই রক্ষণশীল প্রতিবন্ধকতা অপসারণের উদ্যোগ নিই।"[৯৭] জগন্নাথ কলেজে দুই শিফটে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও সাইদুর রহমানের সময় শুরু হয়েছিল। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> সে সময়ে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটার ফলে দিন দিন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলেও সে তুলনায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল খুবই কম। কারণ দেশে কলেজের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প। অন্যদিকে নতুন কলেজ নির্মাণের ব্যাপারটাও ছিল ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য জগন্নাথ কলেজে দুই শিফটে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হলো। এর ফলে অধিক সংখ্যক ছাত্রই শুধু কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল না, সেই সঙ্গে যে সকল মেধাবী ছাত্র অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অক্ষম তারাও আবার কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। এরা সাধারণত নাইট শিফটের ছাত্র। দিনে অফিসে কাজ করে, সন্ধ্যায় কলেজে এসে ক্লাস করতো। দুই শিফটের

[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮, ৮৯
[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
[৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

> ব্যবস্থা করার ফলে দেখা গেল, রাতারাতি কলেজের ছাত্র সংখ্যা ১২ হাজারে পৌঁছে গেছে। নাইট শিফটের ছাত্রদের রেজাল্ট অপেক্ষাকৃত ভাল।[৯৮]

তেজগাঁও মহিলা কলেজের তিনি ছিলেন অবৈতনিক অধ্যক্ষ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সাইদুর রহমানের মতে, নারী শিক্ষা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি নারী শিক্ষার জন্য কাজ করেছেন। নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে।

সাইদুর রহমান সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণের কথা বলতেন। তিনি জাতীয়করণ নীতির পক্ষের লোক ছিলেন। কিন্তু আমাদের মানসিকতা জাতীয়করণ নীতির পরিপন্থি। জাতীয়করণ নীতির পদ্ধতির মধ্যে নয়, আমাদের মানসিকতার ত্রুটির জন্যই জাতীয়করণ নীতি সফল হয়নি। মানবকল্যাণের মানসিকতা সৃষ্টির জন্য আমাদের পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মানবকল্যাণের মানসিকতা আপনা-আপনি বা আকস্মিকভাবে গড়ে উঠবে না। সে লক্ষ্যে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান তাতে এরূপ প্রত্যাশিত মানসিকতা তৈরি করা কষ্টকর। সে কারণেই আমাদের পাঠ্যসূচিকে পরিবর্তন করতে হবে।"[৯৯] মানবকল্যাণের জন্য সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণের জন্য ইহলৌকিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। সাইদুর রহমান পরকালের শান্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইহলোকে মানুষের কল্যাণ।

নারীবাদ

দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা নারীবাদ। দর্শনের ইতিহাসের মত নারীবাদের ইতিহাসও প্রাচীন। পিথাগোরীয় দর্শনে নারীবাদ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। পিথাগোরীয়রা নারী-পুরুষ উভয়কে সমভাবে বিচার করেছে ফলে তাদের সমাজে নারী সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১০০] *রিপাবলিক* গ্রন্থে প্লেটো নারী-পুরুষের সমতার বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিকযুগে নারীবাদের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা বিস্তার লাভ করেছে। পরিবেশ নারীবাদ, পোস্ট হিউম্যান ফ্যামিনিজম নামে নারীবাদের নতুন নতুন চিন্তাধারা নারীবাদকে সমৃদ্ধ করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়েও নারীবাদ নিয়ে বর্তমানে চর্চা হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি মুসলিম দার্শনিক সাইদুর রহমানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও লেখার মধ্যে নারীবাদী চিন্তার ছাপ

---

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬, ৯৭
[৯৯] সাইদুর রহমান, *কল্যাণ দর্শন*, পৃ, ১১
[১০০] রাশিদা আখতার খানম, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনমুদ্রণ ২০১১, পৃ. ১৪

স্পষ্ট। তিনি নারীবাদ নিয়ে আলাদা কোন গ্রন্থ, প্রবন্ধ রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। নারী শিক্ষা এবং নারীর শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে সাইদুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর নারীবাদ হিসাবে বিবেচিত হবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং জীবনে তা অনুসরণ করেছেন। তাঁর মামা তাঁকে মুসলিম শিক্ষিত মেয়ে বিয়ের জন্য পাওয়া না গেলে ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে সাইদুর রহমান লিখেছেন, "মামা ছিলেন আমার দেখা তখনকার প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন মুসলমান ব্যক্তিদের একজন। সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলেই তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, মুসলমান সমাজে যদি উপযুক্ত মেয়ে না পাই, তাহলে আমি যেন একজন রুচি সম্পন্ন কোনো ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করি।"[১০১] সাইদুর রহমান মুসলিম শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীর আধুনিকতা এবং রুচির বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, "বিয়ের পর রাজশাহীর উদ্দেশ্যে আমার স্ত্রীকে বোরখা পরিয়ে বগুড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দেয়া হয়েছিল। বাইরে বোরখা পরে বেড়ানোটা তখন মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের একটি নিয়ম ছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী, ট্রেন ছাড়ার পর প্রথম স্টেশন পার হতে না হতেই গাড়ির দরোজা দিয়ে বোরখাটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।"[১০২] তিনি আর কখনো বোরখা পরেন নাই। সাইদুর রহমানের সমর্থন না থাকলে বোরখা ট্রেনের দরজা দিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল না। শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে সামাজিকভাবে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> বাড়িতে যাওয়ার দুই দিন পর আমার স্ত্রী তার দেবরকে বললো, মনটা ভালো লাগছে না, একটা হারমোনিয়াম এনে দাও, গান-টান গেয়ে সময় কাটানো যাবে। সে সময় আমাদের এলাকায় দশ মাইলের মধ্যে কোনো মুসলমান বাড়িতে হারমোনিয়াম ছিল না। তবে হারমোনিয়ামের জন্য কোনো দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়নি। আমাদের গ্রাম রসুল্লাবাদে হিন্দুদের নিবাস ছিল। কৈবর্ত বাড়ি এবং নাথ বাড়িতে হারমোনিয়াম পাওয়া গেল। আমার বউ গান গাইবে, এ কথা শুনে তারা কেবল তিনটা হারমোনিয়ামই নয়, সে সঙ্গে পাঠিয়েছিল প্রচুর মুড়ি, নাড়ু ও সন্দেশ। আমার স্ত্রী বাড়ির উঠোনে বসে মাত্র কয়েকটি গান গেয়েছিল। পরের দিন গ্রামের বাজারে গিয়ে দেখলাম, ঘটনাটা কারো কানে যেতে বাকি নেই। কোনো ভদ্র মুসলমান ঘরের মেয়ে গান গাইতে জানে, এটা তারা চিন্তাই করতে পারছিল না। তাই কেউ কেউ আমাকে শুনিয়ে বললো, *প্রফেসর সাহেব একটা বাঈজী বিয়া কইরা আনছে।*[১০৩]

বাঙালি মুসলিম সমাজে জন্মশাসন সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। ফলে শিক্ষিত বাঙালি চাকুরে মুসলিমদের মধ্যেও ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বেশি থাকায় সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো। সাইদুর রহমনের ১৯৩৪ সালের ১১ নভেম্বর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। পরের বছর আরেকটি সন্তানের জন্ম। বছর না ঘুরতে আরো

---

[১০১] সাইদুর রহমান, *শতাব্দীর স্মৃতি*, পৃ. ৪১

[১০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

একটির জন্ম । ১৯৪১ সালে তাঁর আরো একটি সন্তানের জন্ম হয়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “এতে শুধু স্ত্রীর স্বাস্থ্যই না, পরিবারের আর্থিক দিকটাও আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি সরকারি কলেজের লেকচারার, শ'দুয়েক টাকার মতো বেতন। ছোট চাকরিই বলা যায়। এতে চারটি ছেলের উপযুক্ত ভরণ-পোষণে টানাটানি পড়াই স্বাভাবিক।”[১০৪]

ছোট এবং সুন্দর পরিবার গঠনের ধারণা সাইদুর রহমান পেয়েছিলেন ইংরেজ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের অধ্যাপকদের কাছে থেকে। ইংরেজ এবং হিন্দু অধ্যাপকদের পরিবার ছিল ছোট। তারা সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতো। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> ইংরেজ ও হিন্দু অধ্যাপকেরা কতো সুন্দরভাবে জীবন যাপন করছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকের স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো, পরিবারও স্বচ্ছল। ছেলেমেয়েদের জন্য তারা যে ধরনের পোশাক-আশাক কিনতো তা আমার পক্ষে কেনা প্রায় অসম্ভব। তাদের প্রত্যেকের পরিবারই ছিল ছোট এবং খরচও কম। আমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জাগলো, ওদের কেন বেশি সন্তান হয় না? এই কৌতূহল বেড়ে উঠলো দিন দিন। সন্তান না হওয়ার যাবতীয় তথ্য-তত্ত্ব জানার জন্য হিন্দু অধ্যাপকদের সঙ্গে বেশি করে মেলামেশা করতে শুরু করলাম।[১০৫]

ইংরেজ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে মেলামেশার সঙ্গে সঙ্গে সাইদুর রহমান জন্মশাসন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার অর্জিত ধারণার সবকিছুই স্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু আগে একবার ডিঅ্যান্ডসি অপারেশন হয়ে যাওয়ায় তাকে লাইগেশন করানোতে অসুবিধা ছিল। ভ্যাসেকটমি -তে আমার নিজের কোনো আপত্তি না থাকলেও কিছুটা সঙ্কোচ ও ভয় ছিল। কিন্তু আমার স্ত্রীর পরামর্শে ও চাপে বাধ্য হয়েই পা বাড়ালাম।”[১০৬] সাইদুর রহমানের সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ বাঙালি মুসলিম সমাজে সম্মানজনক ছিল না। তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলে তাকে হলফনামায় ঘোষণা দিতে হতো। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> তখন জন্মনিয়ন্ত্রণ এতোটা আইনসিদ্ধ ছিল না। তাই সামাজিক কারণে কড়া গোপনীয়তাও বজায় রাখা হতো। তবে আমাকে একটি হলফনামায় সই দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে, স্ত্রী ছাড়া জীবনে অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করবো না। ভ্যাসেকটমির পর কোন নারীর সঙ্গে দৈহিক মিলন ঘটলে ওই নারীর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বলে সমাজে ব্যভিচার বেড়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তখন এভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করানো হতো।[১০৭]

---

[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪, ৪৫
[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

সাইদুর রহমানকে দেখে তখন অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তবে তা অত্যন্ত গোপনভাবে। গোপনীয়তা বজায় না থাকলে শুধু সামাজিকভাবে নয় শারীরিকভাবেও লাঞ্ছনার আশঙ্কা ছিল। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "তখন চলছে যার যতো সন্তান তার ততো গর্ব করার মানসিকতা। তছাড়া মুসলমান সমাজও ছিল জন্ম নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী। গোপনীয়তা বজায় না রাখলে শুধু পাগল আখ্যাই জুটতো না, শারীরিকভাবে নাজেহাল হওয়ার আশঙ্কা ছিল ষোল আনা।"[১০৮]

পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের দায় নারীর উপর চাপানো হয়। নারী জন্মশাসন পদ্ধতি গ্রহণ করলে তার শারীরিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পুরুষের কোন সমস্যা নেই। সাইদুর রহমান নারীর উপর জন্মনিয়ন্ত্রণের দায় চাপিয়ে নিজে মুক্ত হতে চাননি। নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে তিনি লিখেছেন,

> মেয়েদের লাইগেশন আর পুরুষদের ভ্যাসেকটমি জন্মনিয়ন্ত্রণের মোক্ষম পদ্ধতি হলেও দুটির মধ্যে বেশ পার্থক্যও আছে। লাইগেশন সেমি-মেজর অপারেশন, অন্যদিকে ভ্যাসেকটমি খুবই মাইনর অপারেশন, একে অপারেশন বলে গণ্য না করলেও চলে। লাইগেশন করাতে গিয়ে অনেক সময় মেয়েদের জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে হয়। লাইগেশনের পর মোটা হয়ে পড়া ছাড়াও অন্যান্য শারীরিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে মেয়েদের। অন্যদিকে ভ্যাসেকটমিতে পুরুষদের শারীরিক কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা উপসর্গ দেখা দেয় না। এতে পুরুষের পৌরুষত্বেরও কোনো হেরফের হয় না। অথচ আমাদের পুরুষরা নিতান্তই স্বার্থপর। নিজেরা সামান্য ভ্যাসেকটমির দিকে না গিয়ে স্ত্রীদেরই লাইগেশনের দিকে ঠেলে দেয়। দারুণভাবে পুরুষ শাসিত সমাজ বলেই এমনটি ঘটছে নাকি?[১০৯]

সাইদুর রহমান সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর কল্যাণ দর্শনের লক্ষ্যও সমতাভিত্তিক সমাজ। সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণের জন্য নারী-পুরুষের সমান অধিকার সবার আগে সমর্থনযোগ্য। তিনি নারীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে ক্ষমতায়তন করতে চেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নারী-পুরুষের সক্ষমতা সমান। সমাজ উন্নয়নে নারী-পুরুষ সমান ভূমিকা রাখতে পারে। সাইদুর রহমান নারী-পুরুষের সমান অধিকার শুধু বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলন করেছেন। এ-জন্য তাঁর নারীবাদকে ব্যবহারিক নারীবাদ হিসাবে অখ্যায়িত করা যায়।

---

[১০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[১০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

উপসংহার

সাইদুর রহমান তাঁর দর্শনের নাম দিয়েছিলেন কল্যাণ দর্শন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য দর্শন চর্চা করেছেন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় কল্যাণভিত্তিক সমাজ নির্মাণের কথা উঠে এসেছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে তিনি সংশয়বাদ গ্রহণ করেছেন সত্যকে জানার জন্য। কিন্তু সংশয়কে তিনি চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করেননি। সংশয় তাঁর পদ্ধতি। তিনি বিজ্ঞান নির্ভর জ্ঞানের কথা বলেছেন। বিজ্ঞানের জ্ঞান সংশয় দিয়ে শুরু। সংশয় না থাকলে কোনো বিষয়ের জ্ঞান হয় না। সাইদুর রহমানের অধিবিদ্যা আলোচনাতেও দেখা যায় তিনি অধিবিদ্যক বিষয়গুলো নিয়ে আপাত দৃষ্টিতে সংশয় করেছেন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে অধিবিদ্যক বিষয়গুলো বর্জন করতে সক্ষম হন নাই। সমাজের কল্যাণের জন্য অধিবিদ্যক বিষয়গুলোতেও কিছুটা আস্থা রেখেছেন। তাঁর মূল্যবিদ্যার আলোচনায় দেখা যায় তিনি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাইদুর রহমানের ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায় তিনি ধর্মকে বর্জন করেন নি। ধর্মের আচার অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন। ধর্মের মধ্যে পরকালের ধারণাকেও বর্জন করেছেন। ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান এবং পরকাল না প্রচলিত ধর্ম আর ধর্ম থাকে না। সাইদুর রহমান শিক্ষা এবং নারীস্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি নারী মুক্তি চেয়েছেন। কল্যাণদর্শন প্রতিষ্ঠার জন্যই শিক্ষিত নারী দরকার। সমাজের অর্ধেক নারী। সমাজের অর্ধেক অন্ধকারে রেখে কল্যাণভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করা যাবে না। কল্যাণভিত্তিক সমাজ নির্মাণের জন্যই সত্যকে জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি সমর্থন করেছেন। এ সবকিছুর মূলেই রয়েছে তাঁর কল্যাণদর্শন। এই কল্যাণ মানুষের কল্যাণ।

সাইদুর রহমানের জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তিনি যুক্তি বুদ্ধি এবং বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁর কল্যাণদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধর্মভিত্তিক ভাববাদকে সম্পণূরূপে বর্জন করতে পারেন নি। আবার ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণও করেতে পারেন নি। তিনি ধর্মভিত্তিক ভাববাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদ সমন্বয় করে সমন্বয়বাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর কল্যাণ দর্শনের মূল ভিত্তিও হলো সমন্বয়বাদ।

আহমদ শরীফ

জীবন ও কর্ম

বাংলাদেশের বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি মুসলিম দার্শনিক আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)। তিনি পয়লা ফাল্গুনে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুবরণও করেছেন ফাল্গুন মাসে। পেশায় তিনি ছিলেন শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তিনি চৌত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেছেন। ক্লাস রুমের বাইরে, "সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে আর সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রে লিখে নিজের অজান্তেই তিনি জাতির শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছেন।"[১] শিক্ষক লাউঞ্জে, বাংলা বিভাগে, আর্মানিটোলার বাসায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসের ১৮ কিংবা ৩৭ নম্বর বিল্ডিংয়ে, ইস্কাটনে, ধানমণ্ডিতে সর্বত্রই তাঁর বাসায় নিয়মিত সাপ্তাহিক আড্ডা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে, বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার বিখ্যাত গুঁড়িতে, শেষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁকে মধ্যমণি করে একই সঙ্গে প্রবীণ ও তরুণদের আড্ডা বসেছে।[২] এসব আড্ডায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আসতো এবং তাদের চিন্তা চেতনার বিনিময় হতো। "আড্ডায় রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে পণ্ডিতি আলোচনা হত। অনেক সময় তিনিই ছিলেন প্রধান বক্তা।"[৩] আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখেছেন, "আমাদের জাতীয় জীবনে এই আড্ডারও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।"[৪] আড্ডায় আহমদ শরীফকে দেখেছি তরুণদের তিনি বেশি পছন্দ করতেন।[৫] স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী তরুণদের আগমন ছিল নিত্য। তিনি ছিলেন তারুণ্যের পক্ষে।

আহমদ শরীফের শিক্ষকতা জীবনের বর্ণনা দিয়ে অজয় রায় লিখেছেন, "শিক্ষকতা করতে তিনি আনন্দবোধ করতেন। কেবল গতানুগতিক বিষয়বস্তুতে নিজেকে বেঁধে না রেখে, তিনি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন, রাজনীতিক, কৃষ্টিমূলক, সাংস্কৃতিক। কিন্তু এসবই ছিল তাঁর ধারণা নিঃসৃত মুক্তবুদ্ধির চর্চার ঐকান্তিক আগ্রহে।"[৬] শিক্ষার্থীদের তিনি ভালবাসতেন। "ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপক আহমদ শরীফ কোন কৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে তোলেননি। অনেক ছাত্রের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং কোন কারণে

---

[১] আবুল কাসেম ফজলুল হক, ''অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব'', *স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ সংকলিত আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ*, আবুল কাসেম ফজলুল হক, (সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি), মুস্তফা মজিদ ও আফজালুল বাসার (সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৭১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

[৩] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ''অধ্যাপক আহমদ শরীফ : শিক্ষক ও গবেষক'', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

[৪] আবুল কাসেম ফজলুল হক, ''অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব'', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

[৫] আহমদ শরীফের ধানমণ্ডির বাসায় শুক্রবার সকালের আড্ডায় আমার থাকার সুযোগ হয়েছে। প্রায় নিয়মিত আমি শুক্রবার সকালের আড্ডায় যোগদান করেছি। সেখানে দেখেছি স্যার ছিলেন তরুণদের পক্ষের মানুষ।

[৬] অজয় রায়, ''অধ্যাপক আহমদ শরীফ : জীবন ও সাধনা'', *স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ সংকলিত আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ*, পৃ. ১৬৩

বিরক্ত হলে তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করতেন।”[৭] বিরুদ্ধবাদী শিক্ষার্থীদের তিনি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াননি। বিরুদ্ধমতকে তিনি সম্মান করতেন, যুক্তি দিয়ে খণ্ডনের চেষ্টা করতেন।

আহমদ শরীফের শিক্ষা জীবন শুরু হয় মাদ্রাসায়। যদিও শরীফের হাতেখড়ি হয়েছিল চট্টগ্রামের আলকরণ মিউনিসিপাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কিন্তু তিনি সোবহানিয়া মাদ্রাসায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করে ১৯৩১ সালে পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং এই স্কুল থেকে ১৯৩৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শৈশবে আহমদ শরীফকে পারিবারিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয়েছে। তিনি কোরান পড়েছেন, আরবি শিখেছেন, নামাজ পড়েছেন। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। পরিণত বয়সে তিনি যুক্তি-বুদ্ধি এবং বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সত্যের সন্ধান করেছেন। ফলে পারিবারিক শিক্ষা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিশ্বাস শিথিল হয়ে যায়। নিজের শিক্ষা জীবন সম্পর্কে প্রথমা রায় মণ্ডলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “আমি চিরকালই উঁচুমানের মাঝারি ছাত্র। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে (১৯৩৮) এবং অবশিষ্ট, বাদবাকীগুলোতে বিরতিহীনভাবে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। কাজেই কৃতীছাত্রের দাবিদার হওয়ার কোন যোগ্যতা আমার ছিলনা এবং অন্য কোন ক্ষেত্রেও আমি কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারিনি।”[৮]

চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আই.এ এবং ননডিস্টিংশন নিয়ে ১৯৪২ সালে তিনি বি. এ পাশ করেন। আহমদ শরীফ ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম. এ পাশ করেন দ্বিতীয় শ্রেণিতে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে তাঁর স্থান ছিল চতুর্থ। আহমদ শরীফের সঙ্গে এম. এ শ্রেণিতে উমা মজুমদার এবং শান্তিলতা চক্রবর্তী নামে দুইজন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণি পেয়েছিলেন।

এম. এ পাশ করার পর আহমদ শরীফ দুর্নীতি দমন বিভাগে ‘প্রিভেনটিভ অফিসার’ হিসাবে চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন লাকসামের পশ্চিমগাঁও নওয়াব ফয়জুন্নেসা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। ফেনী ডিগ্রি কলেজেও তিনি কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন। কলেজের অধ্যাপনায় অব্যাহতি দিয়ে ১৯৪৯ সালে রেডিও পাকিস্তানের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে (কর্মসূচি নিয়ামক) ঢাকা কেন্দ্রে যোগদান করেন। আহমদ শরীফ রেডিও পাকিস্তানের চাকরি থেকে পদত্যাগ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণা সহকারী পদে যোগদান করেন ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে। তখন বাংলা বিভাগে গবেষণা সহকারী বলে কোন পদ ছিল না। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অনেক পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। এসব পুঁথি পাঠ, সংঙ্কলন এবং সংরক্ষণের জন্য বাংলা বিভাগে গবেষণা

---

[৭] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ‘‘অধ্যাপক আহমদ শরীফ : শিক্ষক ও গবেষক’’, *স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ সংকলিত আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ* , পৃ. ২০৮

[৮] আহমদ শরীফ, *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৮২, (আহমদ শরীফের এই সাক্ষাৎকারটি প্রথমা রায় মণ্ডল নিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারটি উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘‘কবিতীর্থ’’ - ২৫তম সংখ্যা, একাদশ বর্ষ, জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম। পরে এই সাক্ষাৎকারটি আহমদ শরীফের *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

সহকারী পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। আহমদ শরীফ পুঁথি পাঠের কৌশল শিখেছিলেন পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছ থেকে। ১৯৫২ সালে তিনি বাংলা বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এক বছর শিক্ষকতা করার পর তাঁকে অস্থায়ী গবেষণা সহকারী পদে পদাবনতি করা হয়। ১৯৫৭ সালে তিনি আবার অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগ পান এবং ১৯৬০ সালে তাঁর পদটি স্থায়ী হয়। *সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলি ও তাঁর যুগ*-এর উপর অভিসন্দর্ভ রচনার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় থেকে ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে আহমদ শরীফ পি-এইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কলা অনুষদের নির্বাচিত ডিন এবং সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপর আহমদ শরীফের মৌলিক গবেষণাকর্ম বাংলা ভাষা-ভাষীর সীমা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে সমাদৃত। তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তুলে এনেছেন আধুনিক কালের বাঙালিদের কাছে।

> মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণা আহমদ শরীফের চিন্তা-চেতনা বিকাশে খুব ইতিবাচক ফল দিয়েছিল। এই গবেষণা দেশ, জাতি, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ধারণাকে আরো স্বচ্ছ ও প্রীতিময় করে, বাঙালি জাতি সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিচার-বিশ্লষণে জানার ও বোঝার পথ করে দেয় এবং বাঙালির জাতিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিজ্ঞান সৃষ্টি করে।[৯]

ছাত্রজীবন থেকেই আহমদ শরীফের লেখালেখি শুরু। চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় 'ভাষা বিভ্রাট' নামে কলেজ বার্ষিকীকে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দৈনিক আজাদে 'সুনীতিবাবু ও মুসলমান' নামে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। ফজলুল হক হল ম্যাগাজিনে 'মুসলমানের সাহিত্য সাধনার অন্তরায়' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। এসময় সময় তিনি মাসিক *মোহাম্মদী*, *দৈনিক আজাদ*, মাসিক *দিলরুবা* ইত্যাদি কাগজে কয়েকটি গল্প লিখেছেন। ১৯৫২ সালে দৈনিক *অবজার্ভারে* তাঁর প্রথম ইংরেজি ভাষায় লিখিত Poet Quazi Daulat প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। *ইনসাফ*, *মিল্লাত*, *ইত্তেহাদ*, *পূর্বদেশ*, *গণকণ্ঠ*, *সোনার বাংলা*, *সওগাত*, *পূবালী*, *স্পন্দন*, *আলাপনী*, ইত্যাদি কাগজে তিনি লিখেছেন।

আহমদ শরীফের প্রথম প্রবন্ধের গ্রন্থ *বিচিত চিন্তা* ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, *স্বদেশ অন্বেষা*, *জীবনে সমাজে সাহিত্যে* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলো প্রকাশের পর প্রাবন্ধিক হিসাবে আহমদ শরীফের খ্যাতি বাড়ে। আহমদ শরীফের *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ।[১০] *বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তনধারা*, *বাঙলা*, *বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*, *সময় সমাজ ও মানুষ*, *বিশ শতকে বাঙালী*, *বিহগদৃষ্টিতে তাদের রূপ-*

[৯] আহমদ কবির, *আহমদ শরীফ*, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৮
[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

স্বরূপ ইত্যাদি আহমদ শরীফের মৌলিক গ্রন্থ। তাঁর কোন গ্রন্থই কোনটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর অপ্রকাশিত ডায়েরি, *ভাব-বুদ্বুদ* প্রকাশিত হয়েছে। "ড. আহমদ শরীফ নিজেই তাঁর দিনলিপি 'ভাব-বুদ্বুদ' নামে প্রকাশ করতে বলেছেন।"[১১] ড. নেহাল করিম, আহমদ শরীফের *অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ* গ্রন্থের প্রসঙ্গকথায় লিখেছেন, "নিজস্ব দর্শন, চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বোদ্ধা সমাজের কাছে ছিলেন বহুল আলোচিত, সমালোচিত ও বিতর্কিত এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও এ ধারা বহমান।"[১২]

তিনি চোখ দান করেছেন। তাঁর দুটি চোখ দিয়ে দৃষ্টিহীন একজন মানুষ পৃথিবীর আলোবাতাস দেখছে। কিন্তু তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে দৃষ্টি দান করেছেন। মৃত্যুর পর শরীর দান করেছেন মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য। আহমদ শরীফের গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকারের মধ্যে তাঁর দর্শনচিন্তা রয়েছে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। জগৎ জীবন সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে যে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তার সমন্বিত রূপই তাঁর দর্শনচিন্তা। নিম্নে আহমদ শরীফের দর্শনচিন্তা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

দর্শনচিন্তা

আহমদ শরীফ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন না। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল, "দর্শন আমার অধীত বিষয় নয়। দর্শনচর্চায় আমি অনধিকারী।"[১৩] কিন্তু আহমদ শরীফের সব লেখাই মৌলিক। তাঁর অনেক লেখার মধ্যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ স্পষ্ট। দর্শন সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "Philosophy 'র সাধারণ অভিধা হচ্ছে 'প্রজ্ঞা-প্রীতি', 'দর্শন'-এর সাধারণ লক্ষ্য অদৃশ্যকে দেখা। দুটোই মূলত এক - চেতনার গভীরে জীবন-সম্পৃক্ত জগৎকে কিংবা জগৎ-প্রতিবেশে জীবনকে তার সামগ্রিক স্বরূপে ও তাৎপর্যে উপলব্ধি বা ধারণ করার চেষ্টা।"[১৪] জীবন ও জগতের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দর্শনের সৃষ্টি। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "জীবন কী এবং কেন? - এ প্রশ্নের উঁচুমার্গের সূক্ষ্ম সুচিন্তিত তাত্ত্বিক উত্তর দিয়েছেন দার্শনিকরা।"[১৫] দার্শনিকদের কাজ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "সাধারণভাবে দর্শন শাস্ত্রাশ্রয়ী অর্থাৎ শাস্ত্রেও তাত্ত্বিক তৎপর্য সন্ধানই ছিল দার্শনিকদের

---

[১১] আহমদ শরীফের ডায়েরি, *ভাব-বুদ্বুদ*, নেহাল করিম, মোহাম্মদ আজম, খোরশেদ আলম (সম্পাদিত), জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭
[১২] আহমদ শরীফ, *অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ*, ড. নেহাল করিম (সঙ্কলিত), অনন্যা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. প্রসঙ্গ কথা
[১৩] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, (ড. নেহাল করিম সংকলিত), উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৩
[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

লক্ষ্য।"[১৬] তিনি মনে করতেন প্রাচীন গ্রিস এবং ভারতবর্ষে কিছু বিশুদ্ধ তত্ত্বচিন্তা কিছুকাল প্রশ্রয় পেয়েছিল। দর্শনের গুরুত্ব ও সার্থকতা তাঁর দৃষ্টিতে অপরিমেয়। দর্শনের জন্যই মানুষের উৎকৃষ্ট জীবন সম্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো, "মনুষ্য সংস্কৃতির উৎকর্ষ পরোক্ষে দর্শন ও দার্শনিকেরই দান।"[১৭] দর্শন স্থান-কাল এবং সময় নির্ভর। দার্শনিক কোন সময়ে, কোন সমাজে-রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ এবং বাস করেন। সেই সমাজের প্রভাব তাঁর চিন্তা-চেতনায় প্রভাব ফেলে। শূন্য থেকে দার্শনিক কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন না। আহমদ শরীফের মতে, "দার্শনিক চিন্তার উদ্ভবও তাই দেশ-কাল-প্রতিবেশ ও প্রয়োজন সাপেক্ষ।"[১৮] চিন্তার জন্য চিন্তা দর্শনের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের কল্যাণেই দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।

'আমার চেতনায় জীবন ও জগৎ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে আহমদ শরীফ জীবনদর্শন সম্পর্কে লিখেছেন, "ব্যক্তির চেতনায় তার জগতের, জীবনের ও সমাজের বাঞ্ছিত রূপ-স্বরূপই তার জীবনদর্শন।"[১৯] সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। স্থান এবং সময়ের উপর দর্শনের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন সবসময়ই দেখা যায়। প্রাচীন গ্রিক দর্শন এবং ভারতবর্ষের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য এ কারণেই। একই স্থানে একই কালে দুইজন দার্শনিকের চিন্তা এক রকম নয়। দুইজন দুইরকমভাবে জীবন ও জগতের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এজন্য তাঁদের চিন্তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আহমদ শরীফের মতে, "দর্শন সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা অনেককাল আগেই বদলেছে। কাজেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন হয়েছে।"[২০] সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ দর্শনের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "জীবনের শারীরী দিক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মানুষের সব চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা দার্শনিক চিন্তা-চেতনা না থাকলে, একটা আদর্শিক প্রেরণা ও লক্ষ্য না থাকলে মানুষের যৌথ জীবনে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ হয় না।"[২১] সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে দর্শনের অবদান রয়েছে। ব্যক্তি মানুষের উন্নত জীবন, সামাজিক মানুষের বিকাশ এবং রাষ্ট্রের উন্নতির পেছনেও দর্শনের গুরুত্ব কম নয়। দর্শনই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আহমদ শরীফ কোন দর্শন চিন্তার অনুসারী এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "আমি বিশেষ দার্শনিক চিন্তায় বিশ্বাস করি। দার্শনিকদের মতো জীবন জগতের ভাব সত্য

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
[১৮] *আহমদ শরীফ রচনাবলী - ৪*, আহমদ কবির (সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৯
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
[২১] *আহমদ শরীফ রচনাবলী - ৪*, পৃ. ৫৩

মূল্য সত্য ধরার চেষ্টা করি।"[২২] আহমদ শরীফ দর্শনের বিশেষ শাখার অনুসারী ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> জগৎ-জীবন-স্রষ্টার রহস্য জানার আগ্রহ থেকে দর্শন শাস্ত্রের শুরু। কুলকিনারা না পেয়ে দুর্বলেরা আস্তিক্য দর্শন গড়ে তোলেন, পরবর্তীকালে সেগুলো ধর্মনির্ভর দর্শনে পরিণত হয়। অবশ্য কেউ কেউ সংশয়বাদী হয়েছেন, নাস্তিক্যবাদী হয়েছেন। ভারতবর্ষে বৈশেষিক দর্শন বা সাংখ্য দর্শন এক সময় নাস্তিক্য দর্শন ছিল। লোকায়তিকেরা নাস্তিক্যবাদী। এগুলো আমার পছন্দ, কারণ আমি আস্তিক্যে বিশ্বাস করি না। শাস্ত্রকে আমি মনে করি ম্যান-মেইড।[২৩]

প্রাচীন গ্রীসের মত ভারতবর্ষে উঁচুমার্গের দর্শনচর্চা হয়েছে। সাংখ্য, যোগ, লোকায়ত, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম-দর্শনের দেশ ভারতবর্ষ। বেদান্ত, ন্যায় দর্শনের চর্চাও এদেশে হয়েছে। এদেশে দর্শনচর্চা প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "এদেশে আজীবিক ছিল, কপিল-চার্বাক চেলা নাস্তিক ছিল, বৌদ্ধ নির্বাণবাদপ্রসূত উচ্চ দার্শনিক চিন্তার প্রসূন শূন্য ও বজ্রতত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছিল। গুণরত্ন-চেলাদের লোকায়তিক দর্শন বিকাশ পেয়েছিল।"[২৪] বাঙালিদের দর্শনচর্চা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আদিকালের বাঙালীমাত্রই দেহাত্মবাদী নিরীশ্বর। সাংখ্যই তার দর্শন, যোগ-তন্ত্রই তার চর্যা। এবং বিদেশীতত্ত্ব প্রভাবিত অধ্যাত্মবাদী বাঙালীমাত্রই অদ্বৈতবাদী ও কায়াসাধক।"[২৫]

বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া আহমদ শরীফ কোন কিছুই গ্রহণ করেননি। সেলিনা হোসেন আহমদ শরীফকে দার্শনিক হিসাবে অভিহিত করে লিখেছেন, "আমার কাছে তিনি দার্শনিক। কারণ জীবনের অনেক মৌলিক সত্যকে তিনি তাঁর মতো করে বিশ্লেষণ করেছেন। নিজের প্রশ্নটির উত্তর পেয়েছেন চারপাশের সমাজ পরিধির মধ্যে। তাঁর প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মৌলিক সত্য জিজ্ঞাসা তিনি আমাদের মাঝে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।"[২৬] সাহিত্যকে তিনি দর্শন বলেননি। দর্শনও সাহিত্য নয়। দর্শন বিজ্ঞানও নয়। দর্শন ও বিজ্ঞান আলাদা। সাহিত্যে জিজ্ঞাসা না থাকলে সে সাহিত্য মানব সমাজের কোন কাজে লাগে না। জিজ্ঞাসাহীন সাহিত্যকে ঠিক সাহিত্য বলা যায় কিনা সে প্রশ্ন থেকে যায়। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "আমাদের মানতেই হবে যে কেবল দর্শন বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যও চিত্তলোকের জিজ্ঞাসার ও অন্বেষারই ফুল, ফল ও ফসল। জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা পরোক্ষেও প্রকাশ না পেলে, সে সাহিত্য অকেজো বলেই অপ্রয়োজনীয়।"[২৭] আহমদ শরীফ মনে করেন জীবন জিজ্ঞাসা থেকেই দর্শনের সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন ভারতের দর্শন সম্প্রদায়গুলোর উদ্ভব সম্পর্কে লিখেছেন,

---

[২২] হুমায়ুন আজাদ, ''আহমদ শরীফ : পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী (সাক্ষাৎকার), *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ*, আবুল কাসেম ফজলুল হক, (সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি), পৃ. ৩০৮। আহমদ শরীফের এই সাক্ষাৎকারটি প্রথম *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* ১৯৮৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* : ১৩ : ৩৬, ঢাকা ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫ : ৩ ফাল্গুন, ১৩৯১

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

[২৪] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ৫৭

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[২৬] সেলিনা হোসেন, '' নারীমুক্তির প্রশ্নে দার্শনিক আহমদ শরীফ'', *স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ সংকলিত আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ*, পৃ. ২৫৭

[২৭] আহমদ শরীফ, আহমদ শরীফ, *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*, পৃ. ৮

> ভারতে বেদ-উপনিষদ হয়ে ছয়টা দার্শনিক মতের সৃষ্টি হল। এদের মধ্যে লোকায়তিক চার্বাক মত ছাড়াও সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসা মূলত নাস্তিক্যমত, আর বৌদ্ধমতও নাস্তিক্যই, তবু বাঁধন খোলেনা কারো, সবাই এক এক প্রকারের বাঁধনে আজো বাঁধা। জৈন অনেকান্তবাদ, বৌদ্ধ স্কন্ধ-নির্বাণবাদ, সাংখ্যযোগে অনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বরবাদ-সবাইকেই বন্ধনমুক্তির অন্বেষায় ঘুরিয়ে মারছে, মন-বুদ্ধি-চিন্তার মুক্তি দেয়নি কাউকেই।[২৮]

আহমদ শরীফের দর্শনচিন্তায় অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, মূল্যবিদ্যা, বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মূল্যবিদ্যার অন্যতম আলোচনার বিষয় নীতিবিদ্যা। শিক্ষাচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা আহমদ শরীফের দর্শনচিন্তার অংশ। তিনি মনে করেন, সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষ সত্যিকারের জ্ঞানী ও যুক্তি আশ্রয়ী হলেই সবার সুখ কাম্য হতে পারে। ভূতে-ভগবানে, অতিপ্রাকৃতিক, অলৌকিক, অবৈজ্ঞানিক আসমানী শক্তিতে বিশ্বাসী মানুষ জ্ঞানার্জন করতে পারে না। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার জ্ঞানের প্রধান অন্তরায়। অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক আসমানী শক্তিতে বিশ্বাসী মানুষের কোন জিজ্ঞাসা থাকে না। আর জিজ্ঞাসা থেকেই দর্শনের সৃষ্টি। জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া হিসাবে আহমদ শরীফের এই জিজ্ঞাসাকে সমর্থন করে। স্রষ্টা, শাস্ত্র, মন এবং ধর্ম সম্পর্কে আহমদ শরীফের চিন্তাকে অধিবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত করা যায়। নিম্নে আহমদ শরীফের জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করে পর্যায়ক্রমে অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা দর্শনের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। প্রাচীনকালে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাকে জ্ঞানের পথ বলে মনে করা হত। গ্রীক দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে একমাত্র সত্য জ্ঞান বলে মনে করতেন। সোফিস্টদের দর্শনচিন্তায় জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা দেখা যায়। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শনে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিকেরা 'জ্ঞান' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তারা মিথ্যা জ্ঞানের কথাও বলেছেন।[২৯] প্রাচীন ভারতীয় নয়টি দার্শনিক সম্প্রদায়ের দর্শনচিন্তায় জ্ঞানতত্ত্ব গুরুত্ব পেয়েছে। চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষণই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। যথার্থ জ্ঞানকে তারা 'প্রমা' এবং জ্ঞান লাভের উপায়কে 'প্রমাণ' বলে অভিহিত করেছেন। জৈন দর্শনে প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে স্বীকার করলেও অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। ন্যায় দর্শন জ্ঞানতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় দর্শনে জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে মোটাদাগে প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান এবং শব্দকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। নব্যন্যায় এবং বৌদ্ধ

---

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
[২৯] রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৮৭, ৮৮

দার্শনিকগণও জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন। দিংনাগ এবং ধর্মকৃত্তির দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ স্থান দখল করে আছে।[৩০]

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে জ্ঞানতত্ত্ব।[৩১] দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ জ্ঞানতত্ত্বে বুদ্ধিবাদ গ্রহণ করেছেন। বেকন প্রবর্তিত জ্ঞানতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদ হবস ও লক সমর্থন করেন। এই তিনজনই জ্ঞানের উৎস হিসাবে ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করেন। ডেভিড হিউম বার্কলির মতবাদ সমর্থন করে প্রত্যক্ষের বাইরে অন্য কোন কিছু স্বীকার করেননি। তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে কার্য-কারণের মধ্যে বস্তুগতভাবে কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই, সম্পর্কটা আত্মগতভাবে অনিবার্য অর্থাৎ মন অনিবার্যভাবে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে হিউমের জ্ঞানতত্ত্ব সংশয়বাদে পরিণত হয়।[৩২] জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ সমন্বয় করে বিচারবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ অনুসারে আমরা কেবল অবভাসকে জানতে পারি, সত্তাকে জানতে পারি না। সত্তাকে যদি জানা নাই যায় তবে সত্তা সম্পর্কে তিনি জানলেন কিভাবে? কান্টের বিচারবাদী জ্ঞানতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত অজ্ঞেয়বাদে পরিণত হয়।[৩৩] হিউমের সংশয়বাদ এবং কান্টের অজ্ঞেয়বাদ বার্কলির জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদের নানান ধরন ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩৪] মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে জ্ঞানের জন্য বিষয়ী এবং বিষয় উভয় প্রয়োজন। বস্তু জগতই জ্ঞানের উৎস।

বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক আহমদ শরীফ জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হিসাবে বস্তুকে স্বীকার করলেও তিনি মনে করেন জিজ্ঞাসাই জ্ঞানের উৎস। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের উদয়, চিন্তার উদ্ভব, অনুশীলনের বিকাশ। জিজ্ঞাসাই মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতা বিকাশের মূল প্রেরণা। জিজ্ঞাসার অশেষ আকুতিই চিন্তা ও কর্মে প্রবর্তনা দেয়। এই জিজ্ঞাসাই কল্পনা জগতের উপর মানুষের আধিপত্যের কারণ এবং বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-শিল্পাদি কলার জন্মদাতা। এক কথায় মানুষের যা কিছু স্বকীয়, তা জিজ্ঞাসার দান।[৩৫]

জিজ্ঞাসা কি এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন, "কার্যকারণ জানার ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা।"[৩৬] জিজ্ঞাসাহীন মানুষকে আহমদ শরীফ পোষা প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যার জিজ্ঞাসা নেই তার কোন জ্ঞান নেই। জিজ্ঞাসাহীন মানুষ 'ভূতে-ভগবানে', অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে এবং শোনা কথায় বিশ্বাস করে, আস্থা রাখে। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "দুর্বল ও জিজ্ঞাসাহীন মনের প্রশ্রয়ে বিশ্বাস-সংস্কার বুনোলতা

---

[৩০] Bimal Krishna Matilal, ''Buddhist Logic and Epistemology'', *Buddhist Logic and Epistemology,* Bimal Krishna Matilal and Robert D. Evans (Edited), D. Reidel Publishing Company, Dordrecht/ Boston/ Lancaster/ Tokyo, 1986, p. 1

[৩১] হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬৭

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

[৩৩] প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৯

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

[৩৫] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ৯০

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

কিংবা অশ্বত্থশিকড়ের মতো মানুষের মন-বুদ্ধি-আত্মাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে জীর্ণতা আনে জীবনে। এমন মানুষ কেবলই প্রাণী-নিয়তিবাদী পোষমানা প্রাণী; তার না আছে জিজ্ঞাসা, না আছে বিদ্রোহ করবার মত মন।”[৩৭] জিজ্ঞাসাই আহমদ শরীফের জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি। জিজ্ঞাসা থাকলে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় কাজ করে। জিজ্ঞাসাহীন মানুষের ইন্দ্রিয় বন্ধ্যা। তিনি মনে করেন, বিস্ময়, কল্পনা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ভয় ইত্যাদি জ্ঞানের উৎস নয়।

আহমদ শরীফ জ্ঞানের উৎস হিসাবে জিজ্ঞাসাকে যেমন স্বীকার করেছেন তেমনি জ্ঞানের উৎস হিসাবে অলীক-অলৌকিক তত্ত্ব অস্বীকার করে লিখেছেন, “আদি বিস্ময়, কল্পনা, ভয়, ভক্তি, ভরসা প্রসূন আন্দাজী আনুমানিক অদৃশ্য-অলীক-অলৌকিক তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, যাদু বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতি যে জ্ঞানের উৎস, সে জ্ঞানটাই হাওয়াই; বাস্তব নয়, মানসিক ধারণা।”[৩৮] আনুমানিক সিদ্ধান্ত বা ধারণা তাঁর মতে জ্ঞান নয়।[৩৯] জ্ঞান মানেই পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ নির্ভর।

আহমদ শরীফ জ্ঞানকে চক্ষুর সঙ্গে আর বিশ্বাসকে অন্ধতার সাথে তুলনা করে লিখেছেন, “জ্ঞানই চক্ষু, আর বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধতা। জ্ঞানকে যে বিশ্বাসের উপরে ঠাঁই দেয় না, যে বিশ্বাসকে পরিহার করে জ্ঞানকে গ্রহণ করে না, তার জিজ্ঞাসা নেই। সে জগৎ ও জীবনের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত।”[৪০] মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য অর্জনের জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। বিশ্বাস নির্ভর মানুষ জীবনের চরম লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারে না। সে অলৌকিক-অতিপ্রাকৃতিক আসমানী কোন সত্তার উপর নিজেকে সমর্পণ করে। ধর্ম থেকে জ্ঞানকে আহমদ শরীফ আলাদা করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানের জগতে দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম নেই, আছে কেবল তথ্য ও তত্ত্ব।[৪১] জ্ঞান সচল, চিরন্তন নয়। শাশ্বত জ্ঞান বলে কিছু নেই। ধর্ম পরিমার্জন পরিবর্তনযোগ্য নয়। আহমদ শরীফ ধর্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করে লিখেছেন,

> জ্ঞানমাত্রই বর্ধিষ্ণু। কারণ জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। জিজ্ঞাসা অশেষ, তাই জ্ঞানও কোন সীমায় অবসিত নয়। নব নব চিন্তা-ভাবনায় ও আবিষ্ক্রিয়ায় জ্ঞানের পরিধি-পরিসর কেবলই বাড়ছে। যত জানা যায়, তার চেয়েও বেশি জানবার থাকে। জ্ঞান বৃদ্ধির অনুপাতে তথ্যের স্বরূপ ও তত্ত্বের গভীরতা ধরা পড়ে। এজন্যে জ্ঞানের সাথে ধর্মশাস্ত্র সমতা রক্ষা করতে অসমর্থ। কেননা ধর্মশাস্ত্রীয় সত্য হচ্ছে চিরন্তনতায় ও ধ্রুবতায় অবিচল। তার হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিমার্জন নেই। পক্ষান্তরে জ্ঞান হচ্ছে প্রবহমান। তার উন্মেষ, বিকাশ ও প্রয়াস আছে, আছে বিবর্তন ও রূপান্তর। নতুন তথ্যের উদঘাটন, নবসত্যের আবিষ্কার, পুরোনো জ্ঞানকে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত করে।[৪২]

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
[৪১] আহমদ শরীফ, *শিক্ষা সংস্কৃতি প্রগতি*, ড. নেহাল করিম (সংকলিত), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩২
[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

ধর্মশাস্ত্র পরিবর্তনযোগ্য নয়। ধর্ম বিশ্বাস নির্ভর। বিশ্বাস জ্ঞানের ভিত্তি নয়। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "জ্ঞান মানুষকে বোধিসত্তায় উত্তীর্ণ করে। আসলে বোধিসত্ত্ব অর্জনই তো মানুষের লক্ষ।"[৪৩] সব মানুষ জ্ঞানী হয় না। সব মানুষ একই সময়ে যুক্তিবাদীও হতে পারে না। আহমদ শরীফের মতে, "ভীরু বুদ্ধিমানেরা অজ্ঞেয়বাদী; আর সাহসীরা যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদী। সাধারণ জ্ঞানীরা সংশয়বাদী; আত্মপ্রত্যয়ীরা নাস্তিক নিরীশ্বর।"[৪৪]

আহমদ শরীফ বাস্তববাদী। তিনি মনে করেন বস্তু জ্ঞানের উৎস। বস্তু না থাকলে ইন্দ্রিয় সক্রিয় হতে পারে না। বিশ্বাস ও অনুমানে ইন্দ্রিয়ের কোন কার্যকারিতা নেই। "জ্ঞানবাদ, বুদ্ধিবাদ, যুক্তিবাদ, প্রকৃতিবাদ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "বস্তুগত জ্ঞান প্রমাণসম্ভব, প্রমাণলব্ধ বলেই জীবনে অভয় শরণ।"[৪৫]

জ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ অন্তে যে তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য মেলে তা-ই জ্ঞান; কেননা তা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত এবং যুক্তি বুদ্ধি গ্রাহ্য। অতএব জ্ঞানমাত্রই বস্তুগত আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসম্পৃক্ত। কোনো জ্ঞানই এখন আর বিতর্কিত থাকে না, সন্দেহের স্থলে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মীমাংসা সংশোধন সম্ভব।"[৪৬] বস্তুকে সমর্থন করে "ধারণাবাদী ও জ্ঞানবাদী" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি আরো লিখেছেন, "জ্ঞান মাত্রই বস্তুগত ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সমর্থিত প্রত্যক্ষ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও যন্ত্রযোগে প্রমাণসম্ভব।"[৪৭] বস্তুগত জ্ঞানই কেবল প্রমাণসম্ভব।

প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদ শরীফ জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। জ্ঞানকে তিনি শক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অর্জন করেছে আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি।[৪৮] সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ আত্মবিশ্বাসী মানুষে পরিণত হয়। আত্মবিশ্বাসী মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস রাখে এবং নিজের চিন্তা-চেতনায় আস্থাশীল থাকে। দুর্বল মানুষই বিশ্বাস নির্ভর হয়। আহমদ শরীফ মনে করেন, "দুর্বল মানুষের সততা প্রভাবপ্রসূ নয় বলে বন্ধ্যা।"[৪৯] দুর্বল মানুষ সমাজের, রাষ্ট্রের কোন কাজে আসে না। এরা কেবল নিজেকে নিয়েই ভাবে। নিজের জন্যই এরা বেঁচে থাকে। আহমদ শরীফের মতে, "যে মানুষ কেবল নিজের জন্য বাঁচে, তাকে বলি অমানুষ।"[৫০] ভূতে-ভগবানে বিশ্বাস নির্ভর মানুষ নিজের জন্যই বাঁচে। নিজেকে ছাড়া সে আর কিছুই ভাবতে পারে না। কারণ তাঁর তত্ত্ব, তথ্য নির্ভর সঠিক জ্ঞান নেই। জ্ঞানহীন মানুষের কোন আত্মবিশ্বাস থাকে না।

---

[৪৩] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*,পৃ. ১৬২
[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯
[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
[৪৮] আহমদ শরীফ, *বিচিত চিন্তা*, চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৫২
[৪৯] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা, পৃ. ১১৮*
[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

সমাজের অধিকসংখ্যক মানুষের সুখের জন্যও আহমদ শরীফ জ্ঞান বিকাশের কথা বলেছেন। জ্ঞানের বিকাশ না ঘটলে সমাজের সুখ আসবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান ও যুক্তি আশ্রয়ী না হলে 'সুখ' আসে না, আসবে না।"[৫১] ব্যক্তি মানুষের জীবনও জ্ঞানাশ্রয়ী না হলে সুখ স্থায়ী হয় না। উপযোগবাদীরা অধিক সংখ্যক মানুষের জন্য যে সুখ কামনা করেছেন তার জন্যও সমাজের অধিকাংশ মানুষকে জ্ঞান ও যুক্তি আশ্রয়ী হওয়া প্রয়োজন। মানুষের সুখ নয় জ্ঞান কামনা করা উচিত। এজন্যই সুখী শুকর হওয়ার চেয়ে অসুখী সক্রেটিস হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন উপযোগবাদীরা।

প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া মানুষ যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারে না। পরীক্ষা পাশের জ্ঞান দিয়ে সমাজের অন্ধত্ব, গোঁড়ামি, অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব নয়। এ-সম্পর্কে আহমদ শরীফের বক্তব্য পরিষ্কার। তিনি লিখেছেন,

> যা বিশ্বাস করি না, তা পরীক্ষা-পাশের জন্যে জ্ঞান বলে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করি, এবং চাকরি নেবার সময় মুখস্থ আওড়াই তাকেই জ্ঞান বলে, অথচ আবাল্যেও মগজধোলাই অনুগ ভূতে-ভগবানে আস্থা রেখে সারাটা জীবন যাপন করি। ফলে আমাদের বুকের বিশ্বাস ও মুখের কথার অসঙ্গতি আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে প্রতিফলিত হয়। তাই আমাদের চরিত্রে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ মনোজগতে এবং ব্যবহারিক জীবনে এমনিভাবেই দুনৌকায় পা দিয়ে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের, ন্যায়-অন্যায়ের, যুক্তি-অযুক্তির, সঙ্গতি-অসঙ্গতির, আস্থা-অনাস্থার দোলায় দোলাচল।[৫২]

চিন্তার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক নানা উপদানের উপর অতিপ্রাকৃতিক শক্তি আরোপ করেছে আত্মরক্ষা এবং নিরাপদে বসবাসের প্রয়োজনে। আহমদ শরীফ মনে করেন, "প্রাচীন ও মধ্যযুগ ছিল অজ্ঞ-অসহায় মানুষের বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রভৃতি নির্বিচারে বিশ্বাস-সংস্কারের কাল।"[৫৩] কারণ প্রাচীনকাল এবং মধ্যযুগে মানুষের জ্ঞান ছিল সীমিত। তারা চারপাশে অদ্ভুত যা দেখেছে তাকেই বিশ্বাস করেছে। সীমিত জ্ঞানের কারণে মানুষ, "তুক-তাকে, ঝাড়-ফুঁকে, বাণ-উচ্চাটনে, তাবিজে-কবচে, মন্ত্রে-মাদুলীতে, পানিপড়ায়, ধূলিপড়ায়, তাগাপড়ায় আর পাথরে ও যাদুশক্তিতে আস্থা রেখে আত্মরক্ষায় ও আত্মপ্রসারে আত্মপ্রত্যয়ী।"[৫৪] প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের জ্ঞানও ছিল সীমিত। আহমদ শরীফের ভাষায়, "আগের যুগে বিজ্ঞান ছিল না, মানুষের মন-মগজ-মনন-মনীষার অনুশীলনজাত উপলব্ধিকেই 'জ্ঞান' নামে স্বীকার করা হত। যদিও প্রমাণসম্ভব বা প্রমাণিত না হলে কিছুই 'জ্ঞান' হতে পারে না। শাস্ত্র, দর্শন, আপ্ত-বাক্য, প্রবাদ, প্রবচন, সূক্তি সবকিছুই হচ্ছে উপলব্ধির সত্য, প্রমাণিত তথ্য বা তত্ত্ব নয়।"[৫৫]

---

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩
[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
[৫৫] আহমদ শরীফ, *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*, পৃ. ৯

সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের জ্ঞানকে আহমদ শরীফ নিশ্চিত জ্ঞান বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞান অনুমান ও উপলব্ধি নির্ভর। বস্তুকে নির্ভর করে সাহিত্য ও দর্শনের সৃষ্টি হলেও এ জ্ঞান প্রমাণ করা যায় না। প্রমাণসিদ্ধ জ্ঞানকে একমাত্র সত্য জ্ঞান হিসাবে উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন,

> শাস্ত্রে-সাহিত্যে-দর্শনে-ইতিহাসে-সামাজবিজ্ঞানে পরিবেশিত জ্ঞান তো স্বীকৃত সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব নয়; কেননা, এসব জ্ঞান সর্বজনীনস্বীকৃত নয়। এগুলো সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, গৌত্রিক এবং কালিক, এমনকি ব্যক্তিকও - যেমন শাস্ত্র ও দর্শন অনেক ক্ষেত্রেই একান্তই ব্যক্তিমনেরই সৃষ্টি। কাজেই এগুলো হচ্ছে আনুমানিক আন্দাজী কাল্পনিক কিংবা চিন্তা-চেতনা-মনন প্রসূন ধারণা মাত্র। প্রমাণিত বা প্রমাণসাধ্য সত্য নয়।[৫৬]

ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য মানুষের মনন বিকাশে সাহায্য করে। মানবিক বিষয়গুলো মানুষের সুকুমারবৃত্তি বিকশিত করে মানুষকে চিন্তাশীল প্রাণীতে পরিণত করে। আহমদ শরীফ মানবিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে লিখেছেন, "ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য সৃষ্টি করে ও চর্চা করে আমাদের অনুভব, উপলব্ধি ও মনন সূক্ষ্ম ও উন্নত করতে হবে।"[৫৭] সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহিত্যের ও দর্শনের ভূমিকা তিনি স্বীকার করেছেন। তারপরও তিনি মনে করেন, সাহিত্য ও দর্শন আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান দান করে না। আহমদ শরীফ নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছেন।

জ্ঞানকে তিনি প্রগতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। জ্ঞান সবসময় অগ্রগামী। তাঁর মতে, ''জ্ঞান-সামনেই, জ্ঞান অতীতে নেই।"[৫৮] বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধতা, কূপমণ্ডূকতা ও চিন্তা-চেতনায় বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি পায়। আহমদ শরীফের ভাষায়, ''শাস্ত্র ও সংস্কার বন্ধন থেকে মুক্ত করা কেবল জ্ঞান ও যুক্তির জোরেই সম্ভব।"[৫৯] বিজ্ঞান নির্ভর জ্ঞানচর্চার ফলে মানুষ যুক্তিবাদ গ্রহণ করছে। বুদ্ধি বিকশিত হচ্ছে। ফলে আধুনিকালে যাদুমন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা কমছে। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর আস্থা রেখে চলে এমন মানুষের সংখ্যাও বিজ্ঞান হ্রাস করতে সাহায্য করছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞাননির্ভর এবং তথ্যপ্রবাহের বর্তমান যুগকে আহমদ শরীফ, জ্ঞানবাদের, বুদ্ধিবাদের, যুক্তিবাদের এবং প্রকৃতিবাদের যুগ নামে অভিহিত করেছেন।[৬০]

বিজ্ঞান মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করেছে। আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ ভূতে এবং ভগবানে বিশ্বাস করে। ভূতে এবং ভগবানে বিশ্বাসী মানুষ ভাববাদ গ্রহণ করে মানব সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যুক্তিবাদ মানুষকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। আহমদ শরীফ যুক্তিবাদ সমর্থন করে লিখেছেন,

---

[৫৬] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ১৯২
[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

''যুক্তিবাদী মাত্রই হবে ফ্রিথিঙ্কার। মর্ত্যজীবন চেতনাই হবে তার চলার পথের, জীবনযাপনের পুঁজি-পাথেয়। মানবিকতা, মানবতা, শ্রেয়সচেতনা তথা মানববাদই হবে তার বিবেক-বিবেচনার চালিকা শক্তি।''[৬১] পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদ সমানভাবে বিকশিত হয়নি। এমন কি একই অঞ্চলের একই স্থানের সব মানুষ সমানভাবে যুক্তিবাদ গ্রহণ করে না। এক বাড়ির মধ্যেও সবাই সমান যুক্তিবাদী নয়। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, জীবন জিজ্ঞাসা সবার সমান থাকে না। জীবন জিজ্ঞাসা না থাকলে মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারে না। জীবন জিজ্ঞাসা না থাকলে জ্ঞান হয় না।

আহমদ শরীফের মতে এ অঞ্চলের মানুষের জিজ্ঞাসাবৃত্তি কম। রেনেসাঁ উত্তরকালে এ অঞ্চলে জ্ঞানের বিকাশও হয়েছে কম। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি অনেক অনেক কাল ধরে সুপ্ত। তাই আমরা আজ অনুকারক ও প্রতীচ্য-নির্ভর। আমাদের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি উদ্দীপিত না করলে আমরা কখনো স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে স্বকীয়তার ঔজ্জ্বল্যে ও মহিমায় আত্মনির্ভর ও আত্মসম্মানসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠতে পারবো না।"[৬২] লেখাপড়া জানা লোক মাত্রই জ্ঞানী নয়। লেখাপড়া জানা বহু মানুষ ভূতে, ভগবানে বিশ্বাস করে। বহু শিক্ষিত লোকের হাতে পাথর গলায় তাবিজ-কবজ দেখা যায়। বিজ্ঞান পড়া লোকের মধ্যেও এদের সংখ্যা নগণ্য নয়। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "লেখাপড়া জানা লোক হলেই বিদ্বান-জ্ঞানী লোক হয় না।"[৬৩] বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি ক্ষতিকর ব্যাপার ঘটে গেছে। ছাত্র অবস্থা থেকেই শুরু। স্পেশিয়ালাইজেশন দিয়ে জ্ঞান হয় না, পটভূমি দরকার। তাই পাঠ্যবিষয়ের বাইরের জ্ঞান দরকার। আমাদের এখানে এখন তার ব্যবস্থা নেই। ফলে জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি হচ্ছে না, খাড়া হয়ে উঠছে। একটি ডক্টরেট করে জ্ঞানী হয়ে যাচ্ছে, আর কোন লেখাপড়া করছে না। এমন মানুষের দ্বারা জ্ঞানের চর্চা হতে পারে না। জ্ঞানী মানুষ হওয়ার পথে আমাদের দেশে বাধা সৃষ্টি হয়েছে।[৬৪]

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্বান' তৈরির শ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে উল্লেখ করে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কেবল গ্রন্থপাঠজাত বিদ্যা বিতরণের আলয় নয়, নতুন দৃষ্টির, নতুন চিন্তা-চেতনার ও নতুন ব্যাখ্য বিশ্লেষণের প্রসূন নতুন বিদ্যা সৃষ্টিরও আগার। সেজন্য সেখানে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের ও গবেষণাশক্তির প্রয়োজন।"[৬৫] বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই নতুন নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয় এবং নতুন জ্ঞানের বিতরণও হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জ্ঞানের বিকাশও ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। কেরানি তৈরির স্থান বিশ্ববিদ্যালয় নয়। কিন্তু আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞানচর্চা করার জন্য সৃষ্টি হয়নি। উপনিবেশিক শাসনামলে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করার চেয়ে চাকুরীজীবী গড়ে তোলাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। তারপরও এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন জ্ঞানের আলোকে

---

[৬১] আহমদ শরীফ, *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*, পৃ. ৩১, ৩২
[৬২] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ৯৩
[৬৩] আহমদ শরীফ, *সময় সমাজ মানুষ*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৮২
[৬৪] হুমায়ুন আজাদ, ''আহমদ শরীফ : পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী'' (সাক্ষাৎকার), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩, ৩০৪
[৬৫] আহমদ শরীফ, *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*, পৃ. ৬৫

মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট নতুন নতুন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> ইংরেজরা সাম্রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার চায়নি বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীকে য়ুরোপীয় কোন জ্ঞান-বিদ্যা থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টাও করেনি। ব্রিটিশ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলেই শিক্ষাদান করা হত। এবং ঐ বিদ্যা অর্জন করেই ভারতে জ্ঞানে-গুণে মনীষায়-মনুষত্বে বহু বহু আদর্শ ও অনন্য ব্যক্তিত্ব স্ব-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৬৬]

আহমদ শরীফ শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞান চর্চার কথা বলেননি। জ্ঞান আমাদের কি কাজে আসবে এবং কোন জ্ঞান চর্চা করা প্রয়োজন তার কথাও বলেছেন। তিনি মনে করেন জ্ঞান মানুষের কাজে না লাগলে সে জ্ঞানের কোন মূল্য নেই এবং সে জ্ঞান অপ্রয়োজনীয়।[৬৭] আহমদ শরীফ জ্ঞানকে প্রায়োগিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজের অধিকাংশ মানুষের কল্যাণে জ্ঞান কখন কিভাবে কাজে লাগবে এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> শিক্ষিত মানুষ যতদিন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি যোগে জীবনকে ও জগৎকে জানবার-বুঝবার চেষ্টা না করবে, অধীত অধিগত বিদ্যা অনুভব-উপলব্ধিযোগে সতাৎপর্য আত্মস্থ হয়ে যুক্তিনিষ্ঠ মননের বিকাশ না ঘটাবে-যুক্তিবাদী না করবে; দেহ-মন-মনন যে অসামান্য অশেষ পুঁজি, এ মানব জমিন আবাদে যে সোনার ফসল ফলে, অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি না করবে ততদিন মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি-সুরুচি-সৌজন্য বাঞ্ছিত রূপ লাভ করবে না প্রবল মানুষের হাতে সামাজিক মানুষের পীড়ন-লাঞ্ছনা-বঞ্চনাও ঘুচবে না।[৬৮]

সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সত্যিকারের জ্ঞানের বিকাশ ঘটলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অমর্ত্য সেন লিখেছেন, "Silence is a powerful enemy of social justice."[৬৯] কিন্তু সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যও প্রায়োগিক জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রায়োগিক জ্ঞান ছাড়া সামাজিক নীরবতা ভাঙ্গা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিজ্ঞান নির্ভর জ্ঞান ব্যক্তি মানুষ এবং সামাজিক মানুষকে শক্তি যোগায়, আত্মবিশ্বাসী করে। জ্ঞানী আত্মবিশ্বাসী মানুষই সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

আহমদ শরীফের জ্ঞানতত্ত্ব এবং ফ্রান্সিস বেকনের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের বিশেষ মিল রয়েছে। বেকনের মতে জ্ঞানের লক্ষ্য তাত্ত্বিক নয়, জ্ঞান ব্যবহারিক। ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব। আহমদ শরীফের জ্ঞানতত্ত্বেও আমরা ব্যবহারিক দিক দেখতে পাই। আধুনিককালের পাশ্চাত্য দর্শনের অনেক

---

[৬৬] আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী -৪*, পৃ. ৬১
[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
[৬৮] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ১৭
[৬৯] Amartya Sen, *The Argumentative India*, Penguin Books, 2005, p. 39

দার্শনিকের জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের উপস্থিতি কম। তারা কেবল জ্ঞানের উৎস বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু জ্ঞান মানুষের কি কাজে আসে, কোন জ্ঞান মানুষের অর্জন করা প্রয়োজন তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাশ্চাত্যের আধুনিক কালের দার্শনিকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদে পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় আহমদ শরীফের প্রায়োগিক জ্ঞানতত্ত্বে।

অধিবিদ্যা

দর্শনের শাখাগুলোর মধ্যে অন্যতম শাখা হল অধিবিদ্যা। অতিপ্রাকৃতিক সত্তা ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অধিবিদ্যা আলোচনা করে। আহমদ শরীফ বিভিন্ন প্রবন্ধে, গ্রন্থে ও সাক্ষাৎকারে ঈশ্বর আত্মা, মন ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঈশ্বর মন ও আত্মা এবং অতিপ্রাকৃতিক সত্তা সম্পর্কে আলোচনা আহমদ শরীফের অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। অধিবিদ্যা সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, “মানুষের বিস্ময়-ভয়-ভক্তি-ভরসাজাত বুদ্ধি-মনন বা কল্পনাজাত আদি প্রশ্নই হচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে-সৃষ্টি কি, ও কেন এবং স্রষ্টা কে? এ প্রশ্নোত্তর শাস্ত্রের নাম অধিবিদ্যা (Metaphysics), অধ্যাত্মবিদ্যা (Spiritualism), মরমীবিদ্যা (Mysticism), এবং এককথায় স্রষ্টাতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব।”[৭০]

যৌক্তিকদৃষ্টবাদীদের মত তিনি অধিবিদ্যক বিষয়গুলোতে আস্থা রাখতে পারেননি। যৌক্তিকদৃষ্টবাদীরা ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্যে অধিবিদ্যার অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। আহমদ শরীফ বাস্তব অভিজ্ঞতা, যুক্তিবুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিবিদ্যার অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ভয়, বিস্ময়, অজ্ঞতা থেকে মানুষ অধিবিদ্যক বিষয়গুলোয় আস্থা রাখে। ফলে সমাজের রাষ্ট্রের প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। মানুষের অগ্রগতি থেমে যায়। অধিবিদ্যার উদ্ভব সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> ভয়-বিস্ময় থেকে যে-জিজ্ঞাসার উৎপত্তি এবং অজ্ঞের কল্পনা দিয়ে তার উত্তরস্বরূপ যে-জ্ঞান লব্ধ, তা কখনো যথার্থ হতে পারে না। তবুও কৌতূহলী মন বুঝ মানে না। তাই চাওয়া ও পাওয়ার, সাধ ও সাধ্যের, প্রয়াস ও প্রাপ্তির অন্তরায়রহস্য মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। সেই ভাবনা সর্বপ্রাণবাদ, যাদুবিশ্বাস, টোটেম-টেবু তত্ত্ব প্রভৃতির জন্ম দিয়েছে। তার বিসূক্ষ্ম ও পরিশীলিত রূপ পাই পুরাতত্ত্বে বা metaphysics-এ।[৭১]

ভয়-বিস্ময়, অজ্ঞতা, কুসংস্কার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। প্রাচীনকালে আদিম মানুষের ভয়-বিস্ময় ছিল। তখনো কিছু অগ্রসর মানুষ জীবন জগৎ নিয়ে প্রশ্ন করেছে। তারা যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে জীবন ও জগতের অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাদের এ চেষ্টার ফলে সভ্যতার

---

[৭০] আহমদ শরীফ, *অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ*, অনন্যা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৫
[৭১] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ৫৩, ৫৪

বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। কিন্তু দেখা যায়, আধুনিক কালেও বহু মানুষের প্রশ্ন করার অভ্যাস নেই। প্রশ্নহীন মানুষ বিশ্বাস নির্ভর হয়। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "যেখানে অজ্ঞতা, সেখানেই কল্পনার আশ্রয়, কল্পিত ধারণা প্রশ্রয় পেয়ে পরিণত হয় সংস্কারে; আর সংস্কার দৃঢ়মূল হলে তা বিশ্বাস রূপে পায় স্থিতি।"[৭২] জীবন ও জগতে কার্য-কারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না। সব কাজের পিছনে আছে কারণ। এই কার্য-কারণ সম্পর্কে অজ্ঞরাই কল্পনা নির্ভর বিশ্বাসের জগতে বাস করেন। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "কারণ-কার্যের অজ্ঞতা থেকেই উদ্ভব বিস্ময়ের ও কল্পনার। কল্পনা স্থূলযুক্তি ও ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে বিশ্বাসরূপে চিত্তলোকে দৃঢ়মূল হয়। এ বিশ্বাসই সামাজিক প্রতিষ্ঠা পায় শাস্ত্রীয় প্রত্যয়রূপে।"[৭৩]

অধিবিদ্যা বিশ্বাস নির্ভর। অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয়গুলো যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা চলে না। তারপরও কিছু চিন্তাবিদ যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বিশ্বাস নির্ভর অধিবিদ্যার বিষয়গুলো প্রমাণের চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে পূর্বতসিদ্ধ হিসাবে নিয়ে তারা সাধারণত বিচার বিশ্লেষণ করেন। বিশ্বাসকে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন। আহমদ শরীফ এ প্রক্রিয়া সমর্থন করেননি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বিশ্বাসকে যুক্তিগ্রাহ্য করার অপপ্রয়াস পুতুলকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করারই নামান্তর মাত্র। এবং ওই বিশ্বাস আর ওই পূজা - দুটোই রশুনের মতো অভিন্ন মূল।"[৭৪] আদিম মানুষ ভয়-বিস্ময় থেকে শক্তিমানকে সম্মান করেছে। রাজাকে পূজা দিয়েছে। সৃষ্টি করেছে দেব-দেবী, দত্য-দানব। উপাসনার সাহায্যে সৃষ্ট দেবতাকে পূজা দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজেছেন। মুক্তি চেয়েছেন অলৌকিক শক্তির কাছে।

আদিম মানুষ পশুপালনের যুগ থেকে কৃষি এবং আধুনিক যুগের উত্তরণ ঘটিয়েছে বুদ্ধির সাহায্যে। জিজ্ঞাসার সাহায্যে সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান। চাকা, বিদ্যুত থেকে আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার হল জিজ্ঞাসার ফল। জিজ্ঞাসা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নানা শাস্ত্র ও তত্ত্বের। পার্থিব জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে। মানববিদ্য অধিবিদ্যা মানুষের জিজ্ঞাসারই ফল। এ দুটো বিদ্যার উদ্ভব সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> রোগের প্রতিষেধক, জীবিকার নতুন নতুন ক্ষেত্র সুখের ও উপভোগের নানা উপকরণ, নিরাপত্তার নানা ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করে থাকে। তখন থেকেই শাস্ত্র ও পারত্রিক মোক্ষ সাধনা এবং ঐহিক জীবন-প্রয়াস আলাদা হতে থাকে। এভাবে শাস্ত্র পরমাত্মা বা ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা বা 'অধ্যাত্মবিদ্যা' নামে এবং পার্থিব জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিদ্যা-কৌশল অর্জনের নাম মানববিদ্যা নামে চিহ্নিত বা অভিহিত হল।[৭৫]

এই মহা বিশ্বে মানুষ সসীম প্রাণী। জন্ম, মৃত্যু মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের ফলে মানুষ জন্ম শাসন করতে সক্ষম হয়েছে। রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের ফলে বেড়েছে মানুষের গড়

---

[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
[৭৫] আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী -৪*, পৃ. ৫৪

আয়ু। প্রাণীর ক্লোন হচ্ছে। প্রাচীন কাল থেকে মানুষ জন্মগ্রহণ করছে এবং মৃত্যু হচ্ছে। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? মৃত্যুর পর কি মানুষ অন্য কোন জগতে চলে যায় না-কি, মৃত্যুই কি মানুষের শেষ? জগতের সৃষ্টি এবং পরিণাম নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি মানুষ প্রশ্ন করছে। জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "জন্ম-মৃত্যুতেই জীবনের আদি-অন্ত সীমিত। জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে অনুভূত চেতনার সমষ্টিই জীবন।"[৭৬] চেতনা থেকে ভিন্ন মানুষের অস্তিত্ব আহমদ শরীফ সমর্থন করেননি। মানুষের চেতন মুহূর্তগুলোতে সে যা সংবেদ এবং উপলব্ধির সাহায্যে অর্জন করে তাই তার জীবন। কিন্তু দুর্বল মানুষ, বিপন্ন মানুষ অসীম অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে বিশ্বাস করে। এরা বিজ্ঞানের উপর আস্থা রাখতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করে। বিজ্ঞানে অবিশ্বাসী দুর্বল মানুষের বিশ্বাসের কারণ সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "আমরা জানি বিপন্ন মানুষই কেবল ভয়ত্রাতা ও ভরসাদাতা আল্লা ভগবানকে স্মরণ করে। স্রষ্টার ও শক্রশক্তির উদ্ভব এ ভয়-ভরসার কারণেই।"[৭৭] মানুষ নিজের কল্যাণের জন্যই অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন আসমানী স্রষ্টার সৃষ্টি করেছে। স্রষ্টা থেকেই শাস্ত্রের উদ্ভব। দুর্বল মানুষের ভয়-ভরসার আশ্রয়স্থল হল স্রষ্টা এবং শাস্ত্র। আহমদ শরীফের মতে, "অজ্ঞ অসহায় মানুষের মনোভূমেই জন্ম এ স্রষ্টা, সৃষ্টি ও শাস্ত্রতত্ত্বের।"[৭৮] ভক্তরা স্রষ্টাকে স্বয়ম্ভূ হিসাবে কল্পনা করে। সাধারণ ভক্তরা যুক্তি দিয়ে স্রষ্টাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাসী মানুষ স্রষ্টাকে কল্পনা করে। বিশ্বাসীদের এ যুক্তি প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> সবাই বলে সবকিছুরই স্রষ্টা আছে, গাড়ি-বাড়ির, জামা-কাপড়ের, বই-পত্রের যেমন নির্মাতা আছে, তেমনি জগতেরও স্রষ্টা থাকার কথা। একথাগুলো যুক্তিনির্ভর। কিন্তু তারা স্রষ্টাকে স্বয়ম্ভূ বলে। বিজ্ঞান বলে - সবকিছু একাধিক উপদানে গঠিত। তা-ই যদি হয়, স্বয়ম্ভু স্রষ্টাও সম্ভবত একাধিক উপাদানের সমষ্টি। তাহলে তাঁর আগেও কিছু উপাদান ছিল; তাছাড়া খালি-খোলা স্থান ও কাল পরিসরও ছিল; নইলে স্রষ্টার স্বয়ম্ভু হওয়ার ঠাঁই মিলত কোথায়! স্রষ্টার অস্তিত্ব লাভের আগেই যদি স্বয়ম্ভু হবার প্রতিবেশ স্বয়ং তৈরি হয়ে থাকে, তা হলে অন্যকিছুরও স্বয়ম্ভু হবার পথে বাধা কী? কাজেই স্রষ্টাতত্ত্ব টেকে না। অনেকটা এমনি যুক্তিতেই নিরাত্ম আজীবিক বৈশেষিকরা, চার্বাক বৌদ্ধরা নাস্তিক।[৭৯]

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে মোতাজিলা সম্প্রদায় স্রষ্টা এবং স্রষ্টা সৃষ্ট শাস্ত্রকে পৃথক হিসাবে দেখেছেন। তাঁরা স্রষ্টাকে স্বয়ম্ভু হিসাবে দেখেছেন কিন্তু শাস্ত্রকে নয়। সুফিবাদের সৃষ্টিতত্ত্বে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিলনের রসায়ন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ এবং সুফিবাদের রূপান্তরিত রূপ বাউলতত্ত্বে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মিলন দেখানো হয়েছে।

---

[৭৬] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ৪৭

[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

স্রষ্টায় বিশ্বাস থাকলেও সব মানুষের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বিশ্বাস একই রকম নয়। সময়ে সময়ে এবং স্থান ভেদে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস একই রকম থাকে না। আদিম মানুষের সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস এবং বর্তমান সময়ের বিশ্বাস একই রকম নয়। আবার একই সময়ে একই স্থানের সব বিশ্বাসী মানুষ একই রকমভাবে স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না। স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য উপাসনার পদ্ধতিও ভিন্ন। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "স্থানান্তরে ও গোত্রান্তরে কল্পনার মাত্রা ও বিশ্বাসের ভিত্তি অনুযায়ী স্রষ্টা, সৃষ্টি, জগৎ, জন্ম, জীবন, মৃত্যু এবং তার পরবর্তী পরিণাম সম্বন্ধে বহু, বিবিধ ও বিচিত্র ভাব-চিন্তা-অনুভব উপলব্ধি স্থানিক, কালিক, ও গৌত্রিক ভাবে প্রকাশ, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।"[৮০] স্রষ্টা নারী না পুরুষ, সাকার না নিরাকার, জগতের মধ্যে আছেন না জগতের বাইরে অবস্থান করছেন এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক নিয়ে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, সর্বধরেশ্বরবাদ ইত্যাদি নামে মতবাদ সৃষ্টি হয়ে। আহমদ শরীফ পরিষ্কার করে লিখেছেন,

> স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গতানুগতিক চিন্তা-চেতনায় প্রায় সব মানুষই অভিন্ন মতের হলেও তাঁর রূপ-স্বরূপ, তাঁর শক্তির ও গুণের ধরন, তাঁর উদ্দেশ্য-অভিপ্রায়, তাঁর সঙ্গে সৃষ্টের সম্পর্ক ও তাঁর প্রতি সৃষ্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জগতের ও জীবনের পরিণাম প্রভৃতি সম্বন্ধে স্থানিক-কালিক ও গৌত্রিক ধারণার বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য দেখে সন্দেহ থাকে না যে এ সব বিভিন্ন কালের, স্থানের ও গোত্রের মানুষের চাওয়া-পাওয়ার-সমস্যা-সংকটের পৃষ্টপটে ও পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনার, জ্ঞানের, বুদ্ধির, অনুভূতির ও উপলব্ধির স্তর মান ও মাত্রা অনুযায়ী অদৃশ্য রূপময় গুণময় শক্তিময় স্বৈর-স্বেচ্ছাময় ও লীলাময় স্রষ্টা কল্পিত ও পরিকল্পিত। কাজেই শাস্ত্র মাত্রেই স্থানিক-কালিক-গৌত্রিক তথা দলবদ্ধ সহযাত্রী সহযোগী সহবাসী মানুষের যৌথজীবনে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক প্রয়োজনে বানানো হয়েছে।[৮১]

স্রষ্টায় বিশ্বাস থেকে বিশ্বে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়নি। আহমদ শরীফ মনে করেন রক্তপাত, হানাহানি, মানুষে মানুষে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির মূল কারণ শাস্ত্র।[৮২] শাস্ত্র মানুষের প্রয়োজনে মানুষই সৃষ্টি করেছে। স্রষ্টার মুখ দিয়ে শুধু বলিয়ে নিয়েছে।

স্রষ্টায় বিশ্বাস থেকেই অধ্যাত্মজ্ঞানের সৃষ্টি। অধ্যাত্মজ্ঞান কল্পনা নির্ভর। আহমদ শরীফের মতে, ''মানুষের অধ্যাত্মজ্ঞানের উৎস হচ্ছে কল্পনা। যুক্তি ও বুদ্ধি সমর্থিত কল্পনাই অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত করে এবং আস্থাভাজনের মুখে তা উচ্চারিত হলে সাধারণ মানুষ তা অবিসম্বাদিত সত্য বলে মেনে নেয়।''[৮৩] অধিবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিদ্যা দুটোর মূল ভিত্তি বিশ্বাস, কল্পনা। "আধ্যাত্মিকতা মাত্রেরই উদ্ভব, স্থিতি ও প্রসার কল্পনায়, বিশ্বাসে, ভয়ে ও ভাবনায়।"[৮৪] যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা-বিশ্লেষণ অধিবিদ্যা এবং আধ্যাত্মিকতায় চলে না। আধ্যাত্মিকতা অধিবিদ্যার অংশ মাত্র। অধিবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিদ্যা গুরুর মুখে,

[৮০] আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী -৪*, পৃ. ৪৯
[৮১] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ৮৬
[৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
[৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

ওস্তাদের কাছে শুনে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুর জ্ঞান নিয়ে সংশয় এ বিদ্যায় চলে না। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "অধিবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা দুটোই কল্পনার, বুদ্ধির আপাত সঙ্গত ও সমন্বিত প্রয়াসের প্রসূন, সেজন্যে এ বিদ্যা শুরু থেকেই গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু এতে কোন জড় বাস্তব বাহ্য প্রমাণ প্রয়োগ সম্ভব নয়, সেহেতু গুরুমুখে শোনা তত্ত্ব ও তথ্যই চরম ও পরম বলে মানতেই হত। এ বিদ্যার নাম পরাবিদ্যা বা পরাজ্ঞান তথা ব্রহ্মবিদ্যা।"[৮৫] পরাবিদ্যার অনুশীলন করতে গিয়ে গুরু-ওস্তাদ, মোল্লা-পুরোহিত, শ্রমণ-শ্রাবক-ভিক্ষু-মুনি-ঋষি শ্রেণির পরান্ন ও পরশ্রমজীবী নিশ্চিন্ত-নিষ্কর্মা জ্ঞান-প্রজ্ঞাধারী সিদ্ধ-সাধক সমাজের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ঘটে। সাধু-সন্নাসী-ব্রহ্মচারী-যোগী-ফকির-দরবেশ শ্রেনির উদ্ভব বিকাশ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় একই ভাবে।[৮৬]

অধিবিদ্যার আলোচনায় অনেকখানি স্থান দখল করে আছে মন। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উপলব্ধি, ভাব-চিন্তা-চেতনার চৈতন্যগত সমষ্টিকে আহমদ শরীফ জীবন নামে অভিহিত করেছেন। আর এসবের সমষ্টি হচ্ছে মন। মন দিয়ে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা অনুভব করা যায়। মন সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "অনুভব-উপলব্ধির ভাব-চিন্তা-চেতনা-সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, কাম-প্রেম, স্নেহ-মমতা, প্রীতি-ভালবাসা, লোভ-ক্ষোভ-ক্রোধ, ইচ্ছা-অভিলাষ, হিংসা-ঘৃণা-অসূয়া-রিরংসা প্রভৃতি সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ অনুভবের গ্রাহক, সঞ্চালক, নিয়ন্ত্রক হচ্ছে মন।"[৮৭] মনকে আহমদ শরীফ স্বাধীন হিসাবে দেখেছেন। তাঁর মতে, "মন মাত্রই মূলে স্বাধীন বটে, বিশ্ব তার বিচরণ ক্ষেত্র। মনোবিমানের গতি-প্রকৃতিও অতুল্য, অসামান্য। শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব সবার মনই সমান স্বাধীন।"[৮৮] মন শুধু স্বাধীন নয় মুক্তও। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "মন আছে বলেই মানুষ জীব মাত্র নয়। এ মন এক বিচিত্র অস্তিত্ব। তার মেজাজ বন্ধনভীরু। সে মঙ্গলের চেয়ে মুক্তিকেই বেশি পছন্দ করে।"[৮৯] মনকে স্বাধীন হিসাবে অভিহিত করলেও তিনি মনে করেন মন স্বাধীন নয়। মন স্বাধীনতা চায় কিন্তু পায় না। পারিবারিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক নানা বাঁধনে মন সর্বক্ষণ অবরুদ্ধ। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "সামাজিক জীবনে মানুষের মনই যথার্থ অর্থে সর্বক্ষণ কারারুদ্ধ। খাঁচার পাখির মতো সে সর্বক্ষণ ছটফট করে; এমনকি স্বপ্নেও, অবসর সময়েও, নিঃসঙ্গ নিরালায়ও। তার কারণ সে যা চায় তা পায় না।"[৯০]

দেহ ও মন পরস্পর নির্ভরশীল। দেহ অসুস্থ থাকলে মন ভাল থাকে না। দেহের প্রভাব মনের উপর পড়ে। মনের প্রভাব দেহের উপর থাকে। "বাস্তবজগতের মতো মনোজগতের অলিগলিও কম নয়,

[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১
[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১
[৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

মনোজগতের পরিসর সামান্য নয়, বিচিত্রও।"[৯১] কোন মানুষ যদি হুকুমের দাস হয় তার মন স্বাধীন হবে এমন ভাবাই যায় না। আহমদ শরীফ এ-সম্পর্কে লিখেছেন, "দেহের মুক্তি না থাকলে অর্থাৎ লোকটা যদি কারো হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার পাত্র হয়, তা হলে তার মন-বুদ্ধিও হয় বিকৃত ও বিলুপ্ত টবের গাছের মতো বৃদ্ধিরিক্ত।"[৯২] আহমদ শরীফ অধিবিদ্যার মূলসূত্রগুলোতে আস্থাশীল ছিলেন না। যৌক্তিকদৃষ্টবাদীদের মত তিনিও অধিবিদ্যার অসারতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে অধিবিদ্যা মানুষের জীবনে কোন কাজে আসে না। অধিবিদ্যা মানুষকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষকে চিন্তা করতে অক্ষম করে তোলে। মানুষের স্বকীয় সত্তাকে অধিবিদ্যা জরাজীর্ণ করে তোলে। পরকাল, আত্মার অমরত্ব স্বর্গ-নরক ইত্যাদি মানুষের কল্পনার বিষয়। স্বর্গ-নরক, ইহকাল-পরকাল, অমরত্ব, আত্মা ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতিক সত্তা সম্পর্কে আহমদ শরীফ নিজের অবস্থান বর্ণনা করে লিখেছেন, "আমি যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বুঝি এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করি যে মৃত্যুর পরে আর জীবন থাকতে পারে না, এ-ও জানি এবং মানি যে আত্মা বলে কিছুই নেই – কাজেই জন্মান্তর, অমরত্ব, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক বলেও কিছু থাকতে পারে না। কেঁচো থেকে হাতি অবধি সব প্রাণীরই জন্ম-মৃত্যুর পদ্ধতি অভিন্ন।"[৯৩]

স্রষ্টা এবং শাস্ত্র দুটোই বিশ্বাস নির্ভর। শাস্ত্রে যুক্তি চলে না। শাস্ত্র নির্ভর মানুষ উদার ও মানবিক হতে পারে না। এ সম্পর্কে আহমেদ শরীফ লিখেছেন,

> শাস্ত্র হচ্ছে কার্যত বিধি-নিষেধের সমষ্টি ও আকর। ওই আচরণ বিধি নিষেধ মানা-না-মানার উপর নির্ভর করে স্বর্গবাস ও সর্বনাশ। তাই শাস্ত্রমানা মানুষ উদারতার অনুশীলনও করতে পারে না। তার মূল কারণ, যাঁরা তাঁদের জীবনদর্শন, জীবন ও জগৎ চেতনা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-সত্য লাভ করেছেন অরণ্য-পর্বতের নির্জনতায়, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার ফলে এক অদৃশ্য অলৌকিক স্বয়ম্ভুশক্তি পরমের কৃপায়। কাজেই তাঁদের জীবনদর্শনটি মূলে অপার্থিব উৎসসম্ভূত তথা বিশ্বাসসঞ্জাত; যুক্তি-বুদ্ধি প্রসূত নয়।[৯৪]

অধিবিদ্যার আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ধর্ম। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ছিল। যদিও সব মানুষের সব কালে ধর্মবিশ্বাস একই রকম নয়। ধর্ম সম্পর্কে আহমদ শরীফের রয়েছে নিজস্ব চিন্তা। ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ধর্ম বলতে ঈশ্বর, ভূত-প্রেত, জীব-যাদু, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক এবং স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল সমন্বিত এক বিরাট-বিপুল চির রহস্যাবৃত মায়াময় কল্পলোক বা মানস-জগৎ বোঝায় – যার জটিল আলো-আঁধারীর মধ্যে রয়েছে আমাদের বাস্তব জীবনের সম্পদ ও সমস্যার, আনন্দ ও যন্ত্রণার, স্বপ্ন ও সত্যের রহস্য সূত্র।"[৯৫] বিশ্বের সব দেশের মানুষই কম বেশি ধর্মে বিশ্বাস করে। ধর্মহীন মানুষও রয়েছে। আহমদ শরীফ মনে করেন, "ধর্ম-বিরহী দেশ নেই। এবং শাস্ত্রীয়

[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

ধর্ম আচারিক, আনুষ্ঠানিক আর পার্বণিক ধর্ম মানুষের আটপৌরে জীবনে চেতন-অচেতন ভাবে জড়িয়ে আছে।”[৯৬] ধর্ম দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি হয়নি। মানুষ নিজের প্রয়োজনেই ধর্ম সৃষ্টি করেছে। আহমদ শরীফ ধর্মের সময়োপযোগী পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “দেশ-কালের প্রয়োজন নিরপেক্ষ কোনো ধর্মের যে উদ্ভব হয়নি এবং কোনো ধর্মই যে সর্বকালিক, সর্বদৈশিক কিংবা সর্বমানবিক হতে পারে না, ধর্মকে অপরিবর্তিতরূপে আঁকড়ে ধরে রাখলে, তা যে জীবনের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, তার যুগোপযোগী সংস্কার কিংবা পরিবর্তন যে দরকার, তা সাধারণ লোক বোঝে না।”[৯৭] বাঙালির ধর্ম নিয়ে আহমদ শরীফ বিশেষভাবে আলোচনা করেছে। তাঁর মতে সাংখ্য ও যোগ দুই শাস্ত্রই বাঙালির আদি ধর্ম দর্শন।[৯৮] এর পর বাঙালির জীবনে শত মত ও পথের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বাঙালির জীবন ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই। নতুন ধর্ম-দর্শন বাঙালি গ্রহণ করেছে কিন্তু জীবন-যাপন পদ্ধতিতে সে ধর্মের প্রভাব সামান্যই থেকেছে। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> বাঙালির ধর্মতত্ত্বে পাপ-পুণ্যের কথা বেশি নেই। অনেক করে রয়েছে জীবন-রহস্য জানবার ও বুঝবার প্রয়াস। লোক-জীবনে সে-প্রয়াস আজও অবিরল। মনে হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোক-জীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী-চিন্তার মাহাত্ম্য-প্রলেপে বাস্তব জীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে এই নির্মিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ।[৯৯]

ধর্ম মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকলেও বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলের জন্য আসমানি অলৌকিক-অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর বিশ্বাস কমিয়ে আনা প্রয়োজন। আহমদ শরীফ মনে করেন বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের অগ্রসর মানুষের চেষ্টার ফলে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাঁর মতে, “ধর্ম মানুষ ছাড়বে না। তবুও ধর্মবোধের পরিবর্তন সাধন সম্ভব এবং এই লক্ষ্যেই চিন্তাবিদদের ও রাষ্ট্রনায়কের প্রয়াস নিয়োজিত হওয়া আবশ্যিক।”[১০০] আহমদ শরীফ যুক্তির আলোকে এবং বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মানুষের কল্যাণে তিনি ধর্মকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। নাস্তিকতাকে গুরুত্ব দিলেও তিনি ধর্মহীন নয় ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ নির্মাণে গুরুত্ব দিয়েছেন।

---

[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০
[৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪
[১০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

মূল্যবিদ্যা

আহমদ শরীফের মূল্যবিদ্যা ব্যাপক। তিনি নির্দিষ্ট আদর্শের আলোকে রাষ্ট্র, নীতি এবং শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এগুলো মূল্যবিদ্যার আলোচনার বিষয়। মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলোকে তিনি প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আহমদ শরীফের রাষ্ট্রচিন্তা, নীতিচিন্তা এবং শিক্ষাচিন্তা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর মূল্যবিদ্যা আলোচনা করা হবে।

রাষ্ট্রচিন্তা

আহমদ শরীফ জন্মগ্রহণ করেছেন ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে আহমদ শরীফের কর্মক্ষেত্র। তাঁর চিন্তা-চেতনা বিকশিত হয়েছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রেই। স্বাধীন বাংলাদেশে আহমদ শরীফ স্বাধীনতার স্বাদ স্বরূপে দেখতে পাননি। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নানা অসঙ্গতি নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। আহমদ শরীফের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অসঙ্গতি-সঙ্গতি, শোষণ-বঞ্চনা ও প্রতারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সমন্বিত রূপই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক গবেষক। তাই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ-রাষ্ট্রের মধ্যে তিনি যা দেখেছেন তার উপর ভিত্তি করেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা বিকশিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক।

আহমদ শরীফ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন না। কিন্তু এদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন,

> শেখ মুজিবের আমলে যখন ‘জাসদ’ নামে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে ওঠে, তাদের সভাগুলোতে বক্তৃতা দিয়ে গোড়া থেকেই সাহায্য সহযোগিতা করে আসছি। আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে ঐসময় যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তারপর ‘অরণি’ ‘বাসদ’ প্রভৃতির অনুষ্ঠানেও বক্তৃতা দিয়েছি। পরে এক সময়ে সাতাশটি সাংস্কৃতিক দলের জোট গঠিত হলে আমি সভাপতির পদ গ্রহণ করি। ১৯৮৪ সালে প্রখ্যাত হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হবার পরে এই জোটের বিলুপ্তি ঘটে। তবে আমি প্রায় দশ বছর ধরে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাই। আমার ৩৭ নম্বর ফুলার রোডের বাসায় এবং পরে ১২৬ নম্বর নিউ ইস্কাটন রোডস্থ বাসায় বামপন্থী নেতাদের প্রায় দশ/বারটা বৈঠকের ব্যবস্থা করি। এই সব সভায় সর্বজনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, বদরউদ্দীন উমর, রনো, রাশেদ খান মেনন, শান্তি সেন, দেবেন শিকদার প্রমুখ ১২/১৪ জন নেতা উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে আমার প্রয়াস কখনো সফল হয়নি।[১০১]

[১০১] আহমদ শরীফ, *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*, পৃ. ১০০, ১০১

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আহমদ শরীফের সম্পৃক্ততার বিবরণ দিয়ে অজয় রায় লিখেছেন, "তিনি রাজনীতিকে দেখেছেন একাডেমিক দিক থেকে, সরাসরি সম্পৃক্ত হননি। কিন্তু আশির দশকে বা তারও আগে থেকে জাতীয়ভাবে ব্যবহারিক রাজনীতিতে তাঁর সম্পৃক্ততা বেড়েছে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যভুক্ত হননি।"[১০২] তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের এক ধরনের দার্শনিক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতাদের আহমদ শরীফের বাসায় যাতায়াত ছিল। আহমদ শরীফের আড্ডায় বামপন্থীদের উপস্থিতিও থাকতো।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চার বছর পর আহমদ শরীফের জন্ম। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক জগত গড়ে ওঠে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের অনুসারীদের উত্থানকালে। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে আমাদের দেশে মার্কসবাদ জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত হতে থাকে। তার কারণ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দুনিয়ায় দরিদ্র দেশের মানুষ পুরোনো 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'বাদ সমর্থিত কেড়ে-মেরে-শোষণে-বঞ্চনায় বাঁচার তত্ত্বে আস্থা হারিয়ে সম স্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে মার্কসীয় বন্টনে বাঁচাতত্ত্বে ভরসা রাখে।"[১০৩] আহমদ শরীফ নিজেও সমাজতন্ত্রীদের অনুসারী-অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তাঁর চিন্তায় বাংলা, বাংলাদেশ, বাঙালিত্ব, গণমানুষের মুক্তি এবং বাঙালির জীবন-জগত বারবার এসেছে। বাংলাদেশের মানুষের তিনি আত্মিক, মানসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক মুক্তি চেয়েছে। এসব তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার অর্ন্তগত।

দেশ বা রাষ্ট্রকে আহমদ শরীফ যান্ত্রিক মনে করেননি। রাষ্ট্র স্থিরও নয়। রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রীয় আয়তনের পরিবর্তন হয়। নতুন নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। তিনি মনে করেন, "দেশ বা রাষ্ট্র হচ্ছে জাহাজ, বিমান কিংবা রেলগাড়ির মত।"[১০৪] মানুষের কল্যাণে মানুষই রাষ্ট্র গঠন করেছে। লক, হবস, রুশোর দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হচ্ছে চুক্তির ফল। মানুষই চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। আহমদ শরীফের মতে রাষ্ট্র বহু মানুষের কল্যাণের জন্যে গড়ে ওঠেছে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মনের ও চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বজনীন আগ্রহের ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে না হলেও বহুজনহিত ও বহুজনসুখকামী মানুষের চেষ্টায় 'ভালো হও, ভালবাস এবং ভালো করো' নীতিভিত্তিক কিছু সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এ নীতি-আদর্শেরই প্রমূর্তরূপ।"[১০৫] যন্ত্র সম্পর্কে দক্ষতা না থাকলে যন্ত্র চালানো যায় না। বাসের চালক দিয়ে উড়োজাহাজ চালানো যায় না। দন্ত চিকিৎসক দিয়ে চোখের চিকিৎসা হয় না। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও দক্ষতার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "যন্ত্রের নির্মাণে, প্রয়োগে ও শোধনে যেমন

---

[১০২] অজয় রায়, ''অধ্যাপক আহমদ শরীফ : জীবন ও সাধনা'', *স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ সংকলিত আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ*, পৃ. ১৬৬

[১০৩] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ৬২

[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

যন্ত্রবিদের পূর্ণ পটুতা থাকা আবশ্যিক, তেমনি ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা বা দৃষ্টি থাকলেই আপেক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটা সুসমঞ্জস সমাজ বা রাষ্ট্র চালু রাখা সম্ভব।”[১০৬]

রাষ্ট্র চিরস্থায়ী নয়। রাষ্ট্র ভেঙ্গে নতুন রাষ্ট্র হয়। রাষ্ট্রের আয়তন পরিবর্তিত হয়। রাষ্ট্রের আদর্শ বদলায়, শাসক যায়, শাসক আসে, শাসন কাঠামো পরিবর্তিত হয়। রাষ্ট্রীয় চেতনার পরিবর্তন হয়। রাষ্ট্রীয় চেতনাকে আহমদ শরীফ কৃত্রিম হিসাবে অভিহিত করে লিখেছেন, “রাষ্ট্রীক জাতিচেতনা যে নিতান্ত কৃত্রিম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার সঙ্গে তার জন্ম-মৃত্যু ঘটে।”[১০৭] বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের যে আয়তন ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার আগে সে রকম ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্ধারিত হয় এবং পূর্বের আদর্শের মৃত্যু ঘটে। এ জন্য বাঙালি জাতিকে রক্ত দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শই বাংলাদেশের আদর্শ।

স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিককে মুক্তিকামী, যুক্তিবাদী এবং সকল অন্ধতা-অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে হয়। রাষ্ট্রের নাগরিক তার নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে সে রাষ্ট্রে জনকল্যাণ ব্যাহত হয়। আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক হল সেই রাষ্ট্রের নাগরিক। আহমদ শরীফ মনে করেন, “স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিককে অবশ্যই মুক্তিকামী হতে হবে। সে মুক্তি চাইবে অশিক্ষা থেকে, সংস্কার থেকে, অন্ধতা থেকে, অজ্ঞতা থেকে, অকল্যাণ থেকে, লিপ্সা থেকে, স্বার্থপরতা থেকে অনুদারতা থেকে, অতীত প্রীতি থেকে, স্থিতির মোহ থেকে। তাহলেই কেবল সরকার ও সাধারণ মানুষ কল্যাণকর নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম সহ্য করার, গ্রহণ করার যোগ্য হবে।”[১০৮] চিন্তা করার, চিন্তা প্রকাশ করার, প্রচার করার অধিকার না থাকলে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা থাকা না-থাকা সমান কথা।[১০৯] মানুষের স্বভাব সে স্বাধীন। বদ্ধ জলাশয়ে সে থাকতে চায় না। তারপরও কিছু মানুষ জিয়ল মাছের মত থাকতেই ভালবাসে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা বেশি। এরা স্বৈরাচার গণবিদ্বেষী সরকারের সঙ্গে থাকে বা তার আশপাশ থেকে খুদ-কুঁড়া সংগ্রহ করে। “সরকার ঘেঁষারা হলেন কোকিল – সরকারেরও সুদিনের সুহৃদ।”[১১০] এসব মানুষের স্বাধীন সত্তা থাকে না। কর্মদ্বারা মানুষ সমাজে-রাষ্ট্রে তাঁর অবস্থান নির্ধারণ করে। সমাজে মানুষের অবস্থান নিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন, “জীবিতকালে সমাজেও অবস্থান ও কৃতি ভেদে কেউ আবদুল্যা, কেউ আবদুল, কেউ আবদুল মিয়া, কেউ আবদুল সাহেব, কেউ মাননীয় আবদুল, কেউবা মহামান্য আবদুল।”[১১১] ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হন। কর্মগুণেই মহাত্মা, মহামানব, বিদ্যাসাগর

---

[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭
[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮
[১০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২
[১০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২
[১১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬
[১১১] আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী -৪*, পৃ. ৯৪

ইত্যাদি উপাধির তলে মানুষের পারিবারিক নাম অনেক সময় হারিয়ে যায়। স্বৈরাচার, দেশবন্ধু ইত্যাদিও মানুষের কর্মের ফল। উপাধিগুলো নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষ বেঁচে থাকে।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আগে ছোট ছোট রাজ্য ছিল। তারো আগে ছিল গোত্র। গোত্র প্রধানরাই ছিল সে সমাজের আইন-কানুন। রাজাও ছিল অনেকটা তা-ই। রাজাই ছিল রাষ্ট্র। রাজা রাষ্ট্র দখল করত। রাষ্ট্রের সম্পদ রাজার সম্পত্তি। রাজার খুশিতে সবাই খুশি। জনগণের নিজস্ব সম্পদ বলতে কিছু ছিল না। রাষ্ট্রের সাথে জনগণের সম্পর্কও ছিল না। আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নায়ক রাষ্ট্রের সম্পদ বা রাষ্ট্রের মালিক নন। তিনি শুধু পরিচালক মাত্র। জনগণ ইচ্ছা করলে পরিচালক পরিবর্তন করতে পারে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সম্পদের মালিক জনগণ। গণপ্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নায়ককে মহাধ্যক্ষের সঙ্গে তুলনা করে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "আগে রাজ্য ছিল রাজার অর্জিত সম্পদ – একেবারে লাখরাজ মালিকানা ছিল তাঁরই। এখনকার রাষ্ট্র হচ্ছে সমবায় সংস্থা – রাষ্ট্রনায়ক তার প্রধান পরিচালক বা মহাধ্যক্ষ মাত্র।"[১১২] তিনি অবশ্য বলেছেন, "রাজ্য হয়েছে রাষ্ট্র।"[১১৩] ছোট ছোট রাজ্যের রূপান্তরিত রূপই আধুনিক রাষ্ট্র।

আহমদ শরীফ মার্কসবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের অনুসারী। বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুসারীদের সঙ্গে আহমদ শরীফের সখ্যতা ছিল। কার্ল মার্কসকে তিনি আদর্শ মনে করতেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "একালে ইউটোপিয়ান সমাজবিজ্ঞানীরা জনকল্যাণকর্মীরা শোষণমুক্ত সমাজচিন্তায় তাত্ত্বিক সাফল্য অর্জন করলেও কার্ল মার্কসই প্রথম শোষণ মুক্ত আর্থসামাজিক সাম্যের সমাজের মূল সূত্র উদ্ভাবন করে জগতে যুগান্তর ঘটিয়েছেন – নতুন পৃথিবী, মানুষ ও সমাজ সৃষ্টির উপায় বাতলেছেন। আর লেনিন দেখিয়েছেন তার বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ।"[১১৪] সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আগে দাস সমাজ ব্যবস্থা, সামন্তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। মানুষের আন্দোলন এবং গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দাস প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। দাসদের শ্রমের উপর ভিত্তি করেই পুঁজি গড়ে ওঠেছে। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "আত্মপ্রসারকামী সাহসী লিপ্সু শক্তিমানই ভীরু-দুর্বল-স্বল্পবুদ্ধি মানুষের জান-মালের, গতরের মালিক হয়ে চালু করল দাসপ্রথা, বশ করল দুর্বলকে। গোষ্ঠীর সংরক্ষক সরদারও ক্রমে হয়ে উঠল স্বৈরশাসক। পুরোহিতের ও শাহ-সামন্ততন্ত্রের রাজার, রাজ্যের উদ্ভব এভাবেই। তারপর গণচেতনার, গণদাবির ও গণবিদ্রোহের মুখে ক্রমে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে।"[১১৫] আহমদ শরীফ মনে করেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সমাজ থেকে সকল শোষণ-বৈষম্য, অসাম্য, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ এবং সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা দূর করা

---

[১১২] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ২২৮
[১১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
[১১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
[১১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থেকে তিনি লিখেছেন, "আর্থসামাজিক পীড়ন-শোষণ থেকে তথা সর্বপ্রকার জুলুম থেকে মানুষকে মুক্ত করার ও রাখার আজ অবধি উদ্ভাবিত শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।"[১১৬]

কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পর বিশ্বে রাষ্ট্র সম্পর্কে আর কোন মতবাদ আসেনি। মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্বকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ হিসাবে স্বীকার করে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> আজ অবধি সমাজ বিন্যাসে ও সমাজ ব্যবস্থায় মার্কসবাদের বিকল্প কিংবা নতুনতর কোনো পথ-পদ্ধতি আবিষ্কার-উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি, সেহেতু আমাদের মার্কসীয়তত্ত্বের আলোকেই সমাজব্যবস্থা পরিমার্জন পরিশোধন মেরামত মাধ্যমে চালু রাখতেই হবে; যদি আমরা মানব প্রজাতির, মানব অবয়বের সবারই গুণ-শক্তি-বুদ্ধি নির্বিশেষে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার ও বাঁচিয়ে রাখার রাষ্ট্রগত দায়িত্ব স্বীকার করি।[১১৭]

মার্কসবাদকে আদর্শ হিসাবে নিয়ে তিনি সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, গণমানুষের জীবিকার নিরাপত্তার জন্য সমাজতন্ত্রই এ পর্যন্ত একমাত্র মতবাদ হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। মার্কসবাদের কিছু কিছু ভাল দিক পুঁজিবাদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> মার্কসই প্রথম আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য এ ধারণা দেন যে মানুষ মাত্রেরই রয়েছে অশনে বসনে নিবাসে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে চিকিৎসায় জন্মগ্রত অধিকার। সুস্থ-সমর্থ লোককে অর্থোপার্জনের অধিকার দান এবং রুগ্ন, শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, পাগল প্রভৃতি অসমর্থদের ভাতা দিয়ে পালন করাই হচ্ছে সরকারের তথা রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে প্রভাবিত হল বুর্জোয়ারাও, তাই তারা শোষিত জনদের কাজ দিয়ে ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার, অনাহার-মৃত্যু ঠেকানোর ব্যবস্থা করেছে-দায়িত্ব নিয়েছে।[১১৮]

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে বিশ্বের পুঁজিবাদী বুর্জোয়া ও কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো মানুষকে কাজ দিয়ে, বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করেনি। কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাও তখন ছিল না।

আহমদ শরীফ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন শোষণ-বঞ্চনা থেকে গণমানুষের মুক্তি ঘটবেই। তিনি লিখেছেন, "বিশ শতককের নিঃস্ব নিরন্ন শোষিত পীড়িত দলিত দমিত বঞ্চিত গণমানব তাদের ভাতে কাপড়ে ন্যূনতম মানবিক অধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে আশান্বিত ও আশ্বস্ত হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া চীন দেখে। পরে প্রত্যাশা পূরণ সম্বন্ধে প্রত্যয়ী হয়েও উঠেছিল – মনে করেছিল এ কেবল সময়ের ব্যাপার। শোষিত-

---

[১১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[১১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

[১১৮] আহমদ শরীফ, *সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ*, ড. নেহাল করিম (সংকলিত), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৯১

বঞ্চিত মানবের-মানবতার বিশ্বময় মুক্তি ঘটবেই।"[১১৯] মানবতার মুক্তির জন্য, শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমাজতন্ত্রকেই তিনি আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসাবে মনে করতেন। তাঁর ভাষায়, "দ্রুত আমূল সমাজ পরিবর্তনই তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই এ শোষণ-পীড়ন বঞ্চনার ও দুঃশাসন-দুর্নীতি-দুর্ভোগের আশু অবসান ঘটাতে পারে।"[১২০]

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মী প্রয়োজন। মার্কসবাদের বড় অঙ্গীকার মানবতাবাদ। আহমদ শরীফ মনে করেন একালে কেবল মার্কসবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীদের পক্ষেই মানবতাবাদী হওয়া সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "এ-কালে কেবল কম্যুনিস্টরাই আদর্শানুগত্যবশে মানববাদী হয়েছে। ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ মৌল মানবিক অধিকার পেয়ে স্বাধিকারের সম ও সহ স্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় জীবনে-জীবিকায় আশনে-বসনে নিবাসে-নিদানে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা নিয়ে সহাবস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।"[১২১]

বিশ্বের সব দেশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পরই কেবল বৈষম্য বিলোপ সম্ভব। একটি দুটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সমাজতন্ত্রের প্রকৃত সুফল মানুষ ভোগ করতে পারবে না। আহমদ শরীফের দৃষ্টিতে ধন বৈষম্য দূর করে প্রথমে ইকুয়ালিটি প্রতিষ্ঠার পর সবাই এই প্রক্রিয়ায় ধাতস্থ হয়ে গেলেই বিশ্বের মানুষ ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক লিবার্টি ভোগ করতে পারবে।[১২২] সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তির ও সমাজের মন, মনন ও বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করে পুঁজিবাদীদের-এ অপবাদ সত্য নয়। পুঁজিবাদীরা শোষণ এবং কর্তৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে অপবাদ দিয়ে থাকে।

সমাজতন্ত্র গণমানুষের মুক্তির একমাত্র মতবাদ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এই মতবাদ সমর্থন করে না। অথচ সমাজতন্ত্রই একমাত্র মতবাদ যা বিশ্বে মানুষের মৌলিক-মানবিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ-সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> আশৈশবের সংস্কার, অজ্ঞতা আর অনিশ্চয়তাও তাদের সমাজতন্ত্র ভীতির বা বিরাগের অন্যতম কারণ। শোষিত, নির্যাতিত কাঙাল মানুষ কোন প্রকারে অর্থ-সম্পদের অধিকারী হলে সে শোষিত-পীড়িত মানুষের প্রতি সদয় হয় না, বরং সে নতুন পীড়ক শোষক হয়ে দেখা দেয়। তাই দরিদ্র ঘরের শিক্ষিত মানুষরা নিতান্ত অন্ন বস্ত্রের কাঙাল না হলে 'সমাজতন্ত্র' সমর্থন করে না।[১২৩]

মানুষের দুঃখ-দুর্ভোগের কারণ হিসাবে আহমদ শরীফ মনে করেন রাজনীতিকরা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন না। ঠিকাদার-সদাগর-অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে ও তথাকথিত রাজনীতিকরাই রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা

---

[১১৯] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ২০০
[১২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬
[১২১] প্রাগুক্ত পৃ. ১৩০
[১২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
[১২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

করার কারণে গণমানুষ শোষণ-বঞ্চনার স্বীকার। সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে।[১২৪] আহমদ শরীফ বিশ্বাস করতেন বিশ্বের সব দেশেই কোন এক সময় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সম্পর্কে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমার যুক্তি এবং বুদ্ধি অনুসারে মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র সমাজতন্ত্র চালু করার আন্দোলনে নামবে অদূর ভবিষ্যতে।"[১২৫]

বিশ্বের অন্যন্য দেশের মত বাংলাদেশেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এদেশে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ শুরু হয়। এম এন রায়, মোজাফ্ফর আহমদ, অবনী মুখার্জী প্রমুখের মাধ্যমে এদেশে সমাজতন্ত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যদিও এম এন রায় শেষ পর্যন্ত র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে মার্কসবাদ পরিত্যাগ করে। তারপরও এদেশের বহু মানুষ মার্কসবাদী আদর্শে প্রভাবিত হয়। মার্কসবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা পথ ও মতের। ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হতে পারেনি। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> চল্লিশোত্তর বাংলায় সদ্য ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলিম সমাজে বামপন্থী রাজনীতি অনুপ্রবেশ করলেও বেকার শিক্ষিতের অভাবে তা প্রসারলাভ করতে পারেনি। এমনকি যেসব কিশোর-তরুণ মানবিক আবেগবশে কিংবা আদর্শিক প্রেরণাবশে এ পথে পা বাড়িয়েছিল, তারাও সহজলভ্য সুখ-সম্পদের লোভেরবশে কিংবা পারিবারিক দুঃখ-দৈন্যের তাগিদে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল – আপস করেছিল সনাতন নিয়ম-নীতির সঙ্গে।[১২৬]

নেতৃত্বের ব্যর্থতা, অযোগ্যতা, দলীয় কোন্দল, রাশিয়া ও চীনের বিরোধ ইত্যাদি মতাদর্শিক মতপার্থক্যের কারণেও এদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এগুতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বিকাশ মার্কসবাদীদের অবদানই বলতে হয়। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "প্রগতি সাহিত্য বাংলাদেশেরও সাহিত্যে কমুনিস্টদেরই সৃষ্টি। যেহেতু কম্যুনিস্টরা মুখ্যত গুরুবাদী ও তত্ত্বনিষ্ঠ, সেহেতু তাদের রচনায় একঘেয়ে আবর্তন আছে।"[১২৭] সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতনের পর মার্কসীয় সাহিত্যে মানুষের আকর্ষণ কমতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর সারা বিশ্বেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেরও বিপর্যয় দেখা দেয়। গণমানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে মার্কসবাদ ছাড়া অন্যকোন মতবাদ না দাঁড়ালেও মার্কসবাদী কর্মীরা কাস্তে-হাতুড়ি অঙ্কিত পতাকা বর্জন করে পুঁজিবাদী দলগুলোতে মিশে যেতে থাকে। এ-সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> আকস্মিকভাবে পূর্ব য়ুরোপে-সোভিয়েট রাশিয়ায় (এবং চীনেও কিছুটা) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে গেল। শুনে শেখা, শুনে আশ্বস্ত হওয়া, শুনে সমাজবাদী হওয়া গুরুবাদী অজ্ঞ উৎসাহী কম্যুনিস্টরা এ বিপর্যয়ে বিশ্বব্যাপী সর্বত্র যেন নিরাশা-হতাশায় নয় কেবল, ভুল

---

[১২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
[১২৫] আহমদ শরীফ, *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*, পৃ. ৯১
[১২৬] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ১৬০
[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

> মতাদর্শ সমর্থনের ও অনুসরণের জন্যে লজ্জিত এবং অনুশোচনায়ও যেন মর্মাহত। কাস্তে-হাতুড়ি অঙ্কিত পতাকা বর্জনে নয় শুধু, সঙ্ঘ-সমিতি-সংস্থাগুলোর নাম বদলেও হতে চাইল স্বস্থ – যেন তাদের কুমতলব-অপকর্ম হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে, অপরাধের নিন্দা-লজ্জা-শাস্তি এড়ানোর অপপ্রয়াসে সমাজবাদীদের অধিকাংশই দলছুট হয়ে বুর্জোয়া দলে ও মতে আদর্শিত হবার জন্যে ছুটোছুটি করতে থাকে–যেন পূর্ব য়ুরোপে রাশিয়ায় কিংবা দিকভ্রান্ত চীনে যেন মার্কসবাদের ব্যর্থতা ও অলীকতাই প্রমাণিত হয়ে গেল।[১২৮]

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর আহমদ শরীফ আস্থাশীল হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর উপর আস্থা রাখতে পারেননি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর মত সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে এ আশঙ্কা থেকে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "পুঁজিবাদী ও কম্যুনিস্ট বৃহৎ শক্তিগুলো নবতর সাম্রাজ্যবাদে আসক্ত। দুনিয়ার দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে তারা তাদের প্রভাবিত ও সংরক্ষিত তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে সচেষ্ট, যাতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের মতোই আর্থিক শোষণ চালু রাখা যায়। আদর্শবাদের নামে পর-প্রীতির আবরণে বিশ্বমানব-কল্যাণের অজুহাতে আত্মপুষ্টির এ এক আধুনিক উপায়।"[১২৯] আহমদ শরীফ যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় আধুনিকতা থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কামনা করেছেন। তিনি মনে করতেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "তৃতীয় মহাযুদ্ধ প্রয়োজন মানববাদের পূর্ণ স্বীকৃতির জন্যই। ছলনাময় বর্বরতা ও বঞ্চনার কবল থেকে বিশ্বমানবকে উদ্ধারের জন্যই তৃতীয় মহাযুদ্ধ আবশ্যিক। বৈনাশিক আঘাত-সংঘাতের বেদনা এবং ক্ষয়ক্ষতির অনুশোচনা ব্যতীত মনুষ্য-মন-মননের পরিবর্তন হয় না। তাই রক্তক্ষরা বেদনার প্রয়োজন, মর্মদাহী অনুশোচনা দরকার এবং দুটোই মেলে রক্তসাগরে ও জ্বলন্ত লাভাস্রোতে।"[১৩০] তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেলেই যে সমাজে-রাষ্ট্রে শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণার মাত্র কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছাবে তা বলা যায় না। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল আহমদ শরীফের হাইপোথিসিস। তবে তিনি মনে করেন, "সমাজে যুক্তিবাদী বিবেকবান মানুষ কিংবা নাস্তিকের সংখ্যা অন্তত অর্ধেক না হলে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, নির্মাণ-উৎপাদনে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের আর্থিক জীবনে প্রবঞ্চনা-প্রতারণার, ঠকাঠকির, শোষণ-বঞ্চনার অবসান বা হ্রাস বাঞ্ছিত মাত্রায় হবে না।"[১৩১] আহমদ শরীফ মনে করেন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য লোকের অভাব রয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমাদের এখন বড়ো অভাব চরিত্রের ও মানবপ্রেমী নেতার। আজ এমন কিছু চরিত্রবান নীতিনিষ্ঠ আদর্শপুষ্ট মানুষপ্রেমী লোক চাই যারা পরার্থে সমস্যা-তরঙ্গ-তাড়িত রাষ্ট্রনৌকার ধরবে হাল, তুলবে পাল, টানবে গুণ, চালাবে বাঞ্ছিত পথে।"[১৩২] একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আহমদ শরীফ স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীনতার

---

[১২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
[১৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
[১৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩
[১৩২] আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী -৪*, পৃ. ৩৮৩

মর্মবাণী দেখতে চেয়েছেন। তাঁর জীবনের অন্তিম ইচ্ছা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে আমি যেন চোখ মেলে দেখে যেতে পারি যে এ দেশে, এ মাটিতে, এ রাষ্ট্রে স্বাধীনতা তার নিঃসংশয় সর্বশেষ সত্যমূল্য ফিরে পেয়েছে।”[১৩৩]

রাষ্ট্র মানুষের জন্য। মানুষের কল্যাণে মানুষই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। রাষ্ট্রের মানুষ নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হলে রাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। আধুনিক গণপ্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্রে নাগরিকই রাষ্ট্রের সকল কিছুর মালিক। রাষ্ট্রের মানুষ সত্যিকারের শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানমনস্ক হলেই রাষ্ট্রে শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা হ্রাস পাবে। মানুষকে বাঁচানোর জন্য মানবাধিকারের জন্য শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা মুক্ত সমাজ, রাষ্ট্র গড়তে হবে। অধীতবিদ্যা এবং অভিজ্ঞতার আলোকেই আহমদ শরীফ মানুষ নামের মানবেতর প্রাণীকে মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করতে চেয়েছেন। এজন্য সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। সমাজ পরিবর্তনের জন্য যোগ্য দক্ষ যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষ প্রয়োজন। অতিপ্রাকৃতিক, অলৌকিক আসমানি শক্তির উপর আহমদ শরীফের আস্থা ছিল না। তিনি ভাববাদ পরিহার করে যুক্তিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ গ্রহণ করেছেন। যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপই হল আহমদ শরীফের রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি। তিনি যা দেখেছেন যা উপলব্ধি করেছেন তার আলোকেই রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্নও দেখেছেন।

নীতিচিন্তা

মানুষের আচরণের ভাল, মন্দ, ঔচিত্য, অনৌচিত্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা। সহজভাষায় বলা যায় নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের সঙ্গে যুক্ত। আহমদ শরীফ বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মধ্যে মানুষের নীতিবোধ, নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানুষের কল্যাণে তিনি নৈতিকতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। ইমানুয়েল কান্টের দর্শনের রূপরেখা আলোচনা শুরু করার আগে বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন, “ইমানুয়েল কান্টকে সাধারণত আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে সর্বোত্তম দার্শনিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। আমি এই মূল্যায়নের সঙ্গে একমত পোষণ করি না, কিন্তু তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে অস্বীকার করলে বোকামী হবে।”[১৩৪] আহমদ শরীফ পাশ্চাত্য নীতি- দার্শনিকদের অবদানকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি মনে করেন, মানুষের কল্যাণে পাশ্চাত্য নীতি দার্শনিকদের প্রবর্তিত নৈতিকতত্ত্ব কোন কাজে আসেনি। পাশ্চাত্যের নীতি-দার্শনিকদের নৈতিক মতবাদের সমালোচনা করে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

[১৩৩] আহমদ শরীফ, *অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ*, আমার কথা, ১৯৮৭ সালে ড. আহমদ শরীফ সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ।
[১৩৪] বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস - ৩*, ড. প্রদীপ রায় (অনূদিত), পৃ. ৩১

> ইমানুয়েল কান্ট, জি, ই, ম্যুর, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ দার্শনিক প্রচারিত এবং তাঁদের পূর্বের ও পরের দার্শনিক লিউ টলস্টয়, রোমা রঁলা প্রমুখ মানববাদীপ্রোক্ত নীতি ও নৈতিকতা তত্ত্ব কোনো নতুন সামাজিক-রাষ্ট্রিক-মানবিক মূল্যবোধ, বাস্তবে মানুষের বোধ-বোধিগত করাতে পারেনি। তাই এসব প্রয়াসের ফল আশু তো নয়ই, ভাবীকালেও ভবিতব্য বলে আস্থা রাখা স্বেচ্ছায় বিড়ম্বনাকে বরণ করারই নামান্তর।[১৩৫]

নৈতিক বাক্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সঠিক-বেঠিক ইত্যাদি নির্ধারণ করার চেয়ে মানুষের কল্যাণে নীতি কি হওয়া উচিত তা-ই নীতিচিন্তার আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

আহমদ শরীফের নীতিচিন্তা মানুষের কল্যাণের জন্য। একারণেই তাঁর নীতিচিন্তাকে ব্যবহারিক নীতিচিন্তা বলা হয়েছে। তিনি মানুষের ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে নীতির কথা বলেছেন। নীতিকে তিনি ধর্ম থেকে আলাদা করেছেন। নীতি এবং ধর্ম এক নয়। নীতি জাগতিক আর ধর্ম পরকাল বিষয়ক। ধর্মে ইহকালের কথা থাকলেও পরকালই মুখ্য। নীতি এবং ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "ধার্মিকতা ও নীতি নিষ্ঠা এক জিনিস নয়, Ethics মেনে চলা, Moralist হওয়া, ধার্মিক হওয়া এক কথা নয়। ধার্মিক হচ্ছে যন্ত্র। তার কোন চরিত্র নাই। যে Moralist হয়, তার কোন ধর্মের দরকার হয় না।"[১৩৬] নীতি নিষ্ঠ মানুষের কাছে ধর্ম গৌণ। আহমদ শরীফ মনে করেন, "নীতিনিষ্ঠ মানুষকে হিন্দু হতে হয় না, মুসলমান হতে হয় না, খ্রিস্টান হতে হয় না। নীতিনিষ্ঠ মানুষ হচ্ছে ব্যক্তি। সে ধর্মের কারণে নীতিনিষ্ঠ হয় না। সে যে সততার পরিচয় দেয়, দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয়, সে কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দেয়-এটা তার চরিত্র। এই যে নীতিনিষ্ঠা, এটা ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফল। আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ, আত্মবিশ্বাসী মানুষই তা পারে।"[১৩৭] আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ গঠনে পরিবার মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দুর্বৃত্তায়িত পরিবারের সন্তানের পক্ষে নীতিনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব। তারপরও হতে পারে যদি তার উপর পরিবারের চেয়ে অন্যকোন নীতিনিষ্ঠ মানুষের প্রভাব প্রবল থাকে। নীতিনিষ্ঠাকে ধর্ম থেকে আলাদা করার পর আহমদ শরীফ নীতিবিদ্যার মূলসূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

জি. ই. ম্যুর *প্রিন্সিপিয়া ইথিকা* গ্রন্থে প্রথম চারটি অধ্যায় 'ভালত্ব' এই ধারণাটির বিশ্লেষণ এবং সেই বিশ্লেষণলব্ধ তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। শেষ অধ্যায়ে প্রথম চারটি অধ্যায়ের উপসংহারের ভিত্তিতে তাঁর নিজস্ব আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।[১৩৮] ভাল নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে জি. ই. ম্যুর লিখেছেন, " 'ভালই হল ভাল', এবং এটাই হল এই প্রশ্নের শেষ উত্তর। অথবা যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় 'ভাল এর সংজ্ঞা কিভাবে দেয়া সম্ভব?' তাহলে আমি বলব, 'ভাল'-র সংজ্ঞা

---

[১৩৫] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ১৩১
[১৩৬] আহমদ শরীফ, *অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ*, পৃ. ৯৯
[১৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
[১৩৮] জি. ই. ম্যুর, *নীতিবিদ্যার মূলনীতি*, হাসনা বেগম (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

নিরূপণ সম্ভব নয়, এর বেশি এ সম্পর্কে অন্য আর কিছুই আমার বলার নেই।"[১৩৯] আহমদ শরীফ ভাল শব্দটি বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, "সংস্কৃত 'ভদ্রক' থেকে 'ভদ্র' ও 'ভালো' শব্দের উদ্ভব। আমরা জানি 'ভালো' সে-ই, যার হাতে কারো জীবন-জীবিকা কিংবা স্বার্থ ও সম্মান বিপন্ন হয় না, যার সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে নিরাপত্তার স্বতো-আশ্বাস এবং সাহায্য-সহায়তার ভরসা মেলে।"[১৪০] ভালো কে – এমন প্রশ্নের উত্তরে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ভালো সে-ই, যে কোনো অবস্থায় অনধিকার চর্চা করে না, স্বাধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে না, যে নিজে বাঁচতে জানে এবং বিপন্ন অসহায় অক্ষমকে বাঁচতে সাহায্য করে, 'Live and let live' যার জীবনের আদর্শ।"[১৪১] ভাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার পর আহমদ শরীফ সুখ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সুখ কী? সুখ কি সোনালি আকাশ না মেঘে ঢাকা তারা? সুখ কি বিষয়গত না বিষয়ীগত। এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আহমদ শরীফ সুখ সম্পর্কে লিখেছেন, "সুখ কী এবং কেমন - তা অস্পষ্টভাবে অনুভব এবং সচেতনভাবে উপলব্ধি সম্ভব হলেও এর সর্বজনবোধ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব কিংবা সহজ নয়। সুখ অবশ্যই ব্যক্তিক অনুভব-উপলব্ধির গম্য ও যোগ্য চেতনা। এক শব্দে এর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। তাই ঋণাত্মক গুণের অনস্তিত্ব বা অনুপস্থিতিই সুখ বলে মানতে হয়।"[১৪২] সুখ উপলব্ধির বিষয় হলেও আহমদ শরীফ সুখকে সংজ্ঞায়িত করে লিখেছেন, "এক কথায় জীবন-জীবিকার ও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের ও নাগরিকের সর্বপ্রকার জোর-জুলুমমুক্ত মানসিক ও শারীরিক স্থিতির, অবস্থার ও অবস্থানের নাম সুখ।"[১৪৩] 'সুখ তুমি কি বলো জানতে ইচ্ছে করে'। সত্যিই কী সুখকে জানা যায়?

সুখবাদীদের মতে সুখই একমাত্র কামনার বস্তু। উপযোগবাদীরা সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ কামনা করেছেন। উপযোগবাদ অনুসারে "উপযোগিতা অথবা অধিকতম আনন্দ নীতিকে নৈতিকতার ভিত্তি বলে গ্রহণ করে নেয়।"[১৪৪] আহমদ শরীফের মতে, প্রকৃত সুখ পেতে হলে মানুষকে যুক্তি আশ্রয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে। তিনি মনে করেন, "সুখ আমরা চাই বটে, কিন্তু পথ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে মতবিরোধের ফলে সুখ রাষ্ট্রিক জীবনেও অপ্রাপ্য, সামাজিক জীবনে অলব্ধ, পারিবারিক জীবনেও মরীচিকা। তাই সময়ের ও সমাজের চাহিদা মেটাতে আমরা অসমর্থ। অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান ও যুক্তি

---

[১৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
[১৪০] আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ১৬৮
[১৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
[১৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
[১৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
[১৪৪] জন স্টুয়ার্ট মিল, *উপযোগবাদ*, হাসনা বেগম, (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২২

আশ্রয়ী না হলে 'সুখ' আসে না, আসবে না।"[১৪৫] সুখ ব্যক্তিগত। কিন্তু সুখী সমাজ, সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়তে হলে সমাজের অধিকাংশ মানুষকে সুখের আওতায় আনতে হবে।

সুখের বিপরীত দুঃখ। পিতা-মাতার মৃত্যুতে দুঃখ। অপ্রাপ্তিতে দুঃখ। এসব ব্যক্তিগত। মানুষের মৌলিক চাহিদার অপ্রাপ্তিতে যে দুঃখ সমাজে সৃষ্টি হয় তা দূর করা সম্ভব। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ অর্থাৎ আহমদ শরীফের ভাষায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানো সম্ভব। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার যোগান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো দিতে সক্ষম হয়েছিল। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুখের বর্ণনা দিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "পারিবারিক সুখ আদর-কদর-প্রীতি-সদিচ্ছা-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি আর্থিক সাচ্ছল্য সম্পৃক্ত। তেমনি সামাজিক সুখের স্থিতি হচ্ছে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে। আর রাষ্ট্রিক সুখের প্রকটিত রূপ হচ্ছে আইনের প্রয়োগে রক্ষিত শৃঙ্খলা, শান্তি, জীবন-জীবিকায় নিরাপত্তা, নিরুপদ্রব আর্থিক-নৈতিক-সামাজিক-প্রশাসনিক ন্যায়নির্ভরতা।"[১৪৬] মানুষ সারা জীবন ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ কামনা করেছে। সুখের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে শাস্ত্র, মতবাদ ইত্যাদি।

সামাজিক সুখ প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট সুখের জন্য সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সদিচ্ছা প্রয়োজন। তেমনি রাষ্ট্রীয় সুখ প্রতিষ্ঠার জন্যও রাষ্ট্রের বেশিরভাগ লোককে কোন সুর্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে যাওয়াতেই কল্যাণ। পিছনের দিকে কল্যাণ নেই। আহমদ শরীফের একটি প্রবন্ধের নাম "পিছুটানে কল্যাণ নেই, কল্যাণ সম্মুখে"[১৪৭]। সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের ভেতর থেকেই নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। এই নেতার নেতৃত্বে মানুষের কল্যাণে নতুন সমাজ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন সুখই সমাজে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সমাজে সুখ প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশা, মুশা, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর, রামকৃষ্ণ চেষ্টা করেছেন। ফল খুব সুখকর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে স্থায়ী সুখ প্রতিষ্ঠা হয়েছে দাবি করা কঠিন।

সামাজিক জীবনের ভিত্তি নৈতিকতা। আত্মমর্যাদাবোধ, শিক্ষা, সুরুচির উপর ব্যক্তির নৈতিক জীবন অনেকখানি নির্ভর করে। আহমদ শরীফের ভাষায়, "শাস্ত্র নয়, সামাজিক শ্রেয়োনীতি নয়, সরকারি বিধি-নিষেধও নয়, ব্যক্তির জ্ঞান-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাপ্রসূত আত্মমর্যাদাবোধ, সুরুচি, লৌকিকতা, সৌজন্য, স্বলব্ধ জীবনদৃষ্টি এবং স্বঅর্জিত ন্যায়বুদ্ধিই মানুষকে নির্দিষ্ট জীবনাদর্শ গ্রহণের ও নীতিনিষ্ঠ থাকার প্রেরণা যোগায়।"[১৪৮] আহমদ শরীফ মনে করেন নীতিনিষ্ঠ মানুষেরাই সামাজিক অনাচার এবং জাল-জুয়া-শাঠ্য প্রভৃতি দুনীতি-দুর্বৃত্তি থেকে মুক্ত থাকে। শাস্ত্র মানুষকে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন থেকে মুক্ত রাখতে পারে না।

[১৪৫]আহমদ শরীফ, *দর্শনচিন্তা*, পৃ. ১৭৩
[১৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
[১৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
[১৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

মানুষের নীতিবোধ কিভাবে গড়ে উঠবে এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "মানুষ শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে পারিবার পরিজনের বিশ্বাস-সংস্কার-আচারের ও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের প্রভাবে জগৎ জীবন জীবিকা সম্বন্ধীয় মত-পথ-নীতি-আদর্শ বরণ গ্রহণ করে, সেহেতু পরিবারে বয়স্কদের মধ্যে নৈতিকচেতনা ও আচরণ অনুশীলিত হলে নতুন প্রজন্মের মানুষের সমাজ সাধারণভাবে বাঞ্ছিত মাত্রায় নীতিনিষ্ঠ হবে।"[১৪৯] পারিবার থেকে নৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি হবে এই যুক্তি অনেকটাই কান্টের শর্তহীন আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আহমদ শরীফ সে দিকে অগ্রসর হন নাই। তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছেন, "দেশে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে খেয়ে পরে বাঁচার সংগ্রামে পরিশ্রান্ত ও পর্যুদস্ত, সে-দেশে দার্শনিক কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) কথিত কামনা-বাসনার আবেগরিক্ত নৈতিকতা ও যুক্তি কিংবা তাত্ত্বিক শুভবুদ্ধি বা সদিচ্ছা কি মানুষের মন-মত-নীতি-আদর্শের পরিবর্তন ঘটাতে পারে!"[১৫০] মানুষকে নীতি-আদর্শের প্রতি অটল থাকতে হলে তার মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দরকার। কিছু মানুষ প্রচুর অর্থ-বৃত্তের মালিক হয়েও দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত। নৈতিক-মানবিক কোন গুণই দুর্বৃত্তদের মধ্যে দেখা যায় না। তবে এ কথাও সত্য, দুর্বৃত্ত, নীতি-আদর্শহীন মানুষ সমাজে বেশি নেই। দুর্বৃত্তদের সংখ্যা কম হলেও এদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অনেক সময় নীরব থাকে। সবসময় সাধারণ মানুষ নীরব থাকে না। কখনো কখনো প্রতিবাদী হয়, প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিবাদী মানুষের প্রচেষ্টাতে সমাজ ও রাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যায় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আদর্শবাদী মানুষের সংখ্যা বেশি হলে ভেজালদার-নকলবাজেরা সমাজে স্থান পায় না। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবন মোটামুটি নিরাপদ-নিরুপদ্রব করার জন্য অধিক সংখ্যক মানুষের নৈতিক চেতনা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "সমাজে যত বেশিসংখ্যক নীতিবান মানুষ থাকবে, সমাজের স্বাস্থ্য এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা ততবেশি দৃঢ় থাকবে। কাজেই সামন্ত-বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক সমাজে ব্যক্তিক মানুষের স্বাধিকারে নিরুপদ্রব নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার জন্যেই অধিকসংখ্যক নৈতিকচেতনাসম্পন্ন নাগরিক আবশ্যক।"[১৫১] মানুষের নিরাপদ-নিরুপদ্রব জীবন-যাপনের ভিত্তি হিসাবে আহমদ শরীফ নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

মানুষের নিরাপদ এবং সুস্থ জীবনের জন্য নৈতিকতা অপরিহার্য। আহমদ শরীফ মনে করেন, সংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধতা থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে যৌক্তিকসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সমাজে নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। অধিকসংখ্যক মানুষকে অভুক্ত রেখে কোন নৈতিক আদর্শই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ সত্য আহমদ শরীফ উপলব্ধি করেছেন অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক। দরিদ্র দেশের নিম্ন-আয়ের মানুষের জীবন তিনি দেখেছেন। উদ্বাস্তু মানুষের অসহায় জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

---

[১৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
[১৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০
[১৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে মানুষে মানুষে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এই বিভেদ কমিয়ে আনার জন্যও মানুষের নৈতিক জীবন উন্নত করা ছাড়া বিকল্প কিছু নেই।

আহমদ শরীফের নৈতিক চিন্তার ভিত্তি হল তিনি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের সুখ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সুখের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে তিনি মানুষকে সুখী দেখতে চেয়েছেন। কিভাবে মানুষ সমাজে ও রাষ্ট্রে সুখ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার নির্দেশনা আহমদ শরীফের নীতিচিন্তায় পাওয়া যায়। এজন্য আহমদ শরীফের নীতিচিন্তাকে ব্যবহারিক নীতিচিন্তা নামে অভিহিত করা হয়।

শিক্ষাচিন্তা

অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সঙ্গে শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে ও হবে এবং উদ্ভব হয়েছে নানা মত-পথ, তত্ত্ব ও মতবাদের। বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি মুসলিম দার্শনিক আহমদ শরীফ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে লিখেছেন। শিক্ষার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের শিক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ এবং সভা-সমিতিতে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> আমি ‘শিক্ষা’ বিষয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধই লিখেছি। সেগুলো আমার বিভিন্ন বইয়ে সংকলিত হয়েছে। এই শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলোর আলোচ্য বিষয় ছিল আধুনিক স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ, শিক্ষকের বিদ্যা, দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক, বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় সৃষ্ট, শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রসৃষ্ট নানা সংকট-সমস্যা, রাজনৈতিক চেতনার এবং সক্রিয়তার প্রসার, ছাত্র ও শিক্ষকের নৈতিক ও চারিত্রিক বিবর্তন ও পরিবর্তন প্রভৃতি। তাছাড়া গণশিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা পুন পুন আলোচনা করেছি।[১৫২]

শিক্ষা সম্পর্কিত আহমদ শরীফের এসব বিক্ষিপ্ত ভাবনার সংক্ষিপ্ত রূপই হল তাঁর শিক্ষাচিন্তা।

শিক্ষাচিন্তার শুরুতে আহমদ শরীফ শিক্ষা কী, এবং শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য করে লিখেছেন, “যা শেখা হয় তা-ই শিক্ষা। যা জানা যায় তা-ই বিদ্যা বা জ্ঞান। আর যা বোঝা যায় তা-ই বোধি বা প্রজ্ঞা।”[১৫৩] তিনি মনে করেন, কারণ-ক্রিয়া সমেত যা জানা যায় তাকে বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়।[১৫৪] শিক্ষা বিদ্যা এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করার পর শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “সততা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সময় ও নিয়মানুবর্তিতা, স্বাস্থ্য, দায়িত্ব-চেতনা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতির মূল-চেতনা হবে উক্ত শিক্ষার প্রসূন ও ফসল। এক কথায় জীবন-প্রতিবেশ এবং সমাজ সম্পর্কে কল্যাণকর নিরপেক্ষ

---

[১৫২] আহমদ শরীফ, *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*, পৃ. ১০১
[১৫৩] আহমদ শরীফ, *শিক্ষা সংস্কৃতি প্রগতি*, পৃ. ৭৫
[১৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

স্বচ্ছ দৃষ্টিদানই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।”[১৫৫] শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আহমদ শরীফের অভিমত হল, “শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সংবাদের সিন্দুক করা নয়, সুন্দর ও সুস্থ জীবন রচনায় প্রবর্তনা দেয়া, সফল সার্থক জীবন-যাত্রার পথ ও পাথেয় দান।”[১৫৬] শিক্ষা মানুষের চিন্তা করার শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে মানুষ হয় পরিশীলিত ও পরিশ্রুত। আহমদ শরীফ মনে করেন, “শিক্ষা মানুষের রুচি করে পরিশ্রুত, বুদ্ধি করে তীক্ষ্ণ, মন করে পরিচ্ছন্ন, মনন করে মার্জিত ও বিন্যস্ত। অতএব শিক্ষা পরিশীলন ও পরিশ্রুতির মাধ্যম ও বাহন।”[১৫৭]

শিক্ষাতত্ত্ব এবং শিক্ষানীতি সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, “শিক্ষাতত্ত্বটি হচ্ছে নৈতিক, আর শিক্ষা নীতি হচ্ছে বৈষয়িক। প্রথমটি মানবিক, দ্বিতীয়টি জৈবিক। একটি জীবন-সম্পৃক্ত, অপরটি জীবিকাসংলগ্ন। একটি চেতনা সঞ্জাত মানববিদ্যা, অপরটি বিজ্ঞানপ্রসূত প্রযুক্তি বিদ্যা। তাই একটি নীতিমূলক, অপরটি বৃত্তিমূলক।”[১৫৮]

প্রাচীন ভারতবর্ষ নানা শ্রেণি গোত্র ও বর্ণ, বর্গ ও বৃত্তিতে বিন্যস্ত ছিল। শিক্ষা ছিল ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার। আহমদ শরীফের মতে, “শিক্ষায় অধিকারীভেদ ছিল, বেদ উপনিষদ শিক্ষায় অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণের।”[১৫৯] প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ভারতবর্ষে শিক্ষা মাত্রই ছিল মুখস্ত বিদ্যা। গুরুগৃহে শিক্ষা নিতে হত। গুরু থাকতো দুই শ্রেণির। উপাধ্যায় যাঁরা পড়তেন, আর আচার্য যাঁরা নীতি-ধর্মের চর্যা বা বাস্তব আচরণ শেখাতেন।[১৬০] ধনী, ক্ষমতাবানরা গৃহশিক্ষক রেখে সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিত করতেন। ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের এবং ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণজ্ঞ বৈদ্যেরও উপনয়নে এবং হইজাগতিক বিষয়ে-কালিতে ও কষাতে-কাঠাকালি, সুদকষা, মনাকষা কড়া গণ্ডা পণ কাহণ জানার প্রাথমিক গণিত এবং প্রয়োজনীয় কাজ চালানোর শিক্ষা হয়তো ছিল।[১৬১] গুরুগৃহে যাঁরা শাস্ত্র শিক্ষা নিতেন তাঁদের বলা হতো ‘অন্তেবাসী’ আর নিত্যপ্রয়োজনীয় বৈষয়িক বিষয়ে যাঁরা শিক্ষা নিতেন তাঁদের বলা হতো ‘দণ্ডমানব’। শিক্ষার্থীদের তখনো ছাত্র নামে অভিহিত করা হতো না। শিক্ষার্থীদের ছাত্র নামে প্রথম অভিহিত করেন পাণিনি।[১৬২] পরবর্তী সময়ে টোলে-চতুষ্পাঠীতে একজন শিক্ষকই থাকতেন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় একক শিক্ষকের টোল ছিল। বৌদ্ধ মঠ বা বিহারে সে পদ্ধতি চালু ছিল। তুর্কি বিজয়ের পর প্রশাসনিক প্রয়োজনে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এগুলো পরে পাঠশালায় রূপ নেয়। কাজী শহীদুল্লা *পাঠশালা থেকে স্কুল* গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, “মধ্যযুগ থেকেই বাংলায় এক ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যে ব্যবস্থা

---

[১৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
[১৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
[১৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
[১৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
[১৫৯] আহমদ শরীফ, *অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ*, পৃ. ৪৬
[১৬০] প্রাগুক্ত , পৃ. ৪৮
[১৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
[১৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

জনগণ কর্তৃক সমর্থিত এবং জনগণের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ছিল। এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পাঠশালা।"[১৬৩] পাঠশালায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হত। পাঠশালাগুলো সম্পূর্ণরূপে সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। পাঠশালায়, "পঞ্চম বর্ষেই শিশুদের হাতেখড়ি হত। শিক্ষক থাকতেন মূখ্যত বর্ণহিন্দু। মুসলিম সন্তানদের 'তখ্তি হাতে চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে। মুসলিম শিক্ষকের পাঠশালায় অন্ত্যজ শ্রেণীর হাড়ি ডোম ছাত্রও থাকতো।"[১৬৪] পাঠশালার শিক্ষা ছিল একান্তভাবেই ব্যবহারিক। "পড়া, লেখা, গণিত, পত্রলিখন, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, পৌরাণিক কাহিনী এবং জমিদারি ও মহাজনী হিসাবরক্ষণ" ছিল পাঠশালার পাঠ্যক্রমের মধ্যে।"[১৬৫] পাঠশালার শিক্ষা ছিল গুরুনির্ভর। গুরুর মুখ থেকেই শিক্ষা নিতে হতো। "পাঠশালায় সাধারণত কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ ব্যবহার করা হতো না। এমনকি হস্তলিখিত গ্রন্থও ব্যবহার করা হতো না। শিক্ষক মৌখিকভাবেই ছাত্রদের পাঠদান করতেন এবং ছাত্ররা গুরু-প্রদত্ত তথ্যাদি মুখস্ত করতো।"[১৬৬] উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঠশালা টিকে ছিল। প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রিত বইয়ের সহজপ্রাপ্তি পাঠশালার শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। "বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ সনাতনী পাঠশালা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে দুর্বল করে ফেলে। অল্প কয়েকটি পাঠশালা তখনো টিকে ছিল; তবে তারা কোনো প্রকার সরকারি সাহায্য পেতো না।"[১৬৭] এসব পাঠশালার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন ছিল। পাঠশালার স্থান করে নেয় স্কুল।

কোম্পানি আমলে সীমিত পর্যায়ে কোম্পানির প্রয়োজনে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির রাজত্বকালেই ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় নিজ প্রয়োজনেই ইংরেজি শিখতে শুরু করে কলকাতা কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণি। বিত্তবানেরা গৃহশিক্ষক রেখে সন্তানকে ইংরেজি ভাষা লিখতে পড়তে শিখাতে শুরু করে। ডেভিড হেয়ার এবং আরো অনেকের পরামর্শে সামাজিকভাবেই ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ প্রভৃতি এভাবেই চালু হয়।[১৬৮]

শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর কোন দেশের সার্বিক চেহারা ফুটে ওঠে। উন্নত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা পদ্ধতিও উন্নত। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোটা জাতির স্বার্থ জড়িত। এবং জাতীয় জীবনে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই নেই। কেননা আজ অবধি মানুষের জীবন-জীবিকা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত লোকেরাই নিয়ন্ত্রণ করে। নিরক্ষরতার যুগেও সামাজিক প্রয়োজনে মৌখিকভাবে ও ঘরোয়া পরিবেশে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা চালু

---

[১৬৩] কাজী শহীদুল্লাহ, *পাঠশালা থেকে স্কুল*, আবদুল মমিন চৌধুরী (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. মুখবন্ধ
[১৬৪] আহমদ শরীফ, *শিক্ষা সংস্কৃতি প্রগতি*, পৃ. ৫০
[১৬৫] কাজী শহীদুল্লাহ, *পাঠশালা থেকে স্কুল*, পৃ. ১০
[১৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
[১৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
[১৬৮] আহমদ শরীফ, *শিক্ষা সংস্কৃতি প্রগতি*, পৃ. ৫৩

ছিল।"[১৬৯] আমাদের আর্থসামাজিক এবং মানসিক উন্নয়নের জন্যেও আধুনিক সময়োপযোগী বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরি।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আহমদ শরীফের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশেও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়নি। এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামল থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। এসব কমিশনের উদ্যোগে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। এ-সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> ইংরেজ সরকার শিক্ষার প্রসার কামনা করেনি, রোধ করবার চেষ্টা সঙ্গত সামাজিক স্বার্থে। পাকিস্তান সরকার নিয়োজিত কমিশনের সুপারিশ ছিল কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই শিক্ষাকে সীমিত রাখার জন্যে। এক্ষেত্রে শরীফ কমিশন, হামিদুর কমিশন, কুদরতে-ই খুদা কমিশন প্রভৃতির আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল প্রায় অভিন্ন। মন্ত্রী মজিদ খানও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার নামে আরবী-ইংরেজি অবশ্য পাঠ্য করা প্রকৃত পক্ষে ইয়াঙ্কি ইঙ্গিতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সুকৌশলে রুদ্ধই করে দিয়েছিল ১৯৮৩ সালে।[১৭০]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থা সঙ্কুচিত থাকলেও বিদ্যা অর্জনে পথ রুদ্ধ ছিল না। তখন স্কুল কলেজ পাশ করে অক্সফোর্ডে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করতো। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কেউ বার-এট-ল হতে পারতো।[১৭১] পাকিস্তানি উপনিবেশিক আমলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের তেতাল্লিশ বছর বয়সেও বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। আহমদ শরীফ মনে করেন, "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর বয়স্ক শিক্ষার আর প্রয়োজন থাকবে না।"[১৭২] সর্বজনীন কার্যকর প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ার আগে তিনি গণশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর অভিযোগ হল অনুন্নত দেশে কার্যকর গণশিক্ষা বিস্তারে সরকারই প্রতিবন্ধক। সরকারের অনিচ্ছার কথা উল্লেখ করে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> অনুন্নত দেশে গণশিক্ষা দানে সরকারের ভীতিপ্রসূত অনীহা থাকবেই। যে কয়জন শিক্ষিত থাকে তাদের বেকারত্ব ঘুচিয়ে, তাদের ন্যায়-অন্যায় আবদার মিটিয়েও গণস্বার্থ বিরোধী সুযোগ সুবিধা দিয়েও যখন সরকারী গদী নিরঙ্কুশ, নিরাপদ ও স্থায়ী রাখা যায় না – তখন সবাইকে চক্ষুষ্মান তথা দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সচেতন করে তুললে গদীর কাছে ঘেঁষাও অসম্ভব হবে, – জেনেই ক্ষমতালিপ্সু সামন্ত বুর্জোয়া মধ্যবিত্তেরা জনশিক্ষাভীরু।[১৭৩]

---

[১৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
[১৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫, ১০৬
[১৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
[১৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
[১৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

আহমদ শরীফ স্বল্প ব্যয়ে কিভাবে স্থানীয় উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে পত্রিকা পড়ার উপযোগী শিক্ষা দেয়া যায় তার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন প্রতিটি গ্রামে গণশিক্ষার জন্য দশ হাজার করে টাকা কার্যকরভাবে খরচ করা হলে এর সুফল পাওয়া যাবে।[১৭৪] এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আমাদের ধারণা চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণি অবধি পড়েছে, তেমন সাক্ষর প্রশিক্ষক তথা সাহায্যকারী দিয়েই একপক্ষকালের মধ্যেই আগ্রহী নিষ্ঠ বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পত্রিকা পাঠ করার মতো বর্ণজ্ঞান দান সম্ভব। কেননা তারা রাজনীতিকদের চলতিভাষায় দেয়া ভাষণ-বক্তৃতা বোঝে, অর্থাৎ তাদের শুদ্ধ বাক্যবোধ রয়েছেই।"[১৭৫]

প্রাথমিক শিক্ষার উপর আহমদ শরীফ গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কেবল মানববিদ্যা ও বিজ্ঞানের পাঠক্রম পড়ুয়াদের গ্রাহিকা-শক্তি অনুযায়ী তৈরি হওয়া আবশ্যিক। প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগানোই থাকবে প্রধান লক্ষ্য।"[১৭৬] প্রাথমিক শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার উপর ভবিষ্যতের শিক্ষা জীবন নির্ভর করে অনেকখানি। আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> শৈশবে-বাল্যে লেখাপড়াকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। যেখানে ঠেকে যায় সেখানে মমতার মাধুর্য ও ধাঁধা সমাধানের কৌতূহল ও আনন্দ সৃষ্টি করে দিতে হয়। পরিবারে বাবা-মা-ভাই-বোনের সেই সামর্থ্যের অভাবে এবং পাড়ায় লেখা-পড়ার পরিবেশের অনুপস্থিতির ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তা পায় না কখনো। ফলে অধ্যয়ন একটা দুরূহ পর্বতারোহণের মতো দুঃসাধ্য কর্ম কিংবা বন্ধুর ও অন্ধকার অরণ্যে নিরুদ্দিষ্ট বিচরণ বলেই মনে হয়। এতে মন হয় বিরূপ ও বইভীরু। এই কারণেই শতকরা পঁচানব্বই জন প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বিদ্যা এড়িয়ে চলে। যারা তার পরেও চালিয়ে যায় তারা ব্যতিক্রম, মানসিক গঠনে অনন্য এবং অধ্যবসায়ে অসাধারণ। সে-সব ছাত্রই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে।[১৭৭]

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হলে গণশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজন থাকে না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "প্রাথমিক স্তর হচ্ছে শেখানোর - বোঝানোর বা জানানোর স্তর নয়। মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে কেবল জানানোর- তাৎপর্য চেতনা দানের কিংবা উপযোগ বোঝানোর স্তর নয়। উচ্চমাধ্যমিক তথা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে আধুনিকতম নয় কেবল, সাম্প্রত, সদ্য লব্ধ বা জ্ঞাত জ্ঞান-বিজ্ঞান-যন্ত্র-প্রযুক্তি-প্রকৌশল-তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য প্রভৃতির সন্ধান দেয়া আবশ্যিক ও জরুরী।"[১৭৮] প্রাথমিক স্তরকে তিনি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত হওয়ার কথা বলেছেন। এ স্তরের লক্ষ্য হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে স্বাক্ষর জ্ঞান দান করা। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি অবধি আজকের

---

[১৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
[১৭৫] আহমদ শরীফ, *সময়-সমাজ-মানুষ*, পৃ. ৬৬
[১৭৬] আহমদ শরীফ, *শিক্ষা সংস্কৃতি প্রগতি*, পৃ. ৩৪
[১৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
[১৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

বিশ্বের 'লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা' ইংরেজি ভাষাকে ব্রিটিশ আমলের মতো প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে ভাগ করে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে শেখাতে আহমদ শরীফ পরামর্শ দিয়েছেন।[১৭৯] প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন, "প্রাথমিক শিক্ষা থাকবে মাতৃভাষা মাধ্যমে ভাষা, গণিত, স্বাস্থ্য, ছড়া, কবিতা-তরুলতা-ফুল-পাখি সম্পৃক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ চেতনাদানেই সীমিত।"[১৮০] বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহমদ শরীফ প্রাথমিক স্তর থেকেই সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "শিক্ষাকে আধুনিককালের বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে কেজো রূপ দিতে হলে অর্থাৎ একালের মানুষরূপে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হলে মানসিক ও শারীরিকভাবে পেশাজীবী হিসেবে তা হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তর থেকেই হতে হবে দেশ-জাতি নিরপেক্ষভাবে সেক্যুলার।"[১৮১] বাংলাদেশের সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে কোন সরকার আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ মনে করেন, "ব্রিটিশ আমলে যেমন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-কেরানীদের সন্তানদের হিতার্থে শহরে শহরে সরকারী স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজো তেমনি শহুরে শিক্ষিতদের তুষ্ট রাখার নীতি অব্যাহত রয়েছে।"[১৮২] বাংলাদেশে বিত্তবানদের জন্য গড়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। গ্রামের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী নিম্ন আয়ের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা এবং হতদরিদ্রদের জন্য মাদ্রাসা আর এনজিও পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আহমদ শরীফ মনে করেন বিত্তবান উচ্চশিক্ষিত চতুর বুদ্ধিজীবী-বৃত্তিজীবীরা পরিকল্পিতভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নষ্ট করছে। বুদ্ধজীবী-বৃত্তিজীবীদের দ্বিচারিতা সম্পর্কে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা চলছে। আমাদের এখানে মুনীর চৌধুরী প্রথম বাংলা ভাষায় দরখাস্ত করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমেরিকা থেকে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন তিনি রেজিস্ট্রারের কাছে। অথচ তাঁর সন্তান তিনটিকেই তিনি ইংরেজি মিডিয়ামে পড়িয়েছেন। খান সারওয়ার মুরশিদ ছেলেমেয়েকে ইংরেজিতে পড়িয়েছেন। অথচ তিনি সর্বদাই বাংলার পক্ষে বলেছেন, এখানে-ওখানে বক্তৃতা দিয়েছেন। আরো অনেকেই এ লেভেল, ও লেভেলে পড়াচ্ছেন নিজের সন্তানদের আর দেশবাসীকে জানাচ্ছেন, আমরা স্বাধীন হয়েছি আমাদের আর ইংরেজির দরকার নেই। ইংরেজির স্ট্যান্ডার্ড নামিয়ে দিলো একদিকে, অন্যদিকে আবার ইংরেজি স্কুল গড়ে তুলতে লাগলো তারা, কি চমৎকার স্ববিরোধ। আসলে দরিদ্রের সন্তান যারা অনেক কষ্টে পড়াশুনা করছে তাদের আরো দরিদ্র ও বেকার করার চক্রান্ত এটি।[১৮৩]

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত। তিনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে সমাজের মনন শক্তি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আহমদ শরীফ ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছে ত্রিমুখী। ক. বিদেশমুখী উদার-অবাধ মনন চর্চামুখী, খ. গতানুগতিক রক্ষণশীল যৌক্তিক বৌদ্ধিক

---

[১৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
[১৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
[১৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
[১৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
[১৮৩] আহমদ শরীফ, *বিশ্বাসবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ*, পৃ. ১১১

চেতনাবিরহী বন্ধ মন-মগজ-মননহীন বাঙলায় সীমিত সংকীর্ণ বিদ্যামুখী, গ. আর অতীত-ঐতিহ্য ও শাস্ত্রানুগ ইসলামী বিদ্যার সর্বকালীন উপযোগে প্রত্যয়মুখী।"[১৮৪] আহমদ শরীফ মনে করেন, পৃথিবীর কোন সভ্য রাষ্ট্রেই এমন বিশৃঙ্খল শিক্ষানীতি নেই।

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আহমদ শরীফ সৃজনশীল এবং বুদ্ধিদৃপ্ত চেতনার মানুষ হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন পাঠ্যপুস্তক থেকে শ্রেণি কক্ষে পাঠ করা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের দায়িত্ব নয়। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষকতা হচ্ছে সৃষ্টিশীলতার নামান্তর। জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়-অনুভবে-উপলব্ধিতে-অনুশীলনে-মননে তাঁর চিন্তা-চেতনা প্রসৃত হবে, নতুন তাৎপর্যে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পরিবেশিত বা বিরতির জ্ঞান ঘটাবে মানসোৎকর্ষ, দেবে নতুন জীবনদৃষ্টি জাগাবে নতুন জগৎভাবনা। শিক্ষকের চিন্তা-চেতনার মৌলিকতা ও সৃজনশীলতাই শিক্ষার্থীতে সঞ্চারিত হয়, গ্রন্থোক্ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নয়।"[১৮৫]

উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ন্যায়পরায়ণ ও চরিত্রবান হয় এবং আত্মসম্মান বজায় রাখে। যে শিক্ষা মানুষকে চরিত্রবান করে না সে শিক্ষা দিয়ে সমাজের, রাষ্ট্রের এমনকি ব্যক্তিরও কোন কাজে আসে না। এ সম্পর্কে আহমদ শরীফ মনে করেন, "চরিত্রবর্জিত শিক্ষিত মানুষও সমাজের দায় – সম্পদ নয়। কেননা তার চিন্তা ও কর্ম বহুজনহিত ও বহুজন সুখ-লক্ষ্যে নিয়োজিত হয় না।"[১৮৬] সমাজের সুখের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু চরিত্রহীন শিক্ষিত মানুষ সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। এধরনের মানুষ সমাজের দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করে সমাজকে সামনের দিকে এগুতে দেয় না। এরা শুধু অন্যের ক্ষতি করে না, নিজের ক্ষতিও করে।

আহমদ শরীফ একটি উদার যৌক্তিক সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। এই সমাজ নির্মাণের জন্য তিনি মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ চেয়েছেন। উপযুক্ত শিক্ষাই মানুষকে মানবিক গুণসম্পন্ন সামাজিক মানুষে পরিণত করে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মানবিক গুণ-বিশিষ্ট সামাজিক মানুষ তৈরিই আমাদের লক্ষ্য।"[১৮৭] মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ তৈরির জন্য বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা সবকিছুর আগে প্রয়োজন। এ জন্য তিনি সর্বজনীন সেক্যুলার প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছেন। উচ্চশিক্ষায় সৃজনশীলতার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তা তাঁর যৌক্তিক সমাজ নির্মাণের পথ মাত্র।

---

[১৮৪] আহমদ শরীফ, *শিক্ষা সংস্কৃতি প্রগতি*, পৃ. ৮৭
[১৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
[১৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
[১৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

উপসংহার

আহমদ শরীফ বাংলাদেশের একজন মৌলিক দার্শনিক। জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় আহমদ শরীফ মৌলিক অবদান রেখেছেন। ইউরোপীয়, ভারতীয় কোনো দর্শন দিয়েই তিনি প্রভাবিত ছিলেন না। তিনি মৌলিকভাবে জীবন-জগৎ এবং জীবন ও জগতের উৎস পরিণতি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি জ্ঞানের উৎস, বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করতেন জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব। যার জিজ্ঞাসা নেই তার কোনো জ্ঞান নেই। জিজ্ঞাসা কি এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, কার্যকারণকে জানার ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসাহীন মানুষ 'ভূতে-ভগবানে', অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে এবং শোনা কথায় বিশ্বাস করে, আস্থা রাখে। তিনি মনে করেন জিজ্ঞাসা থাকলে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় কাজ করে। জিজ্ঞাসাহীন মানুষের ইন্দ্রিয় বন্ধ্যা। আহমদ শরীফের জ্ঞানতত্ত্ব এবং ফ্রান্সিস বেকনের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের বিশেষ মিল রয়েছে। ফ্রান্সিস বেকন মনে করতেন ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব। আহমদ শরীফের জ্ঞানতত্ত্বে আমরা প্রায়োগিক দিক দেখতে পাই। বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রায়োগিক। আহমদ শরীফ বিজ্ঞানের জ্ঞান সমর্থন করতেন। জীবনের প্রয়োজনে জ্ঞানের উদ্ভবের কথা তিনি বলেছেন। এজন্য তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের নাম প্রায়োগিক জ্ঞানতত্ত্ব। প্রায়োগিক জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি হল অভিজ্ঞতাবাদ।

আহমদ শরীফ অভিজ্ঞতা, যুক্তিবুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিবিদ্যার অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ভয়, বিস্ময়, অজ্ঞতা থেকে মানুষ অধিবিদ্যক বিষয়গুলোর উপর আস্থা রাখে। ভয় ও বিস্ময় থেকেই অধিবিদ্যার উৎপত্তি বলে তিনি মনে করেন। প্রাচীনকালে আদিম মানুষের ভয়-বিস্ময় ছিল। আধুনিক কালেও বহু মানুষের প্রশ্ন করার অভ্যাস নেই। প্রশ্নহীন মানুষ বিশ্বাস নির্ভর হয়। অধিবিদ্যা বিশ্বাস নির্ভর। অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয়গুলো যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা চলে না। তারপরও কিছু চিন্তাবিদ যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বিশ্বাস নির্ভর অধিবিদ্যার বিষয়গুলো প্রমাণের চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে পূর্বতসিদ্ধ হিসাবে নিয়ে তাঁরা সাধারণত বিচার বিশ্লেষণ করেন। আহমদ শরীফ এ প্রক্রিয়া সমর্থন করেননি। তিনি মনে করেন, বিশ্বাসকে যুক্তিগ্রাহ্য করার অপপ্রয়াস পুতুলকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করারই নামান্তর মাত্র। তিনি যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে অধিবিদ্যার অর্থহীনতা প্রমাণ করেছেন। মূল্যবিদ্যার অন্যতম আলোচনার বিষয় রাষ্ট্রচিন্তা, নীতিচিন্তা এবং শিক্ষা চিন্তায় আহমদ শরীফের মৌলিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। আহমদ শরীফ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর আস্থাশীল হলেও শেষ পর্যন্ত আস্থা রাখতে পারেন নি। তিনি দেখেছেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তিনি শেষ পর্যন্ত কল্যাণ রাষ্ট্রের কথাই বলেছেন। তিনি মনে করেন, সমাজে যুক্তিবাদী বিবেকবান মানুষ কিংবা নাস্তিকের সংখ্যা অন্তত অর্ধেক না হলে পরিবারে,

সমাজে, রাষ্ট্রে, নির্মাণ-উৎপাদনে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের আর্থিক জীবনে প্রবঞ্চনা-প্রতারণার, ঠকাঠকির, শোষণ-বঞ্চনার অবসান বা হ্রাস বাঞ্ছিত মাত্রায় হবে না। সংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে যৌক্তিকসমাজ প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন তিনি দেখতেন। সমাজের অধিকসংখ্যক মানুষকে অভুক্ত রেখে কোনো নৈতিক আদর্শই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায় না বলেও তাঁর অভিমত ছিল। তিনি গণমুখী বিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। বিজ্ঞানের জ্ঞান নির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে কুসংস্কার, অন্ধতা, অজ্ঞতা দূর করতে সক্ষম হবে। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যা অপরিহার্য।

আহমদ শরীফের জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনায় দেখা যায় তিনি বিজ্ঞানের জ্ঞান নির্ভর দর্শনচর্চা করেছেন। তিনি ধর্মনির্ভর ভাববাদ পরিহার করেছেন। তিনি মনে করতেন ভাববাদ মানুষকে প্রতারিত করে। তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদ এবং অধিবিদ্যার অর্থহীনতা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমরা তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবে অখ্যায়িত করতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

বাঙালি জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির দর্শনও বিকশিত হয়েছে। লোকায়ত দর্শন, বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, মীমাংসা দর্শনের চর্চা বাংলাদেশে হয়েছে। মধ্যযুগে মুসলিমদের আগমনের মধ্যে দিয়ে পারস্যের সুফিবাদের সঙ্গে বাঙালির লোকায়ত এবং দেশজ ভাববাদী দর্শনের মিথস্ক্রিয়ায় 'বঙ্গীয় সুফিবাদ' সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলোতে নীতিকথা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। *ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণে* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "ভারতে কাব্য ও দর্শন কেমন হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। জীবনে পূর্ণতা লাভের সহজ ও সম্ভব পথটি মানুষকে ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব দর্শন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই এটি ভারতে সম্ভব হইয়াছে।"[১] ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন বাঙালির দর্শনে সে কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বাঙালির দর্শনেও দেখা যায় দর্শন এবং কাব্য হাত ধরাধরি করেই চলেছে। বাঙালির দর্শনে আরেকটি বিশিষ্ট দিক হলো ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদের সমন্বয়ে সমন্বয়বাদী দর্শন। এই তিন ধারায় বাংলাদেশে সবসময় দর্শনচর্চা হচ্ছে।

প্রাচীনকালে এদেশে বস্তুবাদী দর্শনের চর্চা হয়েছে। লোকায়ত দর্শন ছিল বস্তুবাদী। এদেশে যে বস্তুবাদী দর্শনচর্চা হয়েছে তার আরো প্রমাণ হলো বঙ্গদেশকে প্রাচীনকালে অপবিত্র দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এবং এদেশে না আসার জন্য বিধান দেয়া হয়েছিল। কারণ এদেশের মানুষের শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল না। রামায়ণের জাবালি মুনি, হরিবংশের রাজা বেণ, গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক অজিত কেশ কম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, ভাগুরিসহ অনেক দার্শনিক ছিলেন বস্তুবাদী। কাপালিক এবং চার্বাকেরাও বস্তুবাদী। প্রাচীনকালে ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দর্শন এবং সমন্বয়বাদী দর্শনও চর্চা হয়েছে।

বাংলাদেশে জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা হয়েছে। পুণ্ড্রবর্ধনের জৈন দার্শনিক ভদ্রবাহু দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বৌদ্ধ শাসনামলে বাংলাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। জগদ্দল মহাবিহার, পণ্ডিত বিহার, ভাসু বিহার, সোমপুর বিহার, সীতাকূট বিহার, শালবন বিহার বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। এসব বিহার, মহাবিহারে দর্শন, সাহিত্য, কৃষিবিদ্যা, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি গুরুত্বসহকারে পড়ানো হতো। বিহার, মহাবিহারগুলোতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন

[১] রবীন্দ্রনাথ, "ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ", *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

ছিল বাধ্যতামূলক। বৌদ্ধ বিহারগুলোতে আট থেকে এগারো শতকের শেষ দিক পর্যন্ত জগৎ ও জীবনের সমস্যা নিয়ে তত্ত্বালোচনা হয়েছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মহাযান বৌদ্ধ মতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। বর্তমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শিক্ষাধারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েই শুরু হয়েছিল। রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ানো হতো।[২] নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অতীশ দীপঙ্করের বাড়ি ছিল বাংলাদেশের বিক্রমপুরে। মহাযান বৌদ্ধ দার্শনিক শীলভদ্রের বাড়ি ছিল সমতটে।

বৌদ্ধ, ন্যায়, মিমাংসা দর্শনের চর্চা হয়েছে বাংলাদেশে। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে বৌদ্ধ দর্শনের বিকাশের ধারায় যুক্তিবিদ্যা এবং দ্বান্দ্বিক মতবাদের যে বিকাশ ঘটেছিল তা ছিল যথেষ্ট উন্নতমানের।[৩] প্রায় পাঁচশত বৎসর বাংলাদেশে নব্যন্যায় এবং ন্যায় দর্শনের চর্চা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে মিথিলার গাঙ্গেশ উপাধ্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থটি কেন্দ্র করে নব্যন্যায়ের চর্চা শুরু হয়। বাংলাদেশে নব্যন্যায় চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন বাসুদেব সার্বভৌম। পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের জন্ম। বাসুদেবের পিতা নরহরি বিশারদ ভট্টাচার্য নবদ্বীপে নৈয়ায়িক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পিতার কাছে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে পক্ষধর মিশ্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সার্বভৌম উপাধি লাভ করেন।

বাংলাদেশের বিক্রমপুর, কোটালিপাড়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে চৌদ্দ থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত ন্যায় দর্শনের চর্চা হয়েছে। আঠারো শতকে গোপালগঞ্জের বৈজয়ন্তী দেবী এবং প্রিয়ম্বদা দেবী দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রিয়ম্বদা দেবী মীমাংসা দর্শনে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বাংলাদেশে দর্শনচর্চার অন্যতম নিদর্শন চর্যাপদ। মহাযান মতবাদ রূপান্তরিত হয়ে বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান এবং শেষে চর্যাপদে রূপলাভ করে বাংলাদেশে। চর্যাপদের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে, শূন্যতা, তথতা, সংবৃত্তি প্রভৃতি দার্শনিক ধারণাগুলো রয়েছে। চর্যাকারদের পদগুলোতে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যক এবং মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলো প্রবল।

মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলিম শাসকেরা দর্শনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রাচীন আমলে এদেশে যে দর্শনচর্চার ধারা গড়ে উঠেছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে মধ্যযুগের কবিদের কাব্যে জীবন-জিজ্ঞাসা যৌক্তিক এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত রয়েছে। বাঙালি সুফিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে জীবন জিজ্ঞাসা, নৈতিকতা, সমাজে মানুষের অবস্থান ইত্যাদি দার্শনিক প্রশ্নাদির উপস্থিতি দেখা যায়। মধ্যযুগে বাঙালি মুসলিম লেখকদের দর্শন সমৃদ্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষ বিজয়*,

[২] বেলু রানী বড়ুয়া, "বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি : অতীত ঐতিহ্য" , *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খণ্ড ৪ সংখ্যা ৬ জুলাই ২০১০- জুন ২০১১, পৃ. ১৪২
[৩] গালিব আহসান খান, *দর্শনের প্রয়োজনীয়তা : একবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ*, পৃ. ২০

মীর সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞানপ্রদীপ*, *জ্ঞান চৌতিশা*, হাজী মুহম্মদের *নূরনামা*, মোহসেন আলির *মোকাম-মঞ্জিল কথা*, শেখ মনসুরের *সির্নামা*, শেখ জাহিদের *আদ্যপরিচয়* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থের মধ্যে বাঙলার সুফী শাস্ত্রের বিবরণ ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। হাজী মুহম্মদের *নূরনামা* একটি দার্শনিক গ্রন্থ। হাজী মুহম্মদ যথার্থই দার্শনিক কবি ছিলেন। হাজী মুহম্মদের *নূরনামা* গ্রন্থে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালি সুফি-সাধকদের এসব গ্রন্থের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, শূন্যতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, জীবন জিজ্ঞাসা গুরুত্বের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে।

হোসেন শাহী শাসনামল বাংলার গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়। এই সময়ে শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন জনপ্রিয় করেন। সংস্কৃত ভাষায় মাত্র আটটি শ্লোকের মাধ্যমে তিনি বিধৃত করেন তাঁর প্রেমাত্মক মানবতাবাদী দর্শন। চৈতন্যদেবের অনুসারীরা তাঁর ভক্তি প্রেম ও বাণীকে সংগ্রহ করে *চৈতন্য ভাগবত*, *চৈতন্য চরিতামৃত*, *চৈতন্য মঙ্গল* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্যদেবের দর্শন চিন্তায় মাধ্বাচার্য, বল্লভ ভট্ট, রামানুজ, বৌদ্ধ ও সুফি দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর মতে জীবাত্মা ও জগৎ পরস্পর ভিন্ন কিন্তু ঈশ্বর সাথে সম্বন্ধ সাপেক্ষে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

চৈতন্যদেবের অন্যতম শিষ্য সনাতন, রূপ এবং জীব গোস্বামীর গ্রন্থগুলো অবলম্বন করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে। জীব গোস্বামীর *তত্ত্ব-সন্দর্ভ*, *ভগবৎ-সন্দর্ভ*, *পরমাত্ম-সন্দর্ভ*, *কৃষ্ণ-সন্দর্ভ*, *ভক্তি-সন্দর্ভ* ও *প্রীতি-সন্দর্ভের* মধ্যে দিয়েই প্রধানত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল মতবাদ তথা রাধাবাদের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এছাড়া গোস্বামীদের গ্রন্থাবলিতে পৌরাণিক তত্ত্ব, দর্শন, কান্তিবিদ্যা এবং ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় দর্শনের মিলিত স্রোতে নতুন করে দর্শনচর্চা শুরু হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের অনুপ্রেরণায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি দার্শনিকেরা দর্শনচিন্তা করলেও বেদ-বেদান্ত, উপনিষদের দর্শন দিয়ে তাঁরা প্রভাবিত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙালি দার্শনিকের দর্শনচিন্তায় পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবের চেয়ে বেদান্ত দর্শনের অনুসরণ বেশি দেখা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী দর্শন অধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ এই নীতি দ্বারা রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভাবিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন 'জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন'। তাঁর এই মত শঙ্করাচার্যকে সমর্থন করে না, কিন্তু হেগেলের মতকে সমর্থন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাংখ্য দর্শন' পড়লে তাঁকে ভারতীয় দার্শনিক হিসাবেই অভিহিত করতে হয়। আবার 'চিত্তশুদ্ধি,' 'ভালবাসার অত্যাচার,' 'মনুষ্যত্ব কি' এসব প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হলেও কোরান এবং হাদিস থেকে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটেনি। কোরান এবং হাদিসকে মূল ভিত্তি হিসাবে ধরে মুসলিম দার্শনিকেরা দর্শনচর্চা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বশীল মুসলিম চিন্তাবিদ নবাব আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তায় উপযোগবাদের প্রভাব দেখা গেলেও কোরান এবং হাসিদই ছিল তাদের চিন্তার উৎস। এম এন রায়ের নেতৃত্বে এদেশে মার্কসবাদের চর্চা শুরু হয়। মার্কসবাদী দর্শন ও সাহিত্য চর্চায় কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ, অবণী মুখার্জী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিশেষ অবদান রাখেন। কাজী নজরুল ইসলাম কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ না করলেও তাঁর রচনার মধ্যে মার্কসীয় সাম্যবাদের প্রভাব দেখা যায়। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক মতবাদের চেয়ে নজরুলের চিন্তায় সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বেশি। উপলব্ধির সাহায্যে তিনি সমাজের শোষণ বঞ্চনার অবসান চেয়েছেন।

ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির মনন জগতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গুরুদাস চ্যাটার্জী, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রামকমল ভট্টাচার্য প্রমুখের চেষ্টায় কলকাতায় 'পজিটিভিস্ট ক্লাব' গড়ে উঠেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রত্যক্ষবাদ দিয়ে প্রভাবিত হয়ে *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে কোন বিভেদ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হিউমের সংশয়বাদ এবং স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। তাঁর দর্শনচিন্তায় শঙ্করাচার্য এবং বুদ্ধের চিন্তার মিশ্রণ দেখা যায়।

লালন এবং হাছন রাজা বাংলাদেশের দুইজন মৌলিক দার্শনিক। লালনের দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা রয়েছে। যদিও অধিবিদ্যক বিষয়গুলো লালনের দর্শনে প্রধান উপজীব্য তথাপি জ্ঞানবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা লালনের গানের অন্যতম বিষয়। হাছন রাজার গানেও অধিবিদ্যক বিষয়গুলো বিদ্যমান রয়েছে। প্রায়োগিক উপযোগিতা থেকে লালন অধিবিদ্যার বিষয়গুলো গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সহমরণ প্রথা এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মীমাংসাও লালন দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাঙালি দার্শনিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম । গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন, পারিবারিক ধর্মবোধ এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ এ দুটোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। তাঁর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং গানের মধ্যে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানতত্ত্বে স্বজ্ঞার কথা বলেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'হৃদয়ের সহজবোধ'।

রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনা, রাষ্ট্রভাবনা, নীতিচিন্তা রয়েছে। এগুলো তাঁর মূল্যবিদ্যার অংশ। ঈশ্বর ভাবনা, মানবাত্মা এবং পরমাত্মা, মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথের অধিবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শনচর্চা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র রায়, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কাজেমউদ্দিন আহামেদ, মন্মথ মুখার্জী, ক্ষিরোদচন্দ্র মুখার্জী, ড. বিনয়েন্দ্রনাথ রায়, ড. মৌলভী মমতাজউদ্দীন আহম্মদ প্রমুখ দর্শন শাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হরিদাস ভট্টাচার্যের দর্শনচিন্তায় বাস্তববাদ বা Neo-Realism-এর ছাপ স্পষ্ট। তিনি ভাববাদ বা Idealism-কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন।

বাংলাদেশে দর্শন চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন শহীদ দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ। পাকিস্তান সারস্বত সমাজ তাঁকে 'দর্শন সাগর' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। প্রাচ্যের সক্রেটিস নামেও তাকে অভিহিত করা হতো। গোবিন্দচন্দ্র দেব ভাববাদ এবং বস্তুবাদ এই দুইটি সমন্বয় করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। সমন্বয়বাদী দার্শনিক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা নিয়ে জি সি দেবের মৌলিক অবদান রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বাঙালি দার্শনিকদের দর্শনচিন্তায় ইউরোপীয় দর্শন, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন এবং মধ্যযুগীয় মুসলিম ধর্মতত্ত্বের প্রভাব দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির দর্শনে ইউরোপীয় দর্শন, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের প্রভাব থাকলেও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের দর্শনের প্রধান উৎসস্থল হল কোরান, হাদিস। ইসলাম ধর্মের দার্শনিক চেতনা দ্বারা তাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আল-কিন্দি, আল-ফারারি, ইবনে রুশদ এবং আল-গাজ্জালির দর্শন দিয়েও বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা প্রভাবিত ছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবও বাঙালি মুসলমানের দর্শন চিন্তায় দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দীতে আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দর্শন পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। আবদুল মতিনের ভাষায়, "আমাদের দর্শনের পাঠ্যসূচিগুলোতে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ইত্যাদি দর্শনের মৌলিক শাখাগুলোর পাশাপাশি নীতিবিদ্যা, সমাজ-দর্শন, রাষ্ট্রদর্শন ইত্যাদি প্রায়োগিক বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"[৪] দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যার চর্চা করেছে বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে। জ্ঞানের প্রায়োগিক দিক অর্থাৎ যে জ্ঞান মানুষের কাজে লাগে সে জ্ঞানকেই বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা চর্চা করেছেন। জ্ঞানের উৎস, বৈশিষ্ট্য নিয়েও বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা অধিবিদ্যার পক্ষে-বিপক্ষে

---

[৪] আবদুল মতিন, *দর্শন সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১১৬

যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেছে উপযোগিতা লক্ষ্য করে। মূল্যবিদ্যা বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকদের প্রধান আলোচনার বিষয়। মূল্যবিদ্যা প্রায়োগিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। এ দিক বিবেচনায় নিয়েও বলা যায় বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের দর্শন হলো প্রায়োগিক দর্শন।

বিংশ শতাব্দীতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন শিক্ষায় শিক্ষিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। জ্ঞানবিদ্যায় তিনি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। তবে চূড়ান্ত জ্ঞানের জন্য স্বজ্ঞার বিকল্প কিছু নেই বলে তিনি মনে করেন। খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহর স্বজ্ঞাবাদ হেনরি বার্গসোঁর স্বজ্ঞাবাদ থেকে ভিন্ন। হেনরি বার্গসোঁ স্বজ্ঞার সাহায্যে জ্ঞানলাভের কথা বলেছেন। খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বজ্ঞার সাহায্যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে মিল দেখতে চেয়েছেন। তিনি ছিলেন ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দার্শনিক। স্বজ্ঞার সাহায্যে তিনি পরমসত্তার উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। অধিবিদ্যার অন্যতম বিষয় ঈশ্বর, আত্মা নিয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। সুফিবাদ দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মনে করেন পরমাত্মা থেকেই জীবাত্মার সৃষ্টি। জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলতে চায়। অধিবিদ্যার বিষয়গুলোতে তিনি যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দর্শনে যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস প্রবল। বিশ্বাসের পথ ধর্মের আর দর্শনের পথ যুক্তির। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দর্শনচিন্তায় যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসের গুরুত্ব বেশি। তিনি যুক্তি দিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করতে চেয়েছেন। দর্শনের অন্যতম শাখা মূল্যবিদ্যায় তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন ধরনের শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন। মানুষকে সত্যিকারের মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষে পরিণত করতে হলে এই তিন ধরনের শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর জীবন দর্শনকে দুই পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম জীবনে তিনি দর্শনের প্রতি ছিলেন অনুরক্ত। শেষ জীবনে ধর্ম দিয়ে প্রভাবিত। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহই প্রথম যিনি দর্শনের পরিভাষা এবং দার্শনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চা শুরু করেন। বরকতুল্লাহ বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। জ্ঞানতত্ত্বে বরকতুল্লাহ যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা বলেছেন তা স্বজ্ঞারই নামান্তর। বরকতুল্লাহ ছিলেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী। শেষ জীবনে তিনি ইসলামিক আদর্শকে বড় করে তুলে ধরেছেন। অতীন্দ্রিয় সত্তাকে প্রমাণের জন্যই তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন। জগতের আদি কারণ হিসাবে গ্রিক দার্শনিকেরা পানি, বায়ু, অগ্নি, সংখ্যা ইত্যাদি নির্ধারণ করেছিলেন। ভারতীয়দের মতে পঞ্চভূত বিশ্বের আদি কারণ। যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুসারে ব্রহ্মই বিশ্বের আদি কারণ। বরকতুল্লাহর মতে স্রষ্টা বিশ্বের আদি কারণ। বিশ্বাসী মুসলমানদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে অনুভূতি ও মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দার্শনিক ঈশ্বর একই

রকম। নীতিচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা এবং সমাজচিন্তায় বরকতুল্লাহ বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায়। সমাজচিন্তায় দেখা যায় মোহম্মদ বরকতুল্লাহ কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণও করেন নি আবার বর্জনও করেন নি। তিনি শোষণ মুক্তির জন্য সমতাবাদের কথা বলেছেন। বিজ্ঞান এবং ধর্মের পথ ভিন্ন। বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর, ধর্ম বিশ্বাস নির্ভর। উভয়ের পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন। মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দর্শনে ভিন্নমুখী দুটি বিষয়ের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের একজন মৌলিক বাস্তববাদী মুসলিম দার্শনিকের নাম আরজ আলী মাতুব্বর। জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় তাঁর মৌলিকত্ব রয়েছে। জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তিনি কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছেন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব অভিজ্ঞতাভিত্তিক। তিনি মনে করেন অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমাদের জ্ঞান হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা প্রত্যক্ষ করা যায় তাই জ্ঞানের উপাদান। কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকলে সে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না বলে আরজ আলী মাতুব্বর মনে করেন। ইউরোপের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক, বার্কলী, হিউম জ্ঞানের উৎস হিসাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান সমাজের কি কাজে লাগে তা তাঁরা বলেন নি। আরজ আলী মাতুব্বরের মতে, অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান দিয়ে সমাজের কুসংস্কার দূর করা সম্ভব। অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয়গুলো নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলে এগুলোকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। ধর্মকে তিনি বর্জন করেননি। কিন্তু ধর্মের মধ্যে কুসংস্কারকে তিনি বর্জন করেছেন। ধর্ম দ্বারা আরজ আলী মাতুব্বরের চিন্তা প্রভাবিত ছিল না। ধর্মের প্রভাবমুক্ত হয়ে তিনি স্বাধীনভাবে মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর দর্শন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। ফলে তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী দার্শনিক হিসেবে অভিহিত করা যায়। তিনি কুসংস্কার মুক্ত একটি সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। এই সমাজ নির্মাণের জন্য তিনি কুংস্কার দূর করতে চেয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভাববাদী দার্শনিক আবুল হাশিম রাজনীতি করতেন। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি সমাদৃত ছিলেন। রাজনীতির মধ্যে দিয়েই তিনি দর্শনে প্রবেশ করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক নেতাও ছিলেন তিনি। দর্শনের মৌলিক বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় আবুল হাশিমের মৌলিক অবদান রয়েছে। তিনি মনে করতেন বুদ্ধি অথবা অভিজ্ঞতার সাহায্যে পূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য তিনি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন।

জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হিসাবে আবুল হাশিম অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি ইন্দ্রিয় সংবেদনমূলক জ্ঞানকে বর্জন করেছেন। তিনি বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞার সংমিশ্রণ করেছেন। স্বজ্ঞাকে বুদ্ধির উপর স্থান দিয়েছেন। আবুল হাশিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের সাথে আল-গাযালীর জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের মিল পাওয়া যায়। আল-গাযালীর মতে, অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান হচ্ছে উচ্চস্তরের জ্ঞান। আবুল হাশিমও

অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞানকে উচ্চস্তরে স্থান দিয়েছেন। আবুল হাশিমের মতে, কুরআনের জ্ঞানই সর্বোচ্চ জ্ঞান। জ্ঞানতত্ত্বে স্বজ্ঞাবাদের সাহায্যে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। পাকিস্তান ছিল তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্র। তিনি রাজনীতি করেছেন অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের জন্য। কিন্তু তিনি গণতন্ত্র পছন্দ করতেন না। গণতন্ত্রকে তিনি নাসিকা গণনার পদ্ধতি বলে উপহাস করেছিলেন। অভিজাতদের দ্বারা নির্বাচিত নেতার শাসনের দ্বারা তিনি অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের কথা বলেছেন। কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য এই বাক্য শ্রুতিমধুর শোনালেও বাস্তবে অভিজাতরা স্বৈরশাসকে পরিণত হয়। আবুল হাশিম ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ইসলামের চার খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি দ্বারাই তিনি নেতা নির্বাচনের পদ্ধতিকে সঠিক বলে মনে করতেন। আবুল হাশিমের নেতা নির্বাচন পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকলেও আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক বিশ্বে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা আলোচনায় দেখা যায় তিনি ইসলামী দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসাবে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দিলেও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করেন বোধিলব্ধ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে স্বজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি স্বজ্ঞাবাদ গ্রহণ করেছেন ইসলামের একেশ্বরবাদ সমর্থন করার জন্য। অধিবিদ্যার বিষয় ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল ইত্যাদি নিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার প্রকাশ। আল্লাহ শুধু মানুষ সৃষ্টি করেনি এ দুনিয়াও সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রতিটি ধুলিকনা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি ইসলামের নির্দেশিত পথে শাসন কাঠামোর পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই শোষণ বঞ্চনা, নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। খলিফা নির্বাচন করার পদ্ধতিতে তিনি শাসক নির্বাচন করার পদ্ধতির অনুমোদন দিয়েছেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দার্শনিক হিসাবে অভিহিত করা যায়। ধর্মের অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি স্বাধীন মতপ্রকাশে এবং মুক্ত মনে চিন্তা করতে সক্ষম হন নি। তাঁর দর্শনচিন্তা ধর্মমুক্ত নয়। ধর্মীয় আবরণে তিনি চিন্তা করেছেন এবং ধর্মকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের অন্যতম মুসলিম দার্শনিক সাইদুর রহমান তাঁর দর্শনের নাম দিয়েছিলেন কল্যাণ দর্শন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য দর্শন চর্চা করেছেন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় কল্যাণভিত্তিক সমাজ নির্মাণের কথা উঠে এসেছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে তিনি সংশয়বাদ গ্রহণ করেছেন সত্যকে জানার জন্য। রেনে দেকার্ত সত্যকে জানার জন্য সংশয়কে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সাইদুর রহমান কুসংস্কার দূর করার জন্য সংশয়কে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে

বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। সংশয় না থাকলে প্রথা, কুসংস্কার নিয়ে প্রশ্ন উঠে না। আর প্রশ্ন না থাকলে সত্য জানা যায় না। সাইদুর রহমানের কল্যাণভিত্তিক সমাজ নির্মাণের জন্যই সত্যকে জানা প্রয়োজন। সমাজের উন্নয়নের জন্য তিনি নারী স্বাধীনতার কথা বলেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি সমর্থন করেছেন। এ সবকিছুর মূলেই রয়েছে তাঁর কল্যাণ দর্শন। এই কল্যাণ মানুষের কল্যাণ।

আহমদ শরীফ বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক দার্শনিক। দার্শনিক হিসাবে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। এই অভিসন্দর্ভে দেখানো হয়েছে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যায় আহমদ শরীফের মৌলিক অবদান রয়েছে। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি অভিজ্ঞতাবাদ গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করতেন যে জ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য নেই তা নিষ্ফল। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটি উল্লেখ করেন নি। তাঁরা জ্ঞানের উৎস ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। আহমদ শরীফ মনে করেন জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের সৃষ্টি। যার জিজ্ঞাসা নেই তার কোন জ্ঞান নেই। জিজ্ঞাসাহীন মানুষ অন্ধ। জিজ্ঞাসাহীন মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো কাজে আসে না। জিজ্ঞাসা কি এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন কার্যকারণকে জানার ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা। জ্ঞানের সাহায্যে তিনি সমাজের-রাষ্ট্রের কুসংস্কার দূর করে একটি যৌক্তিক সমাজ নির্মাণ করেছেন। অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মনে করতেন অধিবিদ্যার বিয়বস্তুগুলো সমাজে কুসংস্কার সৃষ্টি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষ ভূত-প্রেতে বিশ্বাস রাখে। এরা সমাজের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই সৃষ্টি করে বেশি। তাঁর মূল্যবিদ্যা আলোচনার সময় দেখা যায় তিনি বিজ্ঞানমনস্ক, শোষণমুক্ত আধুনিক একটি সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। রাষ্ট্রচিন্তা, নীতিচিন্তা এবং শিক্ষাচিন্তায় আহমদ শরীফের মৌলিক অবদান রয়েছে। তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুসারী ছিলেন, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না। রাজনীতিকে তিনি দেখেছেন একাডেমিক দিক থেকে। তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের এক ধরনের দার্শনিক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, গণমানুষের জীবন জীবিকার নিরাপত্তার জন্য সমাজতন্ত্রই এ পর্যন্ত একমাত্র মতবাদ হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। আহমদ শরীফ মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। আহমদ শরীফ মনে করেন, ধার্মিকতা ও নীতি নিষ্ঠা এক জিনিস নয়, Ethics মেনে চলা, Moralist হওয়া, ধার্মিক হওয়া এক কথা নয়। ধার্মিক এবং যন্ত্রকে তিনি এক করে দেখেছেন। তিনি মনে করেন, ধার্মিকের কোনো চরিত্র নাই। নীতিনিষ্ঠ মানুষের ধার্মিক হওয়ার প্রয়োজন নেই বলেও তিনি মনে করেন।

ধর্ম মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তায় ধর্ম একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ, বরকতুল্লাহ, আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ দর্শনের পথ দিয়ে ধর্মে প্রবেশ করেছেন। নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসকেই তাঁরা অন্য ধর্মের উপর স্থান দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব চর্চার চেয়ে তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আরজ আলী

মাতুব্বর, আহমদ শরীফ এবং সাইদুর রহমানের দর্শনচিন্তা ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। তারা ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিকতা নিয়ে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আহমদ শরীফ, আরজ আলী মাতুব্বর এবং সাইদুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু তা সর্বাংশে সত্য নয়। ধর্মের মধ্যে যে অধর্ম, কুসংস্কার বিরাজ করছে তার বিপক্ষে ছিলেন তাঁরা। আহমদ শরীফ, আরজ আলী মাতুব্বর সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আগে যৌক্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁরা মনে করতেন যৌক্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠিত হবে। সাইদুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদ এবং ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদের সমন্বয় করেছেন।

বাঙালির দর্শন মানেই জীবন দর্শন। জীবন দর্শনের অপর নাম প্রায়োগিক দর্শন। মানুষকে সুস্থ-সুন্দরভাবে, স্বাধীনভাবে, মুক্তভাবে, যৌক্তিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য দর্শন। বাঙালি চিরকাল সুস্থ-সুন্দর এবং যৌক্তিকভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই বাঙালি সৃষ্টি করেছে শাস্ত্রের এবং দর্শনের। বাঙালির জীবনে ধর্ম একটি বড় বিষয়। কিন্তু ধর্মও সবসময় এক ছিল না। জীবনের প্রয়োজনে বাঙালি ধর্ম গ্রহণ করেছে আবার বর্জনও করেছে। প্রাচীন বাংলার ধর্ম এবং মধ্যযুগের বাংলার ধর্ম এক নয়। জীবনের প্রয়োজনে বাঙালির ধর্মীয় জীবনের পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের। কিন্তু বাঙালি ধর্মকে কখনো বর্জন করেনি। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিমের দর্শনে ধর্ম বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। জীবনের প্রয়োজনেই বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তায় ধর্ম-দর্শন স্থান পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন দার্শনচিন্তায় ধর্ম বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে তাঁদের দর্শনকে ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দর্শন হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ইউরোপীয় দর্শনের আত্মগত ভাববাদ, বস্তুগত ভাববাদ এবং অবভাসিক ভাববাদ দিয়ে প্রভাবিত ছিলেন না। ইসলাম ধর্ম দিয়ে তিনি প্রভাবিত ছিলেন এবং ইসলাম ধর্মের উপর আস্থা রেখে দর্শনচিন্তা করেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এবং মোহম্মদ বরকতুল্লাহর ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদও ইউরোপীয় কিংবা ভারতীয় ভাববাদী দর্শন দিয়ে প্রভাবিত নয়। ইসলাম ধর্মের আলোকেই তাঁরা ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ দর্শনের চর্চা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদী দার্শনিকেরা স্বজ্ঞার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় সত্তার উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম দার্শনিকেরা স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর ধর্মকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলিম ভাববাদী দার্শনিকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে স্বজ্ঞা আর ইউরোপীয় দার্শনিকদের স্বজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য প্রবল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল হাশিম স্বজ্ঞাবাদী হলেও তাঁরা বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু চূড়ান্ত জ্ঞানের জন্য স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করেছেন। খানবাহাদুর

আহ্ছানউল্লা পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলনের কথা বলেছেন। স্বজ্ঞা ছাড়া পরমাত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। স্বজ্ঞার সাহায্যে পরমাত্মার জ্ঞানও হয়। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণ করে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয়। হেনরি বার্গসোঁ স্বজ্ঞাকে অনুভূতির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল হাশিম স্বজ্ঞাকে প্রায়োগিক অর্থে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছন। এমনকি অধিবিদ্যার বিয়বস্তুকে তাঁরা সমর্থন করেছেন প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলো যেমন নীতিচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা, মানবতাবাদ ছিল তাঁদের প্রায়োগিক চিন্তারই ফসল।

আরজ আলী মাতুব্বর এবং আহমদ শরীফ ধর্মনিরপেক্ষ বাস্তববাদী দার্শনিক। আরজ আলী মাতুব্বর এবং আহমদ শরীফ জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে অভিজ্ঞতাবাদ গ্রহণ করেছেন প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম এই দুই দার্শনিক মনে করেন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ জ্ঞান হয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে। ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) দেকার্তের অন্তর-ধারণা খন্ডন করে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। জর্জ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) লকের অভিমত অনুসরণ করে বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করেছেন। ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) লক এবং বার্কলির অভিজ্ঞতাবাদ খন্ডন করে বলেন জ্ঞান হয় ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণা থেকে। হিউম শেষদিকে সংশয়বাদী ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্য দার্শনিকের মত সমালোচনা করে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা দেখা যায় না। সবাই নিজস্বভাবে প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে অভিজ্ঞতাবাদ গ্রহণ করেছেন। ফলে একের অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গে অন্যের অভিজ্ঞতাবাদের পার্থক্য খুব সামান্য। লক, বার্কলি, হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আরজ আলী মাতুব্বর এবং আহমদ শরীফের অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্যই। আজর আলী মাতুব্বর এবং আহমদ শরীফ অভিজ্ঞতাবাদ গ্রহণ করেছেন সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধতা এবং অজ্ঞতা দূর করার জন্য। রেনেসাঁ উত্তর ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় না। তাঁরা জ্ঞানের উৎস, বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালি মুসলিম দাশনিকরা জ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সাইদুর রহমান ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয় করেছেন। তাঁর জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্য, মূল্যবিদ্যা আলোচনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তিনি যুক্তি বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে কল্যাণদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদকে সম্পণূরূপে বর্জন করেন নি। আবার ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণও করতে পারেন নি। তিনি ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদ সমন্বয় করে সমন্বয়বাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর কল্যাণ দর্শনের মূল ভিত্তিও

হলো সমন্বয়বাদ। সাইদুর রহমান সংশয়ের সাহায্যে সত্যের পথে অগ্রসর হয়েছেন। সত্য ছাড়া সমাজের কল্যাণ সম্ভব নয়। তাঁর দর্শনের নাম কল্যাণদর্শন।

বাঙালির দর্শনে প্রায়োগিক দিক অধিক গুরুত্ব পাওয়ায় বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই কখনো ধর্মকে নির্ভর করেছে আবার কখনো ধর্মকে বর্জন করেছে অথবা ধর্ম ও বাস্তবের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বশীল বিশিষ্ট সাত জন বাঙালি মুসলিম দার্শনিকের দর্শনচিন্তায় আমরা ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাস্তববাদ এবং সমন্বয়বাদ দেখেছি। কিন্তু তাদের সবার লক্ষ্যই ছিল নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে মানবের কল্যাণ সাধন করা।

বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালি মুসলমানের দর্শনচিন্তা আলোচনা করে দেখা যায় ধর্মকেন্দ্রিক ভাববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদ এবং সমন্বয়ী দর্শন একই সঙ্গে চলেছে। সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের সুখের জন্য বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলিম বাস্তববাদী দার্শনিকেরা অধিবিদ্যক বিষয়গুলোকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। মূল্যবিদ্যার বিষয়গুলোকে তাঁরা প্রায়োগিক অর্থে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচনা শেষে বলা যায় বাঙালির দর্শন মানেই প্রায়োগিক দর্শন। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের দর্শনও প্রায়োগিক।

প্রাথমিক উৎস : গ্রন্থ বাংলা

১. আরজ আলী মাতুব্বর, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র - ১*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০

২. -------------, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র - ২*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৫

৩. -------------, *আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র - ৩*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৭

৪. আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী (অনূদিত) নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭

৫. -------------, *ইসলামের মর্মকথা*, মুসলিম চৌধুরী (অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১

৬. -------------, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা*, এ, টি, এম, আবদুল মতীন (সম্পাদিত), নূরুল ইসলাম (অনূদিত), ইসলামিক একাডেমি, ঢাকা, ১৯৫৯

৭. আহমদ শরীফ, *বিচিত চিন্তা*, চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০১

৮. -------------, *সময়-সমাজ-মানুষ*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৫

৯. -------------, *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯২

১০. -------------, *দর্শনচিন্তা*, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০২

১১. -------------, *বাউল ও সুফি সাহিত্য*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০

১২. -------------, *বাউলতত্ত্ব*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০০৩,

১৩. -------------, *মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১

১৪. -------------, *বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭

১৫. -------------, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

১৬. -------------, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

১৭. -------------, *বিশ শতকে বাঙালী, বিহগদৃষ্টিতে তাদের রূপ-স্বরূপ*, ঈক্ষণ, ঢাকা, ১৯৯৮

১৮. -------------, *অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৪

১৯. -------------, *বিশ্বাসবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১২

২০. -------------, *ডায়েরী, ভাব-বুদ্বুদ*, (নেহাল করিম, মোহাম্মদ আজম, খোরশেদ আলম সম্পাদিত), জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৯

২১. -------------, *সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ*, (সংকলক, ড. নেহাল করিম), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

২২. -------------, *শিক্ষা সংস্কৃতি প্রগতি*, (সংকলক, ড. নেহাল করিম), বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

২৩. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *সৃষ্টিতত্ত্ব*, আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০৫

২৪. -------------, *ছুফী*, আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০৮

২৫. -------------, *আমার জীবন-ধারা*, আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০৩

২৬. -------------, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত) জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৮

২৭. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, *মানুষের ধর্ম্ম*, মো. আমানুল্লাহ এন্ড ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৫৯

২৮. -------------, *পারস্য প্রতিভা*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা, ২০১০

২৯. -------------, *রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

৩০. -------------, *রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, (সম্পাদিত) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

৩১. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০

৩২. -------------, *অতীত জীবনের স্মৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭

৩৩. -------------, *ধর্ম ও দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

৩৪. -------------, *ভাববাদ যুগে যুগে*, হিমি বুকস এণ্ড বুকস, ঢাকা, ২০০৪

৩৫. -------------, *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০

৩৬. -------------, *ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খুলনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০

৩৭. -------------, *সভাপতির ভাষণ*, কার্য বিবরণী, সপ্তম সাধারণ সম্মেলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬

৩৮. সাইদুর রহমান, *কল্যাণদর্শন*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৩৯৪

৩৯. -------------, *শতাব্দীর স্মৃতি*, যায়যায়দিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫

প্রাথমিক উৎস : গ্রন্থ ইংরেজি

৪০. Syedur Rahaman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Mullick Brothers, 1970, Dacca.

৪১. Abul Hashim, *The Creed of Islam or the Revolutionary Character of Kalima*, Umar Brothers, Dhaka, 1950.

৪২. -------------, *As I See it*, Islamic Academy, Dhaka, 1965

৪৩. -------------, *In Retrospection*, Distributor, Mowla Brothers, Dhaka,1974

সহায়ক গ্রন্থ : বাংলা

১. অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১

২. অজয় রায়, *বাংলা ও বাঙালী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭

৩. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

৪. অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭

৫. অনুপম সেন, *বাংলাদেশ ও বাঙালি রেনেসাঁস স্বাধীনতা-চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান*, অবসর, ঢাকা, ২০০২, পুনর্মুদ্রণ ২০১১

৬. অনুপম হীরা মণ্ডল, *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০

৭. অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস*, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪

৮. অন্নপূর্ণা বিশ্বাস, *অক্ষয়কুমার দত্ত : সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তা*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৮

৯. আকবর আলি খান, *পরার্থপরতার অর্থনীতি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৩

১০. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১২

১১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-সমীক্ষা*, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. *উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯

১৩. আবদুল মতীন, *দর্শন সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

১৪. আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মণীষা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬

১৫. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

১৬. আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতির মণিকোঠায়*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪

১৭. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮

১৮. আইয়ুব হোসেন, *আরজ আলী মাতুব্বর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

১৯. আলোক ভট্টাচার্য, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০

২০. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *খানবাহাদুর আহছানউল্লা শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২

২১. আবুল ফজল, *সমকালীন চিন্তা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭০

২২. -------------, *মানবতন্ত্র*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭২

২৩. আবুল কাশেম ফজলুল হক, *উনিশ শতকের মধ্য শ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য*, খান ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৭৯

২৪. -------------, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা*, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭

২৫. আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

২৬. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫

২৭. -------------, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪

২৮. আ. ন. ম বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী-সাধক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৭৭

২৯. ঋষি দাস, *রাজা রামমোহন*, অশোক পুস্তকালয়, কলকাতা, বাংলা, ১৩৯৯

৩০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৩৬৪

৩১. এম আবুল হামিদ, *দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলন*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১১

৩২. এস. ওয়াজেদ আলি, *ভবিষ্যতের বাঙালি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

৩৩. এন এইচ এম আবু বকর, *বাংলাদেশে সমকালীন দর্শন চর্চার ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৫

৩৪. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩

৩৫. -------------, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

৩৬. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৩

৩৭. কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা*, মাওলা ব্রদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫

৩৮. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯

৩৯. ক্ষিতিমোহন সেন, *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৫৬, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০৭

৪০. খন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪

৪১. খন্দকার মুজাম্মিল হক, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭

৪২. গালিব আহসান খান, *দর্শনের প্রয়োজনীয়তা : একবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫

৪৩. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ : জীবন ও সাহিত্য*, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৮৮

৪৪. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা, ২০০৮

৪৫. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার*, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪

৪৬. চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, *পাশ্চাত্য দর্শনে ঈক্ষণবাদ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯

৪৭. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *তন্ত্রকথা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬২

৪৮. জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ অর্থনীতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

৪৯. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক (সম্পাদিত), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬২

৫০. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা, ১৪১৬

৫১. দিলীপকুমার বড়ুয়া ও সুমনকান্তি বড়ুয়া, *কীর্তিমান বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮

৫২. দীনেশচন্দ্র সেন, *হিন্দু সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০

৫৩. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ (প্রথম খণ্ড)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

৫৪. -------------, *বৃহৎ বঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

৫৫. -------------, *প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

৫৬. দীপংকর চক্রবর্তী, *বাংলার রেনেসাঁস এবং রামমোহন*, পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৯০

৫৭. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও মতামত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১২৮৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮১

৫৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০২

৫৯. নীরদবরণ চক্রবর্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস : প্লেটো, অ্যারিস্টটল*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৮

৬০. নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৭

৬১. প্রদীপ রায়, *রামমোহন রায়, এক ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা*, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৮১

৬২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য*, বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৯৮৬

৬৩. প্রমথনাথ তর্কভূষণ, *বাংলার বৈষ্ণব দর্শন*, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলকাতা, বাংলা ১৩৭০

৬৪. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায় পরিচয়*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৬

৬৫. ফুলরেনু গুহ, *বাঙালির সমাজচিন্তা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩

৬৬. বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০

৬৭. বদরুল আলম খান, *বাংলাদেশের দর্শন সংকট (একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

৬৮. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০*, বুকক্লাব, ঢাকা, ২০০০

৬৯. -------------, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, বীক্ষণ, কলকাতা, কার্তিক ১৩৬৪

৭০. -------------, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, বিক্ষণ, কলকাতা, ১৩৭১

৭১. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (প্রাচীন যুগ)*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১

৭২. মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

৭৩. -------------,*বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

৭৪. -------------, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

৭৫. মতিউর রহমান, *বাঙলার দার্শনিক মনীষা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

৭৬. -------------, *বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০

৭৭. -------------, *বাঙালির দর্শন : ব্রহ্ম ভাবধারা প্রথম খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২

৭৮. -------------, *বাঙালির দর্শন : ব্রহ্ম ভাবধারা দ্বিতীয় খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২

৭৯. -------------, *বাঙালির দর্শন : ব্রহ্ম ভাবধারা তৃতীয় খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২

৮০. -------------, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

৮১. মদনমোহন গরাই, *রামমোহন : সময় জীবন সাধনা*, দাসগুপ্ত এন্ড কো., কলকাতা, ১৯৬৬

৮২. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০

৮৩. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, এম. আবদুল্লাহ এন্ড সন্স, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৭

৮৪. মোহাম্মদ মাহফুজ-উল্লাহ, *বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০

৮৫. মোহিতলাল মজুমদার, *বাংলার নবযুগ*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৫

৮৬. *মোতাহের হোসেন চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ*, আবুল কাশেম ফজলুল হক (সংকলিত), বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯০

৮৭. যতীন সরকার, *বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

৮৮. রহমান হাবিব, *রাজা রামমোহন রায় : দর্শন ও ধর্মচিন্তা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০

৮৯. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩

৯০. রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮২

৯১. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭

৯২. রমাপ্রসাদ দাস, ও শিবপদ চক্রবর্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮১

৯৩. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০২

৯৪. রফিকুল ইসলাম, *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ জীবন ও দর্শন*, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, ২০০৫

৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিতান, কলকাতা, ১৪০০

৯৬. রাখালচন্দ্র নাথ, *উনিশ শতক : ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়*, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৮

৯৭. রাশিদা আখতার খানম, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনমুদ্রণ ২০১১

৯৮. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জিজ্ঞাসা, অ্যাডর্ন, পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১

৯৯. শরদিন্দু ভট্টাচার্য, *বাউল বৈষ্ণব সুফী*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

১০০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *শ্রী রাধার ক্রমবিকাশ দর্শন ও সাহিত্যে*, এ মুখার্জি এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ ২০০৬.

১০১. এম শফিকুল আলম, *বাংলাদেশ দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নকশা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০০৭

১০২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

১০৩. শাহানারা হোসেন, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২

১০৪. সত্যনারায়ন দাশ, *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৪

১০৫. সত্যেন সেন, ব্রিটিশ বিরোধী *স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা, ২০০৭

১০৬. সালাহউদ্দীন,আহমদ, *বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১

১০৭. সাইয়েদ আবদুল হাই, *ভারতীয় দর্শন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৭

১০৮. সা'দ উল্লাহ, *ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক*, সময় প্রকাশন, ঢাকা ২০০০

১০৯. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার বাউল : কাব্য ও দর্শন*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৭১

১১০. সেবক রামচন্দ্র, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত*, সেবকমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৪

১১১. সোলায়মান আলী সরকার, *বাংলার বাউল দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

১১২. সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, *বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৯৯৬

১১৩. -------------, *বাংলাদেশ ও ইসলাম*, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

১১৪. সৈয়দ আজিজুল হক, *মন ও মনন*, ধ্রুবপদ, ঢাকা,২০১১

১১৫. সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবজাগরণ*,এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৭

১১৬. সুকুমার সেন, *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪০৩

১১৭. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, ইস্টান পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৩

১১৮. সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০১

১১৯. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (প্রথম খণ্ড)*, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০

১২০. -------------, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (দ্বিতীয় খণ্ড)*, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১

১২১. স্বরোচিষ সরকার, *বাংলা সাহিত্যে সংস্কার চেতনা মুসলমান সমাজ (১৮৬৯- ১৯৪৭)*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

১২২. হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭

১২৩. হাসান আজিজুল হক, *কথা লেখা কথা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩

১২৪. ------------- *অতলের আঁধি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮

১২৫. হাসনাত আবদুল হাই, *একজন আরজ আলী*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৯

সম্পাদিত গ্রন্থ : বাংলা

১. অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯২

২. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *সওয়াল সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৬

৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *আবুল হুসেনের রচনাবলী*, শিখা প্রকাশনী, ২০০১

৪. আবুল কাশেম ফজলুল হক (সম্পাদিত), *আবুল হুসেন রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

৫. *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ*, আবুল কাশেম ফজলুল হক (সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি), মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার (সম্পাদিত), ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১

৬. আইয়ুব হোসেন (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর : শতবর্ষে ফিরে দেখা*, সময় প্রকাশন , ঢাকা , ২০০২

৭. আ. ফ. ম উবায়দুর রহমান (সম্পাদিত), *উপমহাদেশীয় দর্শন : বিংশ শতকীয় প্রয়াস*, পরিবেশক শ্রাবণ, ঢাকা, ২০০৩

৮. ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত), *বাঙালীর দর্শনচিন্তা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২

৯. -------------(সম্পাদিত), *বাঙালীর চিন্তাধারা : আধুনিক যুগ*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০

১০. গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), *খানবাহাদুর আহছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০২

১১. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), *পূর্বমেঘ : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

১২. নরহরি কবিরাজ (সম্পাদিত), *উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক*, কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৪

১৩. নিমাইসাধন বসু (সম্পাদিত), *শাশ্বত বিবেকানন্দ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯২

১৪. নুরুল ইসলাম মানিক (সংকলক ও সম্পাদিত), *ইসলামী দর্শনের রূপরেখা*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২

১৫. প্রদীপ রায় (সম্পাদিত), *গোবিন্দচন্দ্র দেব : অগ্রন্থিত ও প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

১৬. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *বিবিধ প্রবন্ধ* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৬

১৭. মইনুল হাসান (সম্পাদিত), *মুসলিম সমাজ এবং এই সময় (প্রথম খণ্ড)*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২

১৮. মইনুল হাসান (সম্পাদিত), *মুসলিম সমাজ এবং এই সময় (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩

১৯. এম. মতিউর রহমান (সম্পাদিত ও সংকলিত), *শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-ও দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

২০. মোজাফফর হোসেন (সম্পাদিত),*আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক গ্রন্থ*, বিজ্ঞানচেতনা পরিষদ, ঢাকা, ২০০০

২১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), *শিখা সমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

২২. রায়হান রাইন (সম্পাদিত), *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, সংবেদ, ঢাকা, ২০০৯

২৩. রুদ্র সাইফুল (সম্পাদিত), *আরজ আলী মাতুব্বর পাঠ ও মূল্যায়ন*, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০১২

২৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মুসলিম (সম্পাদিত) *বাংলা সময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজ-চিন্তা (১৯০১-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

২৫. শাহেদ আলী (সম্পাদিত), দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা কমিটি, ঢাকা, ১৯৯৭

২৬. শিবনারায়ণ রায় (সম্পাদিত), *বাংলার রেনেসাঁস*, রেনেসাঁস, কলকাতা, ২০০২

২৭. শরীফ হারুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান (প্রথম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

২৮. -------------, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান (দ্বিতীয় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

২৯. -------------(সম্পাদিত), *বাংলাদেশে দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান (তৃতীয় খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

৩০. সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পাদিত), *আবুল হাশিম : তাঁর জীবন ও সময়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

৩১. সত্যব্রত রায় চৌধুরী ও আশিস কুমার বসু (সম্পাদিত), *জাতীয়তাবাদ ও বাঙালী চিন্তাবিদ,* সুজন পালিকেশনস্, কলকাতা, ১৯৯৭

৩২. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), *গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী* (৩য় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৯,

অনূদিত গ্রন্থ : বাংলা

১. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী,* পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

২. উইল ডুরান্ট, *দর্শনের ইতিকাহিনী*, আবুল ফজল (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮০

৩. এ. ডি উজলী, *জ্ঞানতত্ত্ব,* মো. আবদুর রশিদ (অনূদিত), বাংলা একাডেমি , ঢাকা , ১৯৭৭

৪. জর্জ বার্কলি, *মানুষের জ্ঞানসূত্র,* ডক্টর আবদুল মতীন (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪

৫. জন স্টুয়ার্ট মিল, *উপযোগবাদ,* হাসনা বেগম (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

৬. বার্ট্রান্ড রাসেল, *দর্শনের রূপরেখা,* আবদুল মতিন (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০

৭. -------------*পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-১,* প্রদীপ রায় (অনূদিত), অবসর, ঢাকা, ২০০০

৮. -------------*পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-২,* প্রদীপ রায় (অনূদিত),অবসর, ঢাকা, ২০০৮

৯. -------------*পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-৩,* প্রদীপ রায় (অনূদিত), অবসর, ঢাকা, ২০০৮

১০. এস, এম. জাফর, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষাব্যবস্থ [১০০০-১৮০০]* রশীদ আলফারুকী (অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

১১. রেনে দেকার্ত, *জ্ঞানের পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা,* ডা. পিনাকী ভট্টাচার্য (অনূদিত), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৪

১২. লুইস হেনরি মর্গান, *আদিম সমাজ*, বুলবন ওসমান (অনূদিত), অবসর, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৮

১৩. এ. এফ সালাহউদ্দীন আহমদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন ১৮১৮-১৮৩৫,* সালাহ্উদ্দীন আহমদ, বেলাল চৌধুরী, সুব্রত বড়ুয়া (অনূদিত), অইসিবিএস, ঢাকা, ২০০০

১৪. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাজা রামমোহন রায়,* সোমেন্দ্রনাথ বসু (অনূদিত), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৯

গ্রন্থ : ইংরেজি

1. Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal, Vol.1*, Pakisthan Historical Society, Karachi,1963.
2. A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal*, E. J. Brill, Leiden, Netherlands, 1965
3. Amartya Sen, *The Argumentative India*, penguin books, 2005
4. Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, Sterling publishers Ptv Ltd, New Delhi, 1993
5. Bertrand Russell, *A History of Western Philosophy*, Routled, London, First Published 1946, Reprinted 1995.
6. Basant Kumar Lal, *Contemporary Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass, Delhi, First Edition : Patna, Reprint : Delhi, 1995.
7. Delawarr Hosaen Ahamed Meerza, *Muslim Modernism in Bengal, Selected Writings of Delawarr Hosaen Ahamed Meerza (1840-1913), Vol. 1*. Edited by Sultan Jahan Salik, Centre for Social Studies, Dhaka University, 1980.
8. D. W. Hamlyn, *Metaphysics*, Cambridge University Press, London, 1984.
9. Errol E. Harris, *Fundamentals of Philosophy (A Study of Classical Texts)*, Holt, Rinehart and Winston. Inc. New York, Chicago, Sun Francisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto. 1968.
10. Richard M. Eaton, *The rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760*, Oxford University Press, 1997, Fifth impression 2006.
11. Eugene A. Myers, *Arabic Thought and the western world*, in the Golden Age of Islam, Frederick Ungar Publishing co. New York, 1964.
12. Frank Thilly, *A History of Philosophy*, Revised by, Ledger Wood, Central Book Depot, Allahabad, 1956.
13. W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, Barnalipi Mudrayan, Dhaka, Bangladesh First Edition 1975
14. Momtazur Rahaman Tarafdar, *Husain Shahi Bangal*, University of Dhaka, Dhaka, First Published 1965, Second Revised Edition, 1999

15. Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslim (1871-1906) A Quest for Identity*, Oxford University Press, Oxford, New York.1981.
16. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Volume 1 & 2 Oxford University Press, Ninth impression 2002.
17. M. Hiriyanna, *The Essentials of Indian Philosophy*, Motilal Banars Idass Publishers Private Limited, Delhi, First Indian Edition, 1995, Reprint, 2000.
18. M. M. Sharif, Edited, *A History of Muslim Philosophy Vol. 2*, Low price publications, Delhi, India. First Published: 1961, Reprinted in LPP 1999.
19. Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufi-ism in Bengal*, Asiatic Society of Bengladesh, 1975.
20. Madhava Acharaya, *Tha Sarva-Darsana-Samgraha or Review of the different Systems of Hindu Philosophy*, E. B Cowell and A. E Gough (Translated), Trubner & co, Ludgate Hill, London, 1882,
21. G. Watts Cunningham, *Problems of Philosophy*, Discovery Publishing house, New Delhi, 1993.
22. Richard Kraut, Edited, *The Cambridge Companion to Plato*, Cambridge University Press, First published, 1992. Reprinted -1996
23. Richard Falckenberg, *History of Modern Philosophy*, Khosla Publishing House, New Delhi, 1989.
24. Surendranath Dasgupta, *A History Indian Philosophy*, *Volume-1*, Motilal Banarsidass, India, First edition : Cambridge, 1922. Reprint: Delhi, 1992.
25. Sarasvati, Chennkesavan, *Concept of Mind in Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass, Delhi, Varanasi, Patna, First Edition 1960, Second Revised Edition 1980.
26. Satis Chandra Vidyabhusana, *A History of Indian Logic*, Calcutta, 1970
27. V. S Naravane, *Modern Indian Thought*, Asian Publishing House, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Lucknow, Bangalore, London, New York. First Edition : 1964, Reprinted : 1967.
28. V. Brodov, *Indian Philosophy in Modern Times*, Progress Publishers, Moscow, 1984, Second printing 1988.

29. W T Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, ST Martin's Press, New York,1967.
30. Willem Van Schendel, *A History of Bangladesh*, Cambridge University Press, 2009.
31. William Lillie, *An Introduction to Ethics*, University Paperbacks, Methuen, London, First published 1948, Reprinted 1957

প্রবন্ধ : বাংলা

১. আহমদ শরীফ, "কোম্পানী ও ভিক্টোরিয়া শাসনে বাঙালী", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, নবম সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৮৬ জুন ১৯৭৯
২. -------------, "বাংলায়-তত্ত্ব সাহিত্য", *দর্শন*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৯
৩. আমিনুল ইসলাম, "বাংলাদেশে দর্শনচর্চা", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, গোল্ডেন জুবিলি সংখ্যা, বিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০২
৪. -------------, "বাঙালীর দর্শন", *কার্য বিবরণী*, সপ্তম সাধারণ সম্মেলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬
৫. -------------, "সৈয়দ আহমদ খানের দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, অষ্টাদশ সংখ্যা, পৌষ ১৩৯০ ডিসেম্বর ১৯৮৩
৬. আবদুল ওয়াহাব, "স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা ও মানবপ্রেম", *নিবন্ধমালা*, চতুর্দশ খণ্ড, ২০০৭, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭. আব্দুল করিম, "বাংলাদেশে মুসমান আগমনের প্রাথমিক যুগ", *সাহিত্য পত্রিকা*, সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭০
৮. আবেদা আখতার বানু, "বৌদ্ধ দর্শন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *জীবনদর্শন*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মার্চ ২০০৬, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
৯. এ. টি. এম ফখরুদ্দীন, "খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)-এর শিক্ষা-দর্শন," *দর্শন ও প্রগতি*, একবিংশ বর্ষ : প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০০
১০. এ. এস. এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, "উপযোগবাদ বিতর্ক ঃ সমকালীন নীতিদর্শনের আলোকে", *কপুলা*, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, জুন, ২০০১

১১. ওয়াকিল আহমদ, “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি”, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৩৮৭ ডিসেম্বর ১৯৮০

১২. -------------, “উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁ : কতিপয় দিক”, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, সপ্তদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০৬,

১৩. কাজী নূরুল ইসলাম, “প্রবাদ দর্শন : কয়েকটি বাংলা প্রবাদের দার্শনিক তাৎপর্য”, *জীবনদর্শন*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৬, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, “হাসন রেজার সর্বেশ্বরবাদ”, *দর্শন*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৯

১৫. -------------, “বাংলাদেশে দর্শন”, *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির বিশ বছর স্মারক সংকলন*, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ১৯৯২

১৬. -------------, “লালসশাহ ও আত্মদর্শন”, *জীবনদর্শন*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৬, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. প্রদীপ কুমার রায়, “সাইদুর রহমান : জীবন ও দর্শন”, *বাংলাদেশ দর্শন সমিতির বিশ বছর স্মারক সংকলন*, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ১৯৯২

১৮. ফেরদৌসী বেগম, “যুক্তিবাদী আরজ আলী মাতুব্বর”, *জীবনদর্শন*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৬, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. বেলু রানী বড়ুয়া, “বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি : অতীত ঐতিহ্য” , *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খণ্ড ৪ সংখ্যা ৬ জুলাই ২০১০- জুন ২০১১

২০. মমতাজুর রহমান তরফদার, “বাংলার ধর্মজীবন”, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, প্রধান সম্পাদক, আনিসুজ্জামন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭

২১. -------------,“বাংলার বর্ণ-ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো”, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, অষ্টাদশ সংখ্যা, পৌষ ১৩৯০ ডিসেম্বর ১৯৮৩

২২. মতিউর রহমান, “গীতায় ঈশ্বরতত্ত্ব”, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, দ্বাত্রিংশ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৫ অক্টোবর ১৯৮৮

২৩. মালবিকা বিশ্বাস, “বাংলার নব্যন্যায় ও বাসুদেব সার্বভৌম”, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১২

২৪. মালবিকা বিশ্বাস, “ন্যায় ও নব্যন্যায় : একটি পর্যালোচনা”, দর্শন ও প্রগতি, ২৭শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, ২০১০

২৫. বিচারপতি মোস্তাফা কামাল, "প্রধান অতিথির ভাষণ", *নবম সাধারণ সম্মেলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি*, ১০-১১ ডিসেম্বর ১৯৯৪

২৬. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, "বাঙালীর দার্শনিক আদর্শ : সামাজিক মানবতাবাদ," *দেব স্মারক বক্তৃতা ১৯৯১-১৯৯২*, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯২

২৭. রফিকুল ইসলাম, "বাংলাদেশে দর্শন চর্চা : একুশ শতকের দার্শনিক ভাবনা", *জীবনদর্শন*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৬, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

২৮. -------------,"বাংলাদেশে দর্শন চর্চা : প্রসঙ্গ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ," *কপুলা*, সংখ্যা ১৮ দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১

২৯. মুহাম্মদ শাহজাহান, "বাংলাদেশে দর্শন চর্চা", *কার্য বিবরণী*, সপ্তম সাধারণ সম্মেলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬

৩০. সালাহউদ্দীন আহমদ, "আমাদের রেনেসাঁ ভাবনা", *অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লা স্মারক বক্তৃতা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০০১

৩১. সোলায়মান আলী সরকার, "বাংলার নব্য বুদ্ধিবাদ", *কার্য বিবরণী*, সপ্তম সাধারণ সম্মেলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬

৩২. শিকদার মুহাম্মদ কিব্রিয়াহ, "অধ্যক্ষ আজরফের দর্শন চিন্তার প্রায়োগিক মূল্য", *আল-ইসলাহ্* (বাংলাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্য পত্রিকা), ৭৪ বর্ষ, সপ্তম-দশম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট

৩৩. হোসনে আরা কামাল, "বেগম রোকেয়া ও আরজ আলী মাতুব্বরের মত ও পথ : একটি পর্যালোচনা", *দর্শন ও প্রগতি*, পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৮, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অভিধান/ কোষগ্রন্থ / পরিভাষা ও অন্যান্য গ্রন্থ

1. Zillur Rahman Siddiqui (Ed), *Bangla Academy English-Bengali Dictonary*, Bangla Academy, Dhaka. 32th Reprint 2009

২. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Eight edition, Oxford university press.

৩. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

৪. রাজশেখর বসু (সংকলিত), *চলন্তিকা, আধুনিক বঙ্গভাষা অভিধান*,
এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, নতুন মুদ্রণ ১৪০৫

৫. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০২

৬. সাইয়েদ আবদুল হাই, *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮

৭. রাজশেখর বসু (সারানুবাদ), *বাল্মীকি রামায়ণ*, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা,
দশম মুদ্রণ, ১৩৯৬

৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত), *মহাভারত* (প্রথম খণ্ড), রাজ সংস্করণ, তুলি-কলম, কলকাতা, ২০০১

৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত), *মহাভারত* (দ্বিতীয় খণ্ড), রাজ সংস্করণ, তুলি-কলম, কলকাতা, ২০০১

১০. Vatsyayana, *Kama Sutra* (The illustred Kam Sutrs, Ananga-ranga. Perfumed garden), The Sir Richard Burton and F.F Arbuthnot translations edited and introduced by Charles Fowkes, Hamlyn, England, Third impression 1989.